প্রথম গল্প সংকলন



প্রথম গল্প সংকলন

তাপস গুপ্ত

শিল্পনগরী প্রকাশনী
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

Prathom Galpo Songkolon (Short Stories)
By Tapos Gupto
তাপস গুপ্ত প্রণীত
প্রথম গল্প সংকলন (ছোট গল্প)
(রচনাকাল: ১৯৮০-২০১০)

ISBN 978-93-84383-28-2
প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৫

প্রচ্ছদ : সোনামন
বর্ণ সংস্থাপন: অংশুমান রায়
লেখকের সঙ্গে কথা: ৯৪৭৪৯৮৬৬৭৪
প্রাপ্তিস্থান: বুকহাউস, বহরমপুর (প:ব)

শিল্পনগরী প্রকাশনীর পক্ষে কল্যাণকুমার দাস কর্তৃক নবপল্লী, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত এবং থেকে মুদ্রিত।

মনে পড়ে

আগুন
রৌরব
শুভ চট্টোপাধ্যায়

এবং
দাউদাউ
রৌরবিয়ানদের

উপক্রমণিকা

এত বৈচিত্র্য, এত মানুষ, এত সমাজ-নির্ণায়ক পরিস্থিতি, এত সাহিত্যিক কল্পনার আঙ্গিক-সচেতন দ্রাব্যতা, বিচিত্র সব প্রাণের উদ্ভাস, বিভিন্ন এলাকা ও পেশার নর-নারীর কথকতা ঠিক এরকমভাবে খুব কম সংখ্যক সাহিত্যিকের কলমেই উঠে এসেছে। এই বই সেই বিরল গল্পের খনি বিশেষ।

গল্পকার তাপস গুপ্ত আমার পরম বন্ধুজন। তাপস গুপ্ত কলমনাম। আসল নাম সাধন দাস। বহরমপুরে 'রৌরব' (১৯৭৫-২০০৪) পত্রিকার পরিবারের অন্যতম প্রধান বন্ধু, হিতৈষী এবং লেখক। 'রৌরব' প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৭৭ সালে। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে ১৯৭৫ লেখা হল কেন। 'রৌরব বারো বছর' নামক নির্বাচিত সংকলনে 'রৌরব'-এর পূর্বসূরি বা সহসূরি 'স্বয়ম্বর' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাপত্রও ধরা হয়েছিল। সেভাবেই ১৯৭৫। এখন তাপসের গল্পগ্রন্থটি নিয়ে কিছু কথা আমাকে বলতে হবে।

এই গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৮০ থেকে ২০১০। তিরিশ বছর। কম সময় নয়। গল্পগুলিতে নানান সময়, নানান মানুষ, নানান বিষয়ের ঘোরাফেরা আছে। সবশেষে দুটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ রয়েছে। প্রথমটি আলবেনিয়ান গল্পকার নউম প্রিফতির লেখা গল্প 'মৃত্যু থেকে ফিরে'। দ্বিতীয়টির গল্পকারও আলবেনিয়ান। ড্রিত্রিয়া এ্যাগাল্লি-র গল্পটির নাম 'এ্যাপাসোনেটা'। তাপস অনুবাদ করেছেন ইংরেজি থেকে। এত প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেছেন, পড়তে গিয়ে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না, মনে হয় বাংলাভাষায় লেখা অরিজিনাল কোনো লেখা পড়ছি। অবশ্য গল্প দুটি পড়তে গিয়ে আলবেনিয়ার সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবেশ সবটাই এত সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে যে বোঝা যায় অনুবাদ দুটি সর্বদিক দিয়েই সার্থক। মূল ভাষা থেকে 'সরাসরি' অনূদিত না হয়েও সার্থক।

তাপসের ৩২টি গল্পের প্রতিটি গল্পই সুবিন্যস্ত, চরিত্রদের নির্দিষ্ট মাপে গড়ে তোলা ছাড়াও পৃথক পৃথক পরিস্থিতি ও পরিবেশের খুঁটিনাটি বিবরণও রয়েছে। খুঁটিনাটি বিবরণ মানে তা যে বিস্তারিত হবে তা নয়, খুঁটিনাটি মানে এখানে অল্পকথার মাধ্যমে যথাযথ চিত্রণ। গল্পগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, জীবন ও সমাজের নানান দিক ও পরিসর তিনি খুব ভালোভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছেন যখনই সুযোগ মিলেছে তখনই। শুধুই জীবনকে তুলে ধরা, তা নিশ্চয়ই নয়, গল্পকার হিসেবে শিল্পবোধ ও কলানৈপুণ্য প্রতিটি গল্পের চমৎকার বাঁধুনির মধ্যে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

'কালো বেড়াল' গল্পে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ এমন একজন, যে মৃত্যুদূতের হাতে তুলে দিচ্ছে পূর্বপুরুষের হাতের তীক্ষ্ণ প্রাচীন তরবারি। আর এর পাশাপাশি, মাঝেমাঝেই, দেখা দিয়ে যাচ্ছে মিশকালো একটা বেড়াল, যার একচোখ কানা, অন্যচোখের পলক পড়ে না, চোখের মণিতে কলাপাতা রঙের আগুন জ্বলছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টানটান উত্তেজনায় ছড়িয়ে গিয়েছে মৃত্যুর অদৃষ্টপূর্ব আবহ আর ভিন্ন ধরনের এক অভিজ্ঞতা।

'পাথরের ভ্রমর' গল্পে বিখ্যাত ভাস্কর মণিপাল তৈরি করেছেন মধু-র মূর্তি। মধুবালা দেবী এই শহরে আজ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, তাঁর মূর্তি উদ্বোধন করবেন ভারতবিখ্যাত সেতারবাদক প্রফেসর ভ্রমরলাল, প্রেমিকাকে প্রতিষ্ঠা দিতে এসেছেন প্রেমিক বি. লাল। সারাটা গল্প জুড়ে শুধু যে সংগীতের আবহ, তা নয়, সেটা তো আছেই, সেইসঙ্গে আছে মানুষের মনের বিচিত্র প্রেমের উদ্ঘাটন। নিধা, মাপাধা, মাগা... মাগা... সিনে স্ক্রিনে ফুটে উঠল—নতুন রাত্রির আকাশ। তারায় তারাময়। ম্লান হয়ে এল স্টেজের আলো। খাম্বাজের রাত্রি, দ্বিতীয় প্রহর।

'ভ্যালেনটাইনস ডে' একটি অদ্ভুত প্রেমের গল্প। ডাক্তার চৌধুরী তাঁর মুগ্ধ ফেননিভ সারমেয়টির গোলাপের চেয়ে নরম শরীরে হাত বুলিয়ে বললেন—প্রেমের প্রধান উপাদান

যদি পরস্পরের প্রতি আনুগত্য হয়, তবে এই প্রাণীটি তার প্রকৃষ্ট পরাকাষ্ঠা। ... বৃদ্ধ এই রাজ্যের অন্যতম সেরা, নামী এবং দামি স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। এই শহরে নতুন কিছু দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। শহর তাঁকে বিশেষ সম্মান ও সংবর্ধনা দিয়েছে। বৃদ্ধা নীলা এই হোটেলের মালকিন হিসেবে শহরকে দশ বছরেরও বেশি সময় সেবা করে আসছেন। এই শহরের শিল্পসংস্কৃতি আচার-অনুষ্ঠান ভাগীরথী নদীর মতোই তার আশীর্বাদে ধন্য। নীল চোখের দৌলতে এই শহরে তিনি সম্মাননীয়া শ্রীমতী নীলা কুমারী। সারা গল্পটা জুড়ে আশ্চর্য এক সময়-রোমন্থন।

'অভিসার' গল্পে শুভ্রনীলের বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ডে রঙের গোডাউন। গোডাউনের আন্ডারগ্রাউন্ডে টাকার গোডাউন। তিনি খুব শখ করে মেয়ের নাম রেখেছেন তিলোত্তমা। আদর করে ডাকেন তমা। মা-হারা মেয়ে। তিনি চান মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছে যে অকাল-কুষ্মাণ্ড বাঁশি ও বেহালাবাদক তরুণ উস্তাদ দাউদ আলি খান সুরসেন, সেই ধড়িবাজ উস্তাদকে যেন সরিয়ে দেওয়া হয় তার মেয়ের জীবন থেকে। বারো বছর পরের কথা। শুভ্রনীল সেনের ইচ্ছায় একগুচ্ছ পানকৌড়ির মতো সাম্পানের নাম রাখা হয়েছে তমাসেন'। পিতৃহৃদয় শুধু জেগে থাকে। এই সংক্ষিপ্ততম পরিসরে গল্পটির সাহিত্যিক বর্ণনাগুলো তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। তাপসের মরমী ভাষা প্রতিটি মুহূর্তে পাঠককে অজানা এক রূপকথার দেশে কখন যেন পৌঁছে দেয়।

'কাচের শহর' গল্পে 'মা' কনসেপ্ট 'মডেল' কনসেপ্ট এবং 'সন্তান' কনসেপ্ট এই ত্রিবিধ দিকের অনুসন্ধানে লেখক আমাদের গল্পের আঙ্গিককে অন্যরূপে হাজির করেছেন। সহজ পথে যা বলা যেত, তিনি তা না করেই, অনেক গভীরতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'নেহাত প্রেমের নিছক নক্সা' গল্পে সদ্য তরুণ ও সদ্য তরুণীর মনের কথাগুলোকে এমন সহজ ভঙ্গিতে তাদের মুখের ভাষায় তুলে এনেছেন লেখক, পড়তে পড়তে মনে হতে পারে এই গল্পটির লেখক নির্ঘাৎ কোনো সদ্য তরুণ অথবা তরুণী। এতটাই সজীব।

'চার নম্বর বিবি' গল্পে ঢণ্ডীর পাছা উঁচু, বুক ঝোলা, কুঁজো, বেঢপ চেহারা। কেউ তাকে ভালোবাসে না। ছোটো মোড়ল বলে–আমার চোখ দিয়ে তুই যদি তোকে দেখতিস, তামাম ভূ-ভারতে তোর জোড়া সুন্দরী নাইরে। ছোটো মোড়লের বয়স বিরাশি ছুঁই-ছুঁই। ঢণ্ডীর মা মহম্মদ আলির সঙ্গে সোনা ব্ল্যাক করত। আমাদের সমাজের মধ্যেই বেঁচে থাকা আর-একটা সমাজের মানুষগুলোর 'অসামাজিক' জীবনযাপনকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে তুলে এনেছেন তাপস।

এরপরও রয়েছে আরো পঁচিশ রকমের কিস্‌সা বা আখ্যান।

এইভাবে এক-একটা গল্পে একেক রকম জীবন-পরিসর, তার বিশেষত্ব, গল্পরচনার বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে উত্তীর্ণ করেছেন লেখক তাপস গুপ্ত। বাংলাভাষায় লেখা ছোটগল্পের স্বর্ণমণ্ডিত ইতিহাসে তাপস গুপ্ত রচিত এইসব অসাধারণ ও অদৃষ্টপূর্ব গল্পগুলি একটি বিশেষ মাইলফলক হিসেবে অবস্থান করে আছে, এই বিশ্বাস আমাদের হয়েছে। একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ গল্প-পরিসর হিসেবে তাপস গুপ্ত রচিত এই বইখানি সাহিত্যের পাঠকের কাছে একটি প্রয়োজনীয় আকর হয়ে উঠেছে, জীবনের রূপ-রস-রহস্য-ধ্বনিপাতে, একটি আমর্ম-হাদিস।

নাসের হোসেন

কুঁজোর চিৎ হওয়ার গল্প

বস্তাপচা, রদ্দিমাল। বছর বিশেকতো বটেই, বেশিও হতে পারে। নিখোঁজ ছিলো ঘরের কোণে, আনাচে-কানাচে। ইঁদুর, আরশোলা, ছারপোকাদের ঘর-সংসারে। ধূমকেতুর মতো, হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়তো, ঝাঁটের আগায় দু-এক টুকরো প্রাচীন হৃদপিণ্ড, এক-আধ টুকরো হারিয়ে যাওয়া দীর্ঘশ্বাস, এককালের প্রিয় রক্তক্ষরণ উড়েপুড়ে ঠাঁই নিচ্ছে পথে-প্রবাসে। তখনই বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো মনে হতো, লেখাগুলো কোথাও আছে। রাত-বিরেতে ঘুম ভেঙে দু-একদিন বুকের ভিতর কুটুর-কাটুর ছাড়া বিশেষ জ্বালাতন করে না। ভাবতাম, ইঁদুর-আরশোলাদের মতো ঘরেদোরে থাকার একটা অধিকার ওদেরও জন্মে গেছে। তো থাকুক। এক সঙ্গেই-তো আছি।

বুড়ো দেগে চাকরি থেকে খেদিয়ে দেওয়া, একনম্বর। মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো নাসেরের (কবি নাসের হোসেন, উপক্রমণিকা লেখক) সাথে ইঁদুর, আরশোলা, আবর্জনার গল্প করে। পারলে নাসের তক্ষুনি ইঁদুর-আরশোলা সমেত হাতেনাতে ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেয়। নাসেরের লক্ষণরেখার ঠেলায় গল্পের গোরু মাথায় চড়ে বসলো। অগত্যা মধুসূদন 'প্রথম গল্প সংকলন'।

খাচ্ছিলো তাঁতি তাঁত বুনে কাল করলো এক এঁড়ে গোরু...। গোরু তো মাথায় চড়ে বসে থাকে না। বহুকালের বস্তাবন্দী এঁড়ে, ছাড়া পেয়েছে। মাথায় চেপে তুর্কিনাচন শুরু করে দিলো। মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল অবস্থা। উদয় হলো সমীরণের (কবি সমীরণ ঘোষ, চতুর্থকভাবে যাঁর হাতে 'বন্ধু কর্তৃক লঙ্কাকাণ্ড' উদ্ধার)। দায় বিদায়, বন্ধুর দায়। অতএব হ্যাপা অধমের মাথা গলিয়ে সুড়ুত করে সমীরণের ঘাড়ে চেপে গেলো। সোনায় সোহাগা। ঘাড়ে ঘাড় পেতে দিলো শ্রীমতী অর্ধাঙ্গিনী (ইনিও রূপসা পার নামে গদ্য লেখেন)। নাকে-মুখে গামছা বেঁধে তামাদিমাল (যেনো মহেঞ্জোদারো ঘেঁটে) উদ্ধার থেকে শুরু করে, এক নতুন সভ্যতার পোশাক বুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। প্রুফ দেখে, আপাদ-বালাইসব সূচিপত্রে গেঁথে তবে কোমর থেকে আঁচল, হাতের বারণ এবং কলম নামিয়েছে। যূথবদ্ধ অনুরোধে গল্পগুলির আধুনিকীকরণ অধমের দায়িত্ব ছিলো। যথারীতি ফেল। অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো। গল্পগুলির রচনাকাল বিশ শতকের শেষ তিন দশক (মোটামুটি) আগুন খেকো যৌবনের সেই দিনগুলি ভাষায় বাক্যে নতুন করে ফিরিয়ে আনা আমার মতো অপদার্থের পক্ষে অসম্ভব। এ আমি কাউকে বোঝাতে পারিনি। 'সোনামন' উদ্ধৃত সভ্যতার মলাট এঁকে রদ্দিমালগুলোকে সিন্দুকবন্দী করে অধমকে রেহাই দিয়েছে। যাক, পোকায় খেলে এবার সিন্দুকে ঢুকে খেতে হবে। অন্যথায় পাঠকের অভিরুচি। পোকাগুলো এবং আমি আপাতত হাঁফ ছেড়েছি।

তাপস গুপ্ত

পাঠক্রম

কালো বেড়াল

উদ্যত তরবারি দাঁড়িয়ে গেলো। কনুই থেকে বদ্ধমুষ্টি, এখন স্থির। করতালু, কব্জিতে কিছু আত্মসম্মান অবশিষ্ট আছে। পারলাম না। নিজেকে খুন করতে। আত্মহত্যা জঘন্য, অপমানজনক। আজানুলম্বিত বাহু ছোটো করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সাপের জিভের মতো হিলহিলে মৃত্যুকে ঢুকিয়ে দিলাম রুপোর খাপে। একজন হত্যাকারী চাই।

শুনেছি এ্যাটলাস-হাউসের মোড়ে একটা ভাটিখানা আছে। ওখানে সন্ধের দিকে খুনিরা আসে। মদ খায়। সন্ধে পর্যন্ত বেঁচে থাকা মানে ছ-ঘণ্টা। বিরক্তিকর। ঘরের মধ্যে পায়চারি করি। জংধরা একটা আজব ঘড়ি দেওয়ালে টাঙানো। উজান বইছে। ছ-ছ-ঘণ্টা উজান-ঘড়ির লেজ নাড়া সহ্য করা! অসম্ভব। তার চেয়ে বরং খাপশুদ্ধ তরবারির খোঁচায় নিকেশ করতে চাইলাম, উল্টে ঘড়িটাই ভেঙে পড়লো ঘাড়ের উপর। এবং গেঁথে বসে গেলো। ভ্যালারে বাপু! প্রাণপণে ঝাড়া দিলাম। নামছে না। সামনে আয়না। একটা মানুষ তার মুন্ডুর বদলে দেখতে পাচ্ছে দেওয়ালঘড়ি। অদ্ভুত! আবার ঝাড়া দিলাম। নামছে না। ঘড়িটা ভাঙতে না পারার লজ্জা চেপে ধরলো।

এখন ঘাড়ের উপর বসে সন্ধে পর্যন্ত দালালি করে যাবে। টিক টক টিক টক... সময়ের খবরদারি। ছিঃ! একদলা থুতু শূন্যে ছুড়ে দিই। ছাদ পর্যন্ত পৌঁছায় না। ফিরে আসে আমারই মুখে। শয়তান ঘড়িমুখে। উজান টিক-টিকের দায় চোদ্দপুরুষের? নাকি আমার? যদি আমার হয়, ডাহামিথ্যে। থুতু বাঁ হাত দিয়ে মুছতে গিয়ে সারা কাচমুখ মাখামাখি। চটচট করছে। পেন্ডুলামের ঘর বরাবর বিশ্রী পচা গন্ধ। সাক্ষাৎ মরা মানুষের। আমি একটা সুগন্ধি মৃত্যু আশা করি।

খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। ঘাড় থেকে যদি ঘড়ি নামাতে নাই পারি, একটা হাতুড়ি চাই, ঘাড়ের উপরেই ওটাকে চুরমার করে দেবো। উপড়ে ফেলবো মাথা থেকে।

—বহু খবরদারি করছো বাছাধন!

সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসি একেবারে নিচে, জঞ্জাল ঘরে। বিশাল ঘর। কুড়ি পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। হলুদ। ছানি পড়া আলো। আজকাল কয়লার উনুন জ্বলে না। গ্যাসে রান্না হয়। কয়লাভাঙা হাতুড়ি বাতিল হয়ে গেছে। জঞ্জালঘরে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। এই ভরসায় বাতিল স্তূপে খুঁজি। চোদ্দপুরুষের আবর্জনা জমেছে। ইঁদুরে খাওয়া চাবুক, লোমওঠা বাঘের ছাল, একপাটি নাগরাজুতো, মদের খালি বোতল... হাতড়ে হাতড়ে হাতুড়ির বদলে একটা ক্যালেন্ডার পেলাম। পাকানো সময়ের তামাদি হিসেব। পাক

খুলতেই জড়িয়ে ধরলো হাত। যেন সাপ। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে আমাকে। ঘড়িমুখের সামনে ফণা দোলাচ্ছে। পরাজয় আমাকে ছাড়ছে না। পরাজয়ের ক্রোধ ক্ষণে ক্ষণে ফেঁপে উঠছে। যুক্তি এখন অন্ধ। ক্যালেন্ডার তুলে আনলাম ঘরে। সময়ের ফণাকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো টাঙাবো দেওয়ালে। দু'হাতের তালুতে, পায়ের পাতায় গজাল পুঁতে থামিয়ে দেবো ফোঁস ফোঁস।

ক্রুশকাঠে দিলাম ঝুলিয়ে। না, ক্যালেন্ডার নয়। এটা এই শহরের ম্যাপ। এ্যাটলাস।

ম্যাপ এবং মালিকের নাম নেহাত কাকতালীয়। মালিকের নাম অনুসারে এ শহরে সমস্ত ভাটিখানার নাম এ্যাটলাস। এক, দুই, তিন, নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা। দেওয়ালের ক্রুশে বিস্তৃত ম্যাপে ভাটিখানাগুলো লাল বৃত্ত দিয়ে ঘেরা। ঘড়িচোখের সামনে সবচেয়ে বড়ো বৃত্তের লাল ভাটিখানা জ্বলজ্বল করছে। ওইখানে খুনিরা আসে। এই ছোট্ট হোটেল থেকে ওখানে যাওয়ার রাস্তা নীল কালির দাগে এঁকে নিলাম। শুধু এক নম্বর নয়, দুই তিন চার... সমস্ত ভাটিখানা যাওয়ার পথই নীল নক্সায় এঁকে ভরিয়ে ফেললাম। শহরটাই এখন নীলগুল্মের ডালে-ডালে লাল গোলাপের সমাহার। একজন খুনি খুঁজে বের করা আর কোনো সমস্যা নয়। শেষপর্যন্ত মৃত্যুর সহজ রাস্তাই খুঁজে নিলাম।

আদ্যিকেলে প্রাচীন হোটেল। এখানে ওখানে প্লাস্টার খসে পড়ছে। ক্ষয়িষ্ণু ইট, গাঁথনি। সুযোগ পেলেই চুন সুরকি ঝুরঝুর ঝরে। রাতবিরেতে শোনা যায়। একটেরে বিল্ডিং। আধাঅন্ধকার। আধাস্যাঁতসেঁতে। তিনতলা সমান উঁচু। চোদ্দপুরুষে কারো কিনে রাখা। উত্তরাধিকার সূত্রে আমিই মালিক। আপাতত বোর্ডার নিষিদ্ধ রেখেছি। গোটাটাই দখল নিয়ে থাকি, ছাদের কোণে। একা। একখানা ঘর।

খোলা ছাদ। নিরিবিলি। এখান থেকে দেখা যায় আকাশ-শহর অনেকটা একসঙ্গে সেঁটে আছে। খুন হওয়া এবং খুন করার আদর্শ জায়গা। এই শ্মশানভূমিতে ঠিকঠাক ম্যানেজারির জন্য ভেবেছি, মরার আগে হোটেলকে একটা শংসাপত্র লিখে যাবো। দিনের মৃত্যুকালীন রোদ এসে পড়েছে চৌকাঠে, পায়ের কাছে। মিনতির মতো ম্লান। যাওয়ার আগে ডাক দিয়ে যাচ্ছে। কাঁধের ঘড়িকে বললাম—চল্, বেরিয়ে পড়ি। ভাটিখানা এতক্ষণে খুলে গেছে।

বাইরে কনকনে ঠান্ডা। ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে কান পর্যন্ত কলার তুলে দিলাম। মাথায় পানামাটুপি, সামনের দিকে ঝোঁকানো। যাতে ঘড়িমুখো মুন্ডুখানা আড়াল থাকে। বছরও যায় যায়। বছরের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। নীচেই ফুটপাথে ফুলের দোকান। ফুলেল দেওয়ালে ডিসেম্বরমাস। আসল ক্যালেন্ডার, গলা ফুটো। দড়ি বাঁধা, ঝুলছে। আজ রাত বারোটা পর্যন্ত ৩১। লালকালিতে লেখা। কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটায়, বছরের সাথে আমারও মৃত্যু চাই। একত্রিশ লেখাটা কেউ খোঁচা মেরে ফুটো করেছে। ফুটো অংশটুকু নীলকালিতে ঘেরা। কাউন্টারে লালগোলাপ ডাঁই হয়ে

আছে। কাল শহরবাসীর হাতে হাতে নীল এবং লাল শুভেচ্ছায় ছড়াছড়ি হবে। শীতের দাপটে ফুলগুলো রঙ পাল্টাচ্ছে। মালকিনের বেড়াল ফুলের টিপিতে উবু হয়ে বসে আছে, ওৎ পেতে। বেড়ালটা মিশকালো। যেন কষ্টিপাথরে কোঁদা। আগেও দু'চারবার দেখিনি তা নয়। শয়তানটা ফুটন্ত কালোপিচ। এক চোখ কানা। অন্যচোখে পলক পড়ে না। ঘোলা। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সবসময় চোখের মণিতে কলাপাতা রঙের আগুন জ্বলছে। বেড়ালটার জ্বলন্ত পিচকালো-রঙ চুঁইয়ে নামছে, গোলাপের ডাঁইয়ে। গোলাপগুলো ধীরে ধীরে কালো হয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে পড়েছি দেখে মালকিন ভেবেছে খরিদ্দার। শশব্যস্ত হয়ে বেড়ালটাকে রজনিগন্ধার স্টিক তুলে তাড়ালে। বেড়াল বিন্দুমাত্র নড়লো না। একত্রিশ ডিসেম্বরের ফুটো আর বেড়াল একদৃষ্টে চেয়ে রইলো আমার চোখে। চোখ নামিয়ে দ্রুত পথটুকু পার হয়ে এলাম। কলাপাতা রঙের আগুন এবং অন্ধকার ছিদ্র আমাকে বললো—তুমি যাও, আমি আসছি।

এ্যাটলাস নাম্বার ওয়ান, ভাটিখানা খুলে গেছে। শহর আলোময়। কুয়াশা জড়ানো। শীতের সন্ধ্যা, ঝটপট জাঁকিয়ে নেমেছে। ভাটিখানার মালিক, এ্যাটলাস নাম্বার জিরো, মালটা কে? যার পিঠের উপর এই শহর দাঁড়িয়ে আছে? তাকে আমার চাই। পথে অন্য কোনো মুখ নয়, এ্যাটলাসের মুখ খুঁজি। বাছাধনের মুখখানা একবার দেখতে চাই। এতদিন কেনো চিনিনি তাকে!

ভাটিখানায় আধো আলো আধো অন্ধকার। কাউন্টারে কুঁজো ম্যানেজার, হোঁদল কুতকুত চেহারা। কুটকুটে কালোকম্বল জড়িয়ে বসে আছে। মুখে গাঢ় ছায়া। চোখদুটো নরুন চেরা। প্রায় বোজা। খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় মণির রঙদুটো কচি কলাপাতা। যেন একটা অর্ধেক বেড়াল আর অর্ধেক মানুষ বসে আছে মদের টাটে, নির্বিকার। এবং শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও যেন এ-ভাবেই বসে থাকবে।

দু'পেগ হুইস্কি নিই। জায়গায় দাঁড়িয়ে একঢোক গিলে জিজ্ঞেস করি—এ্যাটলাস কখন আসবে?

ভাঙা খনা গলায় কম্বলের ভিতর থেকে উত্তর এলো—বসুন, এসে পড়বে।

—তুমি কি এ্যাটলাসকে চেনো?

—দুনিয়ার সবাই ভাটিখানায় আসে।

একচুমুক টানি। পেটে পুরোনো মদের ঝিম উঠে আসে। জিজ্ঞেস করি—এ্যাটলাস এখেনে এলে শহরের দায়িত্ব নেবে কে?

কুতকুতে চোখদুটো পিটপিট করে ওঠে—নতুন চেয়ারম্যান। বসুন, তিনিও আসবেন। এক এক করে প্রত্যেক মদ্যপকে জরিপ করি। কারা খুনি আর কে কে খুন হতে চায়।

এখানে এই দু'জাতের প্রাণীই আসে। একজনের পাঁশুটে রঙের কোট। ভাটিখানায় ঢুকছে। আস্তিনে রক্তের ছোপ। এগিয়ে যায়। কানের কাছে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করি —খুনের পারিশ্রমিক কতো?

লোকটা আমার ঘড়িমুখ একপলক মেপে অন্ধকারে সরে গেলো। যাওয়ার সময় বলে গেলো—কাগজে বিজ্ঞাপন দিন।

—খুনির এত আকাল এই শহরে? ধন্যবাদ এ্যাটলাস।

বিজ্ঞাপনের খসড়া ভাবতে ভাবতে ফিরে আসি। আত্মহননের জন্য বিজ্ঞাপন। বেশ উত্তেজনা আসছে। বেঁচে থাকার একটা স্বাদ পাচ্ছি। টেবিলে বসি। লিখি।

একজন দক্ষ খুনি চাই। সুদর্শন। স্বাস্থ্যবান। কোনো প্রশ্ন চাই না। নির্দেশ এবং কাজ। আশাতিরিক্ত পারিশ্রমিক। অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

না, হলো না। একটা সিগ্রেট ধরাই। ঘড়িমুখে সিগ্রেট ঢুকিয়ে দিব্যি টানি। ধোঁয়ার ঘুল্লি পাকায়। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় সামনের সিঁড়িতে লাফ মেরে নেমেছিলো কালো বেড়ালটা। বেড়ালের পায়ের নীচে নরম প্যাড। প্যাডের ভিতর নখর লুকিয়ে রাখা যায়। কোনো শব্দ হয়নি। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখেছিলো। আগুনে চোখ। চোখে চোখ পড়তেই নিঃশব্দ লাফ, মুহূর্তে পগারপার। এখন দেখছি, ঘরের জানালায় বসে আছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আমার দিকে। খসড়া পাল্টে লিখি—

সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, তলোয়ার চালানোয় সুদক্ষ, যুবক চাই। বিশ্বাসযোগ্য। পর্যাপ্ত উপার্জন। দ্রুত যোগাযোগ...

জানালায় বসে বেড়ালটা মজা দেখছে। গোঁফের নীচে একটুকরো মিটমিটে হাসি। ধোঁয়ার ঘুল্লি পাকানো শেষ। নিজের কাজে মন দিই।

খুনিকে সুদর্শন হতেই হবে। মরার আগে কুশ্রী, কদাকার মানুষের মুখ দেখতে চাই না এবং দক্ষ তো বটেই। আনাড়ির হাতে আধ-মরা হয়ে আহাম্মুকি করার চেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ঢের বীরত্বের। ভাষাটা কাঁচা লাগছে। আইনের বেড়াজালে আটকে গেলে মহা ফ্যাকড়া হবে। মৃত্যুটাই কালো কুৎসিত হয়ে উঠবে। পুরোনো খবরের কাগজ ঘেঁটে কোনো নমুনা চোখে পড়লো না। এটাও ছিঁড়ে ফেললাম। কুচিকুচি করে ছুড়ে দিলাম বেড়ালটার দিকে। সে খুশি হলো না। পিঠে লেজ তুলে একটা গোল-ফাঁস তৈরি করে বারকয়েক আমার চোখের সামনে ঘুরেঘুরে বেড়ালো। তারপর গম্ভীর মুখে লাফিয়ে পড়লো অন্ধকারে।

স্কয়ারকাট পার্কে ভেপার-ল্যাম্প জ্বলে উঠলো। ঢোকার মুখে ল্যাম্পের নীচে বসা ভিখিরিটা পায়ের ব্যান্ডেজ খুলে উঠে দাঁড়ালো। উস্কোখুস্কো পরচুল, নকল গোঁফ-দাড়ি

কিটব্যাগে ভরে যখন পার্কের প্রসাধনকক্ষ থেকে সুদর্শন যুবক সেজে বেরিয়ে এলো তখনই সান্ধ্য দৈনিকখানা কিনলাম। বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, বিশ্বাসযোগ্য, দশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কসাই চাই। আশাতিরিক্ত বৃত্তি। ফোন নং... অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

বেঞ্চিতে বসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিজ্ঞাপনটা বারকয়েক পড়লাম। ঘড়িমুখের ভিতরে চোখদুটো বেশ একাগ্র, খানিকটা বেরিয়ে এসে ঝুঁকে আছে কাগজের উপর। টগবগে উত্তেজনা। টানটান উদ্বেগ অনুভব করি। এ রকম জমাটি খেল থাকলে এক-আধ দিন বাঁচা যায় বৈকি! কোলের উপর একটা ঝরাপাতা উড়ে এলো। বুঝতে পারছি, খুনির ফোন এলো বলে! হঠাৎ কানের কাছে বাতাসেরা ফিসফিস করে উঠলো।

—এই যে মিস্টার বিজ্ঞাপনটা ছেড়ে দিন। ওটা আমি আগে দেখেছি।

ঘাড় এবং ঘড়ি ঘুরিয়ে ভেপারল্যাম্পের আলোয় দেখি, ভিখিরিটা যুবক সেজেছে। মিষ্টি চেহারা। গোলাপের মতো সুন্দর মুখখানা। গায়ে একঝাঁক গোলাপের নরম গন্ধ। বললাম—পারফিউমে রুচি আছে দেখছি। ফিফটি ফিফটিতে রাজি হয়ে যাও।

—নতুন আমদানি মনে হচ্ছে?

হাত থেকে কাগজটা কেড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিলো লেকের জলে। ওর পকেটে কি সূক্ষ্ম তারের ফাঁস আছে কিংবা পিস্তল? বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ফ্রিজ থেকে বেরিয়ে আসা একটা মুরগি যেন ডিমের তা ছেড়ে গা ঝাড়া দিলো। উত্তেজনা। একটা মৃত্যুকালীন থ্রিল, বেঁচে থাকার বেশ উত্তাপ পোহাচ্ছি। বাতাসে ফ্রিজের চেয়ে উত্তাপ অনেক বেশি।

বললাম—কুয়াশাটা চেপে নেমেছে। চলো হাঁটা যাক।

মুখের উপরে তুড়ি নাচিয়ে বললো—এই যে, মিস্টার, মাংসের দোকানটা কোথায়?

শক্ত চোখে তাকালাম। বিজ্ঞের মতো বলেই চললো—মনে আছে, ভাটিখানায় দেখা হয়েছিলো? কসাই চাইছো। মাংসের দোকান নেই। মাইরি, পিছনে এক্ষুনি পুলিশ লেগে যাবে। এত কাঁচা লোকের সাথে কাজ করি না।

ঘড়ি ঝাঁকিয়ে বললাম—একদম ঠিক, তোমাকেই খুঁজছিলাম এ্যাটলাস, চলো হাঁটি।

কানের কাছে মুখ নিয়ে একটা শিস ছুড়ে দিলো। বললো—কসাই, মুরগি পাশাপাশি হাঁটে না।

দ্রুত কুয়াশায় মিশে গেলো। মুহূর্তে পাঁশুটে কোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এ্যাটলাসের মুন্ডুখানা কালোগোলাপ হয়ে অন্ধকারে ঢেকে গেলো। দাঁড়িয়ে উত্তেজনা অনুভব করলাম।

ঘাড়ের ঘড়িকে শুনিয়ে বললাম—খুনি জুটে গেছে। তোমার কাঁটার টিকটিক এবার

শেষ।

পেন্ডুলামে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করি—কিহে বিস্বাদ লাগছে জীবন?

হঠাৎ পেন্ডুলাম চেপে ধরি। চিৎকার করে উঠে বলি—মানুষটা মরার আগে একবার জেগে ওঠ। সামনে না চললেও, কিছু সময় অন্তত থমকে থাক।

ঘাড়ে ঘাম জমে গেছে। গলা ভিজেভিজে লাগছে। চেপে রাখা পেন্ডুলামের কষ্টে ঘড়ির মুখ বেয়ে কি ঘাম গড়িয়ে নামছে নাকি কান্না!

পুলিশের হাতে পড়ে জেলখানায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই। বিজ্ঞাপনে তাপ্পিমারা দরকার। পথে একটা মাংসের দোকান। দাঁড়িয়ে গেলাম। কাচের দরোজা। ওপারে সারিসারি ছাল ছাড়ানো খাসির ঝুলন্ত দেহ। মালিকের মুখখানা ভুঁসকো ফুলো। লক্ষ্মীর ভাঁড়ের মতো গোলগাল। দরোজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম।

—মাংসের দর কী?

কসাইদার আমার পোশাক-আশাক দেখে বেশি মনোযোগ দিলো।— কতো চাই?

—গোটা খাসি কতো নেবে?

—ওজন করতে হবে স্যর।

— সব ক'টা খাসি?

লক্ষ্মীর-ভাঁড় আমাকে আগা-পাছতলা মাপলো।

—কী অতো মাপছো? দুনিয়ার সব খাসির দরতো করিনি?

—স্যর, আপনি কাল সকালে আসুন।

ও ভাবছে আমি নেশাগ্রস্ত। হাঃ!

—শোনো, মাতাল-ফাতাল নই। আমার দরকার। দোকানটা কত হলে বেচবে?

—স্যর, আপনার ঠিকানা বলুন। আমার লোক সসম্মানে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

জেদ ধরি। —অন্তত একমাসের জন্যে বিক্রি করো।

—শুনুন স্যর, শহরে পুলিশের ঘোরাঘুরি অনেক বেড়ে গেছে।

—আমার নাম জমিদার গগনেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। কেউ মালিকের নাম জিজ্ঞেস করলে লক্ষ্মীরভাঁড়চন্দ্র না বলে, অন্তত এই নামটা বলো।

দোকানের কসাই আমাকে খেদিয়ে দিতে এগিয়ে আসছে। হাতে রামদা। তড়িঘড়ি পঞ্চাশ হাজারের একটা চেক ঘষে দিলাম কসাইয়ের মুখে। বললাম—দরকার হলে আরও দেবো।

দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। এমন আধুনিক হাঁদা-গঙ্গারাম লক্ষ্মীর ভাঁড় জীবনে দেখিনি। বাঁচার জন্যে সারাজীবন কাচের ঘরে বন্দী। হদ্দগাধা কোথাকার!

হোটেলে ঢোকার মুখে লোডশেডিং। সুস্বাদু অন্ধকার। পাঁচতারা হোটেলে ঘেন্না ধরে গেছে। পুঁচকে হোটেলগুলোতে বৈচিত্র্য অনেক বেশি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো আমার মতো জমিদারের পক্ষে বেশ লাগসই। পুঁচকে শহরে পৈতৃক হোটেলখানা খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। যেন অন্ধকার-আবলুস কাঠের তৈরি, পূর্বনির্ধারিত কফিন। ডালা খোলা। কফিনের অবধারিত ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ডাইনিং টেবিলগুলোতে, কাউন্টারে, মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। রহস্যময় লাগছে। কাউন্টারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ম্যানেজার মাথা চুলকে বললো– স্যার, আধা আলো, আধা অন্ধকারে রাতটা কেমন জমে গেছে বলুন?

ঘাড় থেকে ঘড়িমুখ তুলে দেখলাম, আস্ত একটা নেড়িকুত্তা। তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ইদানীং নেড়িকুত্তারা কি ঘড়ি দেখতে শিখেছে? পিছনের লম্বা লেজ কাঁধের ফাঁকে তুলে নাড়িয়ে চলেছে। নিচু গলায় বললো–স্যার, জেনারেটরের তেল ফুরিয়ে গেছে।

এই আধো অন্ধকারে নেশা পুরোনো মদের মতো চেপে ধরে। মাথার টুপিটা নামিয়ে নিলাম। সিঁড়ির দেওয়ালে সারিসারি আদ্যিকালের ছবি। ঝাপসা। ঝুলকালি মাকড়সার জালে মাখামাখি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার, চৌধুরী বংশের চৌদ্দপুরুষ। সারিসারি মুখ। তাঁদের বাঘের মতো গোঁফ। মোষের মতো চোয়াল। আর ভাঁটার মতো চোখ। প্রত্যেকে গণ্ডারের খাঁড়ার মতো আঙুল তুলে আছে আমার দিকে। অভিযুক্ত আমি। শেষ বংশধর। ঝুরঝুরে দেওয়ালে ভেঙেপড়া স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছি। প্রতিদিন সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় এই গণ্ডারের খাঁড়া পার হয়ে মাথা নিচু করে উঠতে হয়। খুব ক্লান্ত লাগে।

দাঁত চাপা গর্জন। কালো বেড়ালটা লাফিয়ে পড়লো ঘাড়ের উপর। ঘড়ি মুখের খুব কাছাকাছি। আঁতকে উঠলাম। কাঁধ ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিলাম সিঁড়ির ধাপিতে। পায়ের কাছে। পা দিয়ে চেপে খুন করে ফেলতে চাইলাম। শুধুশুধু পায়েই আঘাত লাগলো। শীতের আঘাত, বেশ জোর লেগেছে। পায়ের পাতা হাঁটুর পেশি কাঁপছে। বেড়াল সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে। হাওয়া। পা দুটো টলমল করে উঠলো। ওকে অনুসরণ করি। এর চেয়ে ঈশ্বর অনুসরণে কম নেশাগ্রস্ত ছিলাম। ঘরের সামনে পৌঁছে দাঁড়াতে পারছিলাম না। ঘরে গাঢ় অন্ধকার। দরোজা খোলা। বিছানায় বসে আছে এ্যাটলাস। চিনতে পারলাম। তখনই মুখের সামনে লাইটার জ্বেলে সিগ্রেট ধরালো। মুখখানা হাঁড়ির মতো কালোগোলাপ হয়ে আছে। গম্ভীর।

পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কাঁপছিলাম। কালোবেড়াল আমার পা গলিয়ে এ্যাটলাসের দিকে

চলে গেলো। ওর আচমকা স্পর্শে গলার মধ্যে ভয় লাফিয়ে উঠলো। পড়ে গেলাম, এ্যাটলাসের পায়ের কাছে। মৃত্যু-ভয় ফিরে পেয়েছি। জীবনটাকে সুস্বাদু মনে হচ্ছে। এ্যাটলাস আমার কাঁধে হাত ছুঁয়ে দিলো। ধাতস্থ হই। দরজার চৌকাঠে বসে থাকি। ওঠার শক্তি নেই। অবসন্ন গলায় জিজ্ঞেস করি–পারিশ্রমিক কতো?

পাথরের চেয়ে গম্ভীর, কিন্তু উত্তর নয়, পাল্টা প্রশ্ন আসে–কাকে খুন করতে হবে? উঠে দাঁড়াও। মৃত মানুষকে আমি মারি না।

নিজেকে সামলে নিই। উঠে দাঁড়াই।

বলি–আমি ঈশ্বরের কাছে শিখি। প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন শুনতে অভ্যস্ত নই।

–তোমার উত্তর—আমার কাজের আগে পঞ্চাশ পরে পঞ্চাশ।

–শোনো, তোমাকে একটা তরবারি দিচ্ছি। আমার পূর্বপুরুষের গড়া। ইস্পাতে তৈরি। রুপোর খাপে মোড়া। সোনার হাতলে হিরের কারুকাজ। দাম হিসেব কোরো না। কত পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যাবে তুমি জানো না। ওই তরবারি দিয়েই খুন করবে আমাকে। এটাই শর্ত। তোমাদের ওই এক বিঘৎ পিস্তল আর পঞ্চাশগ্রাম বুলেট। পুটুস শব্দ। ব্যস একটা মানুষ নিকেশ। এটা একটা মৃত্যু হলো! যেমন জীবন তেমন মরা। হোঃ হোঃ!

অন্ধকারের ওপার থেকে কোনো উত্তর এলো না।

স্থির গলায় বলছিলাম–সঙ্গে একটা ইচ্ছাপত্র দিচ্ছি। পড়ে দেখতে পারো। ইচ্ছাপত্রে আছে আমাকে হত্যা করার অধিকার। আর সামন্তিপুরুষের অগাধ সম্পত্তি।

ওপার থেকে কোনো উত্তর এলো না। একটা জান্তব হিংস্র আওয়াজ সামনে থেকে পিছনে সরে গেলো। হাঁফ ছাড়লাম। যাক পাশাটা ঘুরিয়ে দিতে পেরেছি। লুকোচুরি খেলায় মৃত্যু এবার পিছনে।

বললাম–যখন মরবো যেন আকাশ থেকে একটা তারা খসে পড়ে। একটা বাজ পড়ার শব্দ হয়। চন্দনের গন্ধে, ঘণ্টা উলুধ্বনিতে ভরে ওঠে চরাচর।

মৃত্যু সামনে থেকে বুক চিতিয়ে আসবে, অসহ্য। মৃত্যুর এত বড়ো স্পর্ধা সহ্য হয় না।

লোডশেডিং শেষ হলো। তিনতলার ছাদ পেরিয়ে ঝলমল করে উঠলো শহর। আলসেয় গিয়ে দাঁড়ালাম। বেড়ালটা মিউমিউ করে পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে এলো। এক লাথি মেরে ফেলে দিলাম নীচে। জঞ্জালঘরের চৌকাঠে। সমতলে জনপদ। আলো-আঁধারে মিশে আছে হত্যাকারী এবং কৃপাণ। মৃত্যু আমার নীচে, অনেক পিছনে। আরো কিছুদিন মৃত্যুর মুখে বেঁচে থাকাটা বেশ থ্রিল। রাত বারোটা বেজে গেলো। ঘাড়ের উপর উজান-ঘড়িটা বহাল তবিয়তে চলছে টিক টক টিক টক... শহরটা এখন মন্দ লাগছে না।

পাথরের ভ্রমর

একগুচ্ছ প্রস্তরমূর্তির ন্যায় একমিনিট-কাল নীরবতা।

সেতারের অন্তর চিরিয়া সহসা দুঃখস্রোত উত্থিত হইল। বহুকালের জমাট যন্ত্রণা পাপিয়ার তার যেন গলিয়া—

পশ্চাৎপটে সান্ধ্যকালীন রক্তিম উদাসে ছুটন্ত নদী—

তাহার স্রোতে মিলিয়া অনন্তে প্রবাহিত হইল। আঙুলে গাঁথা মেজরাব উত্তাল।

প্রফেসর ধ্যানমগ্ন।

পশ্চিমের ম্লান আলো-অন্ধকারে তাহার ছায়ামূর্তি সেতারের অবয়বে মিশিয়া একাকার আবছায়া ভঙ্গিল পর্বতে উদ্যত—সেতার যেন এক সংগীতচূড়া। গাঢ় কমলার লাল অন্ধকার মাখা পটে জলবিস্তার—ভেসে চলেছেন প্রফেসর বি.লাল।

নিজেরই সৃষ্ট সুর-সাম্পানে।

ভেসে চলেছে গোধূলির সোনা মেঘ, কমলাচ্ছটা নীলাকাশ। দিগন্তে আঁধার গাঢ় হয়ে এলে—বি.লাল ইমন-কল্যাণের ফাঁকে একমাত্র থেমে সম দিলেন পটদীপে।

অপূর্ণ ইমন হাহাকার করে ওঠে।

উদ্গত অশ্রু আড়াল করা সেই বৃদ্ধ, বুঝলেন না, ইমন হাহাকারেই পূর্ণতা পায়—চমকে উঠলেন।

তিনি গল্পের কেউ নন, অসংখ্য টিভি দর্শকের একজন মাত্র। সংগীতের ঐতিহ্যে অনাচার সহ্য করেন না। টিভি বন্ধ করে দিলেন। বৃদ্ধের সজল চোখের পর্দা থেকে দৃশ্যটিকে তুলে নিই। লাইভ টেলিকাস্ট চলছিল। চলুন, নিবিড় মনোযোগে প্রকৃত দৃশ্যে প্রবেশ করি।

দুই

চোখ তুললেন বি.লাল।

এখানে কোনো নদী নেই। বালুচর নেই। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। নিওন আলোয় ভরপুর শহরের চৌমাথা। লোকে লোকারণ্য। অন্ধকার ঠেলে তুলে রাখা আছে মাথার

উপর, শিরীষ অরণ্যে। রাজপথে যোগচিহ্নের উত্তর-পশ্চিম ত্রিভুজে মঞ্চ! মঞ্চের পিছনে সিনেস্ক্রিন। এই নদী, জলস্রোত—ওই বালুচর, রঙে গতিতে মূর্ত হয়ে উঠছে সিনেস্ক্রিনে, বি.লালের রাগকালীন প্রকৃতি। অসম্পূর্ণ রাগের সাথেই বদলে যাচ্ছে প্রকৃতির ছাপ ছবি।

মঞ্চের সামনে দিয়ে হিল্লোল তুলে দ্রুত সরে গেল মধুমিতা। তার হাতে স্টিলের শিকলে বাঁধা কানঝোলা ছোট্ট কুকুর, যেন তুলো দিয়ে তৈরি, স্প্রিং-এর পুতুলের মতো লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল! মধুবালা কুকুর ভালবাসতো খুব।

এক মুহূর্ত, বি.লাল সেতার থেকে তর্জনী তুলে নিলেন। চলনে মেয়েটি অবিকল মধুবালার মতো। গ্রীবার উদ্যত ভঙ্গি বি.লালকে অন্যমনস্ক করে দেয়।

তবলিয়া বত্রিশ মাত্রার টুকরো দিয়ে ভরে দেয় ফাঁকটুকু। মধুমিতার চলনে মিলে যায় সে ছন্দ। দর্শক, শ্রোতা উচ্ছল হয়ে ওঠে।

তবলিয়া টুকরো ঘুরিয়ে বি.লালের হাতে মুখ দিতে—সেই তালেই তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন খাম্বাজে—

—নি ধা, মাপাধা, মাগা ... মাগা... সিনে স্ক্রিনে ফুটে উঠল—নতুন রাত্রির আকাশ। তারায় তারাময়। ম্লান হয়ে এল স্টেজের আলো। খাম্বাজের রাত্রি, দ্বিতীয় প্রহর। প্রফেসর বি. লাল তৃপ্ত। অপূর্ব এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। উদ্যোক্তাদের প্রতি প্রীত। উদ্বোধনের আগেই মধুর মূর্তিটা একবার দেখতে ইচ্ছে হয়।

এদেশে সেতারবাদকদের কোনো মূর্তি আজও বসেনি। অদূর ভবিষ্যতে বসবেও না। মা থেকে মীড়ে করুণ নি কেঁদে উঠল।

ভারতবিখ্যাত সেতারবাদকও সে আশা করেন না।

বিখ্যাত ভাস্কর মণিপাল তৈরি করেছেন মধুর মূর্তি। মধুবালা দেবী এই শহরে আজ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, তার মূর্তি উদ্বোধন করবেন ভারতবিখ্যাত সেতারবাদক প্রফেসর ভ্রমরলাল, প্রেমিকাকে প্রতিষ্ঠা দিতে এসেছেন প্রেমিক বি. লাল।

'মধুবালা স্মরণ মঞ্চে'র উদ্যোগে শহরের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান, শুধু শহর খুশিতে উদ্বেল নয়, টি.কে টিভির প্রাইভেট চ্যানেলে লাইভ টেলিকাস্ট চলছে। শহরের বাইরেও মানুষেরা আকুলনয়নে দেখছে এই মহীয়সী নারীর প্রতিষ্ঠা।

বিখ্যাত মানুষদের বহু মর্মরমূর্তি শহরে ছড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, একজন নারীর কোনো মূর্তি নেই। এই নারীবর্ষে শহরের মানুষ সেই কলঙ্ক দূর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একজন মহীয়সীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবে। সেই নারী, মধুবালা। ভ্রমরের মধু।

বি. লাল চোখ বন্ধ করে জলতরঙ্গ তোলেন তরবের তারে।

নীচেই আর এক স্তর স্টেজ। যে পথে হিল্লোল তুলে হেঁটে গিয়েছিল মধুমিতা, সেখানে

এসে দাঁড়ায় মধুছন্দা। বি. লাল মৃদু অবাক হন।

—এ কে!

অবিকল মধুবালার নাচের ভঙ্গি তুলে স্থির হয়ে আছে। গোলাপি আলোর বৃত্ত তাকে ঘিরে আছে। সে এভাবেই দাঁড়াত আর বি. লাল তরবে তরঙ্গ তুলে তাকে নৃত্যের গতি দিতেন। ছন্দে ছন্দে তাকে নৃত্যের ভঙ্গিমায় রূপ থেকে অপরূপে নিয়ে যেতেন। বহুদিনের পুরোনো অভ্যাসে তরবে সেই তরঙ্গ তুললেন! মধুছন্দা মেতে উঠল নৃত্য বিভঙ্গে। নিজেকে বাইশ বছর আগের 'লাল' মনে হচ্ছে। মধুবালা আবেগে এই নামে ডাকত। চিঠিতে লিখত 'ভ্রমর'।

প্রিয় ভ্রমর,

চিঠি তুমি পাবে। আমি তখন পাথর হয়ে যাবো। তোমার মধুকে দেখার জন্য একবার এসো।

তোমার মধু।

শেষ চিঠিখানা এখন বুকের কাছে। বি. লাল অনুভব করছেন। মধুর বুকের কবোষ্ণ উত্তাপ যেন লেগে আছে। জোড়-তোড়া-ঝালায়-মুড়কি, গিটকিরি, অনুলোম, বিলোমে উজার করে বাজাচ্ছেন—বুকের ভিতর দ্রুতলয়কে কিছুতেই বাঁধতে পারছেন না। বাজ চিকারীতে—দির দা দির্ দা রা দা দির্ দা ... মসীদখানি গৎ ভেঙেচুরে বুকের মধ্যে ঝড় ... দির দা রা দা দা রা ...

মধুছন্দা আলোর চক্রে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলে নীচের স্টেজে ফুটে ওঠে মধুমন্তী। দেবী সরস্বতী নয়। নির্ভুল মধুবালার ভঙ্গিতে বসে মধুমন্তী। 'মধু' নামের প্রত্যেক নারীর বুকে হিরণ্ময় কর্মকারের কারুকাজ করা শোলার উপরে নাম লেখা ব্যাজ। প্রত্যেককেই দেখতে কম বেশি 'মধু'র মতো। বি. লালের শেখানো ভঙ্গিতে মধুমন্তীর কোলে সেতার। মধুবালাকে নিজে হাতে শিখিয়েছিলেন বি. লাল। নিজের সেতার রাখলেন সরিয়ে, বহুকাল পরে আজ মধুবালার সঙ্গে বাজাবেন তবলা। তবলিয়াকে বারণ করলেন ইশারায়। কাঁধে পাট করা সাদা উড়ুনি। ফেটি করে বেঁধে নিলেন কপাল বেড় দিয়ে। বিশ-বাইশ বছর আগে যেমন বাঁধতেন।

তবলা বাঁধলেন সুরে—

—ধিন, ধিন, ধাগি, তির কি ...

—মধুমিতা, মধুছন্দা, মধুমন্তী এরা সকলেই কি আমাকে জানে। মধুবালা তার সম্পর্কে কতখানি শিখিয়েছে! একমাত্র মধুমর্মী তার চেনা। অবিকল পাঁচজন মধুবালা। মধুবালার পাঁচ অংশ, পাঁচ রূপ। মৃত্যুর পর এরাই মধুবালাকে সঞ্জীবিত রাখবে, বিস্তার করবে। ধন্য মধুবালা। আমি তৈরি করেছি ছাত্র, শিষ্য, উত্তরসুরি! আর তুমি টুকরো করে

ছড়িয়ে দিয়েছো নিজেকে। তোমার প্রতিটি অংশকে পূর্ণ রূপ দিতে চেয়েছো।

ভ্রমরের মনে পড়ে। শিবের কাঁধে পার্বতীর কথা। বিষ্ণুর চক্রে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথ্বীময়।

এরপর মঞ্চে এল মধুশ্রী আর মধুমিতা। শুরু হল আলোর খেলা। মধুবালা সাজতে ভালবাসতো। ক্ষণে ক্ষণে পোশাক বদলে আশ্চর্য করে তুলতো ভ্রমরকে।

তার কুকুরের নেশা ছিল। মধুর বাড়িময় ঘুরে বেড়াত—শ্বা, শ্বান, ঘোগ, কোক, তুলোট, কৌলেয়ক, হাংরি—অসংখ্য দেশি-বিদেশি কুকুর। ভ্রমর একদম কুকুর সহ্য করতে পারেন না। এখন হাংরি আর তুলোটকে স্টেজে আনা হয়েছে। আর মধুর ব্যবহৃত অসংখ্য পোশাক। বিচিত্র আলোক-বর্ণচ্ছটায় স্টেজটা যেন হাল্কা মনে হচ্ছে। উঠে এসেছে দর্শকদের চোখের কাছে। মধুশ্রী কুকুর হাতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে নিজেকে স্ট্যাচু তৈরি করছে আর ভাঙছে। রূপে মধুশ্রী মধুবালারই সমকক্ষ।

বি.লাল দেখছেন, বেশ মজা লাগছে। মধুবালার বিচিত্র শাড়িতে, পোশাকে স্টেজ ভরে গেছে। তিনি একটা ক্যাসেট চালিয়ে দিলেন টেপরেকর্ডারে। পেডেস্টাল ফ্যানের নিয়ন্ত্রিত বাতাসে ঝর্নার মতো নেমে আসছে নাইলন শাড়ি, কুয়াশার মতো উড়ে যাচ্ছে ওড়না। তীব্র রঙিন আলোয় দর্শক ভুলে যাচ্ছে—এটা শাড়ির বাগান। তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে—বিচিত্র ফুলের বিশাল সম্ভারে ছয়লাপ মেলা। গাঢ় সবুজ রঙের একটা পিওর সিল্কের শাড়িতে বি.লাল ফিরে গেলেন, দার্জিলিং-এর এক ঘন পাহাড় অরণ্যে। ভ্রমর আর মধু। মধু আর ভ্রমরের গুঞ্জন। দর্শক অভিভূত।

মধুমর্মীর ফ্যাশান শো শুরু হল রাত এগারোটায়। প্রফেসর স্টেজ ছেড়ে উঠে গেলেন। ফ্যাশান শো-কে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। প্রথম ফ্যাশান শো থেকেই মধুবালার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি। এই ফ্যাশান শো থেকেই মধুকে তুলে নেয় টাকার কুমির-কমলাক্ষ স্যান্যাল ওরফে টাকু সান্যাল।

টাকু সান্যালকে ভ্রমরলাল চেনেন। বন্ধু-স্থানীয়। টাকু মনে পড়তেই চোখে ভেসে ওঠে, ছোটখাট গাট্টা-গোট্টা চেহারা, মাথাভর্তি বিশাল টাক। আর অপূর্ব রোমান্টিক দুটি চোখ। টাকুর যৌবনেই টাক পড়ে যায়।

প্রফেসর বি. লাল স্টেজ থেকে নেমে যেতেই টিভি ক্যামেরা বি. লালের পিছন পিছন গ্রিনরুমে ঢুকে গেল। গ্রিনরুমেও টিভি সেট। টিভি সেটে নিজেকে দেখলেন। ক্যামেরার এ্যাঙ্গেলে নিজেকে দীর্ঘতর দেখাচ্ছে। নায়কোচিত দৃঢ় মুখ-মণ্ডল আলোকচ্ছটায় আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। বেশ কিছু বয়স ঝরে গেছে আজ রাতে। মধুবালার মুখ মনে পড়ল, ঝরে গেল স্টেজের গাম্ভীর্য। ভারতীয় সংগীতের ব্যক্তিত্ব ঘরোয়া খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন। হাত জোড় করে রেহাই চাইলেন ক্যামেরাকে।

ক্যামেরার চোখ ঘুরে গেল—টিভিতে ফুটে উঠল স্বল্পবাস নারীদেহ। নানা ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে—ঘুরে যাচ্ছে, কয়েক শো শহরবাসীর সামনে। ফ্যাশান শোর নামে নারীদেহ দেখানো হচ্ছে। এই পোশাকগুলো বাজারে কেউ কেনেও না, পরেও না। শেষপর্যন্ত মধুমর্মী এই অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়েছে—ছিঃ? বি. লাল টিভি বন্ধ করে দিলেন।

তিন

তার জন্যে রাখা ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিলেন নিজেকে। ধীরে ধীরে বন্ধ করলেন চোখ। তার অবসরকালীন প্রিয় ভঙ্গিমা। তার সামনে রাখা আছে মধুবালার পূর্ণাবয়ব ছবি। লাস্যময়ী। ভ্রমর চোখ বন্ধ করেও দেখছেন বছর কুড়ি আগের মুখ। আগুনের মতো চুম্বক। সংগীত, নৃত্য তাকে টেনে রাখতে পারেনি অসহায় ভ্রমর দেখেছেন, রূপ তাকে টেনে নিয়ে গেল। কোথায়! এই ছবিটা দেখেই বিখ্যাত ভাস্কর মণি পাল মধুর পাথরের মূর্তি গড়েছেন। ওই ভাস্করের সাথে সারা দুপুর কথা বলেছেন। যুবক মণি পাল অকপটে স্বীকার করেছে, নিজের অজান্তেই পাথরের মধুবালাকে প্রেমনিবেদন করে বসে আছে সে। রূপবতী মধুবালা। ধন্য।

ফ্ল্যাশের আলোয় চোখের পাতা কুঁচকে গেল। সাংবাদিক। এখন রাত বারোটা। প্রফেসর বি. লালের নিজস্ব কোনো সময় নেই। ধীরে চোখ খুললেন। হাত জুড়ে রেহাই চাইলেন। সাংবাদিকও হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে গেল। ভাবনার সুর যখন কেটেই গেল—ভেবে, বসতে ইঙ্গিত দিলেন। চোখ বন্ধ হলো।

—আজ তো রাগরূপকে ভেঙে তছনছ করে দিলেন?

—না, রাগের নতুন রূপ প্রতিষ্ঠা হলো।

—ঠিক বুঝলাম না।

—এতকাল রাগরাগিনী প্রকৃতির রূপকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, আজ আমার প্রেমিকাকে প্রতিষ্ঠা দিলাম অনুরাগে।

একটু ভেবে বললেন,—মানুষ প্রকৃতিই, তবু অন্যতর, চঞ্চলা, ভাষাহীন পার্থিব রাগে জাগতিক মানবীকে ধরাও কঠিন।

—এ কি নতুন রাগ রূপ?

—জানি না, আমার প্রেমিকার রূপ।

—কার কথা বলছেন?

প্রফেসরের ভ্রূ কুঁচকে কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল।

—মধুবালার কথা।

—তাকে কতখানি চেনেন?

প্রফেসর একটু থেমে উত্তর দিলেন, ইদানীং জানি না।

ভ্রমরের চোখে ভাসছিল—একটা ফুলের মতো ফুরফুরে কিশোরী ছুটতে ছুটতে ... অনেক দূরে ... বাইরে ... দৃশ্যের বাইরে গিয়ে হঠাৎ পাথর হয়ে গেল। না, ভাবনাটা ভুল হচ্ছে।

আগের ভাবনাটা মুছে দিয়ে ভাবতে লাগলেন—একটা ফুলের মতো কিশোরী ছুটতে ছুটতে পাঁচজন নারী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তারই চারপাশে—মধুমিতা, মধুমন্তী, মধুছন্দা, মধুশ্রী, মধুমর্মী—পাঁচজন নারী মিশে যাচ্ছে একটি নারীমূর্তিতে, সে মধুবালা। তার মধুবালা।

—আপনি কি জানেন, মধুবালাদেবীর এই মূর্তির জন্য তার স্বামী দু'লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়েছেন?

—তিনি মহানুভব।

—চাঁদা দেওয়ার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন?

বি. লাল কোনো উত্তর দিলেন না।

—আপনি কি জানেন, মধুবালা বেঁচে থাকতেই তিনি চাঁদা দিতে বাধ্য হন?

বি. লাল ভেবেছিলেন, গ্রামীণ শহরের তরুণ সাংবাদিক, কথা বলতে পেরেই ধন্য হয়ে যাবে। বুঝলেন, ছোকরা তাকে উত্তেজিত করছে।

—মধুবালা টাকা দিয়ে খবর হতেন? টাকার জোরে সভা, সমিতি কমিটিতে নেত্রী সেজে বসেছিলেন?

চোখ বন্ধ রেখেই বি. লাল বললেন—আপনি আসতে পারেন।

—আচ্ছা আপনি এই বয়সে বিয়ে করলেন কেন?

ধাতব কণ্ঠে উত্তর দিলেন—লিভ টুগেদারের কুৎসা সহ্য হবে না।

একটু থেমে ক্ষোভে তীক্ষ্ন হয়ে উঠলেন—

—আমিও তো একটা সন্তান চাইতে পারি?

হঠাৎ রুক্ষস্বরে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন—গেট আউট। আর একটি প্রশ্নও নয়। সাংবাদিকের গলায় খিকখিকিয়ে উঠল অসাংবাদিক হাসি।

—এ মধুমর্মী তোমারই কারখানায় তৈরি বি. লাল। বলে সাংবাদিক চলে গেল।

ভ্রমর কথার গরম ছ্যাঁক সহ্য করলেন।

সুরের রিমঝিমটা চটকে দিয়ে গেল, ছোকরা। একটা রঙমশালের মতো গোটা রাত

আজ জ্বলছে। মধুর বিখ্যাত হওয়ার অসহ্য জেদ এই রাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

চার

মধুছন্দা ধীরছন্দে বসল বি. লালের পায়ে।

—কে?

—আমি মধু।

—মধু কোনোদিন আমার পায়ের কাছে বসেনি।

—আমি মধুছন্দা।

—কী চাও?

—আপনাকে।

মৃদু অসহিষ্ণু বি.লাল উত্তর দেন, পদসেবার যুগ শেষ হয়ে গেছে। আমি মধুকে খুঁজছি, তুমি যাও।

মধুর কথা মনে পড়ে।

মুদ্রিত চোখে কথা বলে পদশব্দ।

—কে?

—মধু।

—এত রাতে?

—আমি ভ্রমরের মধু।

—আঃ ফিরে যাও।

—আমি ভারতবিখ্যাত বি. লালের প্রেমিকা।

—কী চাও?

—ভ্রমরের এই রাত আমি চাই।

—না, এখন দরবারি বাজাবো।

—আমি তোমার দরবারি।

—না।

—আমি মা হতে চাই। ভ্রমরের সন্তান নেব। জোর করে নেবো। আমি বিখ্যাত হবো।

—উঃ। দূর হয়ে যাও।

ভ্রমরের মুদ্রিত পল্লবে পদশব্দ।

—কে?

যেন কেউ না, তবু পদশব্দ।

কেউ ভ্রমরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বহুদিনের চেনা একটা গন্ধের আবর্ত তাকে স্পর্শ করে। অনেক দূর থেকে। মধুর গন্ধ। খুব প্রিয় গন্ধ। খুব ধীরে ধীরে কেউ তার চুলের মধ্যে বাতাসের মতো নরম আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে।

বি. লালের ধ্যানমগ্নতা আরো গভীর হলো।

—কে?

গলার স্বর বুকের মধ্যে নেমে গেল। গন্ধ তার কাছে ভারী হয়ে আছে। বছর কুড়ি আগে মরা বাবলার গাছে যেন বাটিকপ্রিন্টের ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে চাঁদ উঠে আসে। রাগসংগীত গন্ধের মতো বাক-হীন কেন? মধুর বুকের মধ্যে মুখ স্থির হয়ে আছে। সুর ভেসে যায় এক প্রাকৃতিক আবেগে। বুকের ব্যথা আমি কিভাবে বোঝাই! সংগীতে সুর হায়, বোবা।

মাথার উপরে হাত বয়ে যাচ্ছে। ডান হাতখানা দিয়ে টেনে আনতে ইচ্ছে হয় মানবীকে। মনে হয়, গোটা শরীরটাকে সেতারের মতো ছুঁয়ে ছেনে ফুটিয়ে তুলি সংগীতের ভাষা। শরীর ভারী, অবশ। হাত দুটো ওঠে না। কেউ বলেছিল রবীন্দ্রনাথের সুরে কথা আছে। কথায় গন্ধ আছে মধুর। হ্যাঁ, মধু বলেছিল।

কেউ কানের লতি নিয়ে খেলা করছে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া মধুর খেলা।

আবেশে ডাকেন মধু।

মোহময় উত্তর আসে—উঁ!

ভ্রমর ধীরে মধুর বাঁ হাতের আঙুলে আঙুল ভরে দেন। হাতে হাত মিশে যায়।

—মধু, তুমি আজ বিখ্যাত।

—না, তোমার নামের পাশে বিখ্যাত হতে চাই।

টাকু সান্যাল তো বিখ্যাত করেছে।

—না, মধু বিখ্যাত মধুর জোরে।

—মিথ্যা কথা, কে তুমি?

—আমি মধুবালা নই। তোমার মধুশ্রী। তোমাকে জড়িয়ে বড় হতে চাই, বিখ্যাত হতে চাই।

মধুশ্রী নিচু হয়ে ভ্রমরের মুখের কাছে ঠোঁট নিয়ে আসে।

—না।

ভ্রমর ছিটকে সরিয়ে দেন মুখখানা।

—তুমি মধুর শখ, ফ্যাশান, শুধু বাইরেটুকু। ধমক দিয়ে ওঠেন—যাও।

পাঁচ

ঘড়িতে রাত দেড়টা। বাইরেটা গ্রিনরুমের চেয়ে শীতল। ফুটফুটে আকাশ। তারাময়। শাড়ির আঁচল যেন মধুবালার। ঘর থেকে বেরুবার সময় আঁচলের পাকে এক ঝাপটায় যেন বাজিয়ে দেবে তরবের সব তারগুলো। ঝর্নার মতো ঝরে পড়বে সুরের ফুলঝুরি। প্রফেসর বি. লাল চলেছেন—সর্বশ্রী মধুবালাদেবীর মূর্তি উন্মোচনী অনুষ্ঠানে। তার দুপাশে মধুশ্রী আর মধুমর্মী। তাদের সুদীর্ঘ আঁচল আলুলায়িত ভূতলে। নৃত্যের নানান ভঙ্গিমায় তাকে ঘিরে আবাহন করে চলেছে মধুমন্তী, মধুছন্দা, মধুমিতা। তাদের সর্বাঙ্গে ঝরে পড়ছে গোলাপি লাল আলো আর অন্ধকারের খেলা।

স্টেজ ছাড়িয়ে যত সুউচ্চ মূর্তির দিকে তারা উঠে যাচ্ছেন, আলোর খেলায় মনে হচ্ছিল পাঁচজন দ্রৌপদী, একজন অর্জুনকে নিয়ে চলেছেন স্বর্গের দিকে। মর্তে অসংখ্য দর্শক বেসামাল একাগ্রতায় চেয়ে আছে ছায়াপথের দিকে। টি, কে টিভির চ্যানেলে দর্শকেরা হতবাক।

পাচাপা পাজামা, ঢোলা পাঞ্জাবিতে প্রফেসর বি. লাল বিশাল দেহী পুরুষ। এগিয়ে চলেছেন উর্ধ্বমুখে। আজানুলম্বিত বাহু শরীরের পিছনে ঝুলে আছে। হাতে ধরা হাত। সঙ্গীত বক্ষ।

—আমি কাকে উন্মোচিত করবো।

—কাকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছি! কোথায়?

—ইতিহাস আমার হাতে কোন দিকে বইছে? ইত্যাদি তাত্ত্বিক চিন্তায় কেঁপে উঠলেন, বি.লাল। টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ল হাতে ধরা হাত স্থির, খুলছে না। ডান হাত চেপে ধরে আছে বাঁ হাত।

মধুশ্রী বার বার কানের কাছে বলছে,—ভ্রমর, দড়ি ধরে টান দাও। ছোট্ট একটা টান। ভারী সিল্কের আবরণ আপনা থেকেই খসে যাবে। দাও।

মধুমর্মী নাইলনের দড়ি এগিয়ে ধরল বি. লালের দিকে। বি. লালের চোখ বন্ধ হয়ে এল। সর্বাঙ্গ ঘেমে গেছে। তিনি কাঁপছেন। টিভির ক্যামেরা তার হাতের কাছে চোখ জ্বেলে বসে আছে।

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। মধুমন্তী, মধুছন্দা, বুকের সমস্ত বাতাস দিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে দিল। মধুমিতা ডালায় ফুল নিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে, দু হাত এগিয়ে প্রস্তুত।

দু'হাত পাথর হয়ে গেছে বি. লালের।

অনুষ্ঠান ভণ্ডুল হয় দেখে মধুশ্রী আঁচলের ঢেউ তুলে তৈরি করল আড়াল। মধুমর্মী টান দিল দড়িতে। পাথরের মূর্তির শরীর থেকে খসে পড়ল আড়াল। মধুমিতা ছড়িয়ে দিল ফুল। পাঁচজন নারী আবিরের রঙে-গন্ধে ভরে দিল বাতাস। শূন্য থেকে আবির-ফুল উড়ে উড়ে ছড়িয়ে গেল দর্শকের ভিতরে। দর্শকের হাততালিতে জেগে উঠল ঘুমন্ত শহর। শ্যাম্পেনের ফোয়ারায় ভিজে গেল জিয়াজি, গোয়ালিয়র, বোম্বে ডায়িং—ভিজে গেল ঢাকাই মসলিন, মুর্শিদাবাদি সিল্ক, দক্ষিণী কাঞ্জিভরম, বাংলার বেনারসী।

বি. লাল পড়ে যাচ্ছিলেন। মধুমর্মী, মধুশ্রী তাকে ধরে ফেলল। বি. লাল জ্ঞান হারিয়েছেন।

আড়াল তুললো মধুমিতা। মধুমন্তী মধুছন্দা নৃত্যের ভঙ্গিতে পথ দেখিয়ে নেমে এল। মধুমর্মী, মধুশ্রী তাকে নামিয়ে নিয়ে এল গ্রিনরুমে। টিভি ক্যামেরার চোখ ফাঁকি দিতে পারেনি এরা কেউ। গোপন বহু দৃশ্য, তথ্য তোলা রইল। ভবিষ্যতের জন্য। নীচে দর্শক অলিন্দে এখন শ্যাম্পেন নাচ গান আর মুহুর্মুহু হাততালির মধ্যে সকলেই ভুলে গেল— পাঁচ-পাঁচটি নারী—মধুমিতা, মধুমন্তী, মধুছন্দা, মধুশ্রী, মধুমর্মী সকলেরই মিশে যাওয়ার কথা ছিল মধুবালার মূর্তিময়ী দেহে। বিমুগ্ধ চোখে বহু সময় পাথরের মধুবালাকে দেখবেন বি. লাল এবং একা নেমে আসবেন। ভয়ংকর একাকিত্বের সুদীর্ঘ ডাউন স্লোপে পৃথিবীতে, নিঃসঙ্গ নেমে আসছেন—এরকম দৃশ্যে বি. লালকে ধরে রাখার ভীষণ ইচ্ছা ছিল টিভি ক্যামেরাম্যানের।

মণিপালের তৈরি মূর্তি। মূর্তি মধুবালার। বি. লাল দেখবেন না—কেউ ভাবতেই পারেনি। শেষটুকু একেবারে ভেস্তে দিলেন বি.লাল। মধুশ্রী, মধুমর্মী ব্যাপারটাকে সন্দেহজনক ভেবেও চেপে গেল।

অনুষ্ঠানসূচির ক্রমানুযায়ী নীচে মারুতি দাঁড়িয়েছিল। বি. লালকে গাড়িতে তুলে দিতে হবে।

—চোখে মুখে জল দিলে ভাল হতো। মধুছন্দা মৃদুকণ্ঠে একবার মধুশ্রীকে বলল। মধুশ্রী ঠোঁট মোটা করল!

—কিছু হয়নি। আমি সঙ্গে যাচ্ছি। বলে গাড়িতে উঠে বসলো মধুমর্মী। জানালায় মুখ তুলে বলল—গাড়ির বাতাসে ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করার কিছু নেই। ওরা চারজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বিকেলে মধুমর্মী গোপন ইন্টারভিউ দিয়েছে সাংবাদিককে। বুঝল, ওরা কেউ 'মধু' নয়। প্রত্যেকেরই নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। স্বমহিমায় উজ্জ্বলতর নাম আছে। তারা অভিনয় করছে। কেউ কাউকে চেনে না।

নিজের কোলে মাথা নিয়ে মধুমর্মী অপলক বি. লালের আধো-অন্ধকার মুখে। বাইরের

হু-হু বাতাস লাগছে বি. লালের জ্ঞানহীন শরীরে।

ছয়

খবর পেয়ে কমলাক্ষ ওরফে টাকু সান্যাল নিজেই এসেছেন। বি. লাল শুয়ে আছেন। মাথার কাছে মধুমর্মী। বুকের ওপর প্লেট করা আঁচলে 'মধুমর্মী' লেখা সুদৃশ্য ব্যাজ। বি. লাল প্রকৃতিহীন আলোয় ধোয়া ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কতকাল তিনি প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। দেওয়াল, কাচ, আড়ালের জীবন বড় ভারী লাগছে। কতকাল তিনি বৃষ্টি দেখেননি। অথচ 'মেঘ রাগ' বাজিয়ে কতবার খবরের শীর্ষ দখল নিয়েছেন। প্রকৃতির দিন ক্ষণ তিথি—রঙ রূপ রস ভাঙিয়ে অভিনয় শুধু—অভিনয়।

টাকুকে দেখে মনে পড়ে গেল—কোন এক আদিম বর্ষারাতের কথা। টাকুর তবলা, ভ্রমরের সেতার আর বর্ষা ভেজা মধুবালার নাচ—বিদ্যুৎ ঝলক, উদ্দাম ঝড়—মেঘরাগ।
—আয়।

বলে শীর্ণ দরাজ গলায় ডেকে ওঠেন বি. লাল। উঠে কাত হয়ে বসেন। টাকু দু'হাত বাড়িয়ে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরলেন ভ্রমরকে। বহুদিন পর দুই বন্ধুর দেখা।

মধুমর্মী একমুখ বাঁধানো হাসি নিয়ে দেখলো—দুই বিখ্যাত পুরুষের মিলন। সে নির্বাক। মুখ তুলতেই টাকু সান্যালের চোখে চোখ পড়ে গেল। মধুমর্মী চোখ আর নামাতে পারে না। অদ্ভুত চোখ টাকু সান্যালের। গভীর নীল রঙের মণিতে ঘেরা বাদামিরঙের বৃত্ত। বড় শান্ত। বেদনায় সুদূর—অতলস্পর্শী। কেঁপে ওঠে মধুমর্মী।

আবেগ প্রশমিত হলে টাকু বলে ওঠেন, কেমন আছিস ভ্রমর?

—তুই?

—ভাল নেইরে, মধু মারা যাওয়ার পর নিঃস্ব হয়ে গেছি।

ভ্রমর ক্লান্ত হাত তুলে টাকুকে বসতে ইঙ্গিত করেন।

মধুহীন টাকু ওরফে কমলাক্ষ হাঁটু ভেঙে বসে ভ্রমরের শিয়রে। ভ্রমর তাকিয়ে দেখেন। সেই টাকু। একটু মোটা হয়েছে। সেই জাদুকরী চোখ। চোখের বয়স একটুও বাড়েনি। রেওয়াজ করতে করতে একদিন আঙুল ফাটিয়ে ফেলেছিল এই টাকু। হাত খুব মিষ্টি ছিল। একেবারে ভেঙে পড়েছে। মধুকে খুবই ভালবাসতো। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। ভ্রমর বাম করতল বুকে রাখেন। বুকে মধুর চিঠি।

—'চিঠি তুমি পাবে। আমি তখন পাথর হয়ে যাবো।'

—মধু কি জানতো, সে মারা যাবে? জিজ্ঞেস করেন বি. লাল।

—সে সুইসাইড করেছে। অন্য কোনো নারী মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে, সহ্য করতে পারেনি।

বি. লাল সোজা উঠে বসলেন বিছানায়। তার রাত্রি জাগা চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। কানে বাজছে—

—'ভ্রমরের সন্তান নেব। জোর করে নেবো। আমি বিখ্যাত হবো।'

নিষ্প্রাণ গলায় বি. লাল বললেন, তুই দু'লাখ টাকা চাঁদা দিয়েছিস?

টাকুর ম্লান উত্তর আসে,—হ্যাঁ।

বি. লাল চিৎকার করে ওঠেন, —তুই মধুকে খুন করেছিস। করিসনি বল?

বি. লালের ভয়ংকর চিৎকারে ধড়াস করে কেঁপে ওঠে মধুমর্মী। সে পড়ে যাচ্ছিল। ধাক্কা খেয়ে পেছনের দেওয়ালে বসে যায়। জীবনে সে এমন ভয় পায়নি।

—হ্যাঁ, সুইসাইড করারই কথা ছিল। শেষে অস্বীকার করে।

একটু থেমে টাকু ভেঙে পড়ে। —আমি আর পারছিলাম না, ভ্রমর—পারছিলাম না। তুই আমাকে পুলিশে দে।

ভ্রমরের লাল চোখ ঘুরে যায় মধুমর্মীর দিকে।

ভ্রমর এখুনি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন।

মধুমর্মী জানে, তাকে ধরা দরকার। কিন্তু স্পর্শ করার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। ভয়ে তার দু'চোখ ঠিকরে আছে। দু'হাত দিয়ে পেছনের দেওয়াল ধরার চেষ্টা করে। কয়েক মুহূর্ত।

কমলাক্ষ সান্যালের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে নিজেরই পায়ে। অনেকক্ষণ। নীল মণির চারপাশে বাদামি বৃত্ত। অতলস্পর্শী চোখ। টানে। মধুমর্মী ধীরে সরে সরে যায়। নামে মেঝেতে। এগিয়ে যায় কমলাক্ষের দিকে। পরম প্রীতিভরে কমলাক্ষর মাথায় হাত রাখে।

কান্নাভেজা গলায় কমলাক্ষ জিজ্ঞেস করে—কে?

শুকনো ভাঙা গলায় বি. লাল জবাব দেন—আমার তৃতীয় পক্ষ।

ততোধিক সস্নেহে আর একটি উত্তর আসে—আমি মধু।

কমলাক্ষ মধুমর্মীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেন প্রাণভরে।

প্রফেসর ভ্রমরলাল দেখলেন।

কমল-মধু ধীরে ধীরে আবার সংসারের ভিতর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রফেসর বি. লাল আরো একবার নেমে এলেন বিছানা ছেড়ে—দোতলা ছেড়ে—কমলাক্ষর বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে চললেন নদীর দিকে। রাত শেষ হয়ে এল। গঙ্গার একগলা জলে দাঁড়িয়ে বহুদিন 'সোহিনী'কে সাধা হয়নি।

ভ্যালেনটাইনস ডে

সরকার বাহাদুর মদের আইনানুগ ব্যবহারে যেহেতু সম্মতি দিয়েছেন আর প্রেম এবং মদের যখন যুগ-যুগান্তরের বন্ধন, অতএব নীলাভ চোখের রমণী এক গ্লাস মদির পানীয় এগিয়ে দিতে পারলেন ডক্টর চৌধুরীর করতালুতে।

শহরের সবচেয়ে উঁচু আর বিস্তৃত ছাদের কিনার ঘেঁষে দুই সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা। তাঁদের গোলাকৃতি শ্বেতপাথরের টেবিল। মাথায় শূকর চারণের মতো বিশাল রঙিন ছাতা। জ্যোৎস্নামাখা শিশির এবং প্রেমের দেবতা কন্দর্প ইচ্ছে করলেই নিঃশব্দে আশীর্বাদের মতো নেমে আসতে পারেন তাঁদের ছাতার শিখরে।

চতুর্ভুজ খামার সদৃশ বিশাল ছাদে ইতস্তত ছড়িয়ে প্রাসাদ-মৃগ-মৃগীর মতো জোড়া জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। আজ ভ্যালেনটাইনস ডে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক শহরের বিখ্যাত হোটেল হোয়াইট হাউস। তারা স্পনসর করেছেন অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচ। শহরের অভিজাত জ্ঞানী, সম্মাননীয় প্রেমের প্রতিনিধিরা এখানে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে মর্যাদা দান করেছেন। প্রতিসম্মানে কর্তৃপক্ষ উপহার দিয়েছেন মূল্যবান মনোলোভা বিচিত্র পোশাক ও মুখোশ, শ্বাশান, ভষক, সরমা, ঘোঘ, কোক, কৌলেয়ক, অলর্ক মুখোশের আড়ালে, জোড়া জোড়া। কেউ কাউকে চেনে না।

নীচে, একটু দূরেই বয়ে চলেছে—এ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য। প্রেমপ্রীতি ঐশ্বর্যের নদী ভাগীরথী। আমেরিকার বিজয়পতাকা-শোভিত চন্দ্রালোক, নদীর স্রোতে অলংকৃত। ছাদের আলসে বরাবর কোনো কোনো জুটি চেয়ে আছে চাঁদের হিরে মণি, মুক্তো ঝলমলে উর্মিমালার দিকে।

ডাক্তার চৌধুরী তার মুগ্ধ ফেননিভ সারমেয়টির গোলাপের চেয়ে নরম শরীরে হাত বুলিয়ে বললেন—প্রেমের প্রধান উপাদান যদি পরস্পরের প্রতি আনুগত্য হয়, তবে এই প্রাণীটি তার প্রকৃষ্ট পরাকাষ্ঠা।

বৃদ্ধার নীলাভ দৃষ্টি খুশিতে ভরে উঠলো।

বৃদ্ধ এই রাজ্যের অন্যতম সেরা, নামী এবং দামি স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। এই শহরে নতুন কিছু দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। শহর তাঁকে বিশেষ সম্মান ও সম্বর্ধনা দিয়েছে। বৃদ্ধা এই হোটেলের মালকিন হিসেবে শহরকে দশ বছরেরও বেশি সময় সেবা করে আসছেন।

এই শহরের শিল্পসংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠান ভাগীরথী নদীর মতোই তার আশীর্বাদে ধন্য। নীল চোখের দৌলতে এই শহরে তিনি সম্মাননীয়া শ্রীমতী নীলা কুমারী।

ককটেল যে অভিজাত অতিথির আপ্যায়নকে মর্যাদা দেয় তিনি জানেন। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে হিরের টুকরো বসানো বেলজিয়াম কাচের পাত্রে তাকে পরিবেশন করছেন। পানপাত্রটি টেবিলে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে উপবেশন করলেন অসমের গভীর জঙ্গলের বিখ্যাত বেতের তৈরি চেয়ারে। দুই হাতের কনুই টেবিলে রেখে হাতের তালুতে স্থাপন করলেন তার মুখ-প্রতিমা। উজ্জ্বল চোখ দুটি প্রস্ফুটিত হলো ডাক্তার চৌধুরীর চোখে। ডাক্তার বললেন—যে কোনো প্রাণীর শরীরের স্নায়ুকেন্দ্রে শ্রেষ্ঠতম উত্তেজনার ফলে সৃষ্টি হয় প্রেম। ইন্দ্রিয়জ—যেমন দৃষ্টি, শ্রুতি, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি স্নায়ুকেন্দ্রকে মাধ্যম করে প্রেম শরীরে প্রবেশ করে। প্রেমে স্পর্শ ইন্দ্রিয়ই অপেক্ষাকৃত শক্তিমান।

ডক্টর চৌধুরী এক শিপ পানীয় গলায় ঢেলে নিলেন। অনুগতা ছাত্রীর মতো কুমারী নীলা জানতে চাইলেন—

—ঐশ্বরিক প্রেম। প্লেটোনিক লাভ বলে কিছু নেই?

—শূন্য থেকে কি স্নায়ুকেন্দ্রের কোনো উত্তেজনা আসতে পারে? আপনি বলুন।

—আপনার দীর্ঘ জীবনে এরকম কি কোনো অভিজ্ঞতা নেই? যা মনে হয়, আশ্চর্য, জ্ঞানের ওপারে, অব্যাখ্যাত।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ডক্টর চৌধুরী এক চুমুক মদিরা ঢেলে নিলেন স্নায়ুকেন্দ্রের চুল্লিতে।

সমাজসংস্কৃতির একটা যুগ যখন উন্নতির চরম সীমায় উঠতে থাকে, তার ছায়া দীর্ঘতর হয়—সভ্যতার গভীরতর অন্ধকারের আদিকেন্দ্র পর্যন্ত দীর্ঘ হতে থাকে। এরকম কোনো ছায়া অবশ্যই ডক্টর চৌধুরী কিংবা নীলার চোখে পড়েনি। নীল সন্ধ্যা-রাতে শুধু চাঁদের আলোয় হোটেলের ছায়া মিশেছে আ-ভারতবর্ষ বিস্তৃত ভাগীরথীর স্রোতে। মাথা নিচু করে ডক্টর চৌধুরী শুরু করলেন।

—সেটা ষাটের দশকের প্রথম দিক। চিন-ভারত যুদ্ধের বছর। চব্বিশ পরগনা জেলা তখন ভাগ হয়নি। উত্তর চব্বিশ পরগনার এক ছোট্ট শহরে বাবা ট্রান্সফার হয়ে এলেন। ছবির মতো সবুজ শহর। শহরের বুকে ময়নামতি হারের মতো সবুজ জলের শান্ত নদী, ইছামতি। হারের দুই তীরে লায়ার পাখির লেজের মতো বাঁশবনের বুটিতোলা নক্সা দেওয়া পাড়। নদীর ওপারে সোনালি ধানখেতে যখন কচি কুসুম রঙে ভোরের সূর্য ওঠে মনে হয় শহর যেন সবুজ প্রেমের দেবী। সোনালি তার মুখমণ্ডল, উন্নত কপালে টিপ প'রে, ভোরের শিশিরে স্নান সেরে উঠে আসছে। দিন শুরু হবে।

এ সময়ে ফুটবল প্রাকটিস ছিল আমাদের অভ্যেস। ঘাসের জাজিম বিছানো মাঠে

শিশিরে পা ভিজিয়ে ছিল আমাদের খেলা। আমাদের বয়স তখন আঠারোর কোঠায়। ইচ্ছে করে, পিছলে পড়ে শরীরে মেখে নিতাম শিশির। যেন শিশিরের সাথে প্রেম। ওই বয়সে সব কিছু সুন্দর মনে হয়। সবকিছু ভালবাসতে ইচ্ছে করে। মনে হতো প্রেমের এই শহরে আমি অভিনব সুন্দর, আশ্চর্য আগন্তুক। শহরের প্রথম প্রেমিক।

এই পর্যন্ত বলে মুখ তুললেন ড. অপূর্ব চৌধুরী। দু'চোখে তখন যেন জুম লেন্স বসানো। তার চোখের নির্মল আকাশে ফুটে উঠেছে এক হারিয়ে যাওয়া শহরের ছবি।

শ্রীমতী নীলা কুমারী সেই ছবি আরও নিখুঁত দেখার জন্যে করতলে ভাসানো মুখখানা আরও একটু ঝুঁকিয়ে দিলেন অপূর্বর চোখে, যেন তারও কত দিনের চেনা ওই শহর।

অপূর্ব চোখ রাখলেন কুমারী নীলার চোখের গভীরে। নীল চোখের গভীরে যেন ফুটে উঠেছে সাদা ফুটফুটে জুঁই ফুলের মতো রোমশ একটা ছোট্ট জিমি। অস্থির খ্যাপা স্প্যানিয়েল। ছুটতে ছুটতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডক্টর চৌধুরীর মুখে। এক ঝটকায় মুখ সরিয়ে নিতে গিয়ে চলকে পড়ল খানিক রক্তিম পানীয়।

ডাক্তার হেসে উঠলেন।

ককটেলে অর্ধেক খালি অর্ধেক পূর্ণ গেলাসের আড়াল তুলে ধরলেন মুখের সামনে। যেন জিমি তার মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। আধখানা রক্তিম মদির আধখানা স্বচ্ছ হিরে বসানো গ্লাসের ভিতর দিয়ে দেখছেন শ্রীচৌধুরী।

ময়নামতির হার ইছামতি যেখানে বাঁক খেয়েছে—দুই উন্নত বক্ষ বিভাজিত করে উন্মুক্ত করেছে শহরের পশ্চিম-মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে অস্তাচলগামী সিঁদুর টিপের মধ্যে যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে একটি শুভ্র ঋজু কাঞ্চন ফুল, তার পাশে নাচতে নাচতে চলেছে এক গুচ্ছ জুঁই।

খানিকটা আবেশ বিহ্বল গলায় ডাক্তার বলতে শুরু করলেন—কতোদিন! কতোদিন! খেলা শেষ হওয়ার আগেই খেলা ভেঙে যেত আমাদের। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমরা তখন প্রেমের গল্পে ডুবে যেতাম। সেই প্রান্তরে সে সময় সকলেই প্রেমিক হয়ে উঠতো।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে স্বাভাবিক হলেন শ্রীচৌধুরী। চোখের সামনে থেকে নামিয়ে নিলেন কাচের গেলাসের আড়াল।

—আমাদের খেলার মাঠ ছিল ইটভাটার মাটির পাহাড়। শহর ছাড়া অনেক উঁচুতে। ওখান থেকে দেখতাম, বিকেলের মদির আলোয় সূর্যের দিকে মুখ রেখে সে ফিরে যাচ্ছে। তার হাত ধরে গুচ্ছ জুঁইফুলের মতো চঞ্চল জিমি।

ডক্টর চৌধুরী আরো একবার বিস্মৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন: —অপূর্ব, সে ছিল অপূর্ব। আমার নেশা হতো।

বন্ধুদের সকলেরই প্রায় একআধজন প্রজাপতি ছিল। আমার ছিল না। আমি আগন্তুক।

একদিন সর্বসম্মতিক্রমে হাততালির পায়রা উড়িয়ে বন্ধুরা ওই দৃশ্য আমাকে উপহার দিল। নবীনবরণ হলো প্রজাপতি ক্লাবে। বন্ধুদের অযাচিত এই ঔদার্য, মহত্ত্ব আর ওই দৃশ্যের ঐশ্বর্য আমাকে বহুরাত বিনিদ্র আপ্লুত রেখেছে।

সে ছিল অপূর্ব সুন্দরী। সরু কোমর, চওড়া কাঁধ, ঈষৎ ছন্দোময় চলা, আর ছিল আশ্চর্য নীল চোখ, হ্যাঁ আপনার মতো আশ্চর্য নীল। আমাকে মাতাল করে রাখতো।

ডক্টর চৌধুরী চোখ তুলে দেখলেন শ্রীমতী নীলা চেয়ে আছেন তার দিকে। সেই চোখ শ্রীচৌধুরী যেন দেখলেন বহুযুগ পর।

নীলা কুমারীর চোখে মুখে তখন মিটিমিটি হাসি। ছাদের নীল আলোয় সে হাসি রহস্যময়। চৌধুরী বলছেন: মনে হচ্ছিল, আমি এই শহরে শাহজাহান। প্রতিদিন সেই বিখ্যাত দৃশ্যের পিছনে সৃষ্টি হলো আর একটি গতিময় ছায়ামূর্তি। সে আমি।

চলতে চলতে পৌঁছে যেতাম স্বপ্ন-মঞ্জিলের কিনারে। স্বপ্নের মতো ছোট্ট একটা বাংলো বাড়িতে ওরা ভাড়া এসেছিল। ওরাও আমাদের মতো সরকারি যাযাবর। সন্ধে হলে ওদের ঘরে ঘরে জ্বলে উঠত টিউব। সাদা তুলোর মতো আলোয় ঘর-দোর, বাড়ি ঢোকার লম্বা শানবাঁধানো পথ ঝলমল করে উঠত, আমি দেখতাম, আমার প্রজাপতি সারা ঘর বাড়িময় কেমন উড়ে উড়ে বেড়ায়। ফুলে বসার মতো জানলার ধারে টেবিলে পড়তে বসে। ওদের বাড়ি কত শান্ত, স্নিগ্ধ, পরিচ্ছন্ন।

ওদের বাড়ি ঢুকতেই রাস্তার উল্টো দিকে বিশাল শিরীষ গাছের কোলে ছিল ছোট্ট খুপরি চায়ের দোকান। চায়ের দোকানে যেমন বেঞ্চি পাতা থাকে, ওইখানে তৈরি হল আমাদের নতুন আড্ডা। আমার প্রজাপতি ধরার ঠেক। আমার জন্যে বন্ধুরা সকাল সন্ধে এসে জমত এই ঠেকে।

পড়ন্ত বিকেলে রাস্তার মোড়ে ফুটে উঠত কাঞ্চন আর জুঁই। ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হতো। মৌমাছিদের মতো গুঞ্জন শুরু হতো বন্ধুদের মধ্যে—ওই আসছে, ওই আসছে, আজ প্রজাপতি একটু বেশি গম্ভীর মনে হচ্ছে!

—প্রজাপতি মানে জানিস। হবেই তো। প্রজা মানে প্রাণীসমূহ, জনসাধারণ,—পতি মানে রাজা মানে থুড়ি এখানে রানি—আমরা প্রজাবর্গ...

—ব্রাভো, ব্রাভো।

আমি এই অপেক্ষায় থাকতাম। এই দৃশ্য, এই গুঞ্জনে আমার নেশা হয়ে গেছিল।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর এসে পড়ত তার মুখে। এই রোদ্দুরকে বলে কনে দেখা আলো। তার রঙ ছিল দুধে আলতা মেশানো। উন্নত গ্রীবা। ময়ূরের মতো অহংকারী পায়ে সে ঢুকে যেত বাড়ির ভিতর। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতাম।

সে যখন বিধ্বস্ত হয়ে স্কুল থেকে ফেরে জিমি অপেক্ষা করে গেটের ভিতরে। আর

গেটের বাইরে শ্রীমান আমি। যত দূর চোখ যায়, লম্বা পথবরাবর ঘরে ফেরা লোকজন নয়, পথের উপর ঝুলে থাকা নীল আকাশ নয়, স্কুলফেরত নীল স্কার্ট সাদা ব্লাউজ নয়, নীলপাড় সাদাশাড়ির ভিড়ে আমার চোখ দুটো হন্যে হয়ে খুঁজতো পান পাতার মতো রোদে তাতা একটা লালিম মুখ।

এতটুকু দেরি হলে শুরু হতো জিমির অস্থিরতা। ঘড়ি থাকতো আমার হাতে। দেরি হলে বুঝতে পারতো জিমি। অদ্ভুত!

সারাদিনের গ্লানিমাখা ঘর্মাক্ত মুখখানা বিরক্তিতে ঘুরিয়ে নিত জিমির দিকে। আমাকে দেখতেই পেত না। গেট খুলতেই জিমি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত কাঞ্চনের বুকে। কোনো কোনোদিন মাটিতেই পড়ে যেত বইয়ের ব্যাগ, ঝুলে পড়ত শাড়ির আঁচল—আদরে আদরে চুমোয় চুমোয় ভরে যেত জিমি-জুঁইয়ের মুখ-চোখ, সারা শরীর। আমার বুকের ভিতর শির শির করতে করতে কেমন কষ্ট শুরু হয়ে যেত। চোখ মুখ গরম লাগত। মনে হতো, সারা শরীর জ্বালা করছে। চোখ ফিরিয়ে পথের সীমানায় ইকবালের মাংস বিক্রির দোকান দেখতাম। ছাল ছাড়ানো, শুকনো খাসির বিক্রি না-হওয়া টুকরোগুলো, ঠ্যাং, থাই, ঝোলানো সিনার দিকে চেয়ে থাকতাম। জিমি আমার জ্যান্ত শত্রু।

আমাদের পুরো একটা ফুটবল টিম বারবার ফেল করে যাচ্ছিল। কিছুতে কোনো চ্যানেলে প্রজাপতিকে ধরা যাচ্ছিল না। আলোচনায় ঠিক হলো, নিজেরাই চ্যানেল তৈরি করবো। শীতকাল এসে গেছে। অতএব সরস্বতীপুজো। দু-একজনের আপত্তি টিকলো না। এখানেই হবে। হুররে।

আমার স্বপ্ন আর দৃশ্যের ভিতরে একটা ফাটল তবু জন্ম নিচ্ছে, আমি বুঝতে পারি।

যেদিন চাঁদা তুলতে গেলাম, জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম—পড়ার ঘরে বিছানায় শুয়ে কাঞ্চন, বুকের উপর খেলা করছে জিমি। দেখেই আমার গলা কেমন শুকিয়ে এল। আমি আর কুত্তাটাকে সহ্য করতে পারছি নে। গলার কাছে এক দলা যন্ত্রণা পাকিয়ে পাথর হয়ে উঠছিল।

কলিংবেল বাজতেই দরজা খুলে গেল। কাঞ্চন।

—মাসিমা, আমাদের চাঁদাটা, বলার আগেই জানোয়ার-টা কোত্থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার মুখে। রাগে, ভয়ে মুখ ফসকে বলে ফেললাম:

—শালা কুত্তা! হটাও এখান থেকে।

ছুড়ে ফেলে দিলাম মাটিতে।

জানোয়ারটা দ্বিতীয় দফায় আমাকে আক্রমণ করার আগেই কাঞ্চন ওকে বুকে তুলে নিয়ে চলে গেল ভিতরে। একবারও ফিরে দেখল না।

আমার কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। বন্ধুরা আমাকে টেনে নিল পিছনে।

ফেরার মুখে শুনলাম কাঞ্চনের হাও-মাও কান্না।

—মা, মাগো, ওরা আমার জিমিকে কুত্তা বলেছে। ঘটনার হতচকিতায় আমি ছিট্‌কে গেলাম। একটা কষ্টের দূরত্ব—কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। ওর চিকন কান্নার মিষ্টি রোল। বহুদূর থেকে ওর মিষ্টি সুরেলা কান্না আমাকে অস্থির করে তুলতো। আমাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলত। দিন রাত সেই সুর শুনতে পেতাম। চেষ্টা করলে আজও শুনতে পাই। বলে হাসলেন—মি. চৌধুরী।

চতুর্দিক যেন বন্ধ হয়ে গেছে দু'জনের কাছে। তাদের চোখে কানে অন্য কিছু নেই। কুমারী নীলা কিছুই উত্তর দিলেন না। স্তব্ধতাকে ঘনীভূত করে চৌধুরী শুরু করলেন:

—অঞ্জলি হয়ে গেল। বিসর্জনের বরণ হয়ে গেল, ওরা কেউ এল না। নিষ্প্রাণ নিষ্ফল সরস্বতীপুজো। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম।

সেদিন সন্ধের মুখে সে আর কুত্তাটা আসছে। আমি রেডি।

—এই শুনছো।

সে আমার দিকে চকিতে ফিরল। ভয়ে ঘৃণায় আঁতকে ওঠা বিষাক্ত সেই নীল চোখ। এত কাছ থেকে সেই প্রথম দেখলাম। কুকুরটাকে নিয়ে সে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো। আমিও পিছু নিলাম। যেন একটা বেওয়ারিশ। লজ্জার মাথা খেয়ে ডাকলাম—এই!

কুত্তাটা ওর প্রতিদ্বন্দ্বীকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খেপে উঠল। বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ওর তীব্র ঘৃণা, কুত্তার ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বমুহূর্ত আমাকেও খেপিয়ে তুললো। নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না। পথের ধার থেকে একটুকরো পাথর তুলে ছুড়ে মারলাম শয়তান কুত্তাটাকে। অব্যর্থ টিপ। লাগল কুত্তার পায়ে।

—কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ-কেঁ ও?

আমি মুহূর্তে আধো অন্ধকারে মিশে গেলাম।

আঁতকে ওঠা নীল চোখের ঘৃণা আমাকে তাড়িয়ে চলল। বন্ধুদের আড্ডা টানলো না। বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছিল না। আহত হন্যে কুকুরের মতো পথে পথে ঘুরলাম। নিঃসীম যন্ত্রণাদগ্ধ একা। সে রাতে আমার কোন সান্ত্বনা ছিল না।

অপরাধী যেমন অকুস্থলে যায়। পরদিন সকালে গেলাম চায়ের ঠেকে। ওদের বাড়ির সামনে ডাক্তারের গাড়ি। চায়ের দোকানে খবর পেলাম—

কাল সন্ধেবেলা কে বা কারা কুকুরটির পা ভেঙে দিয়েছে। জ্বর, সিরিয়াস অবস্থা। রাতেই অপারেশন হয়েছে। মেয়েটারও নাকি ভীষণ জ্বর। ভুল বকছে।

ভয় হলো, যদি সে নাম বলে দেয়। সরে গেলাম। কিছু দিনের জন্য শহর ছেড়ে

দিলাম।

ফিরে এসে দেখি, আমাদের চায়ের ঠেক উধাও। মেয়েটির বাবা ক্ষমতাশালী আমলা। বে-আইনি ঝুপড়ি ভেঙে দিয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের উপর ভেঙেপড়া গম্বুজের মতো দাঁড়িয়ে দেখলাম—স্বপ্নের মঞ্জিল অন্ধকার। একদিন দূর থেকে দেখলাম, তাকে আর প্রজাপতি বলা যাবে না। ফুলদানিতে জিইয়ে রাখা কাঞ্চনফুলের সরু কোমর, চওড়া কাঁধ, মিইয়ে পড়েছে। হাত দুটো প্রজাপতি-ডানার মতো আর ঝাপটায় না। বড়োজোর মথ বলা যায়। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ির লনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে তার প্রেমিক কুকুর।

কুকুরটা খুঁড়িয়ে হাঁটছে, বুঝলাম, কিন্তু মেয়েটা?

ভাল করে লক্ষ্য করলাম। না, ভুল দেখছি না। আমি, আমি তো মেয়েটাকে কিছু করিনি। ও খোঁড়াচ্ছে কেন? খোঁড়াচ্ছে কেন, কেন?

স্থানীয় কাগজে খবর পেলাম, এটিই আশ্চর্য! কোনো ডাক্তার, বৈদ্য, কবিরাজ সঠিক কিছু বলতে পারেননি। ওর পায়ে কোনো আঘাত ছিল না। কোনো ওষুধে কাজ হচ্ছে না। কোনো পরীক্ষায় কিছু ধরা পড়েনি।

ডক্টর চৌধুরী যেন ক্লান্ত। একটু থামলেম। নীলা দেবী তার নীল প্রশান্ত চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: তার আর পর নেই। নীলা প্রবল আগ্রহে অনুরোধ করলেন— না, বলুন।

ডক্টর চৌধুরী পানপাত্র তুললেন মুখের কাছে। আবার নামিয়ে নিলেন।

—তারপর পড়াশুনোয় ডুবে গেলাম। হয়ত ভুলে থাকার জন্য। হয়ত সেই আশ্চর্য আমাকে নিউরোলজি পড়িয়েছে। হয়ত সবুজ শহরে টেনে নিয়ে গেছে, বারবার। হয়ত স্প্যানিয়েল পুষতে শিখিয়েছে সেই আশ্চর্য।

পায়ের কাছে গুটি মেরে শুয়ে থাকা কুকুরটিকে তুলে নিলেন কোলের মধ্যে। কুকুরটির আজ নেশা হয়েছে। সে মুখ তুলে অস্পষ্ট আওয়াজ করল:

—কেঁও-কেঁ-ও-কেঁ-ওকে।

নীলা জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা ডাক্তার, যেদিন কুকুরটিকে পাথর মেরেছিলেন, কতো তারিখ মনে আছে? ডাক্তার ভাবলেন— ফোরটিনথ্ ফেব্রুয়ারি।

নীলা বললেন—চলুন ডাক্তার ওঠা যাক্। রাত হচ্ছে।

—একস্‌কিউজ মি।

নীলা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছেন। ডাক্তার তাকিয়ে আছেন। যেন একটা ভারী মথ।

একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটেন নীলা। বুঝিবা বয়সের ভার। ডাক্তার অর্ধেক রক্তিম পানীয় অর্ধেক হিরে বসানো কাচের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে আছেন।

সে চলে যাচ্ছে।

ছাদের কিনার ঘেঁষে এখনও অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে যেন রাতে জাহাজের ডেক। কেউ ভাগীরথীর স্রোতে, কেউ আকাশের তারায় মগ্ন। টেবিলে টেবিলে কারা যেন চোখের তারায় নীল রহস্য সন্ধানে রত। রাত এখনও আশ্চর্য মদির!

অভিসার

অর্থনীতিবিদ্যায় উৎপাদন নামে একটি তত্ত্ব আছে। তাত্ত্বিকেরা উৎপাদনকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। বস্তুগত উৎপাদন ও ভাবগত উৎপাদন। বস্তু ও ভাবের সম্পর্ককে দেখেছেন প্রিজমের পঞ্চতলে কার্যকরী ত্রিতলকে সামনে রেখে। প্রিজমটি কল্পনা করুন শ্রমের প্রতীক এবং স্বচ্ছ হিরে। বস্তু ও ভাবের বিষয়কে ভাবুন আলোকরশ্মি।

আইনস্টাইন বলেছেন—আলো বস্তুকণা বৈ অন্য কিছু নয়। আলোকরশ্মিটিকে প্রিজমের একদিকে ফেললে অন্য দুই তলের এক দিকে দেখতে পাবেন ইন্দ্রধনু উদভাসিত মহল ময়ূর। শহরের সর্বজন পরিচিত এবং বিখ্যাত রঙের প্রতিষ্ঠান। ইন্দ্রধনু আসলে সাদা। সাত রঙ দিয়ে তৈরি দেওয়ালে আলো পড়লে ইন্দ্রধনু দেখবেন। মহলের মধ্যে; হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন, আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবার সর্বক্ষণের প্রতিনিধি পাবেন। সাদা আসলে রঙের বীজ। এই বীজ থেকে সাত রঙ জন্ম নেয়। ওই সাত রঙের বর্ণানুক্রমিক চাকতিকে তীব্রগতিতে ঘুরিয়ে দিন কিংবা ময়ূরমহলকে চক্রাকারে দেখুন ওর রঙ সাদা। তবু এই রঙ কৃত্রিম। মহলের ঝকঝকে দেওয়ালে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন — বেগুনি, নীল, আকাশি ... পরপর বেনীআহসকলাবৃত্ত। দেওয়ালটি চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করল। দেখুন বেনীআহসকলা তীব্রগতিতে কেমন শ্বেতবর্ণের কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টি করে।

নিউটন যে চোখে পৃথিবীর রঙ দেখেছিলেন, তার চোখের সঙ্গে আপনার চোখ জুড়ে অতিরিক্ত একটি রঙ আবিষ্কারের আতঙ্ক অনুভব করুন। পদার্থবিদ্যা তাকে সম্মানিত করেছে 'বর্ণহীন' নামে। সমাজ তাকে শক্তিমান, কূটনীতিবিদ, প্রেমিক একশ আট নামের 'কৃষ্ণ', কিংবা মি. ব্ল্যাক নামে কুর্নিশ করে বিশ্ব যাঁর নামের মহিমায় অন্ধ।

বঙ্গভূমিতে 'ফর্সা' নামান্তরে 'হাসা' অর্থাৎ শুভ্র। মহল ময়ূরের কুর্সিতে উপবেশন করে আছেন শুভ্রনীল। তাঁর রঙ এবং নাম। তিনি নিজের রঙ এবং নাম খুবই ভালবাসেন। মাথাভর্তি ধবধবে সাদা কোঁকড়ান চুল। ওৎ পেতে আছেন। বেড়ালের মতো তীব্র কটাশে চোখ। জনবহুল রাজপথ। কে তাঁর আসল খরিদ্দার! কে তাঁর নাম এবং রঙের লোভনীয় জালে আটকায়! গল্প যখন শুরু হল, তিনি ফোন তুললেন। এবং গলা চিরে ছোট্ট আওয়াজ বেরিয়ে এল — এ্যাঁ!!

তাঁর মুখ থেকে অনেকক্ষণ কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। প্রাণপ্রিয় মেয়ে। যাকে তিনি ... যাকে তিনি গোলাপের চেয়েও বেশি যত্নে মানুষ করেছেন। মৃত স্ত্রীর প্রতি প্রেম

অক্ষয় করে রাখতে তাজমহলের মতো সুন্দর করে গড়ে তুলছেন। নির্মাণ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। পালিয়ে গেছে। খুব ধীরে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

হাতখানা বেশ অবশ লাগছে। জোর করে তুলে তালুর উল্টো পিঠে কপাল মুছলেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছিল। উঠলেন। বিশাল বপু। গাড়িতে বসলেন। সাদা রয়েল রয়েস। সোজা বাড়ি। সাতমহল। লিফট তুলে আনার সময়টুকু সহ্যের বাইরে। সিঁড়ি দিয়ে যতদ্রুত সম্ভব নেমে গেলেন। হ্যাঁ, ঘাম বাড়ছে।

পৃথিবীতে জোয়ার আসে পূর্ণিমায়। চাঁদ কাছে এলে। সুখ দুঃখে নয়। ভৌগোলিক বিজ্ঞান বলে — অভিকর্ষজ টানে। প্রেম ভালবাসা স্নেহ ওসব কবিদের কল্পনা। শুভ্রনীলের ঘাম বাড়ছে। মেয়ে পালিয়ে গেছে কোথায়? কতদূরে? সে কি কোথাও থেমেছে? নাকি চলছে? কার সঙ্গে, তিনি জানেন।

— কোন কুক্ষণে যে হারামজাদা বাঁশিওয়ালাকে ঘরে ঢুকিয়েছিলাম।

বাঁশি এখন সাইরেন হয়ে মাথার মধ্যে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বাজছে। পূর্ণিমার চাঁদের মতো চন্দ্রবরণ মেয়ে আমার। ভৌগোলিক বিজ্ঞানে ঘামের জোয়ার ব্যাখ্যা করা যায় না। মেয়ে যতদূরে যায়, শুভ্রনীল তত নীচে নামতে থাকেন। চোখের ভিতর নোনতা জোয়ার যেন ঠেলে আসে। গলায় নোনতা স্বাদ বুঝি আটকে যায়। বুক পিঠ হাতের তালু জুড়ে ঘাম। ঘামের জোয়ার।

বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ডে রঙের গোডাউন। গোডাউনের আন্ডারগ্রাউন্ডে টাকার গোডাউন। স্যরি গোদরেজ ভল্ট। আলো জ্বালতে জ্বালতে এগিয়ে নামছেন শুভ্রনীল। এখানে অন্ধকার, কৃষ্ণ বলে কিছু নেই। বর্ণহীন কিছু নেই। টাকার রঙ? না, সমস্ত নোটেই ভারতবর্ষের আরবিআই গভর্নরের আসল সই। টাকার গোডাউনের আন্ডারগ্রাউন্ডে সোনার বাটের চেম্বার। আলো পড়ে ঝলমল করে উঠল। ক্ষতি খেসারত কিংবা লাভ শুধু লাভ হলে শুভ্রনীল এখানে আসেন। বসেন। হিসাব মেলান। তাঁর মাখনরঙা পেন্টাগন মুখে সোনা হিরে মণি মুক্তো বিচ্ছুরিত আলো খেলা করে। লাভ কিংবা ক্ষতি হোক শুভ্রনীলের মুখের রঙ বদলায় না। অল দ্যাট গ্লিটার্স আর গোল্ড হেয়ার। সমস্ত কষ্টিপাথরে যাচাই করে এই কোটরে ভরা হয়। সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে। আন্ডারগ্রাউন্ডের চারপাশে আরো অনেক আন্ডার ওয়ার্লডস্ আছে। আমাদের গল্পে সেগুলি দরকার হবে না। চেয়ারে না বসে শুভ্রনীল ধীরে ধীরে আন্ডারগ্রাউন্ডের মাটিতে বসে গেলেন। কানে ধরা মোবাইল।

না, মা তমার মোবাইল অফ করা আছে। এ্যাটলিস্ট মুঠোফোন আউট অফ রিচ। শুভ্রনীল খুব শখ করে মেয়ের নাম রেখেছেন তিলোত্তমা। আদর করে ডাকেন তমা। মা হারা মেয়ে।

তার নিজ হাতে ডিজাইন করা এই গোডাউন। আপন সন্তানের মতো চেনা। তবু এই

উদ্‌ভাসিত আলোর নিচে তিনি একা। সবকিছু এলোমেলো, অপরিচিত, গোলমাল লাগছে। এ সময় মা তমাই এগিয়ে দিত তোয়ালে। একটা দীর্ঘশ্বাস বুঝি নিজেকে চিনতে না পেরে বেরিয়ে গেল। ঘাম না মুছেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। না, তা হওয়ার নয়। নিজের পকেট থেকে নিজেই রুমাল বের করে ঘামে ভিজে যাওয়া মুখ, চোখ, মাথা মুছে নিলেন। লক অ্যান্ড কি-র আন্ডারে নিখুঁতভাবে দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন দেওয়াল। চাবি লুকিয়ে নিলেন শরীরের গোপন পাতালে।

মেয়ের সাথে দূরত্ব কমাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলেন। লিফটের কথা ভুলে গেছেন। কিংবা মেয়ের প্রতি ভালবাসার টানে নিজেকে আরো বেশি কষ্ট দিতে চাইছেন। নিজে হাতে বের করলেন মারুতি জেন, মেয়ের হাতের স্পর্শ এখনও লেগে আছে, মেয়ের প্রিয় গাড়ি মারুতি জেন। তমা নিজে পছন্দ করে কিনেছে। যতক্ষণ ছুঁয়ে থাকা যায়। চলতে শুরু করল জেন।

— মা তমা তুই কোথায়?

জেন চলছে। এসি বাড়িয়ে নিলেন শুভ্রনীল। আন্ডারগ্রাউন্ডে টাকার চেম্বারের মতো, সোনার সেলের মত মাথার ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। সুনসান বুরবাক লাগছে নিজেকে।

— এ কী করলি তুই বোকা মেয়ে! চকমিলানো বাড়ি দেব। রাজপুত্তুর বর দেব। দুনিয়াদেখা ধন দেব। বোকা মেয়ে। দীর্ঘশ্বাস কথা বলে না। শুধু ঝাউবনের মতো উদাস করে দেয়।

নিমকহারাম, মিরজাফর ছোকরা কি এখনও সঙ্গে আছে? না মেরে কেটে পালিয়ে গেছে? নহবত বসবে, উলুধ্বনি উঠবে। না, ছাদনাতলা শূন্য হতে দেব না। মা তুই যেখেনেই থাকিস ফিরিয়ে আমি আনবই। দুনিয়ার এমন শয়তান জন্মায়নি যে নীলের কব্জির বাইরে থাকে।

মুনিঋষিরা বলেন, টাকার নাকি পাখনা আছে, ওড়ে। তাকে ধরা দায়। খাঁচায় ভরা আরো দায়। সাতমহলা মাটির নিচে পাথরের দেওয়াল ভেঙে সে উড়ে যায়। যখন পায়ের নিচে জুতোর সুখতলায় নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকে দেওয়াল বন্ধ করা চাবি।

জেন এসে দাঁড়াল হোটেল ময়ূরের পার্কিং-এ। হোটেলময় কর্মচঞ্চলতা নিষ্ঠুরভাবে আরো গতিময় হয়ে উঠল। পাঁচতারা হোটেল। এ প্রতিষ্ঠান তারই। তিনিই মালিক। সোজা উঠে এলেন নিজের কোচে। আগে-ভাগেই সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ বিশ্বশ্রী মনোহরপ্রসাদ। সংক্ষেপে মিঃ বি.এম.পি. গোল্ডমেডালিস্ট। তিনিও শুভ্রনীলের মতো সাদা পোশাকের নাগরিক। যুবক মনোহর প্রসাদ। পাথরের মতো মুখমণ্ডল। তীক্ষ্ণ চোখ। ঠোঁটে কড়া তামাকু জেদ। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক। শুভ্রনীল যথার্থ ব্যক্তিকেই নির্বাচন করেছেন। অন্য রঙের ব্যক্তি তার পছন্দ নয়।

রুদ্ধদ্বার আলোচনার শেষে চুক্তি বিনিময় হল — 'একদিকে সই করা সাদা ব্ল্যাঙ্কচেক, অন্য দিকে মা তমা অর্থাৎ তিলোত্তমা সেনকে নিরাপদ, সুস্থ এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় পৃথিবীর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানার আগে গোপন প্রত্যার্পণ।' অন্য একটি অলিখিত চুক্তিতে বলা হয়েছে, তিলোত্তমা সেনকে এই কাজে সঙ্গ দিয়ে (ফুঁসলিয়ে) যিনি সাহায্য করেছেন (বের করে নিয়ে গেছেন), তিলোত্তমা সেনের কোনো ক্ষতি করার আগে সেই বিখ্যাত (অকাল-কুষ্মাণ্ড) বাঁশি এবং বেহালাবাদক তরুণ ওস্তাদ (ধড়িবাজ কোথাকার!) দাউদ আলি খান সুরসেন যেন তার সুরের মতোই সকলের অগোচরে ঝরে পড়েন পৃথিবী থেকে, এমনকি মা তমারও। আকাশে তারার মধ্যে যেন তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়। তরুণ ওস্তাদের (ধড়িবাজের) পারিবারিক পরিচয়পত্র এবং ছবিসহ চেহারার বর্ণনা দেওয়া হল। ওস্তাদ বন্দে আলি খানের পুত্র ও যোগ্য সহচর। বেতার দূরদর্শন প্রচারিত বেশ নামী শিল্পী। গুরুর সঙ্গে আমেরিকা, জার্মান, ফ্রান্সে অনুষ্ঠান করেছে এবং নাকি প্রশংসা কুড়িয়েছে (ঘোড়ার ডিম)। ছ'ফুট লম্বা। সোনার বরণ ফর্সা। মাথায় বাবরি চুল। নতুন গোঁফ দাড়ি। আয়ত দীর্ঘ, সুর্মাটানা চোখ। ঘন কালো উদাস দৃষ্টি এবং গভীর কালো মণি। পা-চাপা পাজামা। হাঁটু পর্যন্ত পাঞ্জাবি। কাঁধে বাঁশির ঝোলা, পিঠে বেহালা। হাতে বাঁশি।

আশা করা হল শুভ্রনীলের সন্তান-বিরহ এক পক্ষ কালের বেশি স্থায়ী হবে না।

দশ বছর পর গল্প দ্বিতীয়বার শুরু হল।

প্রিজমের পাঁচতলের ভিতর নয় রঙ এবং তিন তলের গল্প তিন কাল ধরে প্রবহমান। প্রেম নিরুপায়। সেই হিরের তৈরি প্রিজমের ভাবগত উৎপাদনশীল তলে প্রস্ফুটিত ময়ূরপঙ্খী হোটেল তিলোত্তমা। ভাগীরথীর জলে ভাসমান। ঐতিহাসিক জেলা মুর্শিদাবাদে শুভ্রনীল সেনের আর এক কীর্তি।

সৌভাগ্যবান শহরবাসী, দশবছর ধরে ভাগীরথীর জলে তিল তিল করে জেগে উঠতে দেখেছেন শ্রীসেনের এই মানসকন্যা। তিলোত্তমা। ফাইবারনির্মিত অপূর্ব কারুকার্যময় ময়ূরপঙ্খী নাও। ময়ূরপঙ্খীর বুকজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রেমের স্নেহরূপ সৌধ তিনতারা হোটেল তিলোত্তমা। হাতির দাঁতের মতো সমস্ত স্তম্ভের রঙ সাদা আর মসৃণ। স্বচ্ছ স্ফটিকরঙের দেওয়াল। ভোরের কিরণ যখন এসে পড়ে যৌবনবতী কন্যা জ্বলে। জলের নীচে ছায়া পড়ে। বিম্ব প্রতিবিম্ব মিলে একাকার। তার দিকে খালি চোখে তাকানো যায় না। আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীরাও দ্রষ্টব্য তালিকায় হাজারদুয়ারি, কাটরা মসজিদের সারিতে লেখা থাকে জলকন্যা তিলোত্তমার নাম। শ্রীসেন তার ইন্দ্রপ্রস্থের সাতমহলা বাড়ির ছাদে বসে দেখেন। চোখে রে-ব্যান। বর্ণহীন চশমা। গজেন্দ্রগমনে চলে কন্যা। দু-চোখ ভরে দেখেন। কন্যাসন্তান, পরায়াধন ছেড়ে দিতেই হয়।

বহরমপুর মাতৃসদন ঘাট থেকে গোরাবাজার মহানির্বাণ ঘাট ময়ূরপঙ্খীর যাত্রাপথ। পতিগৃহে যাত্রা নাকি অভিসার? তিনমহলা তিলোত্তমা চোখের আড়াল হলে, চশমা খুলে চোখ মুছে নেন শ্রীসেন। বয়সের ভার সহ্য হয় না। দৃষ্টি কেবলই ঝাপসা হয়ে আসে।

শহরে পথিক এলে নাবিক হয়ে ফিরে যায়। তিলোত্তমার ঘরে একরাতের অতিথিও হোটেলের পক্ষ থেকে 'নাবিক' উপাধিতে ভূষিত হয়। মুর্শিদাবাদে যে কোনো পুরুষের নাবিক উপাধি গৌরবের। এ জেলার যে কোনো প্রান্তে, যে কোন মুহূর্তে, বাতাসের কানেও যদি তিলোত্তমার অতিথি হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন, স্থলপথে নির্দিষ্ট সময়ে মারুতি জেন, জলপথে 'তমাসেন' আপনাকে বুকে করে পৌঁছে দেবে তিলোত্তমার ঘরে। মারুতি জেন আপনি চেনেন। তিলোত্তমা সেনের প্রিয় স্থলযান। আর শুভ্রনীল সেনের ইচ্ছায় একগুচ্ছ পানকৌড়ির মতো সাম্পানের নামকরণ হয়েছে 'তমাসেন'। অতিথি-আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি তিনি রাখেননি। যদি আপনি ছ'ফুট লম্বা, ফর্সা হন, পা-চাপা পাজামা হাঁটু পর্যন্ত জামা, আয়তাকার সুর্মাটানা চোখ হয়। আপনাকে সম্মানিত করা হবে 'নাবিক সেন' উপাধিতে।

আবার লিখি, যদি আপনি ছ'ফুট লম্বা, ফর্সা, পা-চাপা পাজামা, হাঁটু পর্যন্ত পাঞ্জাবি, কাঁধে বাঁশির ঝোলা, পিঠে বেহালা — শ্রী শুভ্রনীল সেনের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মানিত অতিথি আপনি 'নাবিক সুর সেন'।

ময়ূরপঙ্খী চলে। ইচ্ছে হলে চলে। ইচ্ছে হলে পেখম তুলে দাঁড়ায়। বেলা বাড়ে। রোদ্দুরের রঙ বদলায়। ময়ূরপঙ্খী রঙ বদলায়। একে একে সাত রঙ খেলা করে তার শরীরে। স্নান সারতে এসে বেলা বয়ে যায়। শ্রীতমার দিকে চেয়ে চেয়ে মানুষের কাজ ভুল হয়ে যায়। শ্রীতমা জল, আলো, বাতাস নিয়ে, মানুষের মন নিয়ে আপনমনে খেলা করে আর চলে।

শেষ বিকেলে নাও তখন কলেজ ঘাটে। তার স্ফটিকরঙা দেওয়ালগুলি ফাঁপা। শূন্য নয়। দেওয়ালের অন্তরে স্থাপন করা নানাবর্ণের আলো। দিনের রঙের সাথে মিল রেখে একে একে জ্বলতে শুরু করে। জলের নিচে-উপরে রূপের বাহার খোলে। সান্ধ্য ভ্রমণকারীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। চিকিৎসকের বিধি ভুলে তারা দাঁড়িয়ে যায়। দেখে। ময়ূরপঙ্খী রঙে রঙে রঙমশালের মতো তিলোত্তমাকে সন্ধ্যার সাজে পরিপূর্ণ করে তুলছে। জোয়ারে জল যেমন নদীর ঘাটে ছলাৎছল গানে ভরে ওঠে, তিলোত্তমার বাঁকে বাঁকে যৌবনের ছলাৎছল বাজে, শোনা যায় সন্ধ্যার আঁধারে।

তিলোত্তমার মোহন রূপে তখন আগুন জ্বলে। পতঙ্গের মতো পথিকেরা পিপাসার্ত বেদুইনের মতো পথ ভুল করে। তমাসেন যেন ঝাঁক ঝাঁক পানকৌড়ি ঝুপঝাপ তিলোত্তমার শরীরে বসে। ভাগীরথীর জলে দোল খায়। ক্লান্ত পথিকেরা অবতরণ

করেন। তিলোত্তমা খোঁজে, কোথা সেই মোহন বাঁশিওয়ালা। কবে আসবে। দুয়ার খোলা থাকে। তমাসেন বিষণ্ণ হতে জানে না। আলোর রঙে তিলোত্তমার অঙ্গ ছিঁড়ে ভেসে যায়। কোথা সেই ছ'ফুট লম্বা, সোনার বরণ ফর্সা মোহন বাঁশিওয়ালা।

সান্ধ্যভ্রমণকারী যদি ফেরার পথে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। শুনতে পাবেন ছলাৎছল তালের ভিতর মিহিন এক বাঁশির সুর। নদীর ঢেউয়ের মতো দোদুল। নদীর তীরের মতো দীর্ঘ এবং বিস্তারের মতো উদার। এই সুরে নেশা হয়। শরীরে ছন্দ ওঠে। তিলোত্তমা সন্ধ্যার মৃদুমন্দ সমীরণে দোলে। যেন গজেন্দ্রগামিনী তার চলার ছন্দে নাচ রেখে যায়। রাত বাড়ে, নেশা বড়ে। বাঁশির সুরে মাতাল হয় নদীর দুই কূল। ঝিম লাগে তিলোত্তমার বুকে। হৃৎপিণ্ডের কক্ষে কক্ষে সবুজ নাবিকেরা নীল হয়।

অন্ধকার নদীতীর থেকে ময়ূরপঙ্খীকে মনে হয় চন্দ্রবিছেহার। বিচিত্র বর্ণে সোনা রূপা ফসফরাস রেডিয়াম ধাতুর উজ্জ্বলতায় জ্বলছে। হিরে মণিমাণিক্য খচিত তিলোত্তমা তার লকেট। ঝুলে আছে অন্ধকার নক্ষত্রখচিত আকাশে। ভাগীরথীর বুকে তার ছায়া পড়ে। রাত্রির দিগন্তে এ এক মনোহর অপূর্ব দৃশ্য। সমস্ত শহর যেন মোহময় এই দৃশ্যের দিকে নতজানু হয়ে চেয়ে থাকে।

প্রায় বারোবছর আগে প্রাইভেট ডিটেকটিভ বিশ্বশ্রী মনোহর প্রসাদের সাথে শুভ্রনীল সেনের একটি গোপন এবং ব্যর্থ চুক্তি হয়েছিল। বিখ্যাত তরুণ বেহালা এবং বাঁশি বাদক ওস্তাদ দাউদ আলি খান সেনকে যেন তারার মধ্যে খুঁজে নিতে হয়। তিলোত্তমা যেন সেই তারা খুঁজে না পেয়ে আকাশের গলায় চন্দ্রবিছে হার হয়ে ঝুলে আছে। দুলছে। বাঁশির সুরে, দুলছে। কালনাগিনী যেমন দোলে।

তিলোত্তমার যাত্রা শেষ হয় গোরাবাজার মহানির্বাণ ঘাটে। বাঁশির সুর উঠে আসে শ্মশানের হৃদকন্দর থেকে। বাঁশির টানে ছুটে আসে শ্রীতমা। বাঁশি ডাকে। প্রাণছেঁড়া সেই ডাক। দুকূল উথালপাথাল করা সেই ডাক। চাঁদিনি কি তমানিশা-শ্মশানের গহন-কন্দর থেকে সুর ওঠে। কথা বলে। তিলোত্তমার কানের কাছে গল্প করে, হৃদয় মন্থন করা কথা। মধ্যরাতে লয় দ্রুত হয়। ঝংকার ওঠে। তিলোত্তমা অস্থির হয়। সুখ, সুখ, আহা-সুখ! সুখের ক্লান্তিতে গলে গলে পড়ে তৃপ্তি। এই ঐশ্বর্যের জন্য তার চলা। তার জীবন, তার মরণ, প্রতিদিন। একদিন শ্রুতিতে একদিন স্মৃতিতে সুরের বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে রাত্রির কোলে। ঘুমিয়ে পড়তে চায়। যেন আর কোনো দিন না জেগে ওঠে।

পিতৃহৃদয় কিন্তু জেগে থাকে। যখন রাত্রির কোলে কেঁদে ওঠে সদ্যঃপ্রসূত ভোর। বাতাসে ভেসে আসে বিরহী পিতার অসহায় ডাক। পিতৃভূমির জন্য আকুল হয়ে ওঠে প্রাণ। কুসুমকরের চেয়ে নরম আর মাতৃজঠরের মতো মসৃণ নদীপথ। মাতৃসদন ঘাটের কোলে মা তমা ডাক অপেক্ষা করে আছে। ভোরের আলোয় আবার চলা শুরু।

কাচের শহর

ঘোলা জল ঘেঁটে ঘেঁটে বাঘা বাঘা বুঝমানেরাও ফেল মেরে যায় ভালবাসার খাঁটি জলে পিয়াস মেটাতে। ভালবাসা কখনও ধুলো বালি ইট কাচ পাথরের মধ্যে ধরা দেয়। কখনও ধরা দেয় ল্যাংটো ছোঁড়ার হাতে। ভালবাসা খুব সহজ সরল কিন্তু গভীর ও সহজাত আবেগ দিয়ে অনুভব করতে হয়। না, স্যার না ম্যাডাম, বাঘা বাঘাদের মতো তত্ত্ব ঘেঁটে গল্পটাকে মাটি করার ইচ্ছে আমার নেই।

নেহাতই এক কাচ-ব্যবসায়ীর গল্প। দু-পয়সা কামাই হচ্ছে দেখে ব্যবসাটাকে জড়িয়ে ধরেছে। কাচ জড়িয়ে ধরা বে-আইনি কিছু নয়। বরং কবিতায়-টবিতায় কাচ এবং কাচের রকমারিকে প্রেমের এত কাছের জন হিসেবে দেখানো হয়েছে প্রেমিকারা হয়ত মানিকজোড় ভেবে কাচের দোকানিকে প্রেমের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করে বসবে।

একমাত্র কাচের শৈশব কৈশোর বার্ধক্য কিছু নেই। (জন্ম মৃত্যু পায়ের ভৃত্য)। যৌবন শুধু যৌবন। এ কারণে বাজারে কাচের বিক্রি ইদানীং বেশ বেড়ে গেছে। যৌবনের রঙ, নকশা, উজ্জ্বলতা কে না চায়! যৌবনের গায়ে যখন অর্থের রোশনি লাগে ভালবাসার পোকারা হুমড়ি খেয়ে হুল্লোড় শুরু করে, শহর তখন প্রাণবন্ত হয়।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢোকার মূল সড়কটা সিমেন্ট আর আলো দিয়ে বাঁধানো। সড়কের দু'ধারে এমন দোকান নেই যার শরীরে কাচের গহনা, আলোর তুফান নেই। সড়কটাই যেন যৌবনের সিঁড়ি। আর 'কাচের স্বর্গ' দোকানটা শহরের মুখে সিঁড়ির প্রথম ধাপ।

মোটরবাইক একটা আন-সায়েন্টিফিক্ যান। নিজে দাঁড়াতে পারে না, শীতে বর্ষায় কাবু ইত্যাদি যুক্তি দেখিয়ে 'কাচের স্বর্গে'র মালিক একখানা চার চাকা ফিয়েট কিনে ফেলল দেখে পুলিশের হাতের তালু চুলকে উঠল। পুলিশ কেন, যে কোনো সরকারি কর্মচারীর হাতের তালু চুলকালে আপনারাও বুঝতে পারেন, একটা গল্প শুরু হলো।

সন্ধে হলেই ক' দিন ঘোর কুয়াশা নামছে; ল্যাম্পের নিচে গ্লোসাইন বোর্ডের লেখা পর্যন্ত পড়া যাচ্ছে না। সেই সাথে হাড়-হিম-করা কনকনে সমীরণ। বাতাসে আর্দ্রতার অঙ্ক একশ, ছুঁই ছুঁই। যারা ডিসেম্বরকে ভালবেসে বলেন— শীতকালে শীত পড়বে নাতো বাতাস থেকে কদমা ঝরবে? রাস্তায় তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। সুনসান শহর শীতের আক্রমণে লেপ-তোশকের দুর্গ হয়ে উঠেছে।

এমন প্রতিরোধহীন শহরে, অভিজাত বস্ত্রবিপণি, সততাই যার একমাত্র মূলধন, 'জয় মা কালী বস্ত্র ভাণ্ডারের' কাচের স্ট্যাচু বক্স কে বা কারা কাল রাত্রি সাতটা নাগাদ ভেঙে ডালিমের দানার মতো তছনছ করে ছড়িয়ে রেখে গেছে। কাচের দোকানে ষাঁড় ঢুকেছে সেই প্রবাদটা মনে করুন। ভাগ্যিস, স্টিল লাইভ মিস স্বর্ণময়ী সেই মুহূর্তে স্ট্যাচু বক্সে ছিলেন না। একটা বড়-সড় ঝুট ঝামেলা থেকে রেহাই পেলেন দোকানের মালিক শ্রী প্রমোদকুমার বসাক এ্যান্ড সন্স।

ছড়িয়ে পড়া কাচের মধ্যে পাওয়া গেছে প্রায় নশোপঁচাত্তর গ্রাম ওজনের একটা কালো গ্রানাইট পাথর। মালিকপক্ষের নিজস্ব বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী, পাথরটি বিহারের রাজমহল এলাকায় পাওয়া যায়। কমপক্ষে পঁচিশ থেকে তিরিশ ফুট দূর থেকে ছোড়া হয়েছে। যে ছুড়েছে তার আঙুলে বন্দুকবাজের মতো নিশানা আর বাহুতে ফাস্টবোলারের মতো শক্তি। সে কুয়াশার মধ্যে নদীর, মানে ভাগীরথীর দিক থেকে এসেছে। নৌকায় ও আসতে পারে। পাথর ছোড়ার পর ভাল মানুষের মতো দোকানের সামনে দিয়ে চলে গেছে। সন্দেহভাজন একশ তিরিশজন সম্ভাব্য নামের ফর্দ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে শহরের বিখ্যাত ক্রিকেটার অলিকুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও আছে।

'কাচের স্বর্গ' থেকে কাচ এনে নতুন এবং আরো আধুনিক মডেলের স্ট্যাচু স্ট্যান্ড তৈরি করার পরও বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অব্যাহত রইল। সরকারি তরফে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা হলে বিশেষ সহায়তার আশ্বাস পাওয়া গেল। পুলিশের মেজবাবু বারদুয়েক জলযোগ করে গেলেন। মদিনা মহাবস্ত্রালয় সহ বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আন্তরিক সমবেদনা জানালেন।

এতদসত্ত্বেও কুয়াশা কিন্তু নাছোড়বান্দা। ঠিক সাত দিনের মাথায় 'জয় মা কালী বস্ত্রভাণ্ডার' আবার আক্রান্ত। এবারও স্ট্যাচু স্ট্যান্ড। শহরজুড়ে ডালিমদানার মতো গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। আতঙ্কে নীল হয়ে মিস স্বর্ণময়ী কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন—আমি কাজ ছেড়ে দেবো। এবছরই তার মিস স্বর্ণময়ী হওয়ার শেষ সম্ভাবনা। জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে, ৩৪, ২৪, ৩৪ সুন্দর সংখ্যাগুলো শরীরে ধরে রাখা এবং প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার কাগুজে বয়সও এই বছর শেষ হবে। ছেলেও বড় হয়ে হয়ে আসছে। শরীরে খুঁত তিনি হতে দেবেন না। এ তো জীবন মরণ খেলা। এবারও কপালগুণে না হয় স্ট্যান্ডে ছিলেন না। শ্রী প্রমোদকুমার বসাকের আয়নার মতো টাকে এবং 'এন্ড সন্সে'র কুঞ্চিত চুলে ঈশানী ঝড়ের সংকেত উঁকি দিল। তাদের নিজস্ব প্রডাক্ট ব্রা এবং প্যান্টির এমন আইডিয়াল মডেল, না চোখের সামনে নেই। দারুণ ফিগার। কী কোমর! কোমরের নিচটুকু যেন তানপুরার তম্বুরা। বুক দুটো মাটির তৈরি, মা সরস্বতী। ফ্রক, গাউন, সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি কী নয়? তাবৎ ডিজাইনে যে কোন আদলে অতুলনীয়। স্পেলেন্ ডিড!

স্ট্যাচু স্ট্যান্ডে মিস স্বর্ণময়ীর জীবন্ত মূর্তি প্রতিদিন ভঙ্গি বদলায়। মডেল প্রতিমা দর্শনের আছিলায় বিনি কাজে জয় মা কালী বস্ত্রভাণ্ডারের পথ ঘুরে যায় সন্ধের বৃদ্ধরাও। অঞ্জলিদানের মন্ত্রের মতো গুঞ্জন ওঠে শহরের মধ্যবিত্ত আড্ডায়। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ঘুমুবার আগে অন্তত একবার কল্পনায় দেখে নেয় মিস স্বর্ণময়ীকে। আদায় কাঁচকলা মদিনা মহাবস্ত্রালয়ের মহিলা মালকিন— তোবা তোবা বলতে গিয়েও বলে ফেলেছেন— তোফা।

যতদিন না সমস্যার একটা হিল্লে হয়, মিস স্বর্ণময়ীকে ছুটি মঞ্জুর করা হলো। এজন্য চুক্তির কোনো শর্তকে অসম্মান করা হবে না। তারপর বিশেষজ্ঞ একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ করা হবে। তিনি ছদ্মবেশে দোকানের বিশেষ করে স্ট্যাচুবক্সের চারপাশে প্রতিরক্ষায় সদাপ্রহরী থাকবেন।

কিছুতেই কিছু হলো না, সমস্ত এগ্রিমেন্ট নস্যাৎ করে মিস স্বর্ণময়ী বসাক এ্যান্ড সন্স থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন।

মুক্ত করে নেওয়ার ঠিক উনিশ দিনের মাথায় আবার।

এবার মদিনা মহাবস্ত্রালয়ের স্ট্যাচু স্ট্যান্ড। জয় মা কালী ভাণ্ডারে দুটো ঘটনা ঘটে গেছে নচেৎ এই বিধ্বংসী কাণ্ডকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর জঘন্য আক্রমণ বলে চিহ্নিত করতেন জ্ঞানীগুণীদের বিশেষ সম্প্রদায়। দু'একটি রাজনৈতিক দলের অসুবিধে হলো ঘটনাটিকে নিজেদের পুঁজি বানিয়ে ফেলতে।

মদিনা মহাবস্ত্রালয়ের স্ট্যাচু স্ট্যান্ডে রাখা ছিল কাচের তৈরি অপূর্ব কাবা-মসজিদের প্রতিরূপ। তাঁর মাথায় সৃষ্টি করা হয়েছিল একাদশীর চাঁদ আর অন্ধকার আকাশ ভরা তারা। মদিনা মহাবস্ত্রালয়ের স্ট্যাচু স্ট্যান্ডকে অনেকেই সালাম জানাতো। কেউ কেউ ভক্তিভরে দু-ওয়াক্ত নামাজও পড়ে নিত। সব চুরমার।

না এই শেষ নয়। মানুষ ভুলে যাওয়ার আগেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো কাশ্মীর শাল ভাণ্ডারের স্ট্যাচু।

অতঃপর ইত্যাদি।

কাচের শহর ভয়ে বাকস্তব্ধ।

কে স্টোনম্যান?

পুলিশ পেট্রোল ঘন ঘন টহল দিচ্ছে জিপে। মটরবাইকে। ছদ্মবেশী পুলিশেরা কফি খাচ্ছে কাচের কাউন্টারগুলোতে।

স্টোনম্যান কোথায়?

ব্যবসায়ী সমিতির কাচ এবং সিরামিক ব্যবহারকারী শাখা সংঘের চাপে পুলিশের ডি এস পি সাহেব তড়িঘড়ি ক্লোজডোর মিটিং ডেকে দিলেন অডিটোরিয়ামে।

আলোচনা, পুনারালোচনা, ইন্টারোগেশন, ইনভেস্টিগেশনে প্রকাশ পেল— যে যে পাথর ছুড়ে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে, তার জোগান আসছে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের উন্নয়নমূলক কাজের নমুনা থেকে। কনট্রাকটররা গ্রানাইট পাথরের স্তূপ যত্রতত্র ফেলে রেখেছে পথের দুধারে। ফলে শহর নোংরা হচ্ছে, পথ দুর্ঘটনা বাড়ছে এবং সাম্প্রতিক আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের-এর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পি ডবলিউ ডির উচ্চপর্যায়ে পত্র নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

এবং ইনটেলিজেন্স দপ্তরের প্রশংসনীয় দক্ষতায় ধরা পড়ে গেছে - বার বার ধ্বংস কাণ্ডের ফলে শুধুমাত্র 'কাচের স্বর্গ' নামক কাচের দোকানের বিক্রি অভূতপূর্বভাবে বেড়ে গেছে।

সংস্কৃতিমনস্ক ভিজিলেন্স দপ্তর মিটিংএর শেষপর্যায়ে চার্লি চ্যাপলিনের 'দি কিড' চলচ্চিত্রখানি দেখালেন।

পুলিশবাহিনীর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ইঙ্গিতময় ছবিতে দেখানো হলো—চার্লির পালিত পুত্র কেমন করে জানালার শার্সি পাথর মেরে ভেঙে পালিয়ে আসছে। তারপরেই চার্লি পিঠে কাচ বেঁধে ফেরি করতে বেরিয়ে পড়ছে। মুহুর্মুহু হাততালিতে শেষ হলো মিটিং।

বলাবাহুল্য মিটিংশেষে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি যথাসাধ্য আহার এবং পানীয়ের আয়োজন করেছিলেন শহরের শ্রেষ্ঠ হোটেল 'দি বহরমপুরে'। কোন অনুষ্ঠানে আর্থিক সহায়তাকে আজকাল 'স্পনসর করা' বলা হয়। সমিতি এক্ষেত্রে তাই-ই করেছেন মাত্র।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা পুলিশে ছুঁলে বাইশ। একথা ইদানীং আর বলা যাবে না। কাচের স্বর্গের মালিক শ্রী অটুটবরণ বিশ্বাস এইমাত্র থানা থেকে বেরিয়ে এলেন। মুখে তার দুশ্চিন্তার ছাপ নেই বরং খানিকটা ভিআইপি-গম্ভীর বলা যায়। তার পেছনে গ্লাস এ্যান্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ার কাম ডিজাইনার বন্ধু শ্রী কাঞ্চন পাল এবং ল'ইয়ার সত্যসরণ দাশ। থানার সামনে অপেক্ষা করে আছে শ্রী বিশ্বাসের নতুন এবং প্রিয় মাখন রঙের ফিয়েট গাড়িখানা।

ওদের গাড়ি এখন নির্মীয়মাণ রাজপথ কাজী নজরুল ইসলাম সরণি বেয়ে ধীরে ধীরে চলেছে। সরণির বাঁদিকে বিস্তীর্ণ ভাগীরথী। শীতের বিকেলে মিষ্টি রোদ দেখে গাড়ি দাঁড় করালেন শ্রী বিশ্বাস। গাড়ি থেকে নেমে আড়ামোড়া ভাঙলেন শ্রীপাল, বললেন —বসাক এ্যান্ড সন্সে নতুন ডিজাইনের কাজ দেখে এসআই সাহেব বেশ খুশি, কী বলেন? দাশ রোদের দিকে পিঠ রেখে বললেন —ওই কাজটুকু করতে আমরা বাইশ হাজার টাকার বিল নিয়েছি, এসআই সাহেব এটা বার দুত্তিন বললেন খেয়াল করেন নি?

অটুটবরণ বললেন —বিল আমরা এনাফ রিজিনব্যল করেছি। পাল যে নতুন ডিজাইনটা করেছে, ফ্যানটাসটিক। ওয়েস্ট বেঙ্গলে এত মডার্ন স্ট্যাচু-স্ট্যান্ড আনবিলিভব্যল।

অমূল্য সম্পদ। তাছাড়া দামি আনব্রেকেব্যল ফাইবার।

পুলিশ ওসব বোঝেনা মশাই। কাচের স্টোনম্যান কে? এখন আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। পাল বলে উঠলেন—নিশ্চয় মদিনা মহাবস্ত্রালয়কে হাজারবার বোঝানো সত্ত্বেও কাচের স্ট্যান্ডই তৈরি করালো। ভয় তো থেকেই যাচ্ছে। ডিজাইনটা আমার মনের মতো। ইউনিক। যদি ভেঙে দেয়?

দাশ বললেন—খুঁজে বের করতেই হবে। শ্রীবিশ্বাস মৃদু অসহিষ্ণু গলায় বললেন—পাল, তোমাকে বার বার বলি, সেলস্ এ্যান্ড প্রফিটস্ ম্যানেজমেন্ট কোর্সটা করে নাও। সৃষ্টির প্রেরণাই হচ্ছে পুরানো সৃষ্টিকে বাতিল করে দেওয়া। মোর ডেভেলপড ক্রিয়েশন প্রোমোটস মোর সেলস, মোর প্রফিট।

সত্যসরণ দাশ মাঝপথে বলে উঠলেন—

—দূর মশাই, ওসব এখন রাখেন। ওইদিকে তাকান।

—কোন দিকে?

—দারুণ ফ্রেম। সূর্য। চোখের মণি। যেন আগুনের প্রবাল নিভে আসছে। মণির মাঝ-বরাবর খেজুরগাছের ছায়া—

—আমি বলছি ওই যে ইউক্যালিপটাস গাছটার নীচে স্ট্যাগ করা রাস্তার পাথর দেখেছেন?

দু-জনে একসাথে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—ছোকরাটা কী করছে?

— খেলা করছে।

—না, ছোকরা বেছে বেছে বড় পাথরগুলো ওর ঝোলায় ভরছে।

—এ্যাঁ।

—হ্যাঁ, চুপ।

ফিস ফিস করে পাল বলে উঠলেন—স্টোনম্যান, শয়তান। বিশ্বাস বললেন —ওকে আমার খুব দরকার। চলুন ধরি।

— না গাড়িতে উঠুন। লক্ষ রাখুন। দূর থেকে ফলো করুন। যেন বুঝতে না পারে।

ঘটনাটি ঘটে গেল গল্পের মতো। গল্পের শেষটুকুও যেন দু-টুকরো নাটক। প্রথম দৃশ্য।

বালক ঝোলা হাতে ঘরে ঢুকতেই মা বলে উঠল

—তোকে যে বারণ করলাম। আবার পাথর এনেছিস? এবার আমিই পুলিশে খবর দেবো।

ছেলেটি খেপে আছে।

—দাও, দাও একশো বার দাও। পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যাক। মারুক। জেলে ভরুক। তোমার কী? তোমার তো মজা।

মা দু'হাত দিয়ে ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিলেন।

—সারা সকাল তো তোর কাছে থাকি। জেলে ভরে দিলে সকালটুকুও তো পাবিনে।

—আমার দরকার নেই। তুমি ল্যাংটো ম্যাংটো হয়ে যদি কাচের ঘরে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি কিছুতেই মানবো না। বাজারের সব কাচ ভেঙে দেবো। পুলিশ আমাকে জেলে দিক। মেরে ফেলুক।

বালক মাকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—মাগো, তুমি না থাকলে আমার খেতে ইচ্ছে করে না, ঘুমুতে ইচ্ছে করে না, আমার কিচ্ছু ইচ্ছে করে না। শুধু রাগ হয়।

গল্পের শেষ দৃশ্য।

সন্ধে হয়ে এসেছে। আমাদের অতি পরিচিত একখানা ফিয়েট দাঁড়িয়ে আছে মিস স্বর্ণময়ীর বাড়ির সামনে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

শ্রী অটুটবরণ বিশ্বাস

শ্রী কাঞ্চন পাল

শ্রী সত্যসরণ দাশ।

গল্প শেষ।

গল্প শেষের পরেও ওরা দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওদের দাবি: মডেল মিস স্বর্ণময়ী যুগ যুগ জিও।

নেহাত প্রেমের নিছক নক্সা

আপনি একজন কি একশ'জনের সাথে বন্ধুত্ব করুন আপত্তি নেই। কথায় আছে, আমার সাথে যুজ্জু কর,যুজ্জু করে প্যারাস্ত কর, প্যারাস্ত করে ন'ক্ষ মনের জা'গায় বিশ মন ন'(লোহা) নিয়ে যা, বেয়াই হতেও অপিত্ত করবো না। আমারও এক কথা, বিয়ে হোক আর বেয়াই হোক, যুদ্ধ না করে একটি সম্পর্কও নয়। এটি গল্পের প্রথম উপদেশ।

প্রবাদ আছে, বোকারা তিনবার হাসে। প্রথমবার না বুঝে, তারপর বুঝে, না বুঝে হেসেছে ভেবে লজ্জায় শেষবার। হাসুন, কিন্তু একবার।

হে পাঠক, অনুমতি দিন গল্পটা শুরু হোক।

উপদেশ প্রথমে শুখা লাগে। গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়। লক্ষ্য করুন যুবকটিকে, মেলায় নিয়নগাছের নিচে দাঁড়িয়ে মোহিনী কৃষ্ণের মতো হাসছে, মিটিমিটি। লাখ কথা খর্চা না করলে এ দেশের বিয়ে হয় না, তো প্রেম! আদেখলা গাঁইয়া ভুতগুলোর মতন মাইয়াডারে দ্যাখলি আর ঝাঁপাইলি! আন্ধারে যহন পরানডা ডুকরাইবো, কি করবি, হালার পো! ভ্যালানটাইন ঠাউরপো তহন ঠ্যাইবে?

তবে হ্যাঁ, মেয়ে বটে! মেলা ফেলে টিকিট কেটে মেয়ে দেখতে হয়। রূপের হুজুগে শ্যামাপোকারা জ্বলতে লেগেছে। বোম্বাইয়ের বোটে বোম্বেটে। গাঢ় লালরঙের হাইনেক সোয়েটার, কালো জিনসে যেন আগুন ছুটছে। যুবক দুচোখ ভরে দেখছে। মেয়েটি লম্বা লম্বা পা ফেলে কাচের দরোজা ঠেলে ঢুকে পড়লো 'শাড়িমহলে'। হাইনেকের ভিতর থেকে আধফোটা গোলাপ যেন একঝলক সুগন্ধি ফেভিকল ছুড়ে দিয়ে চলে গেলো।

সোনালি কোঁকড়া চুলে উড়ে এসে বসেছে একটা জীবন্ত প্রজাপতি। জীবন্ত, দূর! এক লক্ষ কথা শুধু নয়, এক লক্ষ ভুলের প্রথম বিলাসে ধরা পড়লো ঝলমলে বিচিত্র রঙের রিবন যেমন বেঁধেছে। উপমাটা এতো পুরোনো তবু যুবকটির ভালো লাগছে যেন আসল। যেন চিরকালীন উপমা, চিরকালীন ভালোলাগা। অন্য কিছু মানায় না।

যুবকটি একপায়ে দেবানন্দ অন্য পায়ে গ্রেগরি পেইকের মোচড় দিয়ে পৌঁছে গেলো কাচের দরোজায়। পুলের বদলে পুশ করে নিজেকে ঢুকিয়ে নিলো 'শাড়িমহল'-এর

ফুলবাগানে। অসংখ্য নারী যেন ফুলের মেলা। হ্যাঁ জেগে আছে, একটায় গোলাপ। মরাল গ্রীবা গোলাপ একটু ঝুঁকে শাড়ি দেখছে। হলুদ জমিন সবুজ পাড় একটা পাটভাঙা শাড়ি কাউন্টারে বিছানো। ঝাঁ চকচকে নিয়ন আলোর সাদা রঙ ঝরে পড়ছে শাড়ি আর দেখুনির শরীরে। অস্থির কোঁকড়া চুলের ঝাঁকুনিতে প্রজাপতিটা বসতেই পারছে না। ছটফট করছে। শুধু হলুদরঙ পছন্দ করার জন্যেই যেন শিল্পী শখ করে এঁকে দিয়েছে চোখদুটো। যে রঙের জন্য যে চোখ। যেন অন্য কাজল চোখ হয় না। বলতে হবে রুচিশীলা। দেখে খুশি। কেনে না। হয়তো কাল, কিংবা পরশু, কিংবা তরশু এসে নিয়ে যাবে। মেলা চলবে ভ্যালেনটাইন মাস জুড়ে। সে আবার কবে আসবে? কবে ফুটবে আবার গোলাপ? সেদিন পাপড়ি কি আরও একটু চোখ মেলবে? শাড়িটা কাউন্টারে থাকতে থাকতে যুবক পৌঁছে গেলো কাচের দেওয়াল তোলা ক্যাশ কাউন্টারে।

লেখক গল্পের সবটুকু জানেন। ভাঁজে ভাঁজে শাড়ির মত সাজিয়ে রাখেন আলমারির দেরাজে। যেটুকু জানেন না, আশ্চর্য হবেন না, প্রিয় পাঠক, হ্যাঁ, জানেন আপনি। আপনার রঙে, রসে আস্বাদে ভরে যায় গল্পের শূন্য দেরাজগুলি। বেচারি চরিত্রেরা কিছুই জানে না। যেমন যুবক জানে না, কবে দেখা হবে তার স্বপ্নসুন্দরীর সাথে। সুন্দরীর কী নাম সে জানে না। বাপের নাম পড়ে মরুক, সে নিজের নামও জানে না। এমন আনাড়ি লেখক। নামের চারপাশ ঘিরে মৌচাকের যে মধু জমে তাতে সুন্দরীর অবশ্য কোন মাথা ব্যথা নেই। সে জানে, সে সুন্দরী, সে যুবতী, তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, হাজার পাঠক, লেখক, লক্ষ যুবক। দরকার হলে গল্পটাই তার নামে অঙ্কিত হয়ে যাবে।

লেখক যে আলমারিতে গল্প সাজিয়ে রাখেন, তার দেরাজে চাবি। লেখকের স্বাধীনতা এইটুকু যে ইচ্ছে মতো দেরাজ খুলতে পারেন। গল্পের পর্ব, অনুচ্ছেদ ইচ্ছে মতন সাজাতে পারেন। উল্টেপাল্টেও রাখতে পারেন। পাঠক এই বিশ্বাস নিশ্চয়ই রাখবেন, স্বাধীনতার অমর্যাদা তিনি করেন না। খাঁটি সেলস্‌ম্যানের মতো সবচেয়ে কম সুন্দর অংশ দিয়ে শুরু করেন। আসুন গল্পের দ্বিতীয় দেরাজটি খুলি।

মেলা যুবকটিকে অনুসরণ করতে শিখিয়েছিলো গল্পের প্রথম দেরাজে। দ্বিতীয় দেরাজে লেখক, সন্ধ্যার এই মৃদুমন্দ শহরে, যুবকটিকে মেয়েটির পাশাপাশি হাঁটার অধিকার দিয়েছেন। প্রত্যেক শহরে স্বর্গের কাননে পৌঁছে যাওয়ার জন্য নিরিবিলি ফুলে ফুলে ছাওয়া কিছু এভিনিউ থাকে। এভিনিউ-এর শেষে থাকে নীল নদীর তীর, উদাস আকাশে বাউল বাতাস কিংবা ফুলেল সবুজ আড়াল পার্ক, অন্তিম পর্বে আদরের লগ্নে পৌঁছে যাওয়ার গোপন সিঁড়ি। কুসুমকলি সন্ধ্যায় যুবকের হাত, হাতের আঙুল বাতাসে ইচ্ছে মতন খেলে বেড়াচ্ছে, নেচে বেড়াচ্ছে যুবতীর চোখ আর পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলে থাকা হাল্কা গোলাপি গাউন। এবং দুজনের একশো আট রকমের হাসি। গল্পটিকে

এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পথটি বেশ প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন এবং দুটি হৃদয়ের মোহনার জন্যে যথেষ্ট খোলামেলা। মেয়েটি বুকের কাছে বই রেখে মশগুল। ছেলেটি বইয়ের কাছে।

—বই খুব ভালোবাসেন বুঝি, সবসময়ের সঙ্গী?

—কেন, হিংসে হয়? বই বুকে থাকবে মশায়। কারণ আমি একইসঙ্গে একজন নারী এবং একজন স্টুডেন্ট।

—মানে, বুকের কাছে একটা পেন রাখলেও ... ব্যাপারটা ...

—সুন্দর বললেন, তবু পেন তো সবসময় দেখানো যায় না। গোপনে থাকে। আপনার মতো লাজুক।

খিলখিল হাসিতে ঝরে পড়তে চায় মেয়েটি। সে বলতেই থাকে।

—তবে বই কেবল পড়ার জন্য নয়। পুরুষদের কৌতূহল জাগাতে পেনের চেয়ে একটা বই মারাত্মক। বুকের কাছে একটা বই ভাবুন!

—ভাবছি, বই সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি আমার নতুন চোখ খুলে দিচ্ছে।

—এইভাবে বলবেন না, প্লিজ। আপনি এ সবই জানেন। তাছাড়া সবসময় আপনার মতো সহৃদয় রক্ষাকবচ বন্ধুতো জুটবে না। যাই বলুন, বন্ধু হিসেবে বই ফ্যানটাসটিক। যখন খুশি যেমন খুশি সঙ্গী বদল করুন। হ্যাপা নেই।

—হুম!

—বিকেলবেলা একা লাগছে? জয় গোস্বামী খুলে বসুন। মিছিলে যাবেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে যান। ঘুম আসছে না, জীবনানন্দ পাশে রাখুন।

যুবকের বুকে খানিক বাতাস জমে গেলো। বিষম খেতে খেতে খেলো না। মসৃণ পথে হোঁচট খেলো। হোঁচটটা বুকের ভিতর ব্যথা হয়ে জমে রইলো। কথা এখন ব্যথা হয়ে আছে। মেয়েটি বলে চলেছে। চলায় ভ্রুক্ষেপ নেই। পায়ের কাছে লুটিয়ে গাউন উড়ছে।

—কিন্তু সে ধরুন বিয়ের আগে পর্যন্ত।

এতক্ষণে যুবকের শ্বাস বেরুলো। বুক হাল্কা হলো। সে শুনেছে, বিয়ের আগে কথা বলে প্রেমিকা। বিয়ের পরে বলে গৃহকর্তা। বিয়ে বুড়িয়ে গেলে, 'তুই থুলি মুই থুলি' শোনে পাড়ার লোকেরা। তখন ঘরের চালে কাকেদের বিস্তর অসুবিধে হয়। এখন যুবকের একনম্বর দশা।

মেয়েটি বলেই চলেছে।

—বিয়ের পরও বই রাখা যায়। স্টুডেন্ট হিসেবে বয়সতো চলে যায় না। বাসে অর্ধেক

ভাড়া। ট্রেনে লাগে না। বুকেও জোর থাক।

—বেশ বেশ। একই সঙ্গে বুদ্ধিমতী এবং সুন্দরী রমণীর দুর্লভ সঙ্গ আজ আমার জীবনের প্রথম সৌভাগ্য।

নারীকে প্রশংসা করার স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের প্রয়োগকে যুবক একবারও হারাতে রাজি নয়। নারীর চোখেও তত্ত্বের গলিত সাফল্য ঝকঝক করে উঠলো। ডাগর দৃষ্টি আরও ডাগর হয়। দৃষ্টি আড় হয়। প্রেমের গল্পে এই দৃষ্টি অত্যন্ত মূল্যবান। প্রেমিক পাঠক বিষয়টি নিশ্চয় অনুভব করেছেন।

ছেলেটি বলে—আরে, আমরাতো কলেজঘাটে চলে এসেছি। চলুন গঙ্গার ধারে ওই বেঞ্চটায় বসি। বাঃ বেঞ্চটা দু'জনের কথা ভেবেই তৈরি। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আসুন।

ছেলেটি মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। মেয়েটির স্বর নদীর নরম ঢেউ যেমন দুলে ওঠে—বেশ লাগছে।

বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয় কিছু অনুধাবন করলেন। গল্পের নির্ঘাত মোচড় এইখানেই লুকিয়ে থাকলো। দুর্বল লেখকের আপনিই ভরসা। বইকেন্দ্রিক এই টাটকা প্রেমপর্ব যুবকের একটু বেশিই মিষ্টি লাগছে। বলে,

—বইয়ের মিষ্টি আলোচনায় চিকেন চাউমিং আর মুড়মুড়ে ঘটিগরম দারুণ জমবে, বলুন? হেই ঘটিগরম, দেখি দুটো বিগব্যাগ।

ঘটিগরমের ঘটর ঘটর ঘটাং ঘটাং ঘুঙুরের ঘুরেঘুরে নাচ শুরু হলো। মেয়েটি হাঁ করে তাকিয়ে আছে, বিগব্যাগ মানে কতো বড় ব্যাগ। সেকি, বস্তা? তার মধ্যে কি দুজন হারিয়ে যেতে পারে?

মেয়েটি বললো—বাহ আপনার রসবোধ চমৎকার, ছেঁড়া বইয়ের পাতায় মুড়ে ঘটিগরম, বই সম্পর্কিত আলোচনার দারুণ পরিণতি। বইয়ের কোনো তুলনা হয় না। বই সব পারে, সব পারে।

ছেলেটি ভুল করেনি। রেস্টুরেন্ট শূন্য নদীর পাড়ে। কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে বের করে সাধের চিকেন চাউমিং।

এই আমটি আমটি শীতে একটু একটু করে ওরা ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে। ঘটিগরমের বিগব্যাগ স্লিপিং ব্যাগে বদলে যাওয়ার খুব চান্স আছে। চলুন, আমরা এখান থেকে সরে পড়ি। গল্পের অন্য দেরাজ খুলি।

দু'ধরনের মানুষ আমার খুব পছন্দ। যারা সুন্দর পোশাক কেবলই কেনেন আর মাত্র একবার ব্যবহার করেন। অতঃপর লনড্রিতে পাঠিয়ে দেন কাচতে এবং যথারীতি ভুলে

যান। মাসের পর মাস পোশাকগুলো লনড্রির তাকে জমজমাট পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে লনড্রির কাউন্টারে বসা কর্মচারী মেয়েটি পড়ে থাকা পোশাকগুলো দিয়ে আলমারির ধুলোবালি ঝাড়ে কিংবা ভাড়া খাটিয়ে ঘরভাড়া উসুল করে নেয়।

আর সেই বেঢপ বিপুল মোটা বেচারিরা দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত। যাদের রান্নাঘরটাই পেছন জানলা দিয়ে দিব্যি বিলিয়ে দেওয়া যায়। দেদার খাবার, ভারতীয়, ইংরেজি, ফরাসি, চিনা, সুগন্ধী, সুবর্ণী, অঢেল হাঁড়ি, কড়াই, ডেক, ঢাকনা পায়ে পায়ে অজস্র বাবুর্চি, পাচক, রাঁধুনি, কুক অথচ খাবেন প্রসাদ কণিকামাত্র, এক প্লেট ফাইবার কিংবা ফাস্ট ফুড, যত পার প্যাকেট জল।

সম্মাননীয় এই দুই শ্রেণি-মানুষের জন্য গল্পটার সুন্দর একটা সুরাহা হয়েছে। বেহিসেবি হৃদয়ের মানুষেরা দীর্ঘজীবী হোক। আসুন, আমরা তৃতীয় দেরাজে গল্পের প্রেমিক প্রেমিকাকে লক্ষ্য করি। প্রায়শই দেখবেন, পানপাতাকৃতি দুটি গলাগলি হৃদয়ের বিখ্যাত মূর্তি একটা বর্গাকৃতি কাচপাত্রে রাখা থাকে। আমাদের সবুজ শহরের কেন্দ্রে সবুজতর হৃদয়ের বর্গাকৃতি সবুজতম মাঠকে যদি কাচপাত্রের সাথে তুলনা করি, আমাদের গোলাপি প্রেমিক প্রেমিকা বর্গাকৃতি সবুজমাঠের হৃদমাঝারে বসে আছে গলাগলি হৃদয়ের বিখ্যাত মূর্তির আদলে। বেনারসি শাড়ির কুঁচি, তালপাতা পাখার মতো সামনে ছড়িয়ে, বসেছে প্রেমিকা আর কষা মাটন চিকেন বিরিয়ানির প্যাকেট সামনে রেখে প্রেমিকপ্রবর বসে আছে পা ছড়িয়ে, পিঠের পিছনে দু'হাতে হেলান দিয়ে। আক্ষরিক অর্থে বর্গাকৃতি সবুজ মাঠকে স্কয়ারফিল্ড নামে চিনি। এই সেই হৃদপিণ্ড, এইখানে সকাল হলে, রক্ত চলাচল শুরু হয় শহরে। বিকেলের আবির ফুরিয়ে এলে, এইখানে অন্ধকার বেশ মোটা এবং মখমল হয়। আসুন, অন্ধকারে আমরা ওদিকেই চোখ কান খোলা রাখি। যুবকের হাতের মধ্যে যুবতীর হাত। হাতজোড়া বেশ গরম। আকাশ বেশ পরিষ্কার, হাল্কা। ছড়িয়ে পড়া সিকি কয়েনের মতো ঝকঝক করছে যাবতীয় তারা। ওদের নাগালের অনেক বাইরে সোনার আধুলির মতো জ্বলজ্বল করছে চাঁদ। চাঁদ যেন স্বপ্নের মতো মেঘেদের সাথে উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে দূরে, অনেক দূরে। যুবকটি প্রায় দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি।

বলছে—ঠিক যখন করেই ফেলেছি, আমার মনে হয় শীতের ওমটুকু বাজে খরচ করা উচিত হবে না। কী বলো?

—ধ্যাত, কী বলবো? মাঠের ঠান্ডা বাতাস ছাড়া আমার আপন আর কেউ নেই। ঈশ্বরও জানেন না, কার সাথে পরামর্শ করি।

—তাহলে পৌষ সংক্রান্তিই ঠিক। চলো বিষ্ণুপুর কালীবাড়ি যাই। শ্রী শ্রী মায়ের চরণে বলি হই।

যুবকটি ভেবেছিলো শ্রীমতী কনে খিলখিল হাসিতে মাঠ ভরিয়ে ফেলবে। কিন্তু না,

থমথমে ভাব। কোথাও মেঘ জমেছে। ঝড় কিংবা বৃষ্টি কিংবা দুটোয় নামবে। ধবধবে সাদা উড়ন্ত হাঁসের মত একজোড়া চোখে (আমাদের দুর্ভাগ্য, অন্ধকারে দেখতে পাইনে, প্রেমিক ঠিক দেখতে পায়) প্রথমে এক পশলা বৃষ্টি নামলো। জলভরা মেঘের মতো ভারী গলায় বললো—ক'দিন ধরে খুব কষ্ট পাচ্ছি। রাতে ঘুমুতে পারছি না। দিনে কাজ ভুল হয়ে যায়। বলবো বলবো করে কিছুতেই বলতে পারছি না। এইখানে বিঁধে আছে। মেয়েটি বুক দেখায়। বলতে বলতে দু-চোখ বেয়ে ঝরঝর করে নামলো দুঃসময়ের বৃষ্টি। যুবকটি অসহায়ের হাসি হেসে বললো, জানোতো মেয়েদের বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না।

যুবতী যুবকের একটা হাত নিজের হাতে তুলে বুকের মধ্যে চেপে ধরে।

—সাতদিন পর যার সঙ্গে বিয়ে হবে, ঘর বাঁধবো, তার কাছে কিছু গোপন করা ঠিক নয়।

এবার বৃষ্টির মধ্যে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাসে দমকা হাওয়া শুরু হলো।

—আমি তোমার সাথে মিথ্যে বলেছি। না, গ্রামে আমাদের বাড়ি নেই, খেত নেই, খামার নেই। মা নেই, বাবা নেই। কলেজেও পড়ি না। বাংলাদেশ থেকে উড়ে আসা ছিন্নমূল, নিঃসঙ্গ প্রাণী। একটা লনড্রির কাউন্টারে বসি, আর ইস্ত্রি করি। আমি একজন মামুলি ইস্তিরিওলি। ওইসব বানানো গল্প না বললে তুমি আমাকে বিয়ে করতে না। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। তোমাকে চাই বলেই মিথ্যে বলেছি।

—ভালোবাসার সেই চিরন্তন বাঁধাগতের আজেবাজে বুলি। আজো সমান নতুন, সমান আবেগময়। 'ভালোবাসা' শব্দের চরিত্রে, খোলনলচে শুধু বদলে যায়, ভালোবাসা শব্দখানার বলিহারি খোলসটুকু, যেন মেয়েমানুষের জান, যুগযুগ ধরে মার খেতেখেতে কেমন বেঁচে থাকে। কিছুতেই পুরোনো হয় না। যুবকের ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কাকে তীব্র আতঙ্কে পরিণত করে তার খোলাবুকে ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে দুমদুম শব্দে কিল, যেন শিলাবৃষ্টি শুরু হলো। যুবক সেই যুগ-যুগান্তরের 'তাকে' বুকে জড়িয়ে ধরে বললো,

—তুমি বলবে তাই, আমি সব জানি। ওসব বস্তাপচা ডায়ালগ দিয়ে বহরমপুর শহরকে তিনশো বছরের পুরোনো যাত্রার স্টেজ বানিয়ে ফেলো না। অন্ধকারে এক্ষুনি হাততালি শুনতে পাবে। আমি নায়কটা কে জানো?

নাকে ফোঁসফোঁস না কমিয়ে নায়কের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে ইঙ্গিত দিলো সে জানে।

যুবকটি বলে—একটা ঝুনঝুনওয়ালার বাড়িতে বাবুর্চির কাজ করি। তোমার আগুনের মতো রূপ। সেদিন মেলায় আমার সাহসই হয়নি তোমাকে দেখি। দেখছিলাম, আমার হাইনেক লাল সোয়েটারটা। কী অপূর্ব মানিয়েছিলো তোমাকে। ওটা কাচতে দিয়েছিলাম

তোমার মালিকের লনড্রিতে। পয়সার অভাবে তুলতে পারিনি। তুমি যে কেমন করে রোজ নতুন নতুন পোশাকে টলিউড, বলিউড, হলিউডকে হার মানিয়ে দাও, আমি জানি। আমার সোনা মেয়ে, কেঁদো না।

বৃষ্টিশেষের আগে যেমন রিমঝিম নামে তেমনই নামছে দু'চোখ বেয়ে। আর মেঘ ভাঙা অলোর মতো হাসি ঠোঁটের কোণায় মিশিয়ে বললো,

—আর রোজ রোজ তুমি যে ঝুনঝুনওয়ালার বাড়ির চাইনিজ, ইংলিশ, সাউথ ইন্ডিয়ান, বিনিপয়সার টিফিন খাওয়াতে, আমিও জানি, তুমি ওখানে কাজ করো। উম্ ম্ ম্! কী দারুণ তোমার হাতের রান্না। সাতজন্ম ওই রান্না খেতে রাজি আছি।

যুবক বলে—আমি মাস গেলে পাই সাকুল্যে তিন হাজার। তবে মালিককে বললে খাবারটা ফ্রি হয়ে যাবে।

মেয়েটি বললে—আমিতো ডেলি পঞ্চাশ যাটের বেশি পাইনে। তবে আমার মালিককে বললেও দু'জনের নিত্য নতুন পোশাকটা ফ্রি হতে পারে।

ছেলেটি গলা ছেড়ে বলে উঠলো—তবে আর কী, রোজ রোজ বাদশাহি খানা ...

মেয়েটি গলা ছেড়ে বলে উঠলো—ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্যুটিং-এর ড্রেস ...

দু'জনে যাত্রা নয়, নাটক নয়, জীবন, জীবনের গলায় কোরাসে হেসে উঠলো, হাঃ হাঃ হাঃ ...

ছেলেটি বললো— আমার তিন হাজার, তোমার মেরে কেটে হোক দু'হাজার ...

মেয়েটি বললে—একটা ছোটখাটো ভালোবাসা কি হবে না?

ছেলেটি আহ্লাদে গেয়ে উঠলো—হবে হবে সব হবে।

দু'জন একসাথে উল্লাসে ফেটে পড়লো—হুররে, আমরাই আসল গল্প এ শহরে।

অন্ধকার এবং গল্পের দু'জন নায়ক নায়িকা আরও নিবিড় হলো। ওরা রাতের নিশ্চিন্ত শিশিরে আরও খানিকক্ষণ ভিজুক, চলুন আমরা ফিরি।

পুনশ্চ : জনান্তিকে বলে রাখি, ওদের বিয়েতে উপহার, ইচ্ছে হলে দিন। কিন্তু ভুলেও 'শাড়ি মহলে' সেই হলুদ জমিন সবুজ পাড় শাড়ি কিনতে যাবেন না। শাড়িখানা যুবক সেদিন নিজের সঙ্গে বাজি রেখে নিজেই কিনে রেখেছে। নতুন বউকে তার প্রথম উপহার। বাংলাদেশে মেয়েদের হৃদয় এত জলবৎ তরলং, মাত্র এক বছরের গেলাশে গড়িয়ে, নায়িকাকে বেফিকির গিলে ফেলতে নায়কের বিন্দুমাত্র বিষম খেতে হয় না, এটি গল্পের শেষ উপদেশ। দাদা, লড়ে যান।

ভ্যাক ভ্যাকুম টু ভ্যাকুম ভ্যাক

অফিসের পিওন ছোকরা হরবোলা। টেবিল গুছিয়ে বেরুবার পিঠে পরিষ্কার শুনলাম কুকুরের ডাক - ভ্যাক ভ্যাকুম ভ্যাক। পিছন গেছে, সামনের সম্মানটুকুও হরিরলুট হতে বসেছে।

মোবাইলের যুগে কেউ পোস্টকার্ড লেখে? এমন তামাদি শাশুড়ি কপালগুণে মিলেছে। চিঠিখানা সাতহাত ঘুরে আসতে সাতবার সবার পড়া হয়ে গেছে, জানতে কারো বাকি নেই। ইতি দিদিমা।

দিদুন, দিদান, নিদেনপক্ষে দিদিভাই, ফেলে ছড়িয়ে হাজার স্টাইলিশ ডাক রয়েছে। মনে ধরেনি। ব্রাকেটে আবার 'ভ্যাকুম ভ্যাক'। ঠেলা সমলাক বাবাজীবন। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, মরেও না শেখেও না। গতপরশু অফিসের ঠিকানায় চিঠিখানা এসেছে। আটকে রেখে গোলটেবিলে সবাই মিলে পড়েছে, আর হ্যা-হ্যা শব্দে দাঁত কেলিয়েছে। গতকাল মদনবাবু হাত বাড়িয়ে দেওয়ার সময় পরিষ্কার বললেন - আপনার ভ্যাকুম ভ্যাকের চিঠি।

'দত্যি কেমন আছে? বড়ো চিন্তা হয়। খুব দামাল হয়েছে, না? চোখে চোখে রাখিস। যা ছুটোছুটি করে শুনেছি, দরজা খুলে রাখিস না, কোথায় হারিয়ে যাবে কেঁদে কেঁদে মরে যাবো। বাবাজীবনকে বেশি কোলে নিতে মানা করিস। কোলঘাঁটা ছেলে বাড়ে না। মর্নিং ওয়াকে যেনো হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। বাড়ন্ত সময়। হাঁটা স্বাস্থ্যকর। আশির্বাদ নিস। দত্যির জন্য দুষ্টুমিষ্টি হামি।' - ইতি দিদিমা (ভ্যাকুম ভ্যাক)

যা ভেবেছি তাই, পেছনে নতুন কিছু নামকরণ হয়েছে আমার। ভ্যাকুমবাবা, কিংবা ভ্যাকবাবাজীবন .... ইত্যাদি।

দিন গেলে আলোয় আলোয় বাড়ি ঢুকবো সে উপায় নেই। ওঠার মুখে সিঁড়ি অন্ধকার। ঘর মানেতো সংসার সমরে অবতীর্ণ হওয়া। তবুতো সিঁড়ির আলোর নীচে যুদ্ধের ছক কষতে কষতে ওঠা যায়। গতকালও ভেবেছি, আজও ভাবছি, আগামিকালও ভেবে যাবো। নুড়োটি কাটবো না, মুখে কুলুপ এঁটে থাকবো। একদম নো চ্যাঁচম্যাচানি, নো ধপাস ধাঁই। জীবনে অন্তত একটা রাত শান্তিতে কাটুক। কিন্তু হয়নি। হবে না। গতকাল যেনো কী নিয়ে বেঁধেছিলো? হ্যাঁ, দত্যির পাপোশে হিসু করা। একটা মানুষ সারাদিন খেটেখুটে বাদুড়ঝোলা হয়ে ঘরে ফিরছে, তাকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে পেচ্ছাবে ভেজা

পাপোশ দিয়ে। কার মাথার ঠিক থাকে। হাতের পোর্টফোলিও ছুড়ে জানান দিয়েছিলাম, ফিরেছি। যতোখানি রাগ দত্যির পাপোশে হিসু করায়, তারচেয়ে বেশি ছিলো, গতপরশুর ঝগড়াতে অবশিষ্ট পরাজয়ের জ্বালায়। ভাগ্যিস, কুঁদুলেকুটির মাঝখানে চেয়ারের দেওয়ালখানা ছিলো। নইলে পিছন ফিরে খবরের কাগজ পড়া পিঠখানা বেঁকে যেতে বেশি সময় লাগতো না। উত্তর আসতে দেরি হয়নি। রেডি ছিলাম। সরে দাঁড়াতেই, টেবিলে রাখা ফুলদানিটা আছড়ে পড়লো সোফার গদিতে। সোফাসেট আগেভাগেই মোটা পলিশীট দিয়ে মোড়া। ফুলদানি স্টীলের তৈরী। দুর্দান্ত শক্তসমর্থ। এসবই যুদ্ধের প্রাকদুর্গপ্রস্তুতি। ফার্স্টরাউন্ডে ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়নি।

গতকাল পাপোশের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম। ভ্যাকুমভ্যাকের চিঠি পকেটে রেখে চলে এসেছি। হাতে তুলে আর দেওয়া হয়নি। ভুলে গেলেও, প্রমাণ হবে, ইচ্ছে করে চিঠি লুকিয়ে রেখেছি। যুদ্ধের শাঁখ নিজেই বাজিয়ে এসেছি। পকেট থেকে চিঠিখানা নিশ্চয় এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে। সেজেগুজে যুদ্ধক্ষেত্রে রেডি। কাল ছিলো বিনা মেঘে বজ্রপাত। হিসুর ইতিহাস পরম্পরা কারোরই জানা ছিলো না। প্রস্তুতিহীন গেরিলা ফাইট। আজ হবে ধুন্ধুমার।

সিঁড়ি থেকেই যুদ্ধ শুরু। অন্ধকারতো নয়, অন্ধ করে প্রথম অস্ত্র শানিয়ে নেওয়া। উঠতে নামতে জলবৎ তরলং সিঁড়ি অথচ প্রথম ধাপেই হোঁচট। সময়মতো সিঁড়ির রেলিং হাতের কাছে পেয়ে আঁকড়ে ধরেছিলাম। নইলে দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে রক্তারক্তি হতো। বুঝলাম, উত্তেজনায় টইটুম্বুর, রাগে টগবগ করে ফুটছি।

লোকে সিঁড়িতে সারারাত আলো জ্বেলে ওঠা নামা করে। সিঁড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় আলো নিভিয়ে যায়। এ ফ্ল্যাটের নিয়ম উল্টো। ফাঁকা সিঁড়িতে সারারাত আলো জ্বলে। সন্ধের আঁধারে সিঁড়ি অন্ধকার থাকে। ভয়ে ভয়ে উঠি। এই বুঝি 'হোঁচট' অপেক্ষা করে আছে। ওই বুঝি 'ধাক্কা' দুদ্দাড় নেমে আসছে। ক্লান্ত পায়ে যতো মনোসংযোগ রাখি, সাবধানে উঠি, যুদ্ধ বিষয়ে ভাবা মুশকিল হয়, আক্রমণ প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটে। এই ব্যাঘাত তৈরি যুদ্ধেরই অঙ্গ। গিন্নি পাক্কা জেডফাইটার। এই অন্ধকার তাঁর কলাকৌশলেই তৈরি হয়েছে। গতকাল পোর্টফোলিওর আক্রমণ আগেভাগে আন্দাজ কষে হাতের কাছে ফুলদানি নিয়ে বসেছিলো। আজ যুদ্ধের প্রথম পাতে অন্ধকারের শুক্তুনি দিয়ে শুরু।

বাড়িওলির মেয়ের টিউটর এই সময় পড়িয়ে নামে। সিঁড়ির মোড়ে টিউটর বিদায় জানাতে আসে ছাত্রী। অন্ধকারে বিদায় সম্ভাষণ। বেশ উত্তেজক এবং সুস্বাদু। যতক্ষণ অন্ধকার ধরে রাখা যায়, চাকুমচুকুম। এ কারণেই সিঁড়ি অন্ধকার। ফেরার সময়টুকু এগিয়ে পিছিয়ে বেঁটে লম্বা করে আমার বিশেষ সুবিধে হয়নি। দীর্ঘসময় আলোর নীচে পড়ানো জ্ঞানী শিক্ষকের লক্ষণ। শিক্ষক যদি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার পুত্র হয়, অতি দীর্ঘ সময় অন্ধকারে বিদায়

সম্ভাষণ জানানো বুদ্ধিমতী ছাত্রীর লক্ষণ। জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে আমার গিন্নির দহরম - মহরম খুব বেশি। রোজ দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত বাড়িওলির মেয়ের সাথে প্রেম এবং যুদ্ধ বিষয়ক গভীর আলোচনা হয়। আলোচনার পরিণতিতে সিঁড়ির এই যুদ্ধ কাম প্রেমান্ধকারে গিন্নির আজানু-লম্বিত বাহু আমি দেখতে পাই।

আমিও আমার শিক্ষক এবং আমিই ছাত্র। বন্ধ দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর দেখার চোখ তৈরি করি। তিনতলার কড়িডোরে টিমটিমে হলুদ বাল্ব জ্বলে। মনে হয়, দমবন্ধ ট্রেঞ্চ। চাবি ঢোকানোর ফুটোয় সন্তর্পণে বাইনাকুলার চোখ রাখি।

দরোজা খুলতেই আজ পোর্টফোলিও ব্যাগটাকে ঢালের মতো ব্যবহার করি। টিফিনে মেনু ছিলো লুচি আলুরদম। আলুরদম খানিকটা নাকে মুখে লেগে, ঢুকে গেলো পোর্টফোলিওর পেটে। কাঁসার বাটিটা এখনও অক্ষত, ঘরের মেঝেতে গড়িয়ে চলেছে। ঝন ঝন ঝনননন...।

বাড়িওলি দোতলার বেডরুমে ইজিচেয়ারে বসা কত্তার দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠলেন - এলো তোমার ভাড়াটিয়া। নাও ঘড়ি মিলিয়ে নাও, রাত ন'টা বাজে।

বাড়িওলা বললেন - ঠিকঠিক, মেয়েটা ফিরতে এখনও আধঘন্টা দেরি সহ্য করা যায়, কী বলো?

বাড়ির নীচে, দক্ষিণদিকের ফুটপাতে হকার মালপত্র গোছাতে ব্যস্ত ছিলো। বিদ্যুৎবেগে মাথা সরিয়ে নেয়। তিনতলার জানালা দিয়ে উড়ে এসেছে সসপ্যানের সরাখানা। ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলো ওপারের ফুটপাথে। উত্তরদিকে স্ট্রিটল্যাম্পের নীচে দাঁড়িয়েছিলো পাহারাওলা। সে বাঁশি বাজিয়ে শহরবাসীকে সাবধান করে দিলো। তিনতলার উত্তর থেকে ছুটে এসেছে এ্যাটলাসের মাথায় গ্লোব বসানো কাঁচের পেপার ওয়েট। মা বাবা দুজনেই বিরহ ব্যাকুল সন্ধ্যা উদযাপনে ব্যস্ত। সেই অবসরে দত্যি দরোজার ফাঁক গলিয়ে টুকটুক পায়ে কোথায় হারিয়ে গেলো। খোঁজ খোঁজ, খোঁজ পড়লো রাত সাড়ে ন'টার যুদ্ধ বিরতিতে।

মা বাবা দু'জনেই হতবাক। দত্যির ঘর তছনছ। যেনো বাস্তিলের দুর্গপতন ঘটে গেছে। কাঠের ঘোড়াখানা ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে। ট্রয়ের যুদ্ধশেষে পরিত্যক্ত অশ্ব যেনো বাতাসে আপন মনে দুলছে। সিলিংফ্যান ঘুরছে পাঁচে। প্রকৃত অর্থে অসম্পূর্ণ রণাঙ্গণ। মহারাজ পুরুর হাতি কুপোকাত। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের তিনচারখানা প্যাটনট্যাঙ্ক চিৎ-কাত-উপুর হয়ে পড়ে আছে। দু'একটা জল এবং হাওয়াই জাহাজ এদিক সেদিক ছড়ানো। অংসখ্য বাস, ট্রেন, মটরবাইক, মর্টার মেসিনগান ছড়াছড়ি। দত্যি নেই।

শোয়ার ঘরে, খাটের নীচে, দত্যি নেই। ড্রেসিংটেবিলের কোণায়, রান্নাঘর, পায়খানা, বাথরুম কোথাও নেই। কোথাও নেই।

মুহ্যমান মাতাশ্রী বাইরের ঘরে সোফার এককোণে কাত হয়ে কেঁদে ফেললেন।

- তোমার জন্যে আমার দত্যি হারিয়ে গেলো।

- থাক, আর সাধু সেজো না। ফিসজারটা ওল্টালো কে? মাছগুলো মেঝেতে ছটফট করছে দেখেইতো দত্যি ভয়ে পালিয়েছে।

- হায় হায় কী অলুক্ষুণে বাপ। ছেলে হারিয়ে গেছে। বলছে, পালিয়েছে!

- ছেলে তোমার। আমি চেয়েছিলাম মেয়ে। ছেলে বলেই উশৃঙ্খল, উজবুক। মেয়ে হলে কক্ষণো পালাতো না। হারাতো।

- নির্লজ্জ মদ্দামানুষ। আমি বুঝি পালাইনি তোমার সঙ্গে! হারিয়ে আছি? হাড়ে হাড়ে চিনি তোমাকে। কুঁড়ের বাদশা কোথাকার! এখনও বসে বসে মুখ নাড়ছো। দত্তক কেনো, নিজের ছেলে হলেও নড়তে না, আমি জানি।

- কিডন্যাপ হলে এখুনি ফোন আসবে, কতো লক্ষ টাকা চাই। টেলিফোনের পাশে বসো। আমি নীচের ফ্ল্যাটগুলো দেখে আসি।

- কেনো, ওখেনে কী মরতে যাবে?

- সিঁড়িতে বাড়িওলির মেয়ে আছে না, বিদায় সম্ভাষণে ব্যস্ত। যদি খোকাকে দেখে থাকে।

- না, তুমি ওই ধিঙ্গি মেয়েটার কাছে যাবে না। এই সোফা ছুড়ে মেরে দেবো।

- কেনো, দরোজাখানা কি হাতের কাছে নেই? আমি ছুড়তে পারিনে? সাবধান, বলে রাখছি। যাই নীচের ফ্ল্যাটগুলো একবার খুঁজে আসি।

- না। নীচের ফ্ল্যাট আমি খুঁজবো। তুমি যাও শহর চষে এসো। ষাঁড় কোথাকার!

না, ফ্ল্যাট শূন্য। দত্যির কোনো লক্ষণ পাওয়া গেলো না। সিঁড়ির মোড়ে ছাত্রী-শিক্ষকের যুগলবন্দী গলিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। বাড়িওলির মেয়ে আজ চার্লি মেখেছে। উত্তেজক গন্ধে ম ম করছে সিঁড়ির অন্ধকার। শরীর শিউরে উঠলো। পথের আলো কানকি মারছে। এখানে ওখানে জোড়াজোড়া জমাট অন্ধকার। রাস্তা আছে, স্ট্রিটল্যাম্প নেই। স্ট্রিটল্যাম্প আছেতো বাল্ব নেই। অজস্র গলি ঘুঁজি, সহস্র ডাস্টবিন। দু'একটা মুক্ত জলাশয়। এতবড়ো শহরে ওইটুকু পুঁচকেকে কোথায় খুঁজি? রাত বাড়ছে। ভিড় পাতলা হয়ে আসছে। ফাঁকা শহরে কাকে জিজ্ঞেস করি?

শয়তান বিটলে তিনতলা ভেঙে নামবে, তারপর এই শহরে হারিয়ে যাবে, বিশ্বাস হয় না! 'বেবিস ডে আউট' মুভি দেখেছি। আমার বউএর এঁটেপাকা বেবিতো নাইটে আউট হয়েছে। কপালে নয় সর্বাঙ্গে আরও করুণ দুর্দশা লেখা আছে আমার। শুনেছি, পুরুষমানুষেরা পথে বেরিয়ে পড়ে মহৎ কাজে। ডাহা মিথ্যে। আসলে বউএর ভয়ে।

তাই যদি হয়, যতো সময় দত্যিকে খুঁজতে থাকি, নিশ্চয় মহৎ কাজে লিপ্ত আছি। খুঁজে যেনো না পাই। পরমপুত্র কে খুঁজতে খুঁজতে মহাপুরুষ হয়ে যাবো একদিন।

সেই মুহূর্তে নিশ্চয় হন্যে কুকুরের মতো দেখাচ্ছিলো আমাকে। নইলে পুলিশের পেট্রলজিপ এসে কেনো হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলো আমার সামনে! এমনি এমনি? ওদেরতো বউএ কামড়ায়নি! জিজ্ঞেস করলো,

- কী খুঁজছেন?

রাগে দুঃখে বললাম - হন্যে কুকুরের বাচ্চা।

- কুকুরটা কৈ?

- আজ্ঞে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে। চিনতে অসুবিধে হচ্ছে?

পেট্রলজিপ ওয়াচফুল আই নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়। হন্যে কুকুরের সংখ্যা বেড়ে গেলে মাঝে মধ্যে শহর পরিষ্কার করে। হন্যে কুকুর ধরায় ওদের একমাত্র কাজ। আর কোনো কাজ নেই। কাজ পেয়ে মহাখুশি।

বললে - অ, বুঝেছি। উঠে আসুন। উই'ল হেল্প য়ু।

শুরু হলো মহৎ পরিক্রমা।

শিশুসুন্দর সমিতি, বিপদভঞ্জন কো-অপারেটিভ, অনাথবন্ধু হসপিটাল শহর উল্টেপাল্টে খোঁজা হলো। ডেলিকাগজের হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ সেকশানে হত্যে দিয়ে পুলিশস্যারের বুদ্ধি খুলে গেলো।

বললেন - চলুনতো, আপনার বাড়ি একবার সার্চ করি।

মহৎ কাজে বিঘ্ন। গাড়িতে চড়ে আর কয়েকঘন্টা কাটাতে পারলে এখান থেকেই অফিস চলে যেতাম। আতঙ্কগ্রস্থ গলায় বলি,

- স্যার, রুটিবেলা বেলেন, গরম চাটু, জ্বলন্ত উনুন, আমার গিন্নি সবাই বাড়িতে আছেন। ওরা কেউ হারাননি। আমরা বরং শ্মশানটা ঘুরে আসি।

পুলিশ স্যারের বুদ্ধি আমার চেয়ে ক্ষুরধার। বুঝতে কিছু বাকি থাকলো না। স্ত্রীদের হাত থেকে নিরীহ স্বামী উদ্ধার, স্বামীর বিপদমুক্তি, শান্তিরক্ষা পুলিশের এলেমেই ঘটে। বউতে প্যাঁদানো, বেবিতে খেপানো হন্যের কথায় শহর চলে না। উড়ন্ত চাকি, ভাসন্ত কেটেলি, ছুটন্ত সসপ্যানের শূন্যে আসা যাওয়ার ছবি মনে জপ করতে করতে ফিরে এলাম। বিধ্বস্ত, যুদ্ধক্লান্ত। বাড়ির লোকেশান, ঘরের অবস্থান, সর্বোপরি খোলা জানালায় আমার বিখ্যাত স্ত্রীর মুখমণ্ডল দেখে পুলিশ অফিসারও থমকে গেলেন। থানার বড়োবাবুও আমার স্ত্রীকে সমীহ করেন। পুলিশস্যর গম্ভীর মুখে বললেন - সঙ্গে মহিলাপুলিশ নিয়ে ফিরে আসছি। ততক্ষণ খোঁজটা আপনি সামলান।

ঘরময় সাদা আলো। টিউব জ্বলছে। কোনো সাড়া শব্দ নেই। জানালায় স্থির, পাথর প্রতিমা যেনো। আহা বেচারি! সুভাষিণী বিরহিনী, পুত্রহারা, একাকিনী, আমার একান্ত অবলাপ্রিয়া দাঁড়িয়ে আছে! আর উত্তর আকাশে তার একমাত্র সঙ্গী নিসঙ্গ ধ্রুবতারা। দুঃখে বিগলিত। স্বামীর কর্তব্যে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মহীয়সী নারীর দু'হাতে ধরা জানালার কপাট। কেঁদে কেঁদে কপাল ফুলে গেছে। নড়ে গেছে জানালার রড। তাকিয়ে আছে দূরে, কোন অজানা আশঙ্কায়। ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে উত্তাপ টেষ্ট করি,

- দত্যিকে দেখতে পাচ্ছো?

মহাকাশ থেকে তার উদাস-বাউল স্বর ভেসে আসে।

- ধরো, দত্যি যদি হারিয়ে মনুমেন্টের মাথায় চড়ে বসে? এখান থেকে দেখতে পাবো?

- আজকাল অলিতে গলিতে আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটের হুজ্জুতি। মনুমেন্টকে ট্যাড়স ভেবেও কেউ পাত্তা দেয় না। চড়তে যদি হয়, দত্যি হাওড়াব্রীজে বসে হাওয়া খাবে। নীচে গঙ্গাকে এ্যাকুরিয়াম ভাববে। মাছেদের খেলা দেখবে। ভুলে যাবে ঘরের মেঝেতে ছটফট করা মাছেদের যন্ত্রণা।

- তোমার যেমন বুদ্ধি! গঙ্গার হাওয়ায় শেষে ছেলেটার সর্দি লাগুক। জ্বর কাশিতে ভুগুক। অপেক্ষা করো, আকাশে চাঁদ ফুটুক, দেখবে, ভিক্টোরিয়ার চূড়ায় যে পরি আছে তার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে খোকা। ভাবছে মায়ের কোলে ঘুমুচ্ছে। জানো, খুব ভয় করছে, যদি পড়ে যায় কী হবে?

- যাবেইতো, দত্যির মতো বোকা পাঁঠারা পড়েই মরে। দত্তা (ভেবেছিলাম, মেয়ে দত্তক নিলে নাম রাখবো) হলে হারিয়েই যেতো। ওসব আজেবাজে জায়গায় যেতো না।

- বললেই হলো। দত্যির পায়ে সাঁড়াশির মতো নখ। ইচ্ছে করলে ধ্রুবতারা আঁকড়ে ঝুলে থাকবে।

- দত্তার পায়ে নরম প্যাড। হারালে ছায়াপথে হেঁটে বেড়াতো।

- ফালতু কথা বোলোনাতো। যে নেই সে হারাবে কী করে? যে সত্যি হারিয়েছে তার জন্যে দুঃখ করতে দাও।

- যে ফিরে এসেই মায়ের সঙ্গে জ্বালাতে শুরু করবে, তার জন্যে নাকে না কেঁদে, ঘরে যে এলো না, তার কথা ভাবো। সে থাকলে সংসার কতো সুন্দর হতো।

- তার মানে দত্যি হারায়নি, বাজে কথা বোলো না। আলবাত হারিয়েছে।

- বলছি হারায়নি। কোথাও ঘাপটি মেরে মজা দেখছে।

- কীইইই, হারায়নি, কথার উপর কথা!

হঠাৎ নড়ে উঠলো জানালার শিক। ভয় পেয়ে গেলাম। আমি কিছু খুঁজছি। হাতের

কাছে খাটের স্ট্যান্ডখানা পেয়ে, চেপে ধরলাম।

দরোজায় দেখি, বাড়িওয়ালা দাড়িয়ে। উফ! এ যাত্রায় বেঁচে গোলম। মোলায়েম গলায় মধু ঢেলে জিজ্ঞেস করি,

- কিছু বলবেন দাদা?

আপনাদের টেনশানে আমার ঘুম আসছে না। একটা ঘুমের ট্যাবলেট হবে?

- নিশ্চয়ই।

মাথার বালিশের নীচে স্লিপিং ট্যাবলেটগুলো ছিলো, গেলো কোথায়! এখন প্রিয়ভাষিণীকে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। জানালার রডখানা নড়ে আছে, উঠে আসতে পারে। খাটের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজি। হুম , শিশিটা খালি পড়ে। মুখ খোলা। ট্যাবলেট নেই। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে বলি - সরি দাদা, খুঁজে পাচ্ছি না। হারিয়ে গেছে।

রড নয়, জানালার মুখ থেকে অমৃতবাণী ঝাঁঝিয়ে উঠলো - মামদোবাজি। সিঁড়ি ভেঙে এতোটা পথ উঠে এলেন দাদা, আর উনি এক কথায় খালাস, 'সরি'। ট্যাবলেট কি দত্যি, যে হারিয়ে গেছে! খোঁজো। আরো খোঁজো। কানার মরণ!

আর পারছিলাম না। হাত পা ছেড়ে এলিয়ে গেলাম বিছানায়। পিঠের দিকে ডাঁই করা লেপ কম্বল। ঠেস দিলাম। হঠাৎ বুকের উপর ভুস করে ঠেলে উঠলো দত্যি। ডেকে উঠলো - ভ্যাকম ভ্যাক

বাড়িওলা দাদা চেঁচিয়ে উঠলেন - ওইতো হারানো কুত্তা!

গিন্নি হাউমাও করে কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরলো আমাকে।

- ওমা আমার কী হবে? লক্ষীসোনা দত্যিকে উনি কুত্তা বলেছেন। কালই তুমি এ বাড়ি ছেড়ে দাও।

- আমার ট্যাবলেটগুলোর পিঁজে মেরে, লেপের ফাঁকে ওম মারছে। বাড়ি হাতের মোয়া, বললেই হলো ছেড়ে দাও। আমি এখন ঘুমোবো কী গিলে?

- তুমি উচ্ছন্নে যাও। জাহান্নমে যাও। আয় বাবা সোনাআ... ছেলে। লক্ষী... ছেলে। উম উমমমমম... কোলে আয়। রাত অনেক হলো, ঘুমুতে যাই।

- তাই যাও। ঘুম যেনো আর না ভাঙে। আমি জাহান্নমেই যাচ্ছি। বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে বাবা দত্যি, একবার ডাকতো, ভ্যাক ভ্যাকুম।

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে পিওন ছোকরাকে না হয় ডেকেই বলবো - হ্যাঁ বাবা, তুই সামনে দাঁড়িয়ে ডাক, প্রাণ ভরে ডাক, ভ্যাকুম ভ্যাক।

আমি দাঁড়িয়ে আছি।

চার নম্বর বিবি

ফাল্গুন মাসের ভোরে যদি গল্পটা শুরু হয় অবশ্যই আপনাকে শীত আর হরিনাম সংকীর্তনের দলটির কথা ভাবতে হবে।

যশোর রোড, জয়হিন্দ লন্ড্রির মোড়, বিভূতি মুখুজ্জেদের বাড়ির ঠিক নীচে, নেহাত পথের মাঝখানে, মাড়িয়ে যাওয়া যায় না, নইলে এসব হরবখত ...

—ছিঃ ছিঃ! লজ্জা!

চোখ দুটো ঠিকরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, মা শ্মশানকালী গায়ে একটুকরো সুতো নেই।

—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ!

তিলক সাবধান করে নামাবলি নাকে মুখে চেপে মূল গায়েন বলে উঠলেন—

—ওঁরে টাঁক টাঁক।

এখনও কসমেটিকসের রঙ, উগ্র সাবানের শিউলি গন্ধে মাখামাখি। টাটকা লাশ।

—রাম রাম রাম রাম।

নামাবলির ফাঁক গলিয়ে কেউ তারিয়ে উপভোগ করে নিল নারীদেহের ভূগোল।

হাঁচড়ানো কামড়ানো শরীরে রক্তের দাগ যেন ছোটখাট সব নদী, খাল—যৌনাঙ্গের অরণ্য ফেটে এক-বিল রক্ত বেরিয়ে কালো পিচ রাস্তার উপর স্থির হয়ে আছে।

—হরিবোল।

শান্ত শীতে ভোরের মত নিরুত্তাপ ছবি। মুখগহ্বর খোলা—হাঁ। দাঁতগুলো উঁচু, সাদা, বেরিয়ে আছে। মুখখানা ছাইপাঁশ লালনীল রঙে মাখামাখি।

উস্কোখুস্কো ঝোড়ো চুলের মধ্যে শুয়ে আছে মাথা রেখে, যেন ঘাড়ভাঙা কাক। বোঝা যাচ্ছে, মৃদু ধস্তাধস্তি হয়েছিল।

চোখ দুটো ঠিকরে তাকিয়ে আছে।

যেন হরিনামের দলকে দেখছে। সামনের বিশাল হোটেলটা, বড় বড় বাড়ি প্রাসাদ, সাজানোগোছানো সুন্দর এই শহরটাকে দেখছে। সাজগোজ ওর খুব পছন্দ।

দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। যেন ভোরের পবিত্র, সাজানো সুন্দর শহর দেখে হাসছে।

—প্রিয় বাসভূমি, বিদায়।

বিশ্বাস করুন, এভাবে শুরু করতে চাইনি। এভাবে শুরু করলে ঠুলি-আঁটা ঘোড়ার মতো গল্পের এক-বগ্গা-ছুট সামলানো দায়। আর ঘোড়ার সঙ্গে জোতা গাড়ির খটর খটর নীরস শব্দে ঝালাপালা লেগে যায়। গাড়ির নীচে চাপা পড়ার ভয় কেবলই। তবু যদি গল্পটা অন্যভাবে শুরু করতে পারতাম!

সকালের রোদ্দুর আর ঘড়ির কাঁটা এসে শহরের ফিতে খুলে দিল। পিকনিকের ক্যারাভান গাড়ির মতো শহর চলতে শুরু করল। রঙ-বেরঙের চুম্বক টাঙানো হল দোকানপাটে। খবরের কাগজওয়ালা বিজ্ঞাপনের বান্ডিলগুলো ছুড়ে মারছে গেরস্থের দরোজায়।

ঠিকে ঝি আর রাঁধুনিদের কান আড়াল করে গিন্নি-সকল এক শিশি আচারের মতো মুখ পাল্টাপাল্টি করছিলেন জানালায় জানালায়।

—কর্তা দেখে এসেছে। পুলিশের খাতায় নাম লিখেছে—ঢণ্ডি! বাব্বা! নাম বটে। ঠোঁট টিপে হাসার মতো নাম।

মুখ টেপাটিপি হাসি এই জানলা, ওই আলসে সেই দরজা পেরিয়ে জ্যান্ত বেলুনের মতো লাফাতে লাফাতে বেলা দশটার আগে গোটা শহরে মালার মতো ছড়িয়ে গেল। ঘোষগিন্নির মুখপাতলা। বলে উঠলেন

—অঃ ঢণ্ডি! ঢণ্ডি। ঢণ্ড ঢণ্ডা ঢণ্ড ঢণ্ড ঢণ্ডির পাছায় কত রঙ।

রায়গিন্নির কানে ঘোষগিন্নির চেয়ে বেশি সোনার ঝুমকোপাশা। তার কান ভারি।

—কী বললি? কী বললি? ঘোষা? আমার অত মনে থাকে না। আর একবার বল দিকি!

—আমি আর কী হিল পরি! আমার যদি চার-আঙুল হয় তো ওর এক-বিঘত উঁচু। যখন হাঁটে, থুড়ি হাঁটতো যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকা চলছে। দোল দোল দুলুনি। দোলায় চলে বাবুনি।

মিউনিসিপ্যালিটি অফিস। এখানে স্থানীয় কর্মচারি বেশি। বেলুনের ছড়াছড়ি। যে যেমন খুশি বেলুন ফোটাচ্ছে, ফাটাচ্ছে, রঙ পাল্টাচ্ছে।

সুগন মাহাতো আউটডোর সুইপার সুইচবোর্ডে টিউবলাইট অন করছিল। চেয়ারে বসে ড্রয়ার খুলতে না খুলতে চ্যাট্যার্জিবাবুর জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো চোখের সামনে বলে উঠল।

—এ শর্মাই ফাস্ট, চ্যাটার্জিদা। হরিনামের দল তখন কোতায়। তখন ড্রেন ঠেলছি। অন্ধকার, ভেপার ল্যাম্পের নিচে শুয়ে ছিল। আমি ভেবিচি নেশাভাঙ করে পড়ে

আছে। দারুণ ফিগার। কোমর যদি সিমির হয় তো বুকদুটো মাইরি মৌসুমির। তবে পাছা বলিহারি, সাঁওতাল মাগিদের চেয়ে দড়ো।

টিউবের সাদা আলো চ্যাটার্জিদার চোখে এক চুমুক শিস দিয়ে উঠলেও দিনের পাকা আলোয় বাবুর মুখে কোনো হেরফের হলো না।

—মেয়েটা তোদের সিডিউলট্রাইব না?

—অতশত জানিনে, মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ। তার আবার সিডিউলটাইব না ফাইব অতো কাস্টের কি আছে? চাকরির দরখাস্ত লিখছি নাকি? ওর মা ছিল চক্কোত্তি। মহম্মদ আলি, ওই যে চড়কতলায় বাড়ি, সোনার কেসে বাঙলাদেশে ফেরার—ওর মার ঘরে যেত। কানা-ঘুষো শুনি মেয়েটা নাকি ওরই।

—দে দে জল দে। এসব খবরে থাকিস না। থানা পুলিশ কোত্থেকে কী হয়ে যাবে!

গলা সরু করে জিজ্ঞেস করলেন—খোঁজ নিসতো ওর মা চক্কোত্তি ছিল কিনা? যত্তসব ছোটলোকদের কাণ্ড।

—তোমার আবার চ্যাটার্জি চক্কোত্তি বাতিক। খোঁজ নেব কি? আমাদের বস্তিতেই বাসা ছিল। ওর মা ছিল কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল। কী যে সুন্দরী ছিল চ্যাটার্জিদা। চাঁদের মতো রূপ। হলে কি হয়, ভেতরটা ছিল মাকালফলের মতো নোংরা। অন্ধকার। কিছুই জানা যেত না।

সুগন গল্পের মেজাজে একটা টুল টেনে বসে পড়ল। গলা নামিয়ে মুখ চ্যাটার্জিবাবুর কানে ঝুঁকিয়ে বলল—সে মাগি ঘরে পায়খানা ফিরত।

—এ্যাঁ!

—জানতে একমাস টাইম লেগেছিল। শুধু তাই না, কেন ঘরে বাহ্যে ফেরে, বুঝতে আরও ছ'মাস। আসলে মহম্মদ আলির সঙ্গে সোনা ব্ল্যাক করত। বাংলাদেশ থেকে, সাইকেলের বলের মতো সলিড সোনার বলগুলো খেয়ে রাতারাতি এদেশে পাচার হয়ে আসত। চ্যাটার্জিবাবু জল খাওয়া ভুলে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ফেললেন। নাক-মুখ ভর্তি ধোঁয়ায় হারিয়ে গিয়ে বললেন—হুম, তারপর—

—চ্যাটার্জিদা, পাপ ছাড়ে না বাপেরে। আস্তে, আস্তে রূপওলি যেন কেমন হয়ে গেল। দেখা হলে ইঁদুরে দাঁতের কুটকুটে হাসিটুকুও হাসত না। কুঁচবরণ মুখ মেঘবরণ হয়ে গেল। চাঁদের একাদশীর মতো, দিন দিন মুখের মাংস শুকিয়ে যেন মড়ার খুলি বেরিয়ে এল। কঙ্কালসার। মেঘবরণ চুল উঠতে উঠতে মাথায় কুঁচের মতো টাক পড়ে গেল। কী বলব চ্যাটার্জিদা, কঙ্কাল মুখে যখন রাতবিরেতে সিগ্রেট খেত, দেখলে আঁতকে ওঠার মতো।

চ্যাটার্জিদার মুখে আগুন, ধোঁয়া উড়ছে। সোনার গল্পের ভয়ে বিষম খেলেন। গলায় ধোঁয়া আটকে বিশ্রী গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে এল।

সুগনের তখন গল্প বলার মুড চেপে বসেছে।

—একবার বাংলাদেশ থেকে ফিরে মল ঘেঁটে সোনা নাকি আর খুঁজে পায়নি। তারপরই মহিলা কেমন চোর চোর হয়ে গেল। যতবার বাহ্যে যেত মল ঘেঁটে দেখে নিত সোনা আছে কিনা। আলিও বাংলাদেশে ফেরার হল। সে এক কিসসা। ঢঙির মার অনেক কিসসা।

মাপ করবেন গল্পটা উলের গোলার মতো এভাবে ছড়িয়ে পড়া খুব খারাপ। মিষ্টি একটা শীতের দিন বুঝি এলোমেলো করে দিলাম। আপনারা যখন শুরু করবেন, নিশ্চয়ই অজস্র রঙিন উলের গোলা পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে এলেও গুটিয়ে একটা সোয়েটারের মতো টাইট গল্প বুনবেন। ভেবেছিলাম, হয়ত প্রাসঙ্গিক। আসলে গল্পের একটা আভিজাত্য আছে। শিক্ষিত সমাজে ওঠাবসা আছে। যতই মৃত্যু হোক ঢঙি কে? ধান ভানতে শিবের গীত, তার মা-ই বা কে? ক্ষুদ্র মৃত্যুর এলোমেলো স্মৃতিচারণের পাশ কাটিয়ে আসুন, আমরা গল্পের অন্যদিকে যাই। এ দেশে মৃত্যুকে শোক নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু নিরপেক্ষ হওয়া যায় না, মনে হয়, এ গল্পে মৃত্যুকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখা উচিত। তাছাড়া ঢঙির মৃত্যুতে যখন কেউ দুঃখ পাচ্ছে না, দুঃখ না পাওয়ার দুঃখ পেয়ে লাভ নেই। বরং ছোট মোড়লের সাথে আসুন আলাপ করি।

পাড়ায় বলে ছোট মোড়লের মুখ তো নয় পুক। তার বায়ুর দোষ। উত্তেজনা, রহস্য, ভক্তি, মাধুর্য মানামানি নেই, সশব্দে বায়ু নিঃসরণ করেন। ঢঙি লোকের বাড়ি ঠিকে ঝি। ঢঙীর পাছা উঁচু, বুক ঝোলা, কুঁজো, বেঢপ চেহারা। কেউ তাকে ভালবাসে না।

ছোট মোড়ল বলে—আমার চোখ দিয়ে তুই যদি তোকে দেখতিস, তামাম ভু-ভারতে তোর জোড়া সুন্দরী নাই রে।

জলের গেলাস আলগোছে ধরে ছোট মোড়লের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ঢঙি। কি সুন্দর কথা বলে লোকটা। ঢঙি লজ্জা পায়। চোখ ঝামটা দিয়ে বলে—যাঃ।

—যাঃ—কিরে। আমি যখন আয়নায় দেখি, তোর মুখ ভাবলে আমাকে মজনু মনে হয় বুঝলি। তুই লায়লি।

ছোট মোড়লের বয়স বিরাশি ছুঁই ছুঁই। বুড়ো যখন আলগোছে জল খায় ঢঙি তাকিয়ে থাকে। চোখের পাতা পড়ে না। জলের গেলাস ফেরত দেওয়ার সময় মোড়ল বলে,

—লাইলির হাতে পানি, কলজে কল-কলাচ্ছে রে, বলছে তোকে লিকে করবে।

গেলাস ফেরত দেওয়ার সময় ঢঙির আঙুল জোরে টিপে দেয়।

ঢঙি ভাবে, এই বুড়োটা কেরে—ভারি অসভ্য তো!

আসর বসে কামারবাড়ি। ভারি জামগাছটার নিচে। জম-জমাট আড্ডা। রবি কামার গরুর গাড়ির চাকা বানায়। কামারশালার উঠোন জুড়ে পাড়ার যত বুড়ো-বুড়ির চুলবুলুনি। বিকেল পড়ে এসেছে। কারো মুখে রোদ্দুর নেই। গোটা উঠোন জুড়ে বয়সের ছায়া।

—কাদের যাওয়ার কথা, কে গেল!

—কালও মেয়েটা এখেনে, এই এখেনে জলের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে।

—ওরে চা দে, জল দে, আর বলতে হবে না। রবি কামার পাশ-কুড়ুল দিয়ে চাকার ফালি সাইজ করছিল।

—চা পাবে, জলও পাবে, ঢঙি আর দেবে না। মেয়েটা সাত-আট বছর আমার বাড়িতে।

রবি কামার মাথা নামাল।

—ঢঙি না, ঢঙি না, খুনি। আমাকে খুন করে গেল। এই বয়সে খোয়াব ছাড়া কী থাকে? তিন তিনটে বিবি বুড়ি হয়ে গেল। আমার আর কে থাকল বলো?

আশি বছরে বহু মৃত্যু পার করেছে মোড়ল, আরও একটা মৃত্যু এসে ভর করল গলায়।

—ভেবেছিলাম, চার লম্বর লিকে করব, ওকে। এ দুয়োরে ও দুয়োরে পাত পেড়ে খায়। জানে কষ্ট লেয়। হতে দিল না।

মানি ঠাকরুণ চিরকালীন প্রতিবাদী। বুকের মধ্যে জমে থাকা বাষ্প খানিকটা ফোঁস করে ছেড়ে বললেন—মোড়ল, নিকে করবা করো। জ্যান্ত বিবিদের খোয়াব নেই, এ কথা বলো না।

—মানি ও আমার কে জানো? জানের জান, কলেজ্যার নতুন টুকরো। চেরাগের সবুজ রোশনাই। ও কোথায় যাচ্ছিল জানো?

—তোমার কাছে—

শিবু ধোপা কবি মানুষ। বুকের ভিতর দম ধরে বলল—শেষ অভিসার।

মোড়ল গম্ভীর—এমন যাওয়া গেল। গান গানা গান গান, নেভার কাম, বুঝলে রবি, নেভার কাম। খুন করে গেল।

ও আমার পড়ে পাওয়া আধুলি। ল্যাজ্য আট আনা। সুদের সুদ। আলির মেয়ে। খাঁটি লাতনি। পাঁচ পাঁচটা পুতের চোদ্দটা লাতি। একটা মাত্তর লাতনি, সে ওই বামনীর গব্বে। মুখ ফুটে কোনোদিন বলতে পারিনি।

কেউ জানে না। আসলে পাড়ার সবাই জানে, বাংলাদেশ থেকে ফেরার পথে বামুনের মেয়েটাকে এনেছিল মহম্মদ আলি, মোড়লের তিন নম্বর কুলাঙ্গার।

—মেয়েটার হুরির মতো রূপ। আমাকে জানায়নি। যদি লিকে করে লিই। শয়তানটা মাতাল ছিল ওই রূপে।

মোড়ল বলে—ওই খুনিটার বয়স তখন পাঁচ, ছ-মাস। সেদিন আলি নেশা করে গিয়েছিল ওর মার ঘরে।

আশনাই করছিল।

কুপির আলোর চাঁচের ঘরে তখন চাঁদ উঠেছে। গায়ের ঘামে আঠা তৈরি হয়ে এসেছে। হুরির শরীরে ফুটিফুটি করছে বেলফুল, জুঁই ফুল, রজনীগন্ধা। গন্ধে দু'জন মাতোয়ারা, হঠাৎ দুধের বাচ্চাটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে নাকি বিছে, কী কামড়েছিল, কে জানে—কেঁদে উঠল চিৎকার ছেড়ে, মৌতাত গেল চটকে। চাঁদ ডুবে গেল। ফুলবাগান শুকিয়ে গেল। গায়ের ঘাম থেকে বেরিয়ে এল দুর্গন্ধ। একসঙ্গে তামাম দুনিয়ার আঁধারে আগুন জ্বলে উঠল আলির চোখে। রাগে লাফ মেরে পড়ল কচি বাচ্চাটার ঘাড়ে। নাকে মুখে চেপে ধরল ক্যাঁথা কাপড়।

—শালি মেরেই ফেলব তোকে।

হুরি তখন মা জননী হয়ে হাতে পায়ে পড়ে, কেঁদে কঁকিয়ে, সেদিনের মতো বাঁচায়। এইসব কথা আমাকে বলেছিল, পরির মতো, হুরির মতো সেই মেয়েমানুষটা। কোলে এনেছিল কচি শিশুটাকে।

হায়, হায়! কী সোন্দর রূপ গো। বসরাই গোলাপ যেন জ্বলছে। মনে হচ্ছিল, তখনই বুকের মধ্যে রেখে পিষি। লিকে করি। হায়, হায় সাতপুরুষে অমন লাতনি দেখিনি।

ভয়ে, ভরসার কথা কিছু বলতে পারিনি। মহম্মদ আলি মানুষ লয়। শয়তান। মেয়েমানুষটা ফিরে গেল।

আমি বলেছিলাম—পালিয়ে যারে ছুঁড়ি, পালিয়ে যা। মহম্মদ আলির হাতে তোর রেহাই নেই। মেয়েমানুষটা বলেছিল—এদেশে মহম্মদ আলি ও দেশে মোহন দাস সব সমান। বাঁচার জায়গা কোথাও নেই। নিজের দেশে নিজের ঘরে কোথায় পালাবো, চাচা। জান ওদের হাতের মুঠোয়। মোহন, আলি একসঙ্গে যদি বাঁচায় চাচা—। বাঁচতে বড় সাধ হয়!

এরপর কাদার মতো নরম মেয়েটাকে আলির ভয়ে লুকিয়ে রাখত একটা পেতলের হাড়ির মধ্যে। মুখে ভরে দিত মধুচুষি। হাড়ির মুখে দিত ঝাঁঝরি সরা। হাড়িটা ঝুলিয়ে রাখত বাঁশের আড়ায়। আলির নাগালের বাইরে।

হাঁড়ির মধ্যে মেয়েটা বড় হতে হতে বড় হতে হতে বেঁকে ধনুক হয়ে গেল। পাছার কাছে মাংস জমতে জমতে হয়ে গেল উল্টানো হাঁড়ি। সাড়ে পাঁচ ফুট মায়ের মেয়ে গিয়ে দাঁড়াল সাড়ে চার ফুটে। হাঁটলে মনে হত এক বিঘত হিল পড়েছে।

গল্পকে বার বার এভাবে পেছনে ঠেলে নিয়ে যাওয়া ভুল, খুবই ভুল। অতীতের নেশায় আচ্ছন্ন হওয়া এক ভারতীয় অসুখ এবং ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার মতো গল্পটি এসে পড়েছে বিরাশি বছর বৃদ্ধের হাতে। যাকে বাংলাদেশে বলে, ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো। যেমন গল্প তেমন নায়ক।

বরং ভাঙা কুলোখানা রবি কামারের বউ-এর হাতে তুলে দিই। গল্পটা এগিয়ে নিয়ে যাই। কামারগিন্নি কুলোখানা বরণডালার মত নামিয়ে দেয় ছোট মোড়লের সামনে। কুলোখানা পাড়ার পুকুরে বিসর্জন দেওয়া ভাঙা কারো বরণডালা। ছাই বলতে প্লাস্টিকের একটা কৌটোতে রাখা সাদা ধবধবে সত্যিই ছাই, নাকি ফেসপাউডার। এগুলো ঢঙি মুখে মাখত। একটা দাঁতভাঙা চিরুনি। একটুকরো আয়না। এ দুটো কিনেছিল কালীবাড়ির পৌষমেলায়। একটা চিমসানো 'ফেয়ার এ্যাণ্ড লাভলি'র টিউব। এটা কুড়িয়ে পাওয়া। এবং ওতে কিছু নেই। আধখানা লিপস্টিক। একটা রঙিন মোমের পেনসিল। এটা নাকি রুজ হিসেবে কাজে লাগাত। ঢঙীর 'বিকুটি পারলার'। কামার-গিন্নি হেসেও হাসে না—এগুলো তোমার চার নম্বর বিবির সম্পত্তি। কী করবো?

রবি কামারের জমির শেষকোণায় পোড়ো একটা জ্বালানিঘরে ঢঙি থাকত। ঘরের অর্ধেকটা কাঠ, পাতা, ঘুঁটে থরে থরে সাজানো, অন্যদিকে একটা বাঁশের মাচা ছিল ঢঙির বাসভূমি। মাচার উপরে শুতো, নিচে রান্না খাওয়া বিষয়-সম্পত্তির কেবিন। ঢঙির হাতে বেদখল সম্পত্তি সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে এইসব উদ্ধার হয়েছে। কামার-গিন্নি কুলোখানা ছোট মোড়লের পায়ের কাছে নামিয়ে দেয়। পথে কুড়োন প্যাস্টেলটা আলতো আঙুলে তুলে নিলেন ছোট মোড়ল আনমনে, কালো তুবড়ে যাওয়া মুখের হনুতে পরম আদরে কখন যেন বুলোচ্ছিলেন। সাদা নুড়োর মতো দাড়িতে একটু একটু গোলাপি আভা ফুটে উঠছিল।

ঢঙির মুখখানা ছিল বড় সুন্দর। কাজ থেকে ফিরে কোন কোন পূর্ণিমারাতে প্রাণভরে মেয়েটা সাজত। সাজা শেষ হলে নিশিরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এই আড্ডার উঠোনে আসত। কেউ কোত্থাও নেই। আসত কাল্পনিক আড়াল তুলে, চুপি চুপি পা টিপে টিপে—নাচের ভঙ্গিতে। যেন অভিসারে যায়। চাঁদের আলোয় ছোট মোড়লের বসার কাঠের গুড়িটার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে সিনেমায় দেখা নায়িকার মতো অভিনয় করত। কল্পনায় জামগাছটাকে ছোট মোড়ল ভেবে জড়িয়ে ধরত। হাসত, কাঁদত, রাগ করত, বিশুদ্ধ প্রেমে ভরিয়ে নিত নিজেকে।

কামার, কামারবউ জানে। পূর্ণিমা রাতে এই দৃশ্য ছোট মোড়লকে চুরি করে দেখিয়েছে ওরা।

ছোট মোড়ল অঘোষিত নীরবতা ভেঙে হঠাৎ বলে উঠলেন—আমার চারনম্বর বিবির ডেড বডি উদ্ধার করতে যাচ্ছি। তোমরা কে কে যাবে?

মনে হল, ছোট মোড়লের গলা মুড়িয়ে কেমন যেন করুণ হয়ে এসেছে।

জামতলা-আড্ডার পুরুষ সদস্যরা যখন থানার দিকে যাচ্ছিল, শহরে সন্ধে নেমেছে। আলোয় ভেসে যাচ্ছে শহর। মৃত্যুর চিহ্ন কোথাও নেই। যশোর রোডের মোড়, জয়হিন্দ লন্ড্রির কাছে এসে সকলেই একটু থমকে দাঁড়ালেন।

এই সেই জন্মস্থান মধ্যবর্তী সভ্যতাগিরি যাহার শিখর দেশে সতত ...

ছোট মোড়ল নিচু হলেন, হাঁটু গেঁড়ে বসলেন পথের উপর—এখনও খানিকটা জমাট বাঁধা রক্ত। মুছে যায়নি। ঝুঁকে সস্নেহে হাত বুলিয়ে নিজের রক্ত চেনার চেষ্টা করলেন। রক্তের ছবিটা অশিক্ষিত ছোট মোড়লের চেনা চেনা ঠেকছিল।

—দেখো দিকি রবি, এটা একটা চেনা চেনা দেশের ছবি, মনে লিচ্ছে। রবি কামারও শিক্ষায় তথৈবচ। অনেক সময় দেখে বলে উঠল,

—আরে ঠিক ঠিক, চিনতে পারছ না মোড়ল, এ তো আমাদের সেই জন্মভূমি গো।

তাদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ানো মানুষের ভিতর থেকে কে যেন বলল

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জন্মভূমির দাগ।

অ্যান্টাসিড ও তেলাকুচো

অবিনাশ কি মরতে এখেনে বাড়ি করেছে! দিন নেই দুপুর নেই, শুরু হল কোঁদল। জানলা খোলা। অবিনাশ দাঁড়িয়ে। নিজে চোখে দেখলো—গোবিন্দ লাথি মেরে মা-পুঁটলিকে উঠোনে ছিটকে দিল। বুড়ি মরেও না। যমের অরুচি। নিত্যদিন খাওয়া খাওয়া নিয়ে আগুনজল। আজ আবার শুরু হলো। বুড়ি চিল্লিয়ে পাড়া মাথায় করছে।

—নামুনে রাক্ষস, খা উলাউটো হবে। খেয়ে মর। কবে পুন্নম যাবি। চ্যারাক জ্বালবো। হাড়ে বাতাস নাগবে।

অকথা কু-কথার কি শেষ আছে, ছেলেমেয়ে দুটো বড়ো হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ একটা হেস্ত-নেস্ত হওয়া দরকার। দশ হাত ছিটকে পড়েও বুড়ি দিব্যি বেঁচে গেল।

অবিনাশ জানালা বন্ধ করে দেয়। কাঁহাতক বন্ধ রাখা যায়। হাওয়াবাতাস একটু খোলা বলতে ওই গোবিন্দদের দিকটায়।

সেবার মিটিং ডেকে গোবিন্দদের তুলে দেওয়ার চেষ্টাও করেছিল অবিনাশরা। বাপরে! মা-বৌ-ব্যাটার কী গলা! কোমর বেঁধে চিৎকার—তোদের বাপের জায়গা! ট্যাসকো দিয়ে বাস করি। আয় কার ঘাড়ে কটা মাতা আছে ছাল ছাড়িয়ে নেব না।

অবিনাশের অসুবিধেই বেশি। জানালা খুললেই দেখা যায়। উদোম গায়ে ছেঁড়া গামছা পরে, বুড়ি রাঁধে। রাখ-ঢাক নেই। লাজলজ্জার বালাই নেই। গরমকালে গোবিন্দ বৌকে নিয়ে উঠোনেই শুয়ে থাকে। ছেলেমেয়ে দুটো বড় হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ!

সিদ্ধার্থওতো ওর মাকে সরিয়ে দিল। বৃন্দাবন পাঠিয়ে দিল। যেন তীর্থে গেল। কেউ বুঝতে পারলো? লেখাপড়া কালচার না থাকলে যা হয়।

চেল্লাচিল্লি আজকাল একদম সহ্য হয় না। ছুটির দুপুরটাই দিলো মাটি করে। গলার কাছে খানিকটা টক ঢেকুর উঠল। বুকের কাছটা জ্বালা করছে। একটা এ্যান্টাসিডের খোঁজে জানালা ছেড়ে ঘরের ভিতরে পা চালালো অবিনাশ।

গুরুজনদের নিয়ে অশান্তি অবিনাশ এদকম পছন্দ করে না। মা বলে কথা। যা করবি শালীনতা বজায় রেখে কর। হৈ-হুজ্জোতি সাতপাড়ার লোক জানাজানি এসব অসভ্যতা

ছাড়া কী?

বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। টেনশান হলেই গ্যাস বেড়ে যায়। মাথা ঝিম ঝিম, শরীর অস্থির করে। অবিনাশ এঘর ওঘর চিলতে বারান্দায় পাক খায়। গ্রিল আঁটা, খাঁচা বাড়ি। সারাজীবন ধরে বাড়িটুকু করেছে। বাড়ি করতে কম ধকল! বাড়ি করতে গিয়েইতো গ্যাস অম্বল ধরেছে। ইট, বালি, সিমেন্ট, লোন, জমি, জান কয়লা হয়ে গেছে।

অবিনাশ ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার হাটকায়। এইখানেই তো একপ্যাকেট এ্যান্টাসিড ছিল। কোনো জাগায় জিনিস রেখে শান্তি আছে? বুকের কাছে চিনচিন করছে ব্যথা, গ্যাস। এত গ্যাস থাকে কোথায়? যা খায় সবই কি গ্যাস হচ্ছে?

মেয়েকে ডাকে—জোছনা, জোছনা?

বৌ-এর সাথে দিন-সাতেক কথা নেই। নটঘট কিছু হলেই হলো। আগে একদিন একবেলা ছিল। এখন পাঁচদিন, সাতদিন, একমাস। অবিনাশকে কেউ বুঝলো না। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।

সেদিন রাতে বললো কিনা—চিটার। অবিনাশ চিটার। অথচ বিয়ের পর থেকেই বৌ চিট করছে।

পূর্ণিমা, অবিনাশের বৌ, গিয়েছিল ব্যাঙ্কে পাশবই দেখেনি। চেক কেটে নাকি অপমানিত হয়েছে। পাঁচটা ভদ্দরলোকের সামনে বলেছে পাসবই কার মাসিমা? ছিঃ!

অবিনাশ টাকা তুলে নিয়েছে। বেশ করেছে। জয়েন্ট এ্যাকাউন্টের কী দরকার! গোপন কাগুতো আছেই। সারা জীবন পকেট মেরে ফাঁক করেছে। মেয়েমানুষের হাতে পয়সা থাকলেই মেজাজ তুঙ্গে থাকে। কিছু অশান্তি হলেই ছেলের সাথে ফুসুর ফুসুর। ছেলে বড় হচ্ছেন দল পাকাচ্ছেন। হুম্। ভয় দেখানো বের করে দেবো।

ছুটির দিন সিদ্ধার্থ বাড়ি। আজ কেউ যায়? মেয়ে গিয়েছে ফষ্টিনষ্টি করতে। দরকারে পাওয়া যায় না তো খেয়ে পরিয়ে লাভ? ছেলে বাড়ি নেই। পূর্ণিমা লেপ টেনে শুয়ে আছে। সব ভস্মে ঘি।

একটা ছুটির দিন ফাঁকা। জোছনা তখন ছোট। বাবা বেঁচে ছিল। বাড়িটা গমগম করতো। একসাথে খাওয়া হৈ চৈ গল্প। বাবার কথা মনে পড়তেই অবিনাশ দ্রুত আলমারীর নিচের তাক ওটকায়। বাবা এইখানে এ্যান্টাসিড রাখতো। কেমন অস্বস্তি হয়। বাবা এই রোগেই গেল। গেল মানে সুইসাইড। অম্বল গ্যাসের এত যন্ত্রণা! না, অবিনাশের সেরকম বাড়াবাড়ি কিছু নয়।

শেষ রাতটা পূর্ণিমা। বাবা একগাছা দড়ি হাতে বেরিয়ে গেল। অবিনাশ জেগে ছিল, দেখেছে। কিছু বলেনি। সেই একটা খোঁচা বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠলো। বুকের খাঁচার মাঝখানে হাত দিয়ে চেপে ধরে। চাঁদ তখন পশ্চিমে, ডুবু ডুবু। ভোর রাতে টর্চ

হাতে। বাড়ির পেছনে আমগাছে ঝুলন্ত। উঃ!

না নেই। কোথাও একটা এ্যান্টাসিড নেই। গোটা বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। বেরুতে গিয়ে দরজায় ঠোকা খায় অবিনাশ। বুড়ো হলেই ভীমরতি ধরে। শেষজীবনটা বুড়ো হাড় জ্বালিয়েছে। অবিনাশ কি বুড়ো হচ্ছে? বৌকে আজকাল কিছু বলতে সাহস হয় না। চিৎকার চেঁচামেচি পাড়া জানাজানিকে বড় ভয়। গোবিন্দদের জাত। হতচ্ছাড়া মেয়েটাও বাড়ি নেই। ওই মরা বাপই যত নষ্টের গোড়া। ব্যাঙ্কের টাকাপয়সা, লকার ওটুকু মেয়ের নামে দিয়ে গেছে। মাথায় উঠে বসে আছে। বলেছিল বাড়িটা নাতির নামে দিয়ে যাবে। ওঃ তেলপানা কলের গান, আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি!

পূর্ণিমার এই আস্পর্দা বুড়োরই দান। মা-মা কত আদিখ্যেতা! ঠেলা সামলাও অবিনাশ।

ভালো একটু কিছু মুখে দেওয়ার উপায় নেই। খাওয়াও শত্রু হয়ে উঠেছে। দু-টুকরো মাংস বেশি খেয়েছে, পেটটা অমনি ফুলছে। লোভ খুব খারাপ। লোভ করে বাড়িখানা দখল নিয়েছে। এখন বাড়িটা অভিশপ্ত হয়ে পেছনে লেগেছে।

একটা বুলবুলি ডেকে উঠল। কলিংবেল। অসময়ে কে জ্বালাতে এল! চাবির গোছা খুঁজে নিয়ে অবিনাশ বাইরের দরজা খোলে। সিদ্ধার্থ। প্রতিবেশি। অবিনাশের মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে।

—এসো, এসো।

—সিদ্ধার্থ গম্ভীর। বেশ অসহিষ্ণু। কিছু একটা হয়েছে। ঢুকতে গ্রিলে আঙুল কেটে গেল সিদ্ধার্থের। সামলে নেয়।

অবিনাশ রেডি। মেয়েটার নামে কুচ্ছো গাইতে এসেছে। আরে বাবা, অবিনাশ জানে! তার মেয়ে সিদ্ধার্থের ছেলের সাথে কী করে?

যেন কত আপনজন, ভাব নিয়ে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করে

—বৌদি কোথায়?

অবিনাশ মোলায়েম স্বরে উত্তর দেয়

—আর বলোনা, ওর শরীর তেমন ভাল নেই।

—যা দিন কাল পড়েছে, ভাল থাকার উপায় নেই।

অবিনাশ মাথার মধ্যেও একটা তুড়ি মেরে জেগে ওঠে। শালা, তুমি জানো না, বৌ-এর সাথে আমার কথা নেই। খোঁচা মেরে শুরু করছো। করো।

বলে,—এসো, ভেতরে এসো।

—বাড়িটাতো জেলখানা বানিয়ে রেখেছো।

দু'জনে ভেতরের ঘরে ঢোকে।

অবিনাশ বিরক্তি না চেপেই বলে, আর বলো না, ছোটলোকের পাশে বাস। সেই সকাল থেকে ঝুঁপড়িটায় খিস্তি খেউড়। মার ধোর। রাবিশ। গোবিন্দর মা ওই পুটলি বুড়িটা মারের চোটে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। কাঁহাতক সহ্য হয়! তোমার বৌদি তো শুয়ে পড়েছে। জোছনা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। একটা এ্যান্টাসিড নেবো, খুঁজেই পাচ্ছি না।

অবিনাশের চোঁয়া ঢেকুর ওঠে।

সিদ্ধার্থ গলা সরু করে বলে—জোছনার বয়স কত হলো?

—কী জানি, ওসব খবর তোমার বৌদি রাখে।

সিদ্ধার্থ মনে মনে বলে ন্যাকা, মেয়ের বয়স কত জানো না! বিয়ের তারিখ তো ঠিক মনে আছে।

বলে—তা বিয়ের বয়স তো হলো।

অবিনাশের চোখ সরু হয়। আবার স্বাভাবিক হয়। আগেও সিদ্ধার্থ একবার ইঙ্গিতে সাবধান করেছে। সিদ্ধার্থর ছেলে সোমনাথ নাকি জোছনার চেয়ে বয়সে ছোট।

অবিনাশ কোন দুর্বল মুহূর্তে ভেবেওছে সিদ্ধার্থর মালকড়ি খারাপ নেই। একমাত্র ছেলে। ঝুলে পড়ে পড়ুক না।

—কী যে বলো, সবে ইস্কুল ফাইনাল দেবে। কচি মেয়ে, কিইবা বোঝে। তোমার মা'র খবর কী?

সিদ্ধার্থ মনে ভাবে ... তোমার মেয়ে যে পেকে উঠছে। সেয়ানা। কতদূর যাবে? হাতে সময় নিয়েই এসেছি। ফয়সালা করে তবে যাবো।

অবিনাশ বলেই চলে—কাগজ পড়েছ? কোথাকার এক জজ নাকি বৃন্দাবনে সমস্ত বিধবাদের ঠিকানা যোগাড় করেছে। কোর্টঅর্ডার করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। তোমার মা'র কিছু খবর পেলে।

সিদ্ধার্থ ভাবে —মাল, ভয় দেখাচ্ছে!

বলে—বড় বড় হাতি-মারি ঘোড়া-মারি জজ ব্যারিস্টারের মা-মাসিরা আছে। আমিতো কেরানি। মাছি মারি। বুড়ো হাবড়াদের নিয়ে সংসার করা যে কী অশান্তি। দিনরাত শাশুড়ি বৌ-এ চুলোচুলি। এটাতো ভদ্দরলোকের পাড়া না কি? অবিনাশদা তুমি কিন্তু বেশ আছো। মেসোমশায় বিষয়-সম্পত্তি লিখেটিখে দিয়ে শান্তিতে গেছেন। তোমার আর জ্বালা কি?

অবিনাশ ছ্যাত্ করে ওঠে। ভাবে সিদ্ধার্থকে উইলে সাক্ষী করাটা উচিৎ হয়নি। উঠতে বসতে ছ্যাঁকা দেয়। সিদ্ধার্থ ভাবে আমি তো তবু বাঁচিয়ে রেখেছি। মাসে মাসে কিছু

পাঠাচ্ছি। সম্পত্তির জন্যে তুইতো বাপকে মেরেই ফেললি।

অবিনাশ ভাবে যা করেছি, বেশ করেছি, তোর মতো বাঁচিয়ে রেখে দগ্ধে দগ্ধে তো মারছিনে।

মোলায়েম কণ্ঠে বলে—দাঁড়াও, খানিকটা চাল জল খেয়ে আসি। যদি এ্যাসিডটা নামে।

সিদ্ধার্থ কিছুক্ষণ একা। পাশের ঝুপড়ি থেকে অস্পষ্ট গোঙানি শোনা যাচ্ছে। সে উঠে যায়। জানালা খুলে দাঁড়ায়। গোবিন্দর বৌ। উঠোনের এক কোণে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গোবিন্দ অপরাধীর মতো অন্য কোণে বুকে হাঁটু দিয়ে বসে আছে। কান্নার সুর যেন সাপ-খেলানো বেণুর মতো।

—ওমা তুমি কোথায় গেলে গো। না খেয়ে গেলে গো। আমি একা কী করে পিণ্ডি গিলবো গো।

সিদ্ধার্থ ভাবে—আদিখ্যেতা, শাশুড়ির জন্য মরাকান্না, লোক দেখানো ছাড়া কি? এক থালা ভাত তরকারি উঠোনে ছড়িয়ে। ছড়ানো অন্ন-ব্যঞ্জনের উপর দিয়ে, গোবিন্দর পাঁচ ছ'বছরের ছেলেটা কোত্থেকে ছুটে এল। জড়িয়ে ধরল মা-র গলা। বলল

—আল কাঁদা কলিসনে মা,আর কাঁদা কলিস নে।

গোবিন্দর বৌ ছেলেটাকে ঠেলে ফেলে দিল। মানুষ না কী! ন্যাংটো ছেলেটা ওঠে ধুলো ঝাড়ে। কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

—বৌ মন্দিরতলায় নেই বাবা। আমার বৌ এনে দে।

গোবিন্দ ছেলেটাকে ধাক্কা মারে। কোনো মায়াদয়া নেই। জানোয়ার। ছেলে ছিটকে পড়ে উঠোনে। বৌ চিৎকার করে ওঠে—উঠতে বসতে গনজোনা। আমিও চলে যাবো। যেদিকে দু'চোখ যায়। যেখান থেকে পারো মাকে এনে দাও।

বলে কেঁদে ওঠে। কান্নাতো নয় ফ্লুট বাঁশি। ড্যাম, বাস্টর্ড। হঠাৎ সিদ্ধার্থর চোখে চোখ পড়ে যায়। গোবিন্দর বৌ গলা নামিয়ে নিল—রেডিওর ভল্যুম কমানোর মতো। ছেলেটা উঠোনে শুয়ে কাঁদে। কাকে ছড়ানো ভাত খায়। বেলা পড়ে এল। গোবিন্দর ছায়াটা কেবলই অবিনাশের বাড়ির দিকে দীর্ঘ হচ্ছে।

অবিনাশ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে—আইনে আছে, বুড়ো বাপ মা দাবি করলে মাসে তিন হাজার পর্যন্ত খোরপোষ দিতে হয়।

—সিদ্ধার্থ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে—

—তোমার মেয়েটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অবিনাশের মাথা চড়াক করে জ্বলে ওঠে। উহু! রাগ দেখালে চলবে না। সাবধানে জাল গুটিয়ে তুলতে হবে।

—কেন, তুমি কিছু শুনেছ নাকি?

সিদ্ধার্থ উদাস-ব্যঙ্গ স্বরে বলে—না দেখেছি! নিজের বাড়িতে।

—ও তাই বলতে এসেছো।

গলা পাল্টে বলে—তুমি তো গার্জেনের মতো, শাসন করতে পারলে না?

—পরের মেয়ে, না এসে উপায় কী?

স্বগোতোক্তি করে,—বাপকা বেটি।

—বাঃ কী যে বলো, ওই দ্যাখো জানলা দিয়ে—লুচ্চা ফ্যামিলি। থার্ডক্লাশ। এপাড়ায় মানুষ বাস করে? এখানে বাড়ি করায় ভুল হয়েছে।

অবিনাশের আবার চোঁয়াঢেকুর ওঠে।

—অবিনাশদা, তোমার বাবাও তো গ্যাস অম্বলে গেলেন। জমিটা লিখিয়ে নেয়ার সময় যে ডাক্তার দেখিয়েছিলে, ঐ যে এফআরসিএস কী টাবলেট খাওয়াতে যেন। ওষুধটা খুব ভাল। আমার ডাইরিতে লেখা আছে।

অবিনাশের মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। শরীরের সমস্ত রক্ত এসে মুখে জমা হয়। শালা মরণকামড় দিয়েছে। অবিনাশের একটায় ভয়। ইদানীং অম্বলটা এত বেড়েছে, গ্যাসে মাথা পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফেলে দেয়। রোগটা বাবারও ছিল। কী করবো? জমিটা নিজের নামে লিখে না নিলে লোন পাচ্ছিলো না। আরো দুটো ভাই, তিনটে বোন। কোনো উপায় ছিল না। হ্যাঁ, বাপকে মেরেছি বেশ করেছি। নিজে হাতে তো মারিনি। নিজে মরেছে। আমার বাবা মরেছে তো তোর কী? বুড়ো বেঁচে থাকলে উইল বদলাতে কতক্ষণ?

অবিনাশ মুখে বলে—অসুখবিসুখ ভাই ঘরে ঘরে। চিন্তা করে লাভ নেই। যার ঘর সেই সামলাক। তুমি এখন বাড়ি যাবেতো? মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিও। ঘর সংসারতো ওই দ্যাখে। ওষুধটা ওই হাতে করে রেখেছে।

সিদ্ধার্থ ভাবে গভীর জলের মাছ। কাটাচ্ছ, কাটাও। কতজল কাটবে?

বলে—দেবো, দেবো। মানুষ মানুষের বাড়ি যায়ই। না হলে প্রতিবেশী কিসের! ছেলেটাকেও ভাবছি মা'র মতো কোথাও পাঠিয়ে দেবো। খুবই অবাধ্য হয়ে উঠেচে। বেশি তেড়িবেড়ি করলে দেব ত্যাজ্যপুত্তর করে। এত কষ্টের বিষয়-সম্পত্তি নষ্টতো করতে পারিনে, বুড়ো হলে কেউ দেখবে না। তুমি কী বলো অবিনাশ দা?

অবিনাশ মেয়ের বাপ। ঘোড়ার চালে চলতে হয়। তড়িঘড়ি করলে চলে না।

বলে—কতই বা বয়স। অত উতলা হয়ো না। সিদ্ধার্থ, যাও মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও বড্ড কষ্ট পাচ্ছি। সিদ্ধার্থ মনে মনে খিস্তিখেউর করতে করতে উঠে পড়ে। গেট খুলে

বিদায়ের ভঙ্গিতে দাঁড়ায় অবিনাশ। হেসে হেসে বেশ জোরেই বলে—যাতে প্রতিবেশীরা শুনতে পায়—

—মেয়েটাকে এখনই দখল করলে কী করে চলবে? একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও।

সিদ্ধার্থ বেশ খানিক চলে গেছে। থমকে দাঁড়ায়। গলির ওপারে দোতলায় ব্যানার্জি বৌদি দাঁড়িয়ে। ঠোঁটের কোণে ঝোলানো হাসি। এপাড়ার গেজেট বৌদি। খবর কানে ঢুকলে, সাঝোঁ ছাড়া বাসি হয় না। একরাতেই ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন।

সিদ্ধার্থ হাত নাড়ে, যেন কিছুই হয়নি।

অবিনাশ ভিতরের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করছে। বমি হলে খানিক স্বস্তি হতো।

ছেলেটা কোথায় বেরিয়েছে কে জানে? বৌ কথা বলে না। মেয়েটা গেছে ফষ্টিনষ্টি করতে। কী জানি, সিদ্ধার্থ ফিরে গিয়ে মেয়েটাকে কী বলবে? অবিনাশ একা। বাবার কথা মনে পড়ছে। আমগাছ। ঝুলন্ত বাবা। চাঁদের অস্পষ্ট আলো। জিভ বেরিয়ে পড়েছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। মণি দুটো ঢ্যালার মতো বেরিয়ে আসছে, উঃ! কী কষ্ট! অবিনাশ একা, ভীষণ একা।

চটকা ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে? ঘরের মধ্যে কে যেন হাঁটছে? কে? বাবা?

ধড়মড় করে উঠে বসে। না। সিদ্ধার্থ।

প্রায় ভয়ার্ত গলায় আর্তনাদ করে ওঠে অবিনাশ।

—তুমি?

সিদ্ধার্থ কিছুই বলে না। একটা কাগজের চিরকুট অবিনাশের চোখের সামনে ঝুলিয়ে ধরে। জানালা খোলা। বাইরে সন্ধের ঘোর লেগেছে। নিজেকে সামলে নেয়। কাগজটা নেয় অবিনাশ।

সিদ্ধার্থ আলোর সুইচ অন করে নিঃশব্দে। অবিনাশ দেখে একটা চিঠি।

পূজনীয় বাবা এবং (শ্বশুর) বাবা,

তোমাদের জীবনে আমাদের হাঁফ ধরে গেছে। লুকিয়ে চুরিয়ে মিথ্যে বলে, পেছনে চাকু চালিয়ে আর পারছিনে। চল্লাম। দরকার হলে গোবিন্দদাদের মতো বস্তিতে থাকবো।

যেখানেই থাকি, ভাল থাকবো। খোঁজ করো না। প্রণাম নিও।

ইতি

জ্যোৎস্না ও সোমনাথ

অবিনাশ কিছু বোঝার আগে সিদ্ধার্থ ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নেয়। হাতের লেখাটা জ্যোৎস্নার। সিদ্ধার্থ ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

অথৈ সমুদ্র। অবিনাশ কঁকিয়ে ওঠে– সিদ্ধার্থ!

সিদ্ধার্থ কোনো সাড়া দেয় না। অনেকটা সময় ঝিম ধরে বসে থাকে অবিনাশ। কী করবে? এখন কী করা উচিৎ? ধীরে ধীরে জানালায় এসে দাঁড়ায়। চাঁদ উঠেছে। সেই পূর্ণিমার রাত। জ্যোস্নায় ভেসে যাচ্ছে গোবিন্দর উঠোন। ভাত রান্না হচ্ছে। কাঠের হল্কা আগুনে রাঙা হয়ে উঠেছে গোবিন্দর বৌ। ন্যাংটো ছেলেটা চাঁদের আলোয় সারা উঠোন নেচে বেড়াচ্ছে। হাততালি দিচ্ছে আর গান গাইছে।

—বলো হরি হরিবোল

গরম ভাত আর মাছের ঝোল

বলো হরি হরিবোল ...

দূরে সেই আমগাছটা, যেখানে অবিনাশের বাবা গলায় দড়ি দিয়েছিল, সেইখানে গোবিন্দর মা লম্ফ জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে। গোবিন্দ কী যেন পাড়ছে। বাবার ডেড বডি নামাতে গিয়ে অবিনাশ দেখেছে গাছটার গোড়ায় তেলাকুচোর ঝোপ।

বুড়ি অস্ফুটে চেঁচিয়ে বলছে ‘খোকা, দুটো বেশি করে তুলিস। তেলাকুচোর ঝোল খেলি মাতা ঠান্ডা হয়। সিতি শকতি বাড়ে।’

গোবিন্দর বৌ চিৎকার করে ওঠে, ‘খেতি খুব স্বাদ নাগে।’

ধায় গাড়ি

ট্রেনে কেউ পায়ের উপর পা তুলে বসলে একদম সহ্য করা যায় না। তারপর যদি পাঁচশো গ্রাম আঙুর একলা গেলে, রাগে শরীর জ্বলে যায়। একে ব্যাঙের মতো বিশাল কদাকার চেহারা। কালো রঙের উপর পালিশ করতে করতে রঙটা হয়ে গেছে পাঁশুটে। নির্বিকার গম্ভীর ভাব। চারিদিকে এত ভিড়, হাহাকার, অভাব, এই সব তেলচুকচুকে জানোয়ারের মতো মানুষ আসে কোত্থেকে। এত ফিনফিনে ধুতি যে থাই-এর লোম পর্যন্ত দেখা যায়, মেয়েরা বসে কী করে।

—এই যে মশায়, এঁটো গায়ে ফেলছেন যে।

গোল্ডেন ফ্রেমের ভিতরে চর্বি কুতকুতে চোখ তুলে লোকটা নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। বিশাল গোঁফজোড়ার নীচ গলিয়ে বেরিয়ে এল একদলা আঙুরের ছিবড়ে, বাঁ হাতের তালুতে ধরে বলল— আজ এত ভিড় কিসের?

গলা নাতো, আশি বছরের নাবালক। জানলা গলিয়ে ছিবড়ে ফেলল বাইরে।

জানালার পাশের লোকটা তড়িঘড়ি বলে উঠল— এমন ভিড় রোজই থাকে, স্যার।

জানোয়ারটার ভ্রু কুঁচকে কপালে ভাঁজ ফেলল।

রাজীব আপনমনেই বলল— লাইনে নতুন মনে হচ্ছে। লোকটি গলে গিয়ে বলল— আপনি জানালার ধারে বসবেন, স্যার?

জানোয়ারটা গ্যাঙর-গ্যাঁ কিছু বলার আগেই লোকটি জানালা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। আর জানোয়ারটা গা তুলে গোটা জায়গা জুড়ে গুরুদেবের মতো কোলাব্যাঙ হয়ে বসে পড়ল। লোকটি হয়ত ভেবেছিল, স্যার জানালার সেদিকে সরে বসলে সেকেন্ড সিটে সে নিজে বসবে। অদ্ভুত, লোকটি কিছু বলল না। 'হ্যাঁ-বাবু' টাইপের মুখ করে কেতার্থ হয়ে গেল। কোমর বেঁকিয়ে বাঙ্কার ধরে ঝুঁকে পড়ল স্যারের মুখ পানে। রাজীব রাগে ফেটে পড়ল।

—পা নামিয়ে বসুন। ভিড়ে মানুষের চামড়া উঠে যাচ্ছে। নবাবী করছেন।

হ্যাঁ বাবুর দিকে রাজীবের চোখের ফলা ছুটে গেল— যত্তসব আপদ, রাজীব একা। নইলে ঘাড় ধরে নামিয়ে দিত কোলাব্যাঙটাকে। কোলাব্যাঙ আড়চোখে একবার রাজীবকে

দেখতে গিয়ে দু' আঙুলের ফাঁকে একটা আঙুর ফাটিয়ে দিল। তারপর ফেলে দিল জানালার বাইরে।

ট্রেন চলছে। নির্বাধ হু হু গতি , রাজীব শুধু অস্বস্তিতে ভুগছে। চারিদিকে মানুষের ভিড়, চেল্লামিল্লি, খেঁচাখেচি, কেউ কাউকে একবিন্দু সহ্য করছে না। সামনে নির্বিকার একটা কোলাব্যাঙ, বিশাল একটা মাংসের স্তূপ। ডানদিকের লোকটা ঘুমুচ্ছে, বাঁ দিকের লোকটা উদাস, হ্যাঁ-বাবু চোখের উপর ঝুলে আছে। অস্বস্তি ক্রমাগত যন্ত্রণায় বদলাচ্ছে। ট্রেনের হু হু গতি, ফুরফুরে বাতাস কোলাব্যাঙটা লুটেপুটে নিচ্ছে। রাজীব কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। যন্ত্রণা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে।

জানোয়ারটা খেয়েই চলেছে। ছিবড়ে কখনও জানালার বাইরে কখনও কম্পার্টমেন্টের ভিতরে ফেলছে। মাঝে মাঝে 'হ্যাঁ বাবু' লোকটার গায়ে পড়ছে। হ্যাঁ বাবু, তবু খুশি খুশি মুখ করে ঝুলে আছে।

আর কোলাব্যাঙ পায়ের উপর পা তুলে আয়েস করে বসে, ভিড়ে মানুষের ফেঁসাফিসি, ঝগড়া, অশালীন কষ্টকর যাত্রা মজা মেরে দেখছে।

রাজীব, হ্যাঁ-বাবু কাউকেই মানুষ বলে গ্রাহ্য করছে না, রাজীব নিজেকে অপমানিত বোধ করছে।

রাজীবের বাঁদিকে একজন দাঁড়িয়ে থাকা মা তার শিশুকে চটাস করে চড় কষিয়ে দিল। ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা। মা জানোয়ারটার দিকে একদলা চোখের আগুন ছুঁড়ে দিয়ে হিস হিস করে বলে উঠল—মরতে ওকেনে যাওয়ার কী দরকার? বাবুদের ঝোলা-ঝম্প ঝুলবে না?

রাজীব বিষয়টায় নিজেকে গলিয়ে দিল। —কী হলো? মারছেন কেন? বলিহারি আপনারা মা, ছেলেটাকে ভয় শেখাচ্ছেন। ওখেনে কি ভাবে যাবে সেটা শিখিয়ে বকলেও তো হয়। আয়, বাবা আমার কাছে আয়।

মা'টি সন্দেহের চোখ কুঁচকে একবার রাজীবকে দেখে নিল। রাজীব হাত বাড়িয়ে নিজের কাছে টেনে নেয় ছেলেটিকে। চোখের জলে নাকের সিকনিতে মাখামাখি কালো পেট মোটা বাচ্চাটি তার কোলে আস্তানা নেয়। রাজীব এটি সেটি ভালমন্দ জিজ্ঞেস করে ছেলেটিকে। মনটা যদি হাল্কা হয়। ছেলেটি কোলের মধ্যে ঘোঁত মেরে থেকে গেল।

ট্রেন থামল নৈহাটি।

মানুষ নামার চেয়ে উঠল বেশি। ভিড় আরো চেপে এল। সামনাসামনি সিটের গলিতে ঢুকে পড়ল মানুষ। জানালা দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে চা, পান, বিড়ি, লেবুর জল ...

— হেই জল।

হোৎকা ব্যাঙ ডেকে উঠল।

হ্যাঁ-বাবু চেঁচিয়ে উঠল – জল, এই জল।

জল ফিরে এল জানালায়।

হ্যাঁ-বাবু খিঁচিয়ে উঠল – বাবু ডাকছে শুনতে পাও না?

জলওয়ালা জল বানাতে বানাতে জিজ্ঞেস করল – দশ না পনের গ্লাস?

হ্যাঁ বাবু উমেদারি করল – দশ পনের গ্লাস কেউ খায়?

জলওয়ালা ভ্রু কপালে তুলে মুখ নাচিয়ে ব্যাঁকা হাসিতে শুধু বলল – বাব্বু!

বাবু দশ গ্লাস খেলেন না। পাঁচ গেলাস্। তোয়ালে বের করে মুখ মুছলেন। হ্যাঁ-বাবু দুবার ঢোঁক গিলে, বাবুর হাত থেকে পয়সা নিয়ে দাম মেটাল।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

হ্যাঁ-বাবু সাহস জুটিয়ে জিজ্ঞেস করল–স্যর, কদ্দুর যাবেন?

জলের মতো স্বচ্ছ পাঞ্জাবির পকেটে তোয়ালে ঢোকাতে ঢোকাতে কোলাব্যাঙ বলল – বহরমপুর।

হ্যাঁ-বাবু আরও খানিক বেঁকে, আরও খানিক ঝুলে পড়ল।

রাজীব এবার বেশ মজা পেল। কেমন বাছা, বোঝ ঠ্যালা। বাবুর পেছনে তেল মারা। থাক দাঁড়িয়ে, শালো। কোলের কাছে কেলে ছোঁড়াটা বড্ড উসখুস করছে। বাঁদরের হাড় আছে পেছনে। রাজীব হ্যাঁ-বাবুকে ঠিক চিনতে পারছে না। ও শালো তাদের একজন প্যাসেঞ্জার না বাবুর চেলা? যাত্রীই তো হওয়া উচিৎ, জানালার ধার ছেড়ে দিল! উজবুক না দাঁওবাজ! কোলাব্যাঙকে চেনে? উহু, চেনার তো লক্ষণ নেই। নিশ্চয় আগে থেকে জানে। গোটা লোকটাকে মাপার চেষ্টা করল। লোকটা বাঙ্কার ধরে ঝুলে আছে। ঘাড়ে কোমরে জোর নেই। যেন ফাঁসিতে ঝুলছে। রাজীব আঙুলের খোঁচা চালিয়ে দিল লোকটার কোঁকে।

– ও, দাদা, আপনারা যাবেন কোথায়?

– ওক্! এ্যাঁ, আমি?

রাজীব অমায়িক গলে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল – আজ্ঞে হ্যাঁ আপনারা।

– আমি জিয়াগঞ্জ, কেন বলুনতো?

– ওই যে উনি আপনার সঙ্গে তো?

রাজীব হাতের মুঠো থেকে তর্জনী বের করে কোলাব্যাঙের দিকে বক দোলাতে লাগল।

হ্যাঁ-বাবু নিঃশব্দে হাঁ-হাঁ করে উঠল। ঘাড় ঝাঁকিয়ে, চোখ বন্ধ করে, ঠোঁটে তর্জনী তুলে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করল – চুপ! চুপ! –উনি মস্তলোক!!

রাজীব ভ্রু তুলে, চোখ বড় বড় করে, অবাক বিস্ময়ে, ভয়ের ভন্ডামি করে বেশ জোরেই বলল – কি, আপনার নেতা, না মালিক?

লোকটি অসহায়ের ভঙ্গিতে নাক মুখ কুঁচকে, দয়া করে চুপ করতে ইশারা করল।

রাজীব ততোধিক জোরে বলল – ওঃ হো, গুরুদেব, তাই বলেন।

রাজীব এবার গলার স্বর অস্বাভাবিক নিচুতে নামিয়ে জিজ্ঞেস করল– একটু বসবেন?

হ্যাঁ-বাবু কেতার্থ হয়ে বলল – না, না, থাক, থাক।

– আরে বসেন তো।

নিজে দাঁড়িয়ে লোকটিকে প্রায় ধরে বসিয়ে দিল রাজীব। কোলাব্যাঙ চোখ বুঁজিয়ে হেলান দিয়েছে।

রাজীবের সিটের ডানদিকে, জানলার পাশে বসা লোকটি ঘুমুচ্ছিল। রাজীব লোকটিকে খেয়াল করল। অদ্ভুত! কুম্ভকর্ণ! চারিদিকে হৈ-হুজ্জোতি লঙ্কাকাণ্ড, এর মধ্যে ঘুমুচ্ছে! কোলাব্যাঙটা ঘুমুবার পর গায়ের চিড়বিড়ানি জ্বালা থিতিয়ে ঘন হচ্ছিল– লোকটিকে দেখে আবার চড়ে গেল।

– ঘুম কেন রে? এ কি ঘুমুবার সময়, না ঘুমুবার জায়গা? ও হাঁটু দিয়ে লোকটার হাঁটুতে পরিষ্কার গুঁতো মারল।

লোকটা ঘুমের মধ্যে পা' টা একটু সরিয়ে– যথা পূর্বং।

লোকটাকে কনস্ট্যান্ট চাপের মধ্যে রাখার জন্য ইচ্ছে করে কোণের দিকে সরে গেল। লোকটার একটা পা ঠেসে ধরল দেওয়ালের সঙ্গে।

এদিকে বাঁ পায়ে একটা গুঁতো খেয়ে নীচে তাকিয়ে দেখে কেলে ছোঁড়াটা হামাগুড়ি দিয়ে সিটের নিচে ঢুকে পড়েছে। ব্যাপার কী বোঝার জন্য ঘুমন্ত লোকটার পায়ে চাপ রেখেই নিচু হল। কোলাব্যাঙের হাত ফসকে ছিটকে পড়া আঙুর কুড়োচ্ছিল ছেলেটা। রাজীবের ছোটবেলায় কুল কুড়োবার স্মৃতি একঝটকায় এসে আবার হারিয়ে গেল। সে ছোঁড়াটার ঘাড় ধরে টেনে বের করল জানোয়ারটার পায়ের নিচ থেকে।

রাজীবের চাপে ঘুমন্ত লোকটা ঠেলে উঠে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল – দূর মশায়! সরে দাঁড়ান তো।

রাজীব একহাতে ছোঁড়াটাকে চেপে ধরে ততোধিক খিঁচিয়ে উঠল – কি হয়েছে কী? এ কি আপনাদের আয়েস করার জায়গা নাকি? সরান, পা সরান – সোজা হয়ে বসুন।

এরপর কোলাব্যাঙটার দিকে ফিরে গোঁজিয়ে উঠল – জানোয়ার না জমিদার কে জানে? কেউ দুজনের জায়গা নিয়ে বসবে, কেউ আয়েস করে ঘুমুবে, যেন বাপের সম্পত্তি। বদমায়েসির একটা সীমা থাকা উচিত।

রাজীবের চিৎকারে সদ্যজাগা লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাঁ করে রাজীবের মুখে তাকাতেই রাজীব আরো তীব্রতায় খিঁচিয়ে ওঠে–হাঁ করে দেখছেন কী, এইদিকে দেখুন। বলে ঘুমন্ত কোলাব্যাঙের প্রায় নাকের ডগায় তর্জনী তুলে ধরে।

সদ্যজাগা লোকটিও অবাক হয়ে তাকায় মোটা লোকটির দিকে। কম্পার্টমেন্টে লোক থৈ থৈ করছে –নির্বিকার ডবল সিট নিয়ে ঘুমুচ্ছে। কী একটা আবেগ কাজ করে ওঠে সদ্যজাগার ভিতরে।কোলাব্যাঙটার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে যায়। 'হ্যাঁ-বাবু' লোকটার হাত টেনে ধরে। রাজীব এবার তাড়া মেরে থামিয়ে দেয় হ্যাঁ-বাবুকে – বসুন চুপ করে।

হ্যাঁ বাবু ভয়ে ভয়ে হাত গুটিয়ে নেয়।

সদ্যজাগা লোকটি কোলাব্যাঙের গায়ে হাত দিয়ে ডাকে – ও মশায়, পা নামিয়ে বসুন, একজন তো বসতে পারে। কোলাব্যাঙ চেতনা, চোখ বন্ধ রেখেই পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে দু'টো রেলের টিকিট বের করে বলে – আমার ডবল জায়গা লাগে– ডবল টিকিট। নিজের চরকায় তেল দিন।

সদ্যজাগা ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে যায়। রাজীবও একমুহূর্ত থমকে গেল। তাহলে?

কেলে ছোঁড়াটা কোন ফাঁকে রাজীবের হাত গলিয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রেন চলছে। মদনপুর স্টেশন পেরিয়ে গেল।

সদ্যজাগা প্রথমে মিটি মিটি হাসছিল। তারপর ফিক্ ফিক্ করে – অবশেষে গলা ছেড়ে হো-হো করে হেসে উঠল। বলল – যত্তসব আপদের রাজত্ব হল দেখছি।

কেলে ছোঁড়ার মাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ছোঁড়া দিব্যি একা আছে – ভেবে রাজীবের বেশ ভালো লাগল। আবার আঙুর খেতে দিল না বলে একধরনের কষ্ট অনুভব করল। মনে মনে একজন আঙুরওয়ালার জন্য ও অপেক্ষা করছিল। কিন্তু যা ভিড় এখন আর হকার উঠবে না। রানাঘাটের পর দেখা যাবে।

ছোটবেলায় একবার মানকের হাতের এঁটো পেয়ারা খেয়েছিল বলে – ছোটকাকা তাকে বেদম পিটিয়েছিল। মানকে ছিল তার বন্ধু। কিন্তু ঐ কোলাব্যাঙটা! ও কি কেলের বন্ধু? বন্ধুর এঁটো খেলে আজ সে হয়ত কিছু বলবে না। কিন্তু জানোয়ারের উপচানো দয়ার খাবার সে একদম সহ্য করতে পারে না।

ভাবছিল, ছোঁড়ার ঝুঁটি ধরে কান টেনে একখানা থাপ্পড় কষিয়ে দেয়। মা'র কথাবার্তা শুনেতো তেমন খারাপ মনে হয় না।

ট্রেন চাকদা ঢোকার মুখে কোলাব্যাঙের পাশের লোক উঠে গেল। সামনেই ছিল রাজীব। জায়গাটায় বসে পড়ল। বসে হাঁক পাড়ল—ও ছেলের মা, এদিক এসো।

ছোঁড়ার মা ওদিক থেকে বুঝতে পেরেছে একটা বসার জায়গা পাওয়া যাবে।

ভিড় ঠেলে ঠুলে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

একজন খিঁচিয়ে উঠল – দেকে যাওনা ক্যানে?

ছোঁড়ার মা দ্বিগুণ খিঁচিয়ে জবাব দিল – পথে ডেরে রয়েচ ঘা গুঁতো লাগবে নাকি আদর লাগবে?

রাজীব উঠে দাঁড়াতেই ছোঁড়ার মা ধপাস করে জানোয়ারটার পাশে বসে বলে উঠল – ঠ্যাং সরাও গো ভদ্দরলোকের পো।

ছোঁড়ার মার যেমন খনখনে তেমন কর্কশ গলা। জায়গা পেয়ে নিজেরটুকু বুঝে নেওয়ার তাগিদও ততোধিক। কোলাব্যাঙ একবার আড়চোখে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করার উপক্রম করতেই ছোঁড়ার মা ঝাঁঝিয়ে উঠল – মরণ দ্যাকো না, দ্যাখচো কী? রূপ উটেচে নাকি? হাঁটু সরাও। হাত দিয়ে হাঁটুটা ঠেলে দিল। ছেলেকে ডাকল

–আয়, ব্যাটা একেনে আয়।

কোলাব্যাঙ গম্ভীর স্বরে বলল – আমার টিকিট আছে।

—আমারও টিকিস্ আছে।

—আমার ডবল টিকিট,

–ডবল টিকিস তা আমি কি কর্বো। ওসব আইনের ধ্যানামি বাবুদের দেখাওগে যাও। বাছা আমার বসবে না নাকি? এ্যাতব্যালা ডে'রে রয়েছে ধন, বইসতেতো বলোনি, মানুষ না জানোয়ার গো?

রাজীব দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কামরার তাবৎ প্যাসেঞ্জার মজা পেয়ে গেছে। হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বাবুর দুর্গতি দেখছে।

ছোঁড়ার মা হাত ধরে টান দিল কেলেকে। কেলে টাল ঠেকাতে না পেরে কোলাব্যাঙের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। যেই না পড়েছে, জানোয়ারটা হঠাৎ ঠেলা মারল কচি ছোঁড়াটাকে। কেলের মাথা ঠুকে গেল ট্রেনের গায়ে। কেলে কেঁদে উঠল ডুকরে। কেলের মা চিৎকার করে উঠল – ওমা - মা আমার কী হবে। ছেলেটাকে মেরে ফেললে গো মেরে ফেললে।

রাজীব হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে টেনে নিল নিজের কাছে। মাথার চুল সরিয়ে দেখল খানিকটা কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। কেলের মা আকুলিবিকুলি করে মাথার উপর ঝুঁকে, চুলে হাত ঢুকিয়ে, আঙুলে রক্ত মাখিয়ে চিৎকার করে উঠল। – অক্তপাত করে

দিয়েচে গো, অক্তপাত। ওরে বে-আক্কেলে মিনসে তুই খুন করলি কোন্ সাহসে–

ডবল টিকিস দেকাস, সমাজ সমসার নাই তোর। তোর মুকে নাতি মারি – ঝাঁটা মারি তোর মুকে,

হ্যাঁ-বাবু কোত্থেকে বলে উঠল – কী হচ্ছে কি? ও মেয়ে চুপ করো না।

– চুপ করবো। ওরে নিববংশের ব্যাটা। ছেলের যখন অক্তপাত করে দিল –কুতায় ছিলি তুই। জানোয়ারটা একটু থতমত খেয়ে পা গুটিয়ে নিয়েছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন বলল – শালোকে পুলিশে দিন।

– কেরে পুলিশ দেকাচ্ছিস। বেশরম মদ্দা মানুষ, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসকে দিচ্ছিস। লজ্জা করে না তোদের। শুয়ে শুয়ে ল্যাজ নাড়া। তোদের লেজে নুড়ো জ্বেলে দিই। পুলিশের আমি রেয়াৎ করি নাকি?

ট্রেন হুড়মুড় করে রানাঘাট ঢুকে পড়ল। রাজীব ছেলেটাকে ফাঁকা জায়গায় বসিয়ে দিল। জানোয়ারটা নরম সরম হয়ে হ্যাঁ-বাবুকে বলল – এই একটু ওষুধ টসুধ এনে দাওনা–

বলে প্যাকেট থেকে মানিব্যাগ বের করেছে। কেলের মা ওমনি চেঁচিয়ে উঠল – অনামুখো মিনসে -ট্যাকার গরম দেকাচ্ছিস। তোর ট্যাকায় আমি থুতু দি। তোর ওষুধ আমি বাতায় দি। তুই উঠ ইকেন থেকে। লইলে তোর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়বো।

সত্যি সত্যি, লোকটা উঠে পড়ল। ভিড় গলিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল প্লাটফর্মে।

এখানে গাড়িটা ইঞ্জিন বদল করে । আট দশ মিনিট দাঁড়ায়।

রাজীব কেলের মাকে বলে—বড্ড চেঁচাচ্ছো।

কথা মাটিতে পড়তে পেল না। কেলের মা গলা ছেড়ে দিল।

– চেঁচাবো না, ছেড়ে দেবো। পয়সার গরম দেকাচ্চে। পয়সা ওর মুকে খুসে দেবো না?

রাজীব ভেতরে ভেতরে স্বস্তি অনুভব করে। যাক্ জানোয়ারটা শেষপর্যন্ত নড়েছে।

– বলছ কাকে। সেতো নেমে গেছে। ছেলের মাথাটা হাত দিয়ে চেপে রাখো। আমি দেখি ওষুধ পাই কিনা? রাজীব নেমে এল প্লাটফর্মে।

জানালার সামনেই জলের ট্যাপ। চায়ের দোকানের কাচের গেলাসে জল এনে দিল। জানলা দিয়ে বলল– কাটা জায়গাটা ধুয়ে দাও। চোখ মুখটায় জলের ঝাপটা দাও।

খালি গেলাস নিয়ে ফেরার পথে রাজীব ভাবছিল একটু ওষুধ ফসুধ পাওয়া যায় কিনা। নজরে পড়ল, জানোয়ারটা একজন টিকিট চেকার দুজন আর.পি.এফ নিয়ে ফিরে আসছে। চড়াৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ওষুধ জোগাড় না করে পাশের পানের দোকান

থেকে একটু চুন চেয়ে নিয়ে দ্রুত ফিরে এল কম্পার্টমেন্টে।

কেলের মা'র চিৎকারে ঘটনাটা ততক্ষণে গোটা কম্পার্টমেন্টে চাউড় হয়ে গেছে। সবাই নিজেদের গল্প, খেলা, ঘুম ফেলে মুখিয়ে আছে, কী হয়!

রাজীব ঢুকে কেলের মাথায় চুন লাগাতে লাগাতে বলল—পুলিশ আসছে।

কেলের মা চিৎকার করে উঠল, আসুক না ঘুষখেকোর ব্যাটারা। ভাল কত্তে পারিনে মন্দ কত্তে পারি কী দিবি তাই বল্।

ডেলি প্যাসেঞ্জারদের তাসখেলা বন্ধ হয়ে গেছে। একজন লাফিয়ে এল রাজীবের কাছে—কী হয়েছে দাদা!

জানোয়ারটা পুলিশ নিয়ে আসছে।

—আসুক শালোর ব্যাটারা।

ততক্ষণে পুলিশ, চেকার কম্পার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছে। তাসুড়ে হাত ইশারায় ডাক দিল দলবলকে। হুড়মুড় করে ছুটে এল সব। 'সদ্যজাগা' ও উঠে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ-বাবু নাক গলিয়ে কখন নেমে গেছে প্লাটফর্মে। জানোয়ারটার পাশে।

গোটা কামরা ভিড়ে ভিড়াক্কার। পুলিশ ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তাসুড়েরা আওয়াজ জুড়ে দিয়েছে। ব্যাঙের ডাক, বেড়ালের কান্না, প্যাঁক-প্যাঁক ছেয়ে গেছে। নানা লোকে নানান টিটকিরি দিচ্ছে। কম্পার্টমেন্টের বাইরে কী হয়, কী হয়—পাবলিকে জম-জমাট।

—হেই!

—হুর্।

—ফোট্।

—শালো!!

এইসব। দু-একজন পেছন থেকে খোঁচাও দিয়েছে। পরিস্থিতিতে পুলিশের মাথাগরম হয়ে গেল। চেকার কিছু বোঝার আগেই—একজন পুলিশ কেলের মা'র হাত ধরে টান দিয়েছে।

—চল্ মাগি থানায়।

আর যাবে কোথায়। কেলের মাতো যাচ্ছেতাই চিৎকার করেই যাচ্ছিল—যাবো মানে, মামার বাড়ি? ঘরে মা-বোন নাই... মেরে মুক সানা করে দেবো।

রাজীব পুলিশটার পেছন দিকের জামার কলার ধরে টান মেরে কেলের মার কাছ থেকে হটিয়ে দিল।

—গায়ে হাত ছেড়ে কথা বলুন।

আর একজন পুলিশ এসে রাজীবকে ধরতে যেতেই হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেল। ডেলিপ্যাসেঞ্জার গ্রুপ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেলের মায়ের চিৎকারে—কেলের আর্তনাদে প্যাসেঞ্জারদের হুজ্জুতি, সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড লেগে গেল। কয়েক মুহূর্ত। চেকার, পুলিশদের গঙ্গাপার করার মতো কম্পার্টমেন্ট থেকে বের করে দিল প্যাসেঞ্জাররা। হুইসেল বেজে উঠল। ছেড়ে দিল ট্রেন। জামার হাতা গোটাতে গোটাতে রাজীব এদিকওদিক দেখল। নীচে প্লাটফর্মে জানোয়ারটা আর হ্যাঁ-বাবু দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন থিকথিক করছে। কম্পার্টমেন্টে প্যাসেঞ্জাররা আনন্দে হৈ হৈ করছে। মনের সুখে জানোয়ারদের গাল পেড়ে উচ্ছন্নে দিচ্ছে। ডানদিকের জানালা গলিয়ে একঝলক পূর্ণিমা ঢুকে পড়েছে। রাজীব কেলের মাকে জানালার ধারে সরিয়ে সে বসল কেলের মার জায়গায়। ট্রেন ততক্ষণে প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

ভীষ্মের শরশয্যা

তিনদিনের মাথায় অতনুর শরীর ফিরে এল মনে। অতনু ভাবল, তিনদিন শরীর কোথায় ছিল! জল, হাওয়া, মন শূন্য থাকে না। আজ কি ভরাট লাগছে নিজেকে। শরীর মনের ভারসাম্য না থাকলে সবকিছু এতোল-বেতোল বোধ হয়।

পাছার উপর শরীরের ভর রেখে বিছানায় উঠে বসলো সে। যেন অনেকদিন পর শরীরের ওজন আয়েস করে অনুভব করলো। পিছনের জানালা খোলা। ভরদুপুরের রোদ পড়েছে পিঠে। বেশ তাপ লাগছে। বেশ ওজনও আছে। তার শরীরের অচিন ভিতরে একটা দাঁড়িপাল্লা আছে। রোদ, হাওয়া, মানুষের কথা, চোখের চাহনির ওজন বুঝতে পারে। হের-ফের হলে, আন্দাজ করে শরীর মনের মিলতাল থাকছে না।

এখন রোদ একটু তীক্ষ্ণ, সামান্য ভার কম। সে বুঝতে পারে, শরীর এখনও দুর্বল, মনের আনুপাতিক ওজন শরীরের ওপর বেশি। শরীরকে অধিকার ফিরিয়ে দিতে সময় লাগবে। এলোপাথারি ট্যাবলেটগুলো শরীরকে নাচার করে তুলেছে।

জানালা দিয়ে একঝলক বাতাস ঢুকে পড়লো। মনের ভাবনাকে খানিক ঘুরিয়ে দিলো। বাতাসের রঙ হালকা বাসন্তী। রোদ্দুরের তীক্ষ্ণতা মৃদু মিহিন। কচি বাসন্তী রঙ হাল্কা মনের প্রতীক।

মিহিনকারী বাতাসে ছিলো পোড়া দুধের গন্ধ। খুব চেনা। প্রায় প্রতিদিন অতনু গন্ধটাকে একবার চেনে। মোটামুটি দিনের বারোটা বেজে যায় এসময়। দোলার চানও হয়ে গেছে। ওভেনে দুধ বসানো। সে আয়নার সামনে চুল ঝাড়ছে, নয় সিঁদুর পরছে। গুন-গুন করে গাইছে—একা থাকার এক কলি।

কাজটুকু খুব একাগ্রতা ঢেলে করতে চায় বলেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তখনই দুধ পোড়া গন্ধ। রান্নাঘরে ছুটে যায়। প্রতিদিনই অঘটনের অপেক্ষায় থাকে অতনু।

দুধপোড়া গন্ধে কেমন অসহায় বোধ করে অতনু। গন্ধের কোন আকার নেই, রঙ নেই। গন্ধ সে কিছুতেই আঁকতে পারে না। পৃথিবীর অনেক আবেগ, অনেক সুখ, অনেক দুঃখ বহন করে আছে এই গন্ধ। গন্ধ ক্রমাগত জটিল হয়। পোড়া দুধের গন্ধে রান্নার গ্যাসের গন্ধ ভেসে আসছে। গ্যাস বেরুচ্ছে। ওভেনে আগুন জ্বলছে। পোড়াদুধ সামলাচ্ছে অস্থির দোলা। সহসা অতনু শরীরে– মনে সম্পৃক্ত হয়ে উঠে। গন্ধের রূপ-রঙ, তার ক্রিয়া উপলব্ধি করার আতঙ্কে শরীরকে দাঁড় করিয়ে দিলো ঘরের মেঝেয়,

অসম্ভব দ্রুত ছুটলো রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ!

—দরজা তো বন্ধ থাকার কথা নয়। তাহলে কি দোলা? ... দুমদাম শক্তিতে দরজায় আঘাত করতে থাকে। হঠাৎ নজরে পড়ে দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। মাথার ভিতর ঝিম ঝিমিয়ে উঠলো। কেনো তালা বন্ধ! চোখ-মুখ ঘেমে ভিজে আসছে। না, গ্যাস, দুধ-পোড়া কোন গন্ধ নেই, দুয়োর বেয়ে নেতিয়ে পড়ে অতনু।

সিঁড়ি বেয়ে পক্ষী-মাতার মতো নেমে এলো দোলা। বসে পড়লো অতনুর পাশে।

—হ্যাঁ, নিশ্বাস পড়ছে।

দ্রুত আর্তিতে ঠান্ডা জল চোখে মুখে ঝাপটা দিলো। ধীরে চোখ মেললো অতনু।

—কী হয়েছে?

অতনুকে বুকের মধ্যে তুলে নেয় দোলা। অতনুর স্নায়ু-সুষুম্নায় সাড়া আসছে। না, দোলার শরীরে কোনো পোড়া গন্ধ নেই। না, গ্যাসীয় আতঙ্ক নেই। অদ্ভুত শীতল স্নিগ্ধতা, আশ্রয়, বিশ্বাস।

অতনুর নিশ্বাস পড়ে—হাঃ। আবার মনের ভুল।

শরীর জুড়ে বিস্তৃত হয় নিস্তেজনা। নিজেকে ছেড়ে দেয় দোলার বুকের ভিতরে। দোলার শরীরে দুধ-পোড়া এবং গ্যাস-গন্ধ যেন অন্যগন্ধে রূপান্তরিত হয়েছে। এই গন্ধ সে চেনে। হ্যাঁ, সে যেন দেখতে পাচ্ছে গন্ধের রূপ। যেন অনেকদিনের চেনা। যেন অনেক দূর, যেন মায়ের গন্ধ, যেন ধরা দিচ্ছে।

—হ্যাঁ, এবার সে আঁকতে পারবে।

অনেকদিনের অরূপকে খুঁজে পাওয়ার স্বপ্নে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। দোলার শরীরের মধ্যে গন্ধকে আরও নিবিড় করে অনুভব করে। প্রশ্বাসের বাতাসে অনুভবের প্রাণ ছড়িয়ে দেয়। না, গন্ধে কোনো রেখা নেই। বিচূর্ণ রেখারাজির ভিতর থেকে জেগে উঠছে রঙ। রঙের শরীর। শরীরের গন্ধ। গন্ধের পটভূমি, গন্ধের সংকেত। এক পরাবর্ত। এক শক্তি। বুকের মধ্যে এলিয়ে যাওয়া শরীরটুকু দোলা বয়ে আনে বিছানায়। যেন ভগীরথ। এক নারীর গতিপথে বহে এল এক নদী। অতনু শুয়ে থাকে।

কিন্তু জেগে আছে ওর মস্তিষ্ক। সম্পূর্ণ সুস্থ। দোলাকে ইশারায় চলে যেতে বলে। ও এখন একা থাকতে চায়।

—দুধ আসেনি। একগ্লাস গরম চা করে আনি?

আবার ও ইশারায় বলে—না, যাও।

দোলা অতনুকে জানে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মগ্ন, যেন বুদ্ধমূর্তির দিকে। তৃপ্তি হলে—ফিরে যায়—যেন মিলিয়ে যায় দূরে।

এক কুয়াশাময় কষ্টমাখা গন্ধ যেন কেটে যাচ্ছে। অনেকদিন এই কষ্ট উপলব্ধি করছে অতনু। এই কষ্ট-যন্ত্রণা আসলে নারীর, দোলার শরীরজ গন্ধে যেন কষ্টযন্ত্রণা আবছায়া আড়াল হয়ে থাকে। মহাভারতে এই কষ্ট আছে। দ্রৌপদীর মধ্যে, গান্ধারীর মধ্যে, অম্বার মধ্যে। ব্যাসদেব নারীর যন্ত্রণা কি জানি কেন, নারী চরিত্রে পরিস্ফুট করতে পারেননি। ভীষ্মের জীবনজুড়ে এই যন্ত্রণার পরিব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন। ভীষ্মের শরশয্যা সে কার যন্ত্রণার মুক্তি!

—দাদা, ওঠো তো। দুধটুকু খেয়ে নাও।

দোলা কোত্থেকে একগেলাস দুধ এনেছে।

অতনুর চিন্তা লাট খেলো। দোলা গায়ে হাত রাখে।

—ওঠো, খেয়ে নাও।

দুধের গন্ধে নারীর প্রকৃতি স্পষ্ট হয়। চোখ বন্ধ করে গভীর প্রশ্বাস নেয় অতনু। দোলা একটা হাত রাখে ঘনিষ্ঠ অতনুর পিঠে। অন্য হাতে দুধের গেলাস তুলে ধরে মুখে। দোলার দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যেই যেন স্পষ্ট হয়ে আছে দুধের গন্ধ এবং নারীর যন্ত্রণা। দুধ খাওয়া হলে দোলা রান্নাঘরের দিকে গেল। অতনু আর নারী প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠে শূন্যস্থান। দুপুরের দুধ-মিষ্টি গন্ধে ফুটে উঠছে রান্নাঘর।

মা মারা যাওয়ার পর এ রকম হয়েছিল অতনুর। কিছুতেই ভাবতে পারতো না—মা নেই। চলতে ফিরতে ঘুমুতে মার পায়ের শব্দ, গায়ের গন্ধ, উঠতে-বসতে-আঁকতে মায়ের প্রচ্ছায়া স্নেহ তাকে ভিজে ভিজে করে তুলতো। ওই সময় তার ছবিতে আবছায়া নেমে আসতো। রেখা রঙ ঝাপসা মনে হতো। অতনুর মনে হয়, মারা যাওয়ার পর একদিন যেন মা তাকে ভাত বেড়ে খাইয়েছে। পূর্ণিমা রাত। লোডশেডিং। জানালা দিয়ে ভাতের থালায় এসে পড়েছিল তীব্র জ্যোৎস্না। মা ছিল পাশে। চাঁদের খানিক আলো ছিল। তালপাতার পাখা ছিল মার হাতে। মার গন্ধ, শব্দ, অস্তিত্বহীন অস্তিত্বের আহারহীন আহারে ছিল পরিপূর্ণ তৃপ্তি।

সুতনু, অতনুর ভাই। দাদাকে বোঝায়।

—দাদা, তুই বোঝার চেষ্টা কর, মা মরে গেছে। মার শরীর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তুই নিজে হাতে মার শরীর-ভস্ম গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিস।

অতনু উত্তর দেয় না। ভাবে।

—মা মারা গিয়েছে সত্যি। মা আমার পাশে বসে খাইয়েছে এও সত্যি।

সুতনুর বিষয় সম্পত্তিতে লোভ নেই। তবু সে মনোবিদ-ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল তাকে। সুতনু লোকাল লিডার। এলাকার দাদা। আসছে ভোটে এমএলএ কনটেস্ট করবে। সুতনুর চেয়ে এ তল্লাটে কেউ বেশি বোঝে না। সে এখন অতনুরও দাদা।

অতনু চুপ করে থাকে।

অতনু জানে—জীবিত মানুষও অনেকসময় মৃত হয়। তার আকারপ্রকার রঙ আলো কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনি মৃত মানুষও জীবিতের চেয়ে স্পষ্টভাবে জেগে ওঠে কখনও।

ঘরের দেওয়ালে চুনের পর্দা খুঁজলে এখনও অনেক অঙ্কের ফর্মূলা, জ্যামিতির উপপাদ্য পাওয়া যাবে। সুতনুকে অঙ্ক শেখাতো অতনু। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ জীবনে বড় হওয়ার অঙ্ক। ভাই বড় হলে নাকি দাদা হয়। দাদা যদি রাজনীতিক হয়?

হাতের নখ দিয়ে দেওয়ালে চুনের পর্দা খোঁটে অতনু। বহুদিন চুনকাম হয়নি। নানান ভেজা-ভাজা ছোপ-ছাপ ইতিহাস, প্রমাণ ছেয়ে আছে ঘরময়। পর্দার নিচে চাপা পড়া অনেক স্মৃতি, অনেক স্বপ্ন। ঘরখানা ছবির আকর। অতনুর স্টুডিও। সে বলে—

—চিত্রাতুরশালা।

বিয়ের ঠিক আগে সুতনু সমস্ত বাড়িঘর হোয়াইট ওয়াশ করিয়েছে। অতনু বলেছে—থাক, আমার ঘরখানা চুনকাম করিস্‌নে। এ আমার প্রত্নভূমি।

সুতনু বলেছিল—তাহলে ঘরের দেওয়ালে সিমেন্ট মেজে ছবি আঁকার একটা পট বানিয়ে দিই? ছবি আঁকিস। অতনু হাসেনি। মনে মনে বলেছিল

—দাদার জন্যে কত ভাবিস, এ তোকে দেখাতেই হবে।

মুখে বলল—বেশ, সিমেন্টের মাউন্ট দিতে হবে চারপাশে। চারফুট বাই ছ'ফুট। তবে চুনকাম করিস নে।

—তুলি ঝেড়ে, মুছে-প্রত্নভূমিতে যে রূপ ফুটবে সে তুই ধ্বংস করিস নে। আমি মরে গেলেও না। সুতনু শোনেনি। সে কাজের মানুষ। অত সময় কোথায়।

অতনু অনেকদিন ছবি আঁকেনি। সিমেন্টের পটে ধুলো ময়লায় ধূসর হয়ে আছে 'ভীষ্মের শরশয্যা'। অর্জুন বুক চিতিয়ে মাথা এত টান করে আছে যে শরীর পেছনে বেঁকে গেছে। মুখে হিংস্র জয়ের চিহ্ন। হাঁটু গেড়ে দুই হাতে উদ্ধত উল্লাস। হাতের তালুতে রক্তচিহ্ন।

দ্রৌপদীর স্বল্প-বাস। শরীরে তীব্র যৌন আবেদন। স্তন-ভারে ঈষৎ ঝুঁকে আছে। দ্রৌপদীর হাতে অর্জুনের রাজ-মুকুট। চরাচর অন্ধকার। মুকুট আর দ্রৌপদীর শরীরের অদ্ভুত আলো ছবিখানাকে ভয়ার্ত রহস্যময় করে তুলেছে। ভীষ্মের শরীরে অসংখ্য তির। প্রত্যেকটি তির যেন ভাষা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বলতে চাইছে। অসংখ্য তীরের দীর্ঘ আকৃতি ছায়াগুলি সৃষ্টি করেছে এক বিশাল মুখাবয়ব। সে মুখ শিখণ্ডীর। শিখণ্ডী আর ভীষ্ম দুই পরাজিত ম্লান মুখের ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে রহস্যময় আলো-আঁধারি আঁকি-বুকি।

এই ছবি অতনুর খ্যাতি এনে দিয়েছে। শহরের পাক্ষিক সব, বাংলা মায় দৈনিক ইংরিজি কাগজেও প্রশংসা বেরিয়েছে। এক বাণিজ্যিক সংস্থা ছবিটির মুদ্রণ-সত্ত্ব কিনেছে। বাজারে দামি ক্যালেন্ডার করে প্রকাশ করেছে। সুতনু একটা শোয়ার ঘরে, একটা বসার ঘরে দাদার ছবি ঝুলিয়ে রেখেছে। অতনুর চিত্রাতুরশালা এখন শহরে দর্শনীয় স্থান।

অতনু দেখছিল, নিজেরই আঁকা ছবি। ধুলোর ওড়না ভেদ করে ভীষ্মকে দেখলো। ভীষ্মের বুকখানা বিশাল করে এঁকেছে। আর ঠিক হৃদপিণ্ডের ভিতর ইচ্ছা করে এক ঝাঁক তির সেঁধিয়ে দিয়েছে, বুকের গভীরতর অন্তরে। অতনু নিজের বুকে হাত বুলোয়। ভীষ্মের মাথা হৃদয়ের মাপে খুবই ক্ষুদ্র। মানুষটা গোটা মহাভারত জুড়ে হৃদয়ের ভারে কিছুতেই মাথার ভারসাম্য রাখতে পারেন নি। অতনুর বুকের মধ্যে কেমন অস্থির লাগছে। না, ব্যাসদেব যেন কিছু ভুল করেছেন। ভীষ্মের এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, অসহ্য!

—কেন? কার যন্ত্রণা? কিসের? এ যন্ত্রণা দ্রৌপদীর? অম্বার, গান্ধারীর? ভীষ্মের শরশয্যা, এই পতন সে তো দ্রৌপদীর অপমান, অসম্মান, গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য। দ্রৌপদীর উত্থানের জন্য। অতনু নিজের বুকে হাত বুলোয়।

চোখ গেল দ্রৌপদীর দিকে। সে এটা কী এঁকেছে! —ছিঃ! যৌনাচারের যন্ত্রণা তো তার ছিল না। ছিল সতীত্বের যন্ত্রণা, নিরাপত্তার যন্ত্রণা, প্রভুত্বের যন্ত্রণা, দ্রৌপদীর দিকে চেয়ে অতনু পরাজিত হলো। লজ্জা পেলো, মুখ নামিয়ে নিলো।

আর তার ঘ্রাণে ভেসে এলো রান্না—গ্যাসের গন্ধ। দুধপোড়া গন্ধ। সেই পোড়া যন্ত্রণার গন্ধ। মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিমিয়ে উঠলো।

দুধ উথলে পড়ছে ওভেনে। ধোঁয়ার ইতস্তত ছড়ানো আঁশের ভিতর দিয়ে অতনু হাওয়ায় ভেসে ছুটছে। একসময় পৌঁছে গেল দুধ উথলে নিভে যাওয়া ওভেনের কাছে। গ্যাস বেরুচ্ছে। নিচু হয়ে সিলিণ্ডারের নব বন্ধ করে দিলো। ততক্ষণে পিছন থেকে তাকে আঁকড়ে ধরেছে দোলা। আতঙ্কে সাঁড়াশির চেয়ে শক্ত দুখানা হাত। দোলার শরীরে জ্বলছে সিন্থেটিকের শাড়ি। এক ঝটকায় দোলাকে ফেলে দিলো মেঝেতে। দুঃশাসন যেন কৃষ্ণহীন দ্রৌপদীর আঁচল থেকে পাক ছাড়িয়ে খুলে ফেললো শাড়ি। পেটিকোটের বাঁধন। নিরাবরণ দোলা তখন মেঝেতে। শাড়ির আগুন নেভালো পাপোশের ঝাপটায়। আগুনের জিভ আর যখন দেখা গেলো না, দোলার আদুল শরীরের উপর নিচু হতেই দোলা প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরলো অতনুকে। অতনু দ্রুত দু'হাতে কোলে তুলে নিল তাকে, বিছানায় শোয়াতে গিয়ে দেখলো অজ্ঞান হয়ে আছে। অবচেতনে হাতের বাঁধন কিছুতেই ছাড়ছে না। আগুনের জিভ লকলক করে উঠল অতনুর শরীরে।

কবেকার কথা? তিন দিন, না তিন যুগ ভাবতে পারে না। আগুন থেকে দোলার শরীর আলাদা করে ফেললেও সেদিন রাতে তার মনে হলো—আগুন জ্বলছে তার শরীরে। সুতনু, দোলার জন্য নয়, অতনুর জন্যে ডাক্তার এনেছিল রাতে। দোলা-অতনুর

শরীরে-শরীর নতুন নয়। সুতনুর সাথে বিয়ের পর এই প্রথম। যন্ত্রণাদগ্ধ নিশুত রাত, নিরালা, বিদ্যুৎ-চমকের মতো অন্ধকার। উত্তেজনায় অসাড় হয়ে আসে অতনু।

অতনুর কাছে পড়তে আসে দোলা। পড়ে দোলা আর সুতনু। দুটি পাশাপাশি বসে। যেন ভাইবোন। শহরের দুটি উজ্জ্বল ছাত্র-ছাত্রী। অতনু নিজে হাতে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলছিল দু'জনকে। দোলা একটু বড় হয়, আর অতনু চিনে নেয় তার সৌন্দর্য, রূপ, রঙ, রস, গন্ধ। সুতনু বড় হয়, চিনে নেয় তার ঔদার্য ভ্রাতৃত্ব, মহত্ত্ব তেজ। আর অতনু খুশিতে ছবি আঁকে। মগ্ন থাকে ছবিতে।

সেই সময় অতনুর একটা ছবি শিল্পীমহলে খুব আদর পেয়েছে—ছবিখানার নাম 'হাত'। আহামরি কিছু নয়। আধখানা চাঁদের দিকে লাফিয়ে উঠেছে একটা সাদা ঘোড়া। সুদীর্ঘ বিশাল একখানা ব্যাকুল হাতে ধরতে চাইছে ঘোড়ার লাগাম। এই অংশটুকু এঁকেছে তেল রঙে। ফ্রেমের বাইরে এই হাতের উত্থান। আর পটে ওয়াশ টেম্পারাতে এঁকেছে এক রমণীর অসংখ্য টুকরো ছায়া। ফ্রেমের ভিতরে বাইরে ছড়িয়ে আছে স্বপ্নের ছিন্ন, নারী। নারীর অংশেরা।

এই নারীর মডেল আর কেউ নয়, দোলা। সে সময় অতনু দোলার শরীরের প্রতিটি অংশ, উল্টেপাল্টে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে। ঘাম, গন্ধ অনুভব করেছে। ভেবেছে এই শরীর আমার। সেই আবেগ থেকেই সৃষ্টি করেছে বিশাল ব্যাকুল হাত, স্বপ্নময় ঘোড়া। তার এ ছবিও খ্যাতি পেয়েছে।

সরলরেখার জীবন কখন ত্রিকোণ হয়ে এলো। অতনু আঁকলো—'ভীষ্মের শরশয্যা' পরাজিত ভীষ্ম। অতনু নিজের দাড়িতে হাত বোলায়। আদর করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে দাড়ি। মাথা নামিয়ে আনে বুকের কাছে। এ-যুগে জন্মালে দ্রৌপদী নিশ্চয়ই ভীষ্মকে 'দাদা' বলে ডাকতো। দ্রৌপদীর উত্থানের জন্য ভীষ্মের এই স্বেচ্ছাপতন। স্বল্প বাস, কাঁচুলি-আবৃত দ্রৌপদী। অতনু লজ্জা পায়। লজ্জা-সঞ্জাত যন্ত্রণা থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় অতনু, পায়ের তালুতে চাপ অনুভব করে। দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য থেকে আরাম পায়। শরীরের মধ্যে যেন নতুন করে রক্ত-চলাচল শুরু হলো। রক্তের গভীর থেকে একটা ডাক ভেসে আসছে। অনেক দূরের আর্তি। নারীকণ্ঠ। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে।

—অতনুদা, তুমি কোথায়?

অন্ধকার গ্যালারি। লোডশেডিং। গৃহের নিয়ম শৃঙ্খলা শাসন ভেঙে পড়েছে। একটা পণ্ড সভাগৃহ। ঠিক যেন শকুনির শেষ চালে এইমাত্র মাত হলেন যুধিষ্ঠির। দোলা অতনুর থেকে দূরে একা একটা সিটে। চিত্রশালার পরিচালক একটা টিমটিমে ইমারজেন্সি আলো জ্বেলেছেন। দোলা কেন উঠে দাঁড়িয়েছে সিটের উপর? আধো-অন্ধকারে অতনু দেখলো, দোলার চারপাশে হারে-রে-রে অসংখ্য হিংস্র লোভার্ত উদ্যত হাত।

পাশের দেওয়ালে পড়েছে ওই কৌরব ছায়া। যেন দোলাকে সবাই টেনে ছিঁড়ে খেতে চায়। প্রদর্শনী চলছে। সেদিন ছিল 'হাত' ছবির প্রথম প্রদর্শনী। আর সেই আর্ত নারীর ডাক।

—অতনুদা তুমি কোথায়? আমাকে বাঁচাও।

ওই ছায়ার মধ্যেও কে জানে সুতনুর হাত ছিল কিনা?

ওই ছায়াচিত্র গেঁথে গেল অতনুর মাথায়। জন্ম নিলো 'ভীষ্মের শরশয্যা'।

অতনু নিচু হয়ে তুলে নিলো রং তুলি।

ভীষ্ম আর দ্রৌপদীর চেয়ে ভাইবোনের এত বড় মিথ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

অতনু গলা ছেড়ে ডাক দিলো—দো-লা।

যেন গ্যালারি হলে দোলা যে ডাক দিয়েছিলো তার উত্তর।

দোলা উৎকর্ণ ছিলো না। অতনু ইজেল তুলি হাতেই উঠে আসে দোতলায়।

সুতনুর জামা প্যান্ট আজকাল লন্ড্রিতে যায় না। দোলা আপনমনে ইস্ত্রি করছে আর গুন গুন করে গাইছে ... ফিরে এসো ঘরে পরবাসী ...

ইস্ত্রিপোড়া গন্ধ, গানের সুর, আর শ্রম ভঙ্গিতে সে একাকার হয়ে আছে।

দোলাকে তার চাই। দ্রৌপদীর নতুন মডেল। অতনু নতুন করে 'ভীষ্মের শরশয্যা' আঁকবে।

দুই পঙ্‌ক্তির গল্প

দেশলাই একটি সাগ্নিক বস্তু। প্রাচীনকালে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালানো হতো। কয়েক হাজার বছর পেরিয়ে বিজ্ঞান আগুনকে দেশলাই বাক্সে বন্দী করেছে। এখন এই বৈজ্ঞানিক আগুন কুড়ি কি পঁচিশ পয়সার বদলে পকেটে পকেটে ঘুরে বেড়ায়। অত্যন্ত অবহেলায় কেউ কেউ যেমন হাবুল কালিদাস কৈবল্য কারো কারো দেশলাই মেরে দেয়। অভ্যেস। অভ্যেস থেকে স্বভাব।

কিন্তু হ্যাংলা নতুন একটা দেশলাই কুড়িয়ে পেয়েছে। সে বিড়ি খায় না, উনুনও ধরায় না। মনোহারীর দোকানে খরিদ্দার ধরার কাজ করে। নতুন চকচকে দেশলাইটি তার খুব পছন্দ। সুতরাং দেশলাইটিকে বুকপকেটে তুলে রেখেছে। মাঝেমধ্যেই বের করে বারুদের গন্ধে বুক ভরিয়ে নিচ্ছে। বেশ ভালো লাগছে। একসময় খেয়াল করলো, বারুদের গন্ধে নেশা হয়। নেশা শব্দটি অসুস্থতার ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং নেশা না বলে বলা উচিৎ এক ধরনের আবেগ সৃষ্টি হয়। এই আবেগ কোনো অসৎ মানসিকতা পুষ্ট নয়। সে চুরি করেনি। স্বাভাবিকভাবেই এটা পেয়ে গেছে। এখন সে একটি দেশলাইয়ের মালিক। আবারও বলি মালিক বলাটা ভুল হলো। মালিক বলতে বোঝে সেই লোকটি, যার নাম কৈবল্য। যার অধীনে সে পেটে-ভাতে কাজ করে। দেশলাইটি কুড়িয়ে পেয়েছে বেশ কিছুক্ষণ হলো, এবং বারুদের গন্ধ উপভোগ করতে করতে দেশলাইটিকে সে ভালবেসে ফেলেছে। অতএব তাকে প্রেমিক বলা যায়। সাগ্নিক বস্তুটিকে বুকপকেটে যত্ন করে তুলে রেখেছে। যেমন লোকে গোলাপফুল রাখে। মাঝে মাঝেই নাক বাড়িয়ে দিচ্ছে বুকপকেটের দিকে। গন্ধের লোভে।

এখন বেলা প্রায় নেমে এসেছে। ভিড় জমে উঠেছে মেলায়। হ্যাংলার মালিক কৈবল্য দোকানে ক্যাশের পাশে দাঁড়িয়ে। তার মনোহারির দোকান। যাযাবরের মতো। মেলায় মেলায় ঘুরে পসরা সাজায়। এবার মেলা বসেছে দেশের গাঁয়ে। গাঁয়ের নাম পরাণডিহি। হ্যাংলা এই গ্রামেরই ছেলে। সে দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। স্ব-গাঁয়ের দেবী পোঁতার মেলায় স্বভাববতই সবচেয়ে জম-জমাটি জায়গা তারা দখল করেছে। হ্যাংলা এখান থেকে মেলার সমস্ত দিকে সমানভাবে নজর রাখতে পারে। কোনো সুন্দরী মেলা দর্শনার্থী নেই যে হ্যাংলার চোখ এবং ডাক থেকে পার পায়। একবার তাকে কৈবল্যর দোকানে আসতেই হবে।

হ্যাংলা প্রেমিক। কিন্তু তার মনে হয়, কেউ তাকে ভালবাসে না, ফলে একধরনের কষ্ট হয়। সে ভালোবাসা পেতে চায়। এবং খোঁজে। সর্বত্র। মেলায় ও। ভিড়ের মধ্যে চোখ ফেলে পাঁতিপাঁতি করে খোঁজে। কাকে খোঁজে, জানে না।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, প্রেমিকার মুখের আদল প্রেমিকের কোনো না কোনো প্রিয়জনের মুখের আদলের ভারি মিল। খুবই আত্ম-মগ্ন কিংবা আত্মীয়হীন প্রেমিকের প্রেমিকা তারই চরিত্রের অনুরাগী কিংবা চেহারার অনুগামী হয়। হ্যাংলার চেহারা দেশলাই কাঠির মতো। প্রথম দেখেই মনে হয়, মাথায় বারুদমাখানো একটি দেশলাই কাঠি।

হ্যাংলার মা নেই। বাপ বাউল। উড়ে উড়ে বেড়ায়। মেলার মাসে, বছরে একবার গাঁয়ে আসে। এবার কন্ঠীবদল করে নতুন মা এনেছে। তাকে মা বলে ডাকতে হ্যাংলার খুব ভালো লাগে। নতুন মা তাকে ভালও বাসে। বাপও। কিন্তু হ্যাংলার ভুলে থাকতেও কষ্ট নেই। কারণ এমন ভালবাসা নয়। অন্য, অন্য এক ভালবাসা হ্যাংলা খুঁজে বেড়ায়। নতুন। যেন সম্পূর্ণ নতুন এক ভালবাসা। হ্যাংলার আর কোনো ইতিহাস নেই। হ্যাংলা ইজ হ্যাংলা।

মনোহারীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চোখজোড়া চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পায়ের গোড়ালি মাটিতে ঘষছে। এখুনি তার কাজ শুরু হবে। তার বর্ণনায় একটি দেশলাই কাঠিই যথেষ্ট। মেরুদণ্ডের মতো সোজা! গলা থেকে নেমে এসেছে শরীর। ছোট্ট একটি বাক্সের অন্ধকারে, একগুচ্ছ দেশলাইকাঠির ভিড়ে লুকিয়ে থাকে। বাক্স থেকে বের করলেই অমসৃণ তলে ঘষা খেয়ে জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় জেদি, আসন্ন গতির সঞ্চিত বেগে এবং তীক্ষ্ণ সম্পন্নতায় অস্থির।

মেলায় ভিড় জমে উঠেছে। হ্যাংলার কাজ শুরু হলো। সে এখন বাক্স থেকে বের করে আনে একটি দেশলাইকাঠি। মেলার ভিড়ের মধ্যেও অবশ্যম্ভাবী চিনে নেওয়া যাচ্ছে ওর ভরাট গলায় সুরেলা চিৎকার।

—টেক টেক, নো টেক নো টেক। ম্যাডাম একবার তো সী। ভিড় জমে উঠেছে ওর চারপাশে। দোকানের মুখজুড়ে। —মেলায় অনলি বেলজিয়াম মিরর, ম্যাডাম, মুখ সেঁধিয়ে মুখের ভিতর, বুক সেঁধিয়ে বুকের ভিতর, সুখ দুঃখের ধুকধুকুনি দেখতে পাবেন, এইখানে সী ম্যাডাম। অনলি সী হেয়ার।

হ্যাংলার চোখ দুটো বন বন করে ঘোরে। মতলববাজ খরিদ্দারের হাত থেকে ছোঁ মেরে জিনিস তুলে নিয়ে বলে—নো, থেপ্টিং বিজনেস, ম্যাডাম। অনেস্টি ইজ দা বেস্ট পলিসি থুড়ি ক্যাপিটাল। বলেন, এমটি পকেট গড়েরমাঠ অমনি দিচ্ছি নিয়ে যান। নারী হচ্ছেন শক্তির বীজ অফ দ্য অনেষ্ট ক্রিয়েশান। জননী-জন্মভুমি-মা-মাগো অমন ছোট হতে নাই। হ্যাংলা কখনো স্যার বলে না। সুন্দরী মেয়ে দেখলে মেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে যাবে। মা আমার মাসি আমার দিদি আমার, বোন আমার বলে

টেনে আনবে দোকানে। —টেক টেক, নো টেক নো টেক, ম্যাডাম একবার তো সী। স্নো, পাউডার, সিঁদুর, আয়না, চিরুনি, মাথার চুল বাঁধার বল কি নেই?

—মায়ের আমার জগদ্ধাত্রী রূপ, আমার শুধু সাজিয়ে সুখ।

এ সমস্তই নৈমিত্তিক। ব্যয় নেই, বিস্তার নেই, যেন অন্তহীন অক্ষয় অব্যয় জীবনের প্রতিটি দিন প্রতিটি ক্ষণ। এর মধ্যেও হ্যাংলার চোখ বন বন করে খোঁজে। কী খোঁজে ঠিক জানে না। খোঁজে, খোঁজার শেষ নেই। ভিড়ের শেষ নেই। কিন্তু সে আজ একটি নতুন দেশলাই খুঁজে পেয়েছে। অবসর বুঝে দেশলাইবাক্স থেকে কাঠি বের করে কান চুলকোয়, দাঁত খোঁচে। এ সমস্তই ছলনা, বারুদের গন্ধ তাকে ডাকছে। বারুদের ডাকে সে যথাযথ সাড়া দিতে পারছে না। অতৃপ্ত দেশলাইকাঠিটি কাজের চাপে আবার অন্ধকার বাক্সে ঢুকে পড়ছে। একবারও জ্বলে ওঠে না। জ্বলে উঠতে শেখেনি। হ্যাংলা বিড়িও খায় না, উনুনও ধরায় না। মনোহারির দোকানে খরিদ্দার ধরার কাজ করে। কেবল বারুদের ডাকে সাড়া দিয়ে ওঠে ওর গলার স্বর—টেক টেক ম্যাডাম, নো টেক নো টেক, একবার তো সী।

বারুদের সুগন্ধ জমে থাকে মস্তিষ্কে। দাহ্যটা লুকিয়ে থাকে বুকে। দৃঢ়তা শরীর জুড়ে চষে বেড়ায়। নৈমিত্তিক গুজরান শেষ হলে, রাত যত বাড়ে বুকের বারুদ তত ডাকে। হ্যাংলা বারুদকাঠির ডাকে অস্থির হয়ে ওঠে। মালিক কৈবল্য যখন ক্যাশবাক্স গুছিয়ে উঠে দাঁড়ায়, হ্যাংলা তখন নতুন কুড়িয়ে পাওয়া বাক্সটি থেকে একটা কাঠি বের করছিল। কৈবল্যর চোখে পড়ে। ডাক দেয়—হ্যাংলা, বিড়ি খাসনে দেশলাই কি করিস, দে।

—হ্যাংলার হাতে ধরা থাকে বারুদ মাখানো একটিমাত্র কাঠি। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মালিকের দিকে। মালিক ক্যাশবাক্স নিয়ে শিস্ দিতে দিতে অন্ধকার পথে মিলিয়ে যায়।

মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে যাওয়া হ্যাংলার চোখ দুটো বন বন করে পাক খায়। ক্রোধে বিস্ফারিত হয়। এই বিস্ফোরণ সে লুকিয়ে ফেলে। ধীরে ধীরে চোখ বেয়ে নামিয়ে দেয় বুকের গভীরে। জমা হয়। যেখানে একটিমাত্র দেশলাইকাঠি তার বারুদের দাহ্য নিয়ে অপেক্ষা করে আছে।

চেয়ার জুড়ে জুড়ে বেঞ্চির বিছানায় শুয়ে সে বারুদের কাঠিটি বের করে। একটিমাত্র কাঠি। হ্যাংলার মুখে, চোখে, কপালে, হাতের তালুতে ঘুরে বেড়ায়। বারুদের গন্ধে বারুদের স্পর্শে মনে হয় সে বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। অমসৃণ তল পেলে ঘষা খেয়ে জ্বলে উঠতে পারে দাউ দাউ করে। ঘুম আসে না। মাথা গরম হয়ে ওঠে। সে বিছানায় উঠে বসে থাকে পা ঝুলিয়ে। মেলার প্রান্তে দূর যাত্রীদের কেউ টিউবওয়েল টানছে। করুণ সুরে জল পড়ে। অন্ধকারে কেউ যেন সুর করে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে চলেছে। মধ্যরাত্রে ভেসে বেড়ায় সাপ-খেলানো সুর।

২

প্রাচীনতম পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাস বলে লক্ষ লক্ষ হাজার বছর পেরিয়ে অর্জিত হয়েছে এই প্রাকৃতিক সভ্যতা। বড় আশ্চর্য সমস্ত পরিবর্তন। বৈপ্লবিক, গতিময়, শৈল্পিক। কী ভীষণ এই শিল্প। ফলে, ফুলে, প্রাণে, জলে, স্থলে—শিল্পের মধ্যে জীবন, জীবনের মধ্যে শিল্প। দুয়ে মাখামাখি হয়ে এক অপূর্ব সৃষ্টি এই প্রকৃতি। এবং প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম বৈপ্লবিক পরিবর্তনহেতু সৃষ্টি হয়েছে হ্যাংলা, হাবুল, কালিদাস, কৈবল্য নামক মানুষ। প্রকৃতি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সামাজিক সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠতম উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে, এই আগুন। এবং তা দেশলাইরূপে হাত বদল হয়ে যায়। কেউ কেউ দেশলাই মেরে দেয়। অভ্যেস।

হ্যাংলার মালিক কৈবল্য প্রতিরাতে একটা দেশলাই হারিয়ে ফেলে কিংবা নষ্ট করে। দেশলাই-দেশলাই-ই। কুড়ি কি পঁচিশ পয়সা দাম। কেউই মনে রাখে না। সহস্র বছরের সাধনার ফল এই দেশলাই বাক্স, বারুদমাখানো প্রতিটি কাঠি। কৈবল্যও রাখে না। দোকানের হিসেব মিলিয়ে, ক্যাশবাক্স নিয়ে পথে নেমেই সে একটা সিগ্রেট ধরায়। দেশলাই বাক্সটি ঢুকিয়ে রাখে প্যান্টের পকেটে। প্রতিদিনের অভ্যস্ত পথ বেয়ে কৈবল্য শুঁড়িখানায় ঢোকে! শুঁড়িখানার আধো আলো আধো অন্ধকার বাতাসে নেশা ছড়ানো থাকে! বেশখানিক নেশা কৈবল্যকে সেখানেই জড়িয়ে ধরে। কৈবল্যর নেশাধরার প্রাচীন ইতিহাস সেই বারুদ। বারুদ থেকে আগুন। আগুন থেকে সিগ্রেট! সিগ্রেট থেকে গেলাস। গেলাসের আগেই মাতাল কৈবল্য পরেও গেলাসে গেলাসে চুর। আকণ্ঠ চুর হয়ে আবার পথে নামে। ফস্ করে দেশলাই জ্বালে, সিগারেট ধরায়। পা টলে, পথ চলে। মদের জ্বালানিতে সিগ্রেটের আগুন দিয়ে কলজে পোড়ায়। মেরে দেওয়া হ্যাংলার দেশলাই আজ পকেটে। মেলায় হ্যাংলার গাওয়া সুরেলা গানগুলো, বেঁকে চুরে বেসুরো হয়ে টলতে টলতে এলিয়ে পড়েছে কৈবল্যের গলায়।

লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না
তার চায় লাল ফিতে চিরুনি আর আয়না।

পড়ে যাওয়ার ভয়ে পথের ধারে গাছে হেলান দিয়ে পেচ্ছাব করে আর বলে—

—টেকমী, টেকমী, হেয়ার ইজ স্নো, ম্যাডাম, টেকমী—হ্যাংলাকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে নিজের বাকচাতুর্যে নিজেই খ্যাক খ্যাক করে স্বমুগ্ধ হাসি হাসে। ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে যায় মাটিতে! ফস্ করে দেশলাই ঠোকে। নতুন সিগারেট ধরায়।

ট্যাঁকের ক্যাশবাক্সে হাত রেখে, হ্যাংলার কথা, সুর, চোখঠারা সমস্ত কিছুকে ভেংচে ভেংচে কৈবল্য বলে, চলে আর সিগ্রেটের আগুনকে গনগনে করে তোলে। অথচ ভুলেই গেছে, ছোট্ট এতটুকু হ্যাংলাকে সে কোলে পিঠে বড় করে তুলেছে। বাপ পালানো মাওড়া ছেলেটা তারই কাছে হাঁটা, চলা, কথাবলা, মায় গান পর্যন্ত শিখে

হ্যাংলা আজ কত বড় হয়ে গেছে। এ সমস্ত অনেক পুরোনোদিনের ঐতিহাসিক কথাবার্তা। পকেটের দেশলাইটি যে হ্যাংলার কাছ থেকে অদ্য সন্ধেবেলা মেরে দিয়েছে, একথাও সে এখন বেমালুম ভুলে মেরেছে। কিন্তু ঘরে ঢোকার আগে অন্য আর এক ঘরে কৈবল্য নির্ভুলভাবে ঢুকে পড়ে।

ক্যাশবাক্সে টুং টাং আওয়াজ তুলে বলে—নো থেপ্টিং বিজনেস ম্যাডাম, অনেস্টি ইজ দা বেস্ট পলিসি থুড়ি ক্যাপিটাল।

—ম্যাডাম, তুমি হচ্ছ শক্তি তুমিই গতি। তা না হলে এ পর্যন্ত আসতে পারতাম না।

ফস্ করে দেশলাই জ্বেলে সিগ্রেট ধরিয়ে বলে—ওনলি এই সিগারেটের আলোয় সখি তোমার ঘরে পৌঁছে গেছি। তুমি সৃষ্টি, তুমি বীজ, তুমি প্রকৃতি, সব বলতে পারবো না ম্যাডাম, চণ্ডীস্তোত্র পড়েছ? পড়ে নিও।

তোমার বুকের ভিতর যে জীবন বয়ে যায়, সে না জানি কত সুন্দর! —ওঃ হোঃ হোঃ আমি সুন্দর জীবন খুঁজে মরি।

কৈবল্য দু-হাত বাড়িয়ে সুন্দর জীবন প্রবাহ খুঁজতে গিয়ে মুখ থুবড়ে মেঝেয় পড়ে যায়।

৩

হ্যাঁ, অত্যন্ত নাটকীয়। এবং ভীষণ বাস্তব। সে কারণে এ পর্যন্ত গোটা বিষয়টি কোনো গল্পই নয়। গল্পের পটভূমি। নৈমিত্তিক ঘটনা। গল্প মাত্র দুই পঙ্‌ক্তির। সেই একটা রাত্রির। যে রাত্রে দেশলাই বাক্সে একটি কাঠিও অবশিষ্ট থাকতে কৈবল্য ঘরে ফেরেনি। যে রাত্রে তিনটি ঘটনা সমাপতিত ছিল, একটি রেখায়। যে রেখার শেষপ্রান্তে ছিল খালি, বারুদ কাঠিহীন দেশলাইবাক্সটি ও কৈবল্যের বৌ। যে কেরোসিন গায়ে ঢেলে বসেছিল মরবে বলে। কৈবল্যর পকেটে দেশলাইবাক্সটি ছিল শূন্য, কাঠি নেই দেখে মরেনি। মরতে পারেনি অকস্মাৎ জীবনের প্রতি মমতাবশত।

প্রকৃত অর্থে নারীর অন্তরে প্রকৃতির মতই ফলে ফুলে ভরা সহস্র সহস্র বছরের সামাজিক প্রক্রিয়ার অন্তরালে আর এক প্রবাহ প্রকৃতির বড় আশ্চর্য এই পরিবর্তন। বৈপ্লবিক গতিময়, শৈল্পিক, এ শিল্পের মধ্যে জীবন। জীবনের মধ্যে শিল্প। দু'য়ে মাখামাখি হয়ে অপূর্ব এই দুই পঙ্‌ক্তির গল্প।

বাজি

সুবর্ণ হাত তীক্ষ্ণ-উঁচু করে বললো—ওই তো মরা ঝর্না।

—উই, উই, উ-ই তো আর একটা।

কল কল করে উঠলো রেখা।

—আহা রে!

রেখার মা কষ্ট পেলেন। —কতো ঝর্না মরে গেছে! মৃত ঝর্না আবিষ্কারের দুঃখ ছড়িয়ে গেল রেখার মুখে। মুখখানা পানপাতার মতো। ফর্সা ঝকঝকে। যেন সেলোফেন পেপারে মোড়া। সবসময় টাটকা। বাঁশবনের ছায়া এসে পড়েছে মুখে। পাহাড়ের এই অঞ্চলটা বাঁশবনে ছয়লাপ। অজস্র বাঁশের প্রশাখাময় ডগা নুয়ে নুয়ে আছে লায়ারপাখির ল্যাজের মতো। চলন্ত বাসের গা ঘেঁষে, জানালা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে। লায়ার-ডানার কষ্টকর ফাঁক দিয়ে চিলতে চিলতে রোদ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই রেখার মুখ ছুঁয়ে ফেলতে পারছে না। মুখখানা অন্ধকার লায়ার অরণ্যে।

কতো বছরের পাথর-চাপা মৃত্যুর বেদনা রেখার বিহ্বল কণ্ঠে কেঁদে উঠলো—বাবা, আর কোনোদিন এই ঝর্নারা বেঁচে উঠবে না, না?

লায়ার অরণ্যে সুবর্ণ মুগ্ধ। এই অনন্ত পাথরের নীচে পাতাল ঝর্নার ঝর ঝর শুনতে পেল। রেখা কেনো ঝর্নার মতো কথা বলে না? মরা ঝর্নার শোক, ব্যথা এখন রেখার মুখে, ডাগর চোখে। সুবর্ণ দৃষ্টি আড়াল করে দেখছে রেখার মুখখানা।

রেখার বাবা মি. রে বললেন—সামনের বর্ষায় ঝর্নাগুলো সব বেঁচে উঠবে।

রেখা হাততালি দিয়ে আবার কল কল করে উঠলো। তার করতালুর উৎসে মৃত ঝর্নারা তক্ষুনি বেঁচে উঠলো। ঝর্নার স্রোত কথা বলে উঠলো—তাই? সত্যি! পাহাড়ে কি মজার খেলা, বাঃ। আমরা বর্ষায় একবার ঝর্না-পাহাড়ে আসবো, হ্যাঁ?

বাস পাহাড়ি খাড়াই পথে উঠছিলো। ধীরে ধীরে। সরু বাঁকা লুপ। ঘুরে ঘুরে পথ। উঠছে গোঁয়ার বুনো জানোয়ারের মতো। ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। পথের বাঁদিকে পাহাড়, উঁচু। ডানদিকে অগাধ অন্ধকার খাদ। তাকালে গা শির শির করে। পড়ে গেলে, গোটা বাসখানা হাঁসের ডিমের মতো ভেঙে চৌচির হ'য়ে যাবে। হঠাৎ

ব্রেক কষলো বাঁকে। ব্রেক ধরছে না। বাসখানা পিছিয়ে যাচ্ছে। পেছনে অগাধ খাদ। রেখা একবার নীচে তাকিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো — মাগো!

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দিল। সুবর্ণর হৃদপিণ্ড দাঁড়িয়ে গেছে। বুকের ভিতর দমবন্ধ। গোটা বাস ভয়ে কাঠ। বাসের সহিস ছোকরা বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে গিয়ে বিশাল কাঠের একটা প্রিজম পেছনের চাকায় গুঁজে দিলো। বাস দাঁড়িয়ে গ্যালো। ছোকরা হ্যা হ্যা করে হেসে বললো—এটা কোনো ব্যাপারই নয়। ধড়ে প্রাণ এল। বাস আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলো। বাঁদিকে শাল-পাইনের গভীর জঙ্গল। ক্লান্ত সূর্যের আলো নিস্প্রভ হয়ে আছে। আকাশে ইতস্তত মেঘ। মি. রে হঠাৎ বলে উঠলেন—এই সেই শাল পাইনের বন। এখানে সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিন রাত্রি' সুটিং হয়েছে।

সুবর্ণর মনে পড়ে যায়—সেই দৃশ্যের কথা—একটি যুবক গ্রিক দেবতার মতো—নিরাবরণ দেহে জ্যোৎস্নার আলোয় ছুটে যাচ্ছে। তবু উপন্যাসখানা পড়েছে ভেবে লজ্জা পেলো।

বললে—সিনেমায় এরকমই জঙ্গল দেখিয়েছিলো। মি. রে, রেখার বাবা জেনে গেলেন — সে 'অরণ্যের দিন রাত্রি' দেখেছে।

মি. রে বললেন—এরকম কি, এটাই সেই জঙ্গল।

সুবর্ণ ভাবলো, রেখা নিশ্চয় এরকম বাজে দৃশ্যের সিনেমা দ্যাখে না। সে একবার রেখার দিকে তাকালো। রেখা মায়ের কোল ঘেঁষে জড়োসড়ো। বাইরে তাকিয়ে আছে।

সুবর্ণ এফসিআইতে নতুন চাকরি পেয়েছে। এফসিআই মানে —ফাইনানসিয়াল করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া। মি. রে তার ম্যানেজার। সে আর কিছু বলার সাহস পেলো না বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। রেখা যা দ্যাখে সুবর্ণও তাই দ্যাখে। বাসের পিছন দিকে টেপ রেকর্ডারে পপ ডিসকো বাজছে। আট-দশজন মিলে হুল্লোড় করছে। একটা খালি মদের বোতল গড়িয়ে বার বার সুবর্ণর কাছে চলে আসছে। সুবর্ণ লজ্জা পাচ্ছে। সে গাঁয়ের ছেলে। চাকরিতে ঢুকেই সুযোগ পেয়ে গেছে নেতারহাট ট্যুরে। এখনও তার কনফারমেশন হয়নি। কৌতূহল ছিলো, দ্যাখে, অফিসাররা ওখানে কি ধরনের হুজ্জোতি করছে। সাহসে কুলালো না। ,

মি. রে পাশের ভদ্রলোককে বললেন—নেতারহাট পাহাড়ে সানসেট, সানরাইজ দুইই খুব বিখ্যাত।

ভদ্রলোক নিশ্চয় কোনো ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হবেন। বললেন—এনাফ টাইম আছে। আমরা সানসেট দেখে গেস্টহাউসে ফিরবো।

সূর্যাস্ত দেখার বিশাল পাহাড়ি চত্বরে যখন বাস এসে দাঁড়ালো, তার আগেই আরো দু'তিন খানা জিপ, বাস এসে দাঁড়িয়েছে। উল্লাস, গল্প, কথাবার্তা—ছোটোখাটো একটা মেলা। বাসের শেষ পাদানি থেকে লাফ মেরে নামলো সুবর্ণ। সমস্ত গা হাত পা মুড়িয়ে

মড় মড় করে কব্জি-কব্জা ভেঙে নিচ্ছিলো। এক রাত একদিন বাসে।

রেখার মা বললেন—সুবর্ণ আমাকে ধরোতো। সুবর্ণ দেখলো মায়ের পেছনে রেখা। চোখে চোখ পড়তেই মুখ নিচু করলো সুবর্ণ। মাসিমাকে নামালো, অসাবধানে রেখার আঙুল ছুঁয়ে গেল ওর হাত। কী গরম!

এই প্রচণ্ড শীতে রেখার আঙুল এত গরম কী করে? পাহাড়ের কিনারে বাঁধানো আলসে। ওখানে ভিড় জমেছে। দর্শকেরা সারি সারি বসে-দাঁড়িয়ে। সামনে বিশাল খাদ। নীচে শাল, পাইন, আমলকি, হরিতকি, বিশাল বিশাল বৃক্ষের জঙ্গল। বহুদূর পর্যন্ত ফাঁকা। এখান থেকে পুরোপুরি সূর্যাস্ত দেখা যায়। কাঁধে কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার চোখ উঠে এসেছে চোখে।

মাসিমা বললেন— সুবর্ণ একটু সরে দাঁড়াও তো। সুবর্ণ ফিরে দেখলো, মাসিমা রেখাকে প্রায় বুকের মধ্যে রেখে মা-মেয়েতে তাকিয়ে আছে পশ্চিম আকাশে।

কোত্থেকে হাতির মতো একটা কালো মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে ফেললো। পেছনে ছলকে পড়া একগুচ্ছ হাসির দমকা গড়িয়ে পড়লো কানে।

সুবর্ণর সামনে পিছনে হায় হায় গুঞ্জন উঠছে। কোলকাতার মতো দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে সূর্য ডোবা দেখতে। সেই সূর্য ঢেকে দিল মেঘে। ইস্ হতাশ শব্দেরা এপাশ থেকে ওপাশ মানুষের কণ্ঠ বেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুঃখ সুবর্ণরও হচ্ছিলো। সে দুঃখিত মানুষের মুখগুলো দেখছিলো। আরো পেছনে, বয়স্ক পুরুষেরা আবার হাততালি দিয়ে উঠলো। সূর্যডোবা নিয়ে ওদের মাথা ব্যথা নেই। ওরা যেন চন্দ্রোদয় নিয়ে মেতেছে।

একটু দূরে একজোড়া দম্পতি ছবি তুলছে। সুবর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো তাদের স্বল্পবাস আর অশ্লীল ভঙ্গি। অবাক লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল ধীরে। আবার হাততালি আর ছেঁড়া ছেঁড়া হাসি শুনতে পাচ্ছে। সে ভাবছিলো, কে ওই বৌ, কার বৌ, কারো ঘরের বৌ তো বটে। ছিঃ! বৌটিকে সে রাঁচি আর লোহারদাগাতে নামতে দেখেছে। সুদেব দের পাশে বসে খেয়েছে। সুদেব দে হেড অফিসের একজন এজিএম। এ্যাসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার। মহিলাটি সুদেব দের সঙ্গেই ঘুরছিলো। এখন সুদেব দেকে ওখানে দেখতে পেলো না। বৌটি বেশ সুন্দর। তবে বড় বেশি পেন্টে রাখে মুখখানা। সুবর্ণ বুঝতে পারে রেখার মা এ রকমই একটা অশ্লীল ভঙ্গি দেখে রেখাকে পেছন থেকে আড়াল করে নিয়েছেন।

সানসেট দেখা বুঝি আর হয় না। আড়াল পাতলা হচ্ছে, পাতলা হচ্ছে, আবার গাঢ় হচ্ছে। শেষ আর হয় না।

মি. রে তার বাজখাঁই গলায় বললেন—সানসেট হবে না। চলো ফিরে যাই।

মি. রের পাশের সেই ভদ্রলোক, বারাসাত ব্রাঞ্চের ম্যানেজার, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন—হবে, হবে, দেখছেন না, মেঘটা শেষ হয়ে আসছে।

রে ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন—আমি বলছি, হবে না।

বারাসাত ব্রাঞ্চের ম্যানেজারবাবু —আমি বলছি, হবে।

মি. রে —হবে না। পঞ্চাশ টাকা।

বারাসাত— হবে। একশ টাকা।

রে —হবে না। দেড়শ টাকা।

বারাসাত— হবে। দু'শো টাকা।

দর্শকেরা হৈ হৈ করে উঠলো। দু'দলে ভাগ হয়ে গেলো। রেখা খুব মজা পেয়েছে। হাততালি দিয়ে খানিক নেচে উঠলো। বাবার উপর তার অগাধ আস্থা। সে চেঁচিয়ে উঠলো —বাবা জিতবেই।

সুবর্ণ ভাবলো— এই সানসেটের দাম দু'শো টাকা। দূরে ঢালু পাহাড়ে ঘাসের রঙ তখন সিসের মতো গাঢ় হয়ে এসেছে। দুই ত্রিভুজ চূড়ার মাঝখানে মেঘে ঢাকা সূর্য এসে দাঁড়িয়েছে। সুবর্ণ দেখলো, পরিবেশ এমন কিছু দুর্ধর্ষ ফ্রেমে নেই। সাধারণ সূর্যাস্ত। তাদের গাঁয়ের ইট-ভাটার মাটির পাহড়ে উঠলে ইছামতির সবুজ অরণ্যানীর ঢালে এর চেয়ে মন মাতানো সূর্যাস্ত হামেশা দেখা যায়। হাজার মাইল পথ ভেঙে, মানুষ কি সত্যিই এই সূর্যাস্ত দেখতে আসে? আশ্চর্য হুজুগে মানুষেরা। সুবর্ণ নানা এ্যাঙ্গেলে চোখ রেখে বিভিন্ন ফ্রেম তৈরি করতে চাইলো। ধুস! কে এই লোকেশন নির্বাচন করেছে?

ততক্ষণ বারাসাত গ্রুপ হেঁকেছে— সূর্যাস্ত পাঁচশো টাকা।

মি. রে'র গ্রুপ চেঁচিয়ে উঠলো— নো সূর্যাস্ত হাজার টাকা।

মজা পেয়ে অন্যদলের নানান ভাষা-ভাষী মানুষ এমনকি দু'চার জন বিদেশি-বিদেশিনী -কেও সুবর্ণ দেখতে পেল, ভিড়ে গেছে দু'দলে ভাগ হয়ে।

সূর্য্যাস্ত এখন দেড় হাজার টাকা।

নো—সূর্যাস্ত এখন দু'হাজার টাকা।

একদল আশা ছেড়ে দিয়ে বাস নিয়ে ফিরে গেলো। এদিকে, বাসের আচমকা স্টার্ট নেওয়ার শব্দে পড়ে গেল, এজিএম সুদেব দে। ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে অস্থির পথ নেমে গেছে নীচে, খাদে, জঙ্গলে, গভীর জঙ্গলে। লোকটি গড়িয়ে যাচ্ছে। চতুর্দিকে আলগা পাথর ছড়ানো। হাতের কনুই, মাথা, শরীরের বিভিন্ন জায়গা ধাক্কা খাচ্ছে। কাঁটা ঝোপে বেঁধে জামা, প্যান্ট, গায়ের চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে, রক্ত বেরুচ্ছে।

একদল মানুষ ধর্ ধর্ শব্দে হৈ হৈ করে উঠলো। কয়েকজন মজা পেয়ে কোমর নাচিয়ে হাততালি দিয়ে উঠলো।

—লোকটা বেঁচে যাবে — হাজার টাকা।

—লোকটা বাঁচবে না — দু'হাজার টাকা।

মানুষটি গভীর খাদে মৃত্যুর দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ কোনো চেষ্টা করছে না। কেবল সুবর্ণ ছুট ধরলো। সে গাঁয়ের ছেলে। ছোটবেলা থেকে মাটির পাহাড়ে খেলা করেছে। ছোটখাটো ট্রেকিং করেছে। একনিমেষে পৌঁছে গেল সুদেব দে'র কাছে। সুদেব দে তখন পথের ঝোপে আটকে গেছে। আরও দু-তিন জন ওকে তুলে নিয়ে এল।

লোকটা মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে। লম্বা লম্বা অবশ হাত দু'খানা দুলছে। পা-দুটো মাটিতে ঘেঁষড়ে এসেছে। মৃত্যুর আতঙ্কে চোখ দুটো বিস্ফারিত। মুখ বেঁকে গেছে। গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে। হাঁচড়-পাঁচড় করতে করতে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে গেলো।

একদল লোক হাততালি দিয়ে উঠলো — ব্রাভো! ব্রাভো! লোকটা পারলো না।

ভেঙে চুরে পড়ে গেল মাটিতে। সুবর্ণ তখনও মানুষটাকে ছুঁয়ে আছে। লোকটা শুয়ে শুয়েই আস্ফালন করছে—সব শালাকে দেখে নেবো।

জিভ ভারী হয়ে গেছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে ভক ভক করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। সুবর্ণর নাক মুখ জ্বলে যাচ্ছে। বমি বমি পাচ্ছে। ওকে ছেড়ে দিল।

লোকটা বকে যাচ্ছে— সব শালাকে দেখে নেব, এ্যাঁ—খাঁটি মাল বিক্রি? এ্যাঁ—ইক! র'মাল খাওয়ানো এ্যাঁ—কোলকাতায় ফিরি।

রেখার মা ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে একবার সুদেব দের দিকে তাকালেন। সেই সাথে থুতু ফেললেন এক তাল। তারপর রেখাকে নিয়ে বাসে উঠে গেলেন। রেখা কেবলই কাঁদছিল।

—মাগো, সুদেব কাকুকে একটু দেখলে না। কাকুর যে কেটে গেছে, অনেক রক্ত পড়ছে।

রেখা ছুটে যেতে চেয়েছিল সুদেবকাকুর কাছে। রেখার মা প্রায় টেনে হিঁচড়ে রেখাকে বাসে তুলেছেন। রেখার কান্নাভেজা মুখখানা স্থির। বাসের জানালায় ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো চেয়েছিল সুদেবকাকুর দিকে। সারি সারি পাথরের চোখ। মাত্র একজোড়া চোখের উৎসধারায় ঝর্নার মতো অশ্রু নেমে আসছিলো। সুবর্ণর ইচ্ছা করলো ওই ঝর্নায় অবগাহন করে।

বাস যখন ছেড়ে দিয়েছে, রেখা তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছিল। সুবর্ণ একবার সুদেব দে একবার রেখাকে দেখছিল। তখন সুবর্ণ, রেখার মা'র মতো অনেকেই জেনে গেছে, ডিপ পেন্টের বৌটি, সুদেব দের কেউ নয়, ভাড়াকরা মেয়েছেলে, ক্যাবারে ড্যান্সার মিস ডায়ানা।

রাত দশটা। গেস্টহাউস। এখানে সুবর্ণ হিরো। সব আলো নিভে গেছে। গোছা গোছা মোমবাতি টেবিলে টেবিলে জ্বলছে। তাসের পর তাস। খুচরোর পর কয়েন। নোট, পাত্তির ঝনঝন। মদের বোতল—টুং টাঙ। সুবর্ণ টেবিল থেকে টেবিলে ঘুরে বেড়ায় একা। যে টেবিলেই যায় সেখানেই সুবর্ণর নামে বাজি চলছে। সবাই সিনিয়র। সুবর্ণ হিরো। কেউ না কেউ পিঠে হাত রাখছে। অন্ধকারে সে অনেককেই চিনতে পারছে না। কেউ বলছে—গুরু একবার ছুঁয়ে দাও কার্ডগুলো।। কেউ বলছে—গুরু একটা কিস্।

কেউ সুর করে বলে উঠছে — হিরো, একটু বসো পাশে আমার।

সুবর্ণর অস্বস্তি লাগছে। অন্য টেবিলে গেলো সে। সেখানেও তাস, পাত্তি, মদ। সেখানেও সে বাজির ঘোড়া। ওদের বাজি সুবর্ণর সাথে রেখার প্রেম হবে কি, না?

সুবর্ণ লজ্জা পেয়ে বলে উঠল— ছিঃ এ বাজি বন্ধ করুন।

মদ-মেদুর কণ্ঠে একজন বললো —পেটে খিদে মুখে লজ্জা কেন, হিরো?

সুবর্ণ আরো কুঁকড়ে গ্যালো। টেবিল ছেড়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। একজন তার হাত টেনে ধরলো। আন্তরিক গলায় বললো—লজ্জা কিসের? রেখাকে তুমি চাও কি না? তার মুখ থেকে বিলিতি মদের গন্ধ সুবর্ণকে অস্থির করে তোলে। অন্যজন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো—আজই তো রাত গুরু। চান্স লাগিয়ে দাও।

সুবর্ণর গা গুলিয়ে উঠলো। হাত ছিনিয়ে পালিয়ে গেলো। অন্য কাউকে খুঁজতে লাগলো। যাকে সে চেনে। মেয়েরা অন্দর মহলে আড্ডা দিচ্ছে। কী জানি, রেখা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটু আস্থা, একটু বিশ্বাস, একটু নির্ভরতা। না কেউ নেই। ঘরের দক্ষিণ মেঝের দিকে খানিকটা ফাঁকা। ওখানে সুদেব দে মরার মতো চিৎপাত পড়ে আছে। গায়ে শীতের কিছু নেই। পাহাড়ি ঠান্ডায় পাঁচ সাতটা জড়িয়েও সে ওম পাচ্ছিল না। পাশে মি. রের আড্ডা। এখানে তাস, আর মহুয়ার মদ। সুবর্ণ একটু দূরত্ব রেখে এখানেই বসে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে কোথাও মিন মিন করে টেপ রেকর্ডারটা বাজছিলো। মি. রে মাঝে মাঝে এক চুমুক খাচ্ছিলেন। চশমার ভিতর দিয়েও সুবর্ণ দেখলো তার চোখ দুটো লাল। ঢুলু ঢুলু, মেদুর। তার পাশেই দেওয়ালের একটা নালা দিয়ে ফিনফিনে হাওয়া ঢুকে শাল জড়ানো হাতের আঙুলগুলো শক্ত করে তুলছে। সে সহ্য করতে পারলো না। সুদেব দের জন্য কষ্ট হচ্ছিল। মৃদু গলায় মি. রে কে বলেই ফেললো— ম্যানেজারবাবু, এজিএম স্যারের গায়ে একটা কম্বল চাপিয়ে দিলে হয় না?

চারজন ম্যানেজারের মাথা হুমড়ি খেয়ে পড়লো সুবর্ণর মুখের দিকে। চার দু-গুণে আটখানা লাল ডগডগে চোখ তাকে যেন পুড়িয়ে ফেলবে। একজন বললে—ছোকরা, শীতে মদ খাওনি কখনও?

সুবর্ণ হকচকিয়ে গেল, ভাবতে পারে নি এরকমটা হবে। সে উত্তর দিল—না।

একজন বলল—একটু?

হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ফাঁকে মাপ দেখিয়ে বললো —এই একটু?

সুবর্ণ উঠে পড়তে চাইলো। একজন তার চাদর টেনে বসিয়ে দিলো—আরে ভাই বসো বসো।

আগামী দিনে এসব দায়িত্ব তোমাদেরই নিতে হবে। বলে দু'জনেই বোতল থেকে বিলিতি মদ ঢালতে লাগলো।

সুবর্ণ অসহায় ভাবে তাকালো মি. রের দিকে।

মি. রে স্খলিত গাম্ভীর্যে বললেন—আরে খাও খাও মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। মদ এখন আইনসিদ্ধ। ওরা তিনজনে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল।

সুবর্ণ—গোঁৎ গোঁৎ করে খানিকটা গিলে ওখান থেকে উঠে পড়লো। একটুতেই গা'র মধ্যে কেমন পাকিয়ে গ্যালো। র'নাকি? টেপরেকর্ডারে পপ বাজছিলো।

এবার ঝনঝন শব্দে বেজে উঠলো। চারিদিকে চিৎকার, হট্টগোল, রক 'ন রোল নাচ। সুবর্ণ একটু নিরিবিলি চাইছে। শীতের অন্ধকারে কোথায় যাবে? রেখার কথা মনে পড়ছে। খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। সে রেখাদের ঘরের পাশ দিয়ে নিজের ডর্মিটরির দিকে চললো। কটা বাজে? রাত বারোটা হবে। রেখার নামকে নিজের নামের পাশে বসিয়ে আপনমনে খেলা করতে করতে যাচ্ছিল। অক্ষর নিয়ে শব্দ নিয়ে নতুন শব্দ তৈরির খেলা। চার পাঁচজন এসে ওকে ঘিরে রোল নাচতে শুরু করলো।

—গুরু তুমি জিতে গেছো। বাজির দান। লাক লাক হ্যাটট্রিক লাক। সুদেব দের ঘোড়া তুমি জিতে গেছো।

কি ঘোড়া, কিসের বাজি, কার লাক, বোঝার আগেই মিস ডায়না এসে সুবর্ণর হাত ধরলো। কব্জি ছিঁড়ে সে হাত বের করে নিতে চাইলো। শরীর অবশ হয়ে গেছে। মিস ডায়না আর সুবর্ণকে সবাই মিলে সুদেব দে'র ঘরে ঢুকিয়ে দিলো। অগাধ অন্ধকার, ঘরময়। সুবর্ণ আচমকা ঢুকে গেল অন্ধকারে। যেন কেউ পাহাড়ের গা বেয়ে ঠেলে ফেলে দিল। কেউ টেনে নামাচ্ছে। সুবর্ণ গড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না। সুবর্ণ শুনতে পায় ঘরের বাইরে থেকে তালা পড়লো। দরজার সামনে রক 'ন রোল চলছে। লাক লাক হ্যাট্রিক লাক। কে জিতবে সুবর্ণ? না, সুদেব দে'র ঘোড়া?

—বাজি?

—বাজি।

—সুবর্ণ ষোল আনা।

—ওই তো রেখা।

—আঠারো আনা।

যাত্রার নায়িকার মত আলুথালু রেখা ছুটে এল কোথা থেকে। মনে হয় ঘুমোচ্ছিলো। হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বন্ধ দরজার সামনে লুটিয়ে পড়লো।

—তোমরা ওকে মেরে ফেলো না। ছেড়ে দাও। দরজা খোলো। দরজা খোলো।

কচি হাতের নরম ঘুষিতে দরজার কিছু যায় আসে না। কে কার কথা শোনে। রেখাকে ঘিরেই শুরু হলো রক 'ন রোল। লাক লাক হ্যাট্রিক লাক। অট্টহাসি।

মকশোর নিশানাথ

একটা গল্প লিখতে হলে, বেশ কিছু গল্প মকশো করতে হয়। মকশোর হরেক রীতি। প্রতি সন্ধ্যেয় দু'চার জন মানুষকে কলমের ডগায় বসিয়ে আড্ডা দেওয়া ভালো। তবে বেছে গুছে নিয়ে বসাই শুদ্ধরীতি। তেমন দু'এক জনের সঙ্গে হরবকত দেখা হয়। উঠি বসি। ঘর পাতি। সংসার গড়ি। সমাজ বাঁধি। আড্ডা দিই। দিন কেটে যায়।

নিশানাথ ওরফে নিশাপতি নাথ কি তেমনি একজন! নিশানাথের সঙ্গে দেখা হল অনেকদিন পর। তখন গোধূলির গায়ে আঁধার লেগেছে। সেই স্বভাবসিদ্ধ মিটি মিটি হাঁটা। লম্বা উঁচু মানুষটা একটু কুঁজো হয়েছে। হাঁটন বদলায়নি। যদিও পিঠে ময়লা ব্যাগে বইয়ের বোঝা। গায়ের কোটটা বে-বোতাম। ফুলশার্টটা কোটের নীচে ঝুলে আছে। পাহাড়ি টিলার গায়ে এলোমেলো পাথরের মতো রকমারি বই, খাতা, পেন, পেনসিল, শ্লেট ইত্যাদি। নিশানাথ ফেরিওয়ালা। হেঁকে যাওয়া অভ্যেস।

—শ্লেট পেনসিল হাতেখড়ি বর্ণবোধ ধারাপাত ... গ্রাম-গ্রামান্তর কাঠফাটা রোদ্দুর, খাঁ খাঁ মাঠ, ধু-ধু বালুচর, জনপ্রাণী আছে কি নেই—সে হেঁকে চলে।

—ডটপেন, নিব, রিফিল, খাতা, পেন, পেনসিল, শ্লেট হাতের ফাঁকে কখনও ফুলের পাপড়ির মতো ছড়ান বই কখনও একঝাঁক পেনসিল।

ধোপঘাটির পুকুরের ধার ঘেঁষে বিশাল মাঠের সরু পথ বেয়ে এগিয়ে আসছে নিশানাথ। লম্বা দুখানা পায়ের স্থির পদক্ষেপে ফুটে উঠেছিল তার অবয়ব। যেন নিশানাথের কোনো আদি অন্ত নেই। আদিগন্ত মাঠের মধ্যে নিরালম্ব একটি প্রাণী। ক্রমাগত এগিয়ে আসছে।

এ শহরে নিশানাথকে অনেকেই চেনে। অনড় চেহারা। অতীত তার ফেলে আসা পেছনের মতোই অন্ধকার। ভবিষ্যত হয়ত গড়িয়ে আসা রাত্রির মতো। মাঝে চলমান একক নিশানাথ। কেউ বলে, অনাথ, বাংলাদেশি, উদ্বাস্তু। কেউ বলে—নকশাল। কেউ বলে—খুনের আসামি, গা ঢাকা দিয়েছে। হঠাৎ-ই একদিন গঙ্গার ধারে বস্তির বাসিন্দা হয়ে গেল। একা। নিরম্বু একা।

একা মানুষ কথা বলে না। তবে সবাই সমীহ করে। কথা বলে ধীরে। শুদ্ধ স্পষ্ট, গম্ভীর উচ্চারণ। শ্লেট, পেনসিল, হাতে খড়ি, বর্ণবোধ, ধারাপাত ... আর পাঁচজন ফেরিওয়ালার মতো গলা বিকৃত করে না। স্বাভাবিক বলেই নজরে আসে। এখন নজরে এই

জন্যে—হাওয়াই চটির একখানা পায়ে অন্যটা ঝুলছে হাতে।

অন্য একজনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে না দিলে একজন মানুষকে চেনা যায় না। সুতরাং মকশোটাকে পোক্ত করতে আর একজন চাই। চাইতো বটে। কত লোক বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, আসছে। নিশানাথও পৌঁছে গেছে।

চাই নিশানাথের দরকার মতো।

ষাট-সত্তর দশকের মতো কোন এ্যাকসিডেন্ট আজকাল গল্পের মকশোতেও চলে না। সুতরাং মারুতি এ্যামব্যাসাডর, স্কুটারগুলো ভোঁ ভোঁ বেরিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার আলো জ্বলে গেছে।

—শ্লেট, পেনসিল, হাতেখড়ি, বর্ণবোধ, ধারাপাতে ... ফেরি-হাঁক রাস্তার দ্রুতগামী জটিল শব্দস্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

নিশানাথকে আর একজনের মুখোমুখি হতেই হবে। না হলে মকশোটা মাটি হয়ে যাবে। রিক্সা, সাইকেল, অফিসফেরতা লোকজন, কাঁধে ব্যাগ, হাতে ব্যাগ পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। নিশানাথ খপ করে একজনের হাত চেপে ধরে।

—এ্যাই ফটকে না?

ফুরফুরে শিস দিতে দিতে চলা ইস্টম্যানকালার এক ছোকরাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে নিশানাথ। সে রাস্তা পার হচ্ছিল। গম্ভীর গলা, অন্ধকার মানুষটার সামনে ভড়কে যায় ফটকে। মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলে ওঠে—না, ফটিকচন্দ্র দাস।

দুটো মানুষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলে মকশোর দফারফা। ক্যালিডিস্কোপের কাচের মতো গল্পের ছক কেবলই বদলায়। কুশীলব আপন ইচ্ছায় নড়েচড়ে ওঠে। মকশোকারের ধার ধারে না। সমস্যাটাকে কোনোমতে দুজনের মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়ে সাইড হয়ে যাওয়া।

ফটকের দু'হাতে দুটো বিলিতি মদের বোতল। চোখ মটকে গম্ভীর হয়ে ওঠে—কী চাই—?

এ কোন ফটকে! প্যান্টের রশি খুলেখুলে যায়। নাকে শিকনি ঝরে। 'কাকা' 'কাকা' রবে পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করে—সে তো নয়। অভ্যন্তরে সমঝে নেয় নিশানাথ।

—চাই মানে, চটি ছিঁড়ে গেছে সারাই করে দে।

ফুরফুরে দিলদরিয়ায় টাল খেয়ে খিঁচড়ে ওঠে ফটকে—ওসব মুচিফুচির কাজ আর করিনে। রেকসা চালাই।

বাঁ হাতে সরিয়ে দেয় নিশানাথকে। নিশানাথ পড়ে যাচ্ছিল। সামলে ঋজু হয়ে ওঠে।
—ফটকে, শহরে চালবাজি শিখেছিস!

শিরিষগাছের অন্ধকারে রিকশাখানা দাঁড়িয়েছিল। ফটকে লাফ দিয়ে রিকশার কাছে

পৌঁছে যায়। সিটে কেউ বসেছিল। তাকে তুলে দ্রুত বোতল দুটো সিটের নীচে ভরে দেয়। নিশানাথ গলা চড়ায়—

—এ্যাই, দুদিনের ভালমানুষ, দে আমার টাকা দে। তখন কত ন্যাকা ন্যাকা কথা। ... ফটকের পুরোনো একদিনের গলা নকল করে বলে ... ছেলে মানুষ করবো। মাসে মাসে শোধ দেব। সারা জীবন জুতো ফিরি সেরে দেব।

ফটকে প্যাডেলে পা চাপিয়ে রিকশা নিয়ে সটকে যাচ্ছিল। নিশানাথ পথ আগলায়। একটা দুটো লোক জমে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে ভোল পালটে ফেলে ফটকে।

—কাকা, রাগছ কেন? ঘরে চল, জুতো সেরে দেব।

তড়িঘড়ি নিশানাথকে ঠেলে রিকশায় তুলে নেয়। হকচকিয়ে নিশানাথও উঠে পড়ে। ফটিক প্যাডেল ঘুরিয়ে দেয়। রিকশা চলতে শুরু করে।

নিশানাথ চেঁচাতে পারত, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঘটনা এরকম ঘটার কথা একদম ছিল না। গল্পের গতিও তথৈবচ। মকশো এখন ফটকের হাতে মানে রিকশার হ্যান্ডেলে আর পায়ের প্যাডেলে। রিকশা যে দিকে যায়।

একটা মিষ্টি গন্ধ। একটু ঠুনঠান। নির্ঘাত চুড়ির। নিশানাথের খেয়াল এল। পাশে একজন মেয়েছেলে।

শুধায়—কে গা।

কোনো উত্তর নেই।

আবার শুধায়। উত্তর নেই। নিশানাথ মৃদু ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

—কানে কি কান নেই?

শাড়ির দামি খস খস। বয়সভরা গন্ধ। নিশানাথ সমঝে নেয়। সামনের দিকে গলা তুলে ধরে!

—কে রে ফটকে?

উত্তর গম্ভীর—সওয়ারি।

—হাইকোর্ট বোঝাচ্ছিস! ভদ্দরলোকের মেয়ে হলে খাপটি মেরে রয়!

—আমার ইস্ত্রী।

শাড়ি খসখসিয়ে ওঠে এলোমেলো। চুড়ি বেজে ওঠে বেসামাল। নিশানাথ সাইডে গলা ছাড়ে।

—কথা সত্যি?

চুড়ি কথা বলে—টুটুং টাং টাং

নিশানাথ সোজামানুষ, বোঝে না। সিধে গলা ছোড়ে।

—নীচে মদ, ওপরে মেয়ে ছেলে—স্ত্রী ...

কথা শেষ হয় না। ফটকের গলা হিংস্র শোনায়।

—বুড়ো, কপালে তোর দুঃখ আছে।

নিশানাথ হতবাক। কে তুই? ফট্‌কে? কোথায় যাচ্ছিস? সামনে অচিন অন্ধকার। হায়রে দুনিয়া। তল কোথায়। নিশানাথ হাতের কাছে একটুকরো শাড়ির আঁচল পেয়ে খামচে ধরে।

ভাগীরথী ব্রিজের খাড়া উঁচু থেকে একটা ল্যাংটো খোকা গড়িয়ে যাচ্ছে। নীচে। অনেক নীচে। গঙ্গার খাদে। থামছে না। হুড়মুড় করে নামছে নিশানাথ। খোকাটাকে ধরবে। নাগালের বেশ বাইরে। জলে যাচ্ছে একটা জীবন্ত খোকা। পায়ে ঝোপ জড়িয়ে গড়িয়ে গেল নিশানাথ। প্রাণপণ শক্তিতে গড়াচ্ছে। একটু—আর—একটু পেয়ে গেছি। আঃ। খোকা তার বুকের মধ্যে।

খোকাটা ফটকে। তার বস্তি ঘরেরই প্রতিবেশী।

সে অনেকদিনের কথা। নিশানাথের তখন সস্তা বইয়ের ব্যবসা। লোকাল ট্রেনে ফেরি করে—গোর্কি, পুশকিন, গোগল, তলস্তয়, জনরিড, ইভানবুনিন।

ফটকে পায়ে পায়ে ঘোরে। ঝকঝকে ভারি বইগুলো মোছে। নতুন বইয়ের গন্ধে নাক ঘষে। এঘর থেকে বই টেনে ওঘরে নেয়। নিশানাথ মাঝে মধ্যে শতরঞ্চি বিছিয়ে দোকান পাতে, এখানে ওখানে, জনসভার সীমানায়। একা নিশানাথের সঙ্গী ফটকে। কখনও রাতের বিছানায়, কখনও হাতেখড়ি বর্ণবোধ নিয়ে ভোরের দাওয়ায়। ফটকে বড় হয়। একদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সস্তা বইয়ের ব্যবসা। ফট্‌কের আঁশটে শ্যাওলামাখা কচিগন্ধ হারিয়ে গেল শহরে। নিশানাথের বুকে পিঠে ফিরে এল—হাতেখড়ি, বর্ণবোধ, নতুন ধারাপাত। এর মধ্যেই নিশানাথ খোঁজে শ্যাওলামাখা আঁশটে কচিগন্ধ। রিকশা খুব লাফাচ্ছে। হটর-মটর গলিপথ। নেই আলো। কখন যেন বড় রাস্তা হারিয়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছে? নিশানাথের চিন্তা হয়।

—ফটকে ভাল চাসতো নামিয়ে দে।

ফট্‌কে নাটক করে।

—কাকা, অমন করছো কেন, চলোনা, ফুর্তি হবে।

—তোর ফুর্তি করার স্যাঙাৎ আমি?

রিকশা থামল এক সাদা দোতলা বাড়ির সামনে। লোহার গেট। ঢুকে খানিকটা জমি। দোতলায় আলো জ্বলছে। ওখানে কারা আছে? ফটকে তাকে নিয়ে কী করবে?

—কৈ কাকা নামো!

—ফটকে, এই তোর বাড়ি? এখেনে চটি সেরে দিবি? ফটকে খিক খিক করে হাসে নিশানাথের গলায়।

—শালা, আমার চোদ্দ ভাতারের বাড়ি।

নিশানাথ চটিজোড়া হাতে নেমে এল। কী করবে সে? তার কাঁধে, বুকে, পিঠে গুহার মতো অসংখ্য ঝোলা। চটিজোড়া তাদের একটিতে ঢুকিয়ে দিল। খিদের টানে পেট পিঠে ঠেকে গেছে। সারাদিন কিছু খায়নি। নাড়ি পর্যন্ত কুঁই কুঁই করছে। চুড়ির টুং টাং শাড়ির খসখস নেমে দাঁড়ায় রিকশার অন্ধকার থেকে পথের অন্ধকারে।

লজ্জাও নেই। ছিঃ!

এই পথ, গলি, বাড়ি, নিশানাথ বেশ চেনে। এপথেও ফেরি হেঁকে গেছে। এখানকার বাতাসে, দেওয়ালে স্মৃতি হয়ে আছে তার কণ্ঠস্বর।

—হাতেখড়ি, বর্ণবোধ, ধারাপাত, রাশিয়ান পাবলিকেশনের সস্তা বই—গোর্কি, পুশকিন, জনরিড, গোগল, তলস্তয় স্মৃতির কণ্ঠস্বরটুকুই নিশানাথের সহায় সম্বল। রাত কত হল? আজ তো হরতাল ছিল না। জনমানবশূন্য গলি মৃত সাপের মতো পড়ে আছে। আজ কিসের ফুর্তি? বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর।

—ফট্‌কে রাত হয়েছে, বাড়ি নিয়ে চল। মশকরা ভাল লাগছে না। খিদে পেয়েছে। শকুনের ডানার মতো দুহাত বিস্তার করে ফট্‌কে উথলে ওঠে—আহা, কাকা তাই হয়? ফটকের কবলে পড়ে এমন বিপদ হবে নিশানাথ ভাবেনি। সে সহজ সাহসী মানুষ। ট্রেনে হকারি সেরে ঘরে ফিরত রাত করে। কত সাপ-খোপ আপদবিপদের পাশ কাটিয়ে। ফটকে ওদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকত কাকা আসবে। ঘরে হেরিকেন জ্বললেই হাঁক পাড়ত।

—কাকা, কাকা, ভয় করে।

মাঝে দু-তিনটে উঠোন। নিশানাথ আলো হাতে দাঁড়াত।

—আয়, ফটকে ভয় নেই—আয়—।

সুর করে বলত—ফটকে আসে ভয় নেই। অন্ধকারে ভয় নেই। ফটকের ভয় নেই।

চাঁদের আধা আলোয় একটা উদোম বালক ছুটতে ছুটতে এসে জড়িয়ে ধরত নিশানাথের জানুদেশ! শক্তি কমে এলে সাহস কমে যায়। নিশানাথ দুর্বলবোধ করে। ফটকের দিকে তাকিয়ে কেমন দমে যায়। ভয় ভয় করে নিশানাথের।

—ফটকে, না যাস, ছেড়ে দে, চলে যাই।

সাপের ফনার মতো ফটকের কণ্ঠস্বর দুলে ওঠে।

—টাকা, টাকা নেবে না!

অন্য কেউ হলে নিশানাথের সাহস বেড়ে যেত। ফটকে বলেই কেমন অসহায় মনে হয়।

—না বাপ, আমি যাই।

ফটকের ক্রূর হাত নিশানাথের কব্জি চেপে ধরে। আর্তনাদ করে ওঠে নিশানাথ। খিদে, তেষ্টা, অপমানে মাটিতে বসে যায়। নিশানাথের চোখে জঙ্গলের অন্ধকার। এ দুনিয়ায় তার কেউ নেই।

একটু দূরেই জেগে ওঠে শাড়ির তীব্র খসখস। যেন জঙ্গলের মধ্যে আচমকা শব্দ।

চমকে ওঠে ফটকে। চাপা পাথর ঘষার মতো নারী কণ্ঠস্বর—ফটিক ওকে ছেড়ে দাও।

নিশানাথ বিহ্বল হয়।

এইখানে কি থামা উচিৎ! মকশোটা যদি আপনি করতেন? হতাশ হবেন না। আর একটা মোচড় এ-গল্পে অনিবার্য।

পাশে কোথাও শুয়োরের খোঁয়ার। পাশব গন্ধ বাতাসে। ক্ষুধার্ত নিশানাথের নাক ঝাঁঝায়। গাছের ছোপ ছোপ অন্ধকার পড়েছে ফটকের শরীরে। চিতার মৃত পশুর মাংস খুবলে তোলার মতো নিচু হয়ে মদ বের করছে। রিকসার সিটের ভিতর থেকে। ভয়ংকর দেখাচ্ছে। নিশানাথের গা ছমছম করে। খোঁয়ার আর নোংরা নর্দমার পচা গন্ধে, মিষ্টি গন্ধ শাড়ির খসখস ডুবে গেছে। নিশানাথ চাপা পাথর ঘষার কণ্ঠস্বর হাতড়ায়। গলির উল্টোদিক থেকে একজোড়া সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির আবির্ভাব এবং

—কে?

বলে দাঁড়িয়ে গেল।

দেখুন ব্যাপারটা কী ঘটে।

শশব্যস্ত ফটিক সেঁটে গেল পাজামা-পাঞ্জাবির গায়ে। একটু শলা, একটু খ্যাসখেসে হাসি, বোতলে বোতলে ঠোকাঠুকি। ব্যস!

অন্ধকারে গুটিয়ে গিয়ে নিশানাথ একপা দু'পা পিছিয়ে সরে পড়ছিল। প্রায় লাফিয়ে ফটকে থাবা বসিয়ে দিল নিশানাথের ঘাড়ে।

—বললাম যে, ফুর্তি হবে। উপরে চলো, কাকা।

'কাকা' ডাকে জ্বলে ওঠে নিশানাথ। একটা হাত ঘুরিয়ে চেপে ধরে ফটকের হাত। ছিটকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে।

—গায়ে হাত দিবিনে, ফটকে। টাকা দিয়ে দে, চলে যাচ্ছি। বৃদ্ধ নিশানাথ থাবা নড়াতে পারে না। খোলা গেট দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলল ফটকে, সিঁড়ি ভেঙে উপরে। শক্ত হয়ে

গেছে নিশানাথ। কোথায় যাচ্ছে? পাতালে? সিঁড়ির নীচে ইঁদুর কিংবা বেড়াল-পচা গন্ধ। পাজামা-পাঞ্জাবি, শাড়ি কেউ নেই। অন্ধকার।

দেখতে পেল হো-হো হাসির উৎকট দমকে। একটা হা খোলা আলো মুখ-দরজায়। নিয়ন আলোর নীচে বিচিত্র সব হায়েনা। ঝাঁঝাল গন্ধের হাসি হাঙরের দাঁতের মতো ছুটে আসছে ঘরের চেয়ার টেবিল, খাট, বইয়ের আলমারি থেকে। জঙ্গলের বীভৎস চিৎকারে কান দুটো ছেঁকে ধরেছে।

—ও বাবা, শকুন্তলার বদলে এ যে আস্ত শকুন।

—কী চাই বাবা তোমার?

পরিশ্রমী মানুষ ব্যঙ্গ সহ্য করে না। চিৎকার করে ওঠে নিশানাথ—ফটকে টাকা দিয়ে দে, বাড়ি যাবো।

—হো-হো-হি-হি...

কেউ নিশানাথের মুখ চেপে ধরে। সে গোঁ গোঁ করে।

—খি খিদে পেয়েছে।

—খিক-খিক-খিক-খিক

—খিদে পেয়েছে রে।

—এক পেগ মাল খাইয়ে দে।

পরের দৃশ্য আপনাদের জানা। ফটকে নিশানাথকে চিৎ করে শুইয়ে ফেলে। মুখ ফাঁক করে মদ ঢেলে দেয়। কুঁকড়ে যায় নিশানাথ। গলা শুকিয়ে গেছে। বেশ খানিকটা মদ খেয়ে ফেলে।

—ওরে গিলছে রে গিলছে।

ফটকে ছেড়ে দিতেই জল থেকে ওঠা কুকুরের মতো গা মাথা ঝাড়া দেয় নিশানাথ। কুঁই কুঁই করে বলে

—আমার টাকা!

ফটকে নিচু গলায় বলে—দশ টাকা চার আনা।

—টাকা! যাঃ ফোট্। শালা আড্ডাটাই মাটি করে দেবে। দে-দে ছেড়ে দে।

নিশানাথের ঝুলেপড়া ঝোপ ভ্রুর নীচে চোখদুটো কুত কুত করে। লোকটার মুখ সে খুব চেনে। —ঘেউ-করে ডেকে ওঠার মতো নিশানাথের গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল— টাকা।

উগরে এল বমি। দুর্গন্ধময় থকথকে বমি ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মেঝেতে।

বিছানায় একটা বইয়ের উপর মদের বোতল খাড়া ছিল। একজন বোতলটা তুলে নিয়ে বইটা ছুড়ে দিল নিশানাথের মুখে।

—বিচে টাকা লিয়ে লিস্।

একজন হাঁসের পায়ের মতো হাত উঁচু করে হাঁ হাঁ করে ওঠে। একজন শেয়ালের হাঁস ধরার মতো তার হাত চেপে ধরে নামিয়ে আনে।

—ছাড়্ ছাড়্।

—আরে ওটা দুনিয়া কাঁপানো দশদিন।

—ধ্যাত্,

—ফটকে, বিদেয় কর ওটাকে।

শেষের ঘটনা খুব ছোট্ট। প্রায় শব্দহীন। শাড়ির খস খস, মৃদু সুগন্ধ, চুড়ির টুং টাং বৃদ্ধ ফেরিওয়ালাকে তুলে ধরে। শাড়ির আঁচলের পাশ দিয়ে নেমে আসা দুখানা ঝর্নার মতো হাত, ফেরিওয়ালার সর্বাঙ্গে সাজিয়ে দেয় হাতেখড়ি, বর্ণবোধ নতুন-ধারাপাতের কোলাজ। সঙ্গে নতুন একখানা বই। মায়ের মমতায় মুছিয়ে দেয় নিশানাথের সর্বাঙ্গ। একখানা হাত নির্ভয়ে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে। অন্য হাতে একজোড়া ছেঁড়া হাওয়াই চটি। জোড়া পদক্ষেপ ধীরে ধীরে নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে।

টলছে, হ্যাঁ নিশানাথ, সিঁড়িতেই হাঁক তুলল।

—হাতেখড়ি, বর্ণবোধ, নবগণিত ধারাপাত—দুনিয়া কাঁপানো দশদিন।

বইটা একদিন এই বাড়িতে বিক্রি করেছিল নিশানাথ।

ময়নামতীর বাসভূমি

প্রদীপের শিখা উপরে ওঠে। জল নীচে নামে। আশ্চর্য এই প্রশ্ন দুটোর সহজ সন্ধির মুখে একটা ঘোরানো সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে এ গল্পের স্বাদগন্ধ পুরোপুরি পাবেন না। দু'এক ধাপ উপরে উঠে দাঁড়ান, সেখানে প্রদীপের শিখা অনির্বাণ জ্বলে। শীতের শুরুতে এখানে রঙ আলো দুইই নাগালে পাবেন। না হয় নেমে আসুন, যেখানে জলের স্রোত আছে, জলের শব্দ আছে। শব্দপতনের রহস্য আছে। সিদ্ধান্ত আপনার, এ নিয়ে আপাতত কোনো রিসার্চ চলবে না। কোথায় দাঁড়াবেন।

বহরমপুর স্টেশন। রাত দশটা দশের ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ঢুকলো। হুড়মুড়িয়ে নামছে প্যাসেঞ্জার। নামছে তো নামছে। বুবি আর কানি কী করে যে নামে! ভিড়ে বোবা কানা বলে নামতে পারার কোনো কনসেশান নেই। জনস্রোত চলছে, চলতে হবে। এক ধাক্কা। ছিটকে সোজা ভিড়ের বার কূলে। এখানে তত আছাড়িপিছাড়ি নেই।

কিন্তু ওরা হারিয়ে ফেলেছে সঙ্গী ফুনুৎকে। সারাটা দিন সঙ্গে ছিল। সারা সন্ধে। কোথায় গেলো? 'কানি' ওর নাম। আসলে অন্ধ। ও কি খুঁজবে? তাই হুমড়ি খেয়ে পিঠ পেতে দেয়। চক্ষুষ্মান বুবি ওর পিঠে উঠে খোঁজে। কানি যদি পড়ে যাওয়া আধুলির মতো খুঁজছিল তো বুবি খোঁজে স্রোতে ভেসে যাওয়া কুটোর মতো। ফুনুতের আজ হারিয়ে যাওয়ার কোনো কথা ছিল না। ভিড়ের মাথা ছাড়া উঁচু শুটকো ঢ্যাঙা মানুষটা। পাঁচ-কোণা কুড়ি পয়সার মতো মুখ। ফুনুৎ হারিয়ে গেল নাকি?

না, ওই, ওইতো। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে।

যেন পালিয়ে যাচ্ছে।

বুবিতো বোবা। গোঁ গোঁ করে। লাঠির ভিতর দিয়ে কানিকে ইশারা করে, আর কানির চাপাপড়া গলায় ডেকে ওঠার ফাঁকে ফুনুতের মতো লোকটা ভিড়ে মিশে গেল।

কোথায় গেল ও। ও ফুনুৎ নয়। নিশ্চয় অন্য কেউ। ফুনুৎ ওভাবে যাবে কেন? ওর যে আজ মাংস-ভাত খাওয়ার কথা।

বানের জলে চুপসে যাওয়া দুটো কুত্তির মতো হাঁচড়ে কামড়ে ওরা খাড়া হয়। ভিড়ের পাশে ভ্যাকুম খুলে লাঠি খাড়া করে। গা ঘেঁষাঘেষি করে লাঠির নীচে বসে পড়ে। ওরা ভিক্ষুক। লাঠির মাথায় ঝুলে থাকে স্নেহশূন্য একটা আমূল কৌটো। কৌটোটা লাঠির মাথা বরাবর বাঁধা থাকে। কৌটোর তলায় একটা ফুটো। ফুটো দিয়ে টাকাটা সিকিটা

এসে কোলের মধ্যে পড়ে। সকালের আলো, দুনিয়ার অন্ধকার, ফুটো দিয়ে সব দেখা যায়। এতে রাতে কেউ ভিক্ষে দেবে না। যদি ফুনুৎ ফিরে আসে। কিংবা কৌটোর ফুটো দিয়ে যদি ফুনুতের মুখ ভেসে ওঠে। সেই অপেক্ষায় থাকে।

আর যদি দয়া করে কেউ কিছু দিয়ে ফেলে। দাতা ভগবান। তাঁদের কি আর সময় অসময় আছে। যখন দেন, পাছায় খোঁচা মেরেও দেন, ছাপ্পর ফেড়েও দেন। দাতার হাত অনেক লম্বা। তবু সে দাতা। মহানুভব। সে কেন নিচু হবে। ভিক্ষাপাত্র তাই লাঠির মাথায় উঁচু হয়ে থাকে। দয়ার একটু কাছে পৌঁছে যাওয়া অন্তত। কানি গুনগুনিয়ে গাইছিল– বসে আছি পথ চেয়ে / ফাগুনের গান গেয়ে / যত ভাবি ভুলে যাবো / মন মানে না।

গান থামিয়ে কানি বলে–চল্, বুবি, ও আর আসবে না।

ইচ্ছে না থাকলেও লাঠির গায়ে কয়েন বাজিয়ে সাড়া দেয় বুবি। যদি ফুনুৎ আসে।

–ঠক। মানে–ওঠ।

বুবি এভাবেই কথা বলে। ছোট বড় নানারকম কয়েন দিয়ে নানা শব্দে কথা বলে। আনন্দে রাগে গলার মধ্যে শব্দ ভেঙে গুঁড়িয়ে কথা বলে। এখন কিছুই বলল না। ক্লান্ত শ্বাস ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। সে চোখে দেখে। লাঠির সামনের মাথা ধরে। হুইশেল দেয়–কু... উ... উ... উ... ট্রেন ছাড়ে–ঝিক্ ঝিক্... ঝিক্ ... ঝিক্... সে ইনজিন।

ঘরের পথ অনেক দূর। পা ওঠে, কানি ডেরাইভার। গান গেয়ে ট্রেন চালায়। এক কলি গেয়ে ওঠে।

–মন চলো নিজ নিকেতনে, পিতার ভবনে অমৃত সদনে, চলো যাই।

স্টেশন ফাঁকা। ধু-ধু। একটু পরেই রাত উজান নামবে। ভ্যাকুম জোড়া লাগে। মানে, কানি লাঠির শেষ মাথা চেপে ধরে। টিশান থেকে ওদের টেরেন স্টাট নেয়। ঘণ্টা বাজে না। বাঁশিও না। বেশ শীত শীত লাগছে। কানি গানখানা জোর করে গলায় চেপে ধরে।

–মন চলো নিজ নিকেতনে ...

বুবি আস্তে আস্তে স্টার্ট নেয়। ইনজিন আর ড্রাইভার। মাঝখানে ভ্যাকুম, লাঠি। ট্রেন সর্বদা ছোটে না। ইনজিনের আজ মনখারাপ। ট্রেন দুলকি চালে হাঁটে। পথের ধারে মানুষেরা আগুন পোহায়। উদ্বাস্তুদের আগুন। পাশে পমেটম (প্রমোটার) বাবু, কেন? এতরাতে কিসের হাত পা শেঁকা, এখেনে! ওর পোষা বিশাল মদ্দা কুকুরটা একটা রাস্তার মাদি কুত্তির পিছনে লেগেছে। আদিখ্যেতা হচ্ছে। মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁসলাচ্ছে।

বুবির নিশ্বাস পড়ে গাল দিয়ে–হাঃ।

আগুনের আলো পড়েছে উদ্বাস্তুদের মুখে। বুক অন্ধকার। পিঠ ঠান্ডা। মাদি কুত্তিটা

বুবিকানির পায়ের কাছে এসে খুনসুটি করে, লুটোপুটি খায়। আবার পালিয়ে যায়। যেন ওদের ডাকে। বুবি-কানি থামে না। ট্রেন যেখেনে সেখেন কি দাঁড়ায়?

ইনজিন চাপা হুইশেল দেয়। কুঁ... উ... উ... ফোঁ... স... ফোঁ... স্... স্...

মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। –খ্যা... স... খ্যাস্... স্... খ্য...্য... ্য...াস্... স্...

ব্রেক কষার আগে ইনজিনে এরকম শব্দ হয়।

কানি জিজ্ঞেস করে–কীরে, তেল কয়লা সব আছে, তো বেরেক কষবি কেন?

বুবি কাঁদছে। একা। ইনজিনের চোখে জল।

–অন্ধকারে কানি বলে–ফুনুতের সঙ্গে আজ দেখা না হলেই ভাল হয়।

এই কষ্টটা বুবি কী করে বোঝাবে? কানির তো যৌবন নেই। শুকিয়ে গেছে। বাংলাদেশে রাজাকারদের অত্যাচারে। স্বাধীনতার যুদ্ধে কানির যৌবন শহিদ হয়ে গেছে।

এ অন্য ভাষা। নতুন ভাষা। লাঠিতে কয়েন, আধুলি, সিকি, আমূলকৌটো কোন কিছু ঠুকেই বুবি বোঝাতে পারে না।

ইনজিন চলে না। ডেরাইভার লাঠি দিয়ে ঠেলা মারে–চল্... চল্... স্টাট নে। মনে হয়, ইনজিন খারাপ হয়ে গেছে। ট্রেন আস্তে আস্তে চলে।

তখন ভোর। সবে আলো ফুটছে।

বুবি হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে পা ধোয়। ফুনুৎ দেখে। কানি টিউবওয়েল চাপে। জল পড়ে। কেউ নেই দেখে, ফুনুৎ হঠাৎ বুবির পায়ে হাত দিয়ে পা ভর্তি পচা কাদা, দুর্গন্ধময় পাঁক ধুতে শুরু করে।

বুবি হাসে–খিক্ খিক্...। হাসে–খিক্... খিক্...।

কানি জিজ্ঞেস করে–কী হলো?

বুবি 'ফুনুৎ' বলতে পারে না। হাসে। বলে–ফুনু। ধোয়। ফুনু। ধোয়, কানি অন্ধ। কিছু দেখে না।

আবারও কেউ নেই দেখে, ধোয়া অর্ধেক রেখে, বুবির ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে দেয়। বুবির ঠোঁট ছোঁয়া আঙুল নিজের ঠোঁটে চাপিয়ে গলে পড়ে বুবির পায়ের কাছে। বুবির ভোরের শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে। নতুন শীত। খেজুরগাছের মত শরীরে রস উথলে ওঠে। বুবি আড়চোখে কানিকে দেখে। হাসে না। চোখদুটো মটকায়, ছটকায়, একবার চারপাশে দেখে। একেবারে ফুনুতের চোখে চোখ রাখে সোজাসুজি। উঁচু বড়ো দাঁত বের করে। ফুনুৎ কান পর্যন্ত হাসে। হাসিখানা একাদশীর চাঁদের মতো।

ফুলের কুঁড়ির মতো দিন ফুটেছে। লজ্জায় রাঙামুখ বুবি, নিচু হয়।

ফুনুতের হাত সরিয়ে দেয় ঠেলে।

—যাঃ। ইশারায় বলে—ভাগ।

বুবির গাল টিপে থুতনি ধরে আদর করার ছলে ফুনুৎ বুবির বুক ছুঁয়ে দেয়। আদরে একটু চাপ দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক চোরের মতো। পায়ে কোন শব্দ হল না। কানি চিৎকার করে ওঠে—কে? কে?

বুবি হি-হি করে হাসে, —ফুনু। ফুনু। ভাগ। ভাগ।

বুবি যত্ন করে পা ধোয়। ফর্সা পেলব সুঠাম পা। বুবি ধোয়। নিজের পা নিজে আদর করে। এইখানে হাত রেখেছিল ফুনু। আরামে চোখ বন্ধ করে। পাঁক ধোয় আর একটু একটু করে যৌবন ফুটে ওঠে।

বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে পচা-গলা মোষের মত মস্ত একটা নর্দমা। পার হয়, একটা কাঠের গুঁড়ি বেয়ে।

নর্দমায় জল বাড়ছে। দেখতে গিয়ে পা হড়কে বুবি আজ—ইয়া, আল্লা! নর্দমার পাঁক-মাখামাখি।

এ সেই পা। বুবি, কাপড় তুলেছে অনেক উপরে। হাঁটুর উপর সবুজ শ্যাওলা ঘেরা বর্ডার। নিচে ঘোর কালো নোংরা সরের আস্তরণ যেন মোজা পরেছে। আরো নিচে পায়ের পাতা ঘিরে কালো পাঁকের জুতো। পাকিস্তানি খান ঘরানার উৎখেতে কপাল-পোড়া মাগি। ওর বাহুতে মোষের মতো শক্তি। কাঠের গুঁড়ি আঁকড়ে নেহাৎ জীবন ফিরে পেয়েছে। প্যাঙলা ফুনুৎ পড়লে নির্ঘাত তলিয়ে যেত। ওর নাম মহিষ-মারা ড্রেন।

ভোরের পাপড়ি রোদ্দুর এসে পড়েছে কলপাড়ে। দিনটা ঝকঝকে। খুব সুন্দর। শরীরটা চনমন লাগছে। হাল্কা হাল্কা। ট্রেনের ধোঁয়ার মতো উড়ে যেতে পারে বুবি।

কানির শরীর বিরস কাঠ। সে বিরক্ত হয়—বলে—চল্ চল্।

ইনজিন আর ডেরাইভার।

ইনজিন হুইসেল ছাড়ে—কু... উ... উ...

বুবি ভাবে হুইসেলটা আজ ওরই মত হাল্কা। যেন ফুনুতের মতো হারিয়ে যাবে, কোথাও।

—কু... উ... উ... ঝিক্ ঝিক্... ঝিক্ ঝিক্... মতি আর ময়না... দেরি আর সয় না... মতি আর ময়না... দেরি আর সয় না... ঝিক্ ঝিক্... ঝিক্ ঝিক্...

সামনে, পমেটম (প্রমোটার) বাবুর হলুদ বাড়ি।

ময়না হিঁদু, মতি মুসলমান।

মতি বলে—আললা

ময়না বলে—ভগমান

ময়নামতি বলে—বাবু-দুটো ভিক্ষে দ্যান।

হলুদ বাড়ির দোতলা থেকে রূপালি কয়েন ঘুরতে ঘুরতে নামে আশীর্বাদের মতো। আনকোরা কয়েন রোদ্দুরে পাক খায়। আনকোরা রোদ্দুর কয়েনে পাক খায়। পমেটম বাবুর হলুদ বাড়ি ওদের পয়মন্ত। রোজ ওরা এখান থেকে সাইত করে।

ডেরাইভার বলে—চল চল। হুইসেল বাজা। বেলা বহে যায়।

এককলি গেয়ে ওঠে—বেলা বহে যায়। ছোট্ট মোদের পানসি তরী। সঙ্গে কে কে যাবি আয়।

—কু-উ-উ-উ .... ঝিক ঝিক ... ঝিক ঝিক ... ঝিক্ ঝিক্ .... ঝাঁ।

এবার টিশান-ফট্‌কের চা।

ওরা বেঞ্চিতে আরাম করে বসে। কুসুম রোদে পিঠ দিয়ে একখানা কুটকুটে কম্বল দু'আধখানা করে দুজনে ফুটি ফুটি রোদ্দুরে শীতের সম্বল, ভাল করে জড়িয়ে নেয়।

ময়না বলে—দে ফটকে দেরি করিসনে।

গুন গুন করে গায় : বেলা বহে যায় ...

চাইতে হয় না। দুটো চা দু'জোড়া বিস্কুট ওদের বাঁধা।

মতি হাত বাড়িয়ে তর্জনী উঁচু করে বাধা দেয়।

—হে ... হে .... ফট্ ... উঁ ... উঁ ... না না ... উঁ ... উঁ ... উঁ ... হু।

মানে আজ রুটি ঘুগনি চা।

গরম ঘুগনি। ধোঁয়া ওড়ে। কী সুন্দর, আঃ! পিঠে রোদ্দুর, ওম। গরম সেঁকা পাঁউরুটির ঘিয়ে ভাজা মাথা। কী স্বাদ! কী ভাল্লাগে। ছন্দে দুলে দুলে খেতে বড় ভালো লাগে। যেন রাতে ময়নার বুক পেট কোলের মধ্যে জড়াজড়ি করে শুয়ে কি গরম। বুবির হাত ফসকে লাঠি গড়িয়ে যায়। ময়না লাঠি সামলায়। মতি খায়। একটু পরেই গরম চা। কি মিষ্টি, আঃ!

ময়না গম্ভীর ভাবে বলে—ফটকে আমার চায়ে একটু চিনি বেশি দিস। ডাক্তার বলেছে আমার সুগার কম।

মতি খাওয়ার সময় শব্দ করে—হাম হাম ... হাম হাম ...
—আমি খাচ্ছি চা বিস্কুট, শালি ভিখিরি খাচ্ছে রুটি ঘুগনি।
দোকানের ভিতর থেকে ফুনুৎ বলে ওঠে।
গালে ঠাসা রুটি ঘুগনি নিয়ে বুবি ঠেলতে থাকে কানিকে।

কানি রা-রা করে ওঠে—পয়সা দিয়ে খাই। তোর মতো মাগনা নাকি?

ফুনুৎ জিজ্ঞেস করে—ভিখ মাঙতে বসিস কোথায়?

—বাটার মোড়ে। তোর কী?

—বসিস্ বেশ করিস, রোজ সকালে আমার চা-বিস্কুটের পয়সা দিয়ে যাবি। ওটা আমার এলাকা।

কানি ভেংচিয়ে চিৎকার করলে—আমার চা-বিস্কুটের পয়সা দিয়ে যাবি। ওটা আমার এলাকা!

গলায় আঙুল দিয়ে চীৎকার করলে যেমন শব্দ বেরোয় প্রায় ওরকম আওয়াজে গুঙিয়ে ওঠে বুবি—যা-যা ফো-ফো ট।

কানি প্রায় বুবির গোঙানির ঘাড়ে কথা চাপিয়ে দেয়।

—দাদাগিরি? অন্য ঘাটে যা ফুনুৎ

ফুনুৎ হাসে। বলে টেরেনের লাইন ধরে দেব। কী দিবি?

ব্যস! বুবি কাত। সে কানির গা টেপে। অনেক টিপ চান্স নিয়েও ট্রেন লাইনে ওরা ঢুকতে পারেনি।

একজন অন্ধ একজন বোবা।

একজন গায় একজন মুখে তাল দেয়। ঠোঁটে ঠোঁট বাজিয়ে প্রায় খোলের মতো শব্দ করে।

একজন হিন্দু অন্যজন মুছলমান।
একজন ময়না অন্যজন মতি
একজন চিমড়ে যাওয়া মায়ের মতো
অন্যজন টানটান যুবতি।

টেরেনের তাবৎ কয়েনে ওরা তখন রাজত্ব করে। অন্য ভিখিরিদের পেটে টান। ওরা বলেছে টিশানে দেখলেই লাইনে ফেলে দেবে।

শালোদের বাপের লাইন!
কানি জিজ্ঞেস করে—কী নিবি?

ফুনুৎ গম্ভীর হয়। চোখে আর ঠোঁটে একটা লোভী হাসির ভাব জুলজুল করে ঝোলে। বুবির চোখদুটো চকচক করে। বুকের ভিতরটা চুমকুরি দিয়ে ওঠে।

ফুনুৎ বলে—এক রাত মাংস-ভাত খাওয়াবি।
খ্যাক খ্যাক শব্দে হেসে ওঠে।

মাংস খাওয়ানোর মানে ফুনুৎও বোঝে। বুবিও বোঝে। বুবির কাঁচা মাংস খেতে চায়।

কানি রোওয়াব মেরে বলে—যা যা শ্লা, মায়ের দুধ খেগে যা। মাংস-ভাত দেকিচিস চোখে?

খাওয়ার টেবিলে দাঁড়ানো মুরগির মতো ডেকে ওঠে বুবি। কানির গা টেপে। সোনার খনি টেরেনের লাইনটা ওদের দরকার। বাটার মোড় শুকিয়ে আসছে। অনেক ভিখিরি জুটে গেছে।

কানির কোঁকে কোৎকা মারে বুবি। কানি কাত হয়। দাঁত মুখ চেপে খিঁচিয়ে ওঠে—মাগির নোলা কতো? রেতের বেলা মাংস খাবে। চল্ চল্ বাটার মোড়ে। যা জুটবে তাই খাবি। টেরেন মাড়াতি হবে না।

বুবি পা দিয়ে খালি ঘুগনির প্লেটে লাথি মারে। ভেঙে দেয়। পা দাপায়। হাত ছোঁড়ে। মুখ ভ্যাঙচায়। অশ্লীল ইঙ্গিত করে— যেন বলে,

—আর ঘুগনি মারাতি হবে না। অনেক খেয়েচিস্। এবার চা-ও জুটবে না।

কানি ফিক করে হেসে গান ধরে—মরণদশা ধরল যখন / মরল ভালোবেসে / একটু বেশি রাতে...

—কু... উ... উ... ঝিক্ ঝিক্... ঝিক্ ঝিক্... ঝিক্ ঝিক্...

টেরেন এবার সত্যি সত্যি টিশানের দিকে চলেছে। কানির কষ্ট হয়। কত কালের বাটার মোড়। সত্যি সত্যি তো শুকিয়ে যায়নি। ছেড়ে তুই চললি কোথায় বুবি। বুবির মুখের দিকে চেয়ে থাকে কানি। মুখে কিছু বলতে পারে না। শহরে ভিখিরির যা বাড়-বাড়ন্ত, বাটার মোড়ে আজ অন্য কেউ বসে যাবে। তিন মাথার মোড়। শহরে ঢোকার মুখ। অফিস, আদালত, হাট-বাজার সব এই পথে। জায়গাটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

দাতা মহানুভব। সর্বজনে করুণা তার। তিনি দেখতেও চাইবেন না, বাটার মোড়ে কখন কৌটো বদল হয়ে গেছে। অনেক লম্বা তার হাত। বাটার মোড়ে যেমন তার হাত বেয়ে সিকি, আধুলি কয়েন ঝরে পড়ে ঠিক তখন যেন টেরেন লাইনেও তাঁর করুণা ঝরে পড়ে।

ভগমান থাকেন অনেক উঁচুতে। চোখ নেই তাই করুণা পাওয়ার আশায় কানি মুখ উঁচু করে দেখে। শহর কত উঁচু। দুই, তিন, চার—তলার পর তলা। বুঝি আকাশ ছুঁয়ে গেছে। ভগমান ওইখানে থাকেন। নাকি আরো উঁচুতে। কানি জানে না। কানি তো আসলে অন্ধ। বুবির কাছে শুনেছে, ভাবে। অভ্যাসবশত ঘাড় কাঁধে ফেলে রাখে। ক্লান্ত হলে নামিয়ে নেয়।

ওরা থাকে ভগমানের পায়ের কাছে। অনেক নীচে। পাতালে। ভগমানের হাতও এখেনে নামে না। নামে চরণামৃত। শিশ্নামৃত। ভগমানের রান্নাঘরের জলখাবার থালার কাছে এসে জমে থাকে। বাথরুম পায়খানার জল এসে বিছানায় উঠে পড়তে চায়। ওরা যে নিচু বস্তিতে থাকে। লোকে বলে ধুকড়ির মাঠ। এখানে ভগমানের জল জমে জমে জোয়ার অসে। শহরের উঁচুতে যখন মচ্ছব হয়। খানাপিনা চলে। জল-পানি

বেশি খরচ হয়। বোতল, গেলাশ, উপচে পড়ে জলে তখন মাতন আসে। তখন দুর্গন্ধে মাতাল করা নেশা হয় এখানে। তখন বুবি-কানিরা জেগে থাকে। ভগমানের উপাসনা করে, করুণা ভিক্ষা করে।

বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে দেখে এসেছে মহিষমারা ড্রেনে জল বাড়ছে। যেখেনে বুবি পড়ে গেছিল, পার হওয়ার গুড়িটা তখন ডুবে গেছে। ড্রেনের জল ঘরে ঢুকি ঢুকি। রাতের অন্ধকারে গুড়ি মেরে মহিষমারা ড্রেন পার হওয়া—ভয় করে। কানি বলে—

—তাড়াতাড়ি চল্, বুবি তাড়াতাড়ি চল্।

বুবির পা উঠছে না। শরীর ভারি লাগছে। রাত বাড়ছে। জল বাড়ছে। কানি তাড়া দেয়— চল্ বুবি চল। আর ক'পা। এসে গেছি, গিয়ে চাট্টি খেয়েই ঘুম। দেখবি রাতের সাথে মনও, ফর্সা হয়ে যাবে।

বুবি গোঁ গোঁ করে। যেন ইনজিনে কোথাও কিছু বিগড়ে গেছে। শালা হারামি ফুনুৎ সারাটা দিন নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়ালো।

কানি শ্বাস ফেলে বলে—ও আমাদের ফুঁসলে নিয়ে গেছে, বুঝলি বুবি। বাটার মোড়টা দখল নিয়ে নিল। অন্য ভিখিরি বসিয়ে ব্যবসা ফাঁদবে। খুব ভুল হয়ে গেছে বুবি। খুব ভুল হয়ে গেছে।

বাতাসে ড্রেনের পচা দুর্গন্ধ নাকে মুখে চেপে বসছে। টেরেন থেমে গেছে। কানির বুক কেঁপে ওঠে।

বলে— তাড়াতাড়ি চ বুবি।

টেরেন আর যাবে না। অন্ধকার যেন মহিষমারা খালের পচা পাঁক। ওদের জড়িয়ে ধরছে। এইখানে অনেক নিচুতে ওদের বাস। কোথায় ওদের ঘর? বুবিও বুঝি অন্ধ হয়ে গেছে। নিজের ঘর খুঁজে পাচ্ছে না। মহিষমারা খালের বিশাল চওড়া মুখ। একপাশ বন্ধ করে ওদের বস্তি। অন্য পাশে আল্লা-ভগমানেরা। খালের মুখে কানি বুবিদের পাশটুকু কেউ খুলে দিয়েছে। যত দূর চোখ যায় শুধু আলকাতরার মত জল। হলুদ দোতলা থেকে ঝরে পড়া অজস্র কয়েনের মতো চাঁদের কিরণ খেলা করে বিস্তীর্ণ নিচু বস্তির ডুব জলে। দূরে আধডোবা আট দশখানা দর্মার বেড়া দেওয়া ঘর। বুবি, কানি আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। ওরা দুমড়ে মুচড়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ভ্যাকুম খুলে লাঠিখানা গড়িয়ে যায় মহিষমারার জলে। বিলের তীরে ময়নামতি হাহাকার করে ওঠে।

—ভগমান আমাদের ঘুমুবার জায়গাটুকু কেড়ে নিও না।

—আল্লা আমাদের বসার জায়গা থেকে তোমার আশীর্বাদও তুলে নিলে!

—হাঃ আল্লামান!

বুড়ির হত্যারহস্য

সূত্রধর

পুরোনো গোয়েন্দাকাহিনিকে সরিয়ে রাখি। আসুন অন্যচোখে বিষয়টি দেখি। বর্ষাকাল এসে গেছে। যারা লাট-বেলাটদের খুন লেখেন আর বাপের অঢেল থাকলে ডিটেকটিভ তৈরি করেন, তাদের ছুটি দিই। যথার্থ হত্যাকাণ্ড আর প্রকৃত রহস্যের পক্ষপাতিত্ব করি।

অমাবস্যার রাত। না, পুরোনো জমিদার বাড়ি নয়। বস্তি এলাকা। পিচ অন্ধকার। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। একডাকের দূরত্বে কবরখানা। যত কবর তারও বেশি মৃত্যুর গল্প এখানে। ঝড়ো বাতাস। হো-হো শব্দ। উথালিপাথালি করছে গাছপালা। বাঁশঝাড় পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে কট কট আওয়াজ।

ছড়ান কবর। ফাঁকে ফাঁকে গলিপথ। কাদা প্যাচপ্যাচ পিছল। খুনিরা চারজন। একটা জ্যান্ত বাঁশ আড় হয়ে শুয়ে আছে। সব মুখোশ আঁটা। গায়ে বর্ষাতি। মাথায় টুপি। পায়ে গামবুট। পেনসিল টর্চের সড়কি আলোয় ডিঙিয়ে গেল বাঁশখানা। যাকে খুন করা হবে, ভিজে চুপসে গেছে। মুখ বাঁধা। হাত পিছমোড়া। হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে। আড় বাঁশে বেঁধে পা দুখানার ছাল-মাংস ছিঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। চেনা গেল না কাউকেই। কেনই বা যাবে? পড়ুয়ারা, যাদের হাতে এই হত্যা-রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা কাদের খুঁজে বের করবেন?

এখানে যে কোনো হত্যাকাণ্ডের চেয়ে বেশি অন্ধকার। আসুন, কান পাতি। ভেদ করি, ঝড়ের সাঁ-সাঁ শব্দ। বাঁশঝাড়ে পাকানো কটকট। ঝমঝম বৃষ্টি। কবরখানা ফাটিয়ে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উত্থিত হলো। হ্যাঁ, একটা মানুষের আর্ত-চিৎকার লোকালয়ের দিকে ছুটে গেল আকুল ঝড়ে।

গল্পের শেষে, ইন্টারোগেশনে জেনে নেবো, রাত তখন কত? কারা কারা চিৎকার শুনেছেন? আর্তনাদ না উল্লাস! সমাধিফলকে গামবুটের দাগ পড়ে বুঝে নেবো আততায়ী কোথা থেকে এসেছিল, কোন দিকে গেছে। এ সবই টিকটিকি কাহিনির পুরোনো ছক।

আমাদের গল্পে সারারাত বৃষ্টি থামেনি। পথেপ্রান্তরে গামবুটের কালো দাগ ধুয়েমুছে

গেল। এক দশাসই নেড়িকুত্তা এসেছিল মাঝরাতে। অন্ধকারে, ঝড়-বৃষ্টি মাথায়। এক সমাধির পাশে উবু হয়ে, গলা উঁচু করে দীর্ঘকাল কেঁদেছিল। বৃষ্টিপাত আর সোঁ সোঁ বাতাস করুণ কান্নায় ভরে দিয়েছিল গোটা কবরখানা। অন্ধকারে কুকুরের চোখ জ্বলে। মানুষের কাটা টুকরোগুলো গুনে নিতে অসুবিধা হয়নি। অবশিষ্ট শোকের মতো বৃষ্টি যখন ঝরছিল। নেড়িকুত্তা একখানা কাটা হাত মুখে বয়ে নিয়ে এল বস্তির ভিতরে। একেবারে শেষ ঝুপড়িতে।

ঝুপড়িটায় থাকে এক ঝগড়ুটে বুড়ি। তার ডাকসাইটে ছেলে। দশাসই নেড়িকুত্তাটা। বুড়ি শুয়ে আছে বাঁশের মাচায়। ঘর অন্ধকার। তেল বাড়ন্ত। কুপি জ্বলছে না। চাল বাড়ন্ত। দু-মুঠো আধসিদ্ধ চাল চিবিয়েছে। গেলাস গেলাস জল। খোকা নেই। মন খারাপ। বিকট বৃষ্টি নেমেছে। কামারশালে জল, চুল্লি জলের নীচে। মাচার উপর পেটে গামছা বেঁধে বুড়ি শুয়ে আছে। ঘরের ঝাঁপ খোলা। খোকা আসবে। নেড়ি কাটা হাতখানা মাচার নীচে রেখে, করুণ সুরে চিকরিয়ে উঠল। বুড়ি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

–আঃ জ্বালা! মরা ভাগাড়টা চুলোয় এসে জুটলো।

—নেড়ি ককিয়ে উঠলো।

–ছেই, ছেই, দূর হ।

নেড়ি কাটা হাতখানা মুখে নিয়ে, লাফ মেরে দু'বার মাচায় ওঠার চেষ্টা করে পড়ে গেল। কুপির খালি পেটের মতো অন্ধকার। বুড়ি বুঝল, নেড়ির লেগেছে। মাচার নীচে পড়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। চোখ খোলা রেখে যে অন্ধকার চোখ বুঁজেও সেই অন্ধকার। বুড়ি শুয়ে গেল চোখ বন্ধ করে।

সূত্র-এক

কবে ফিরবে খোকা! ভ-জা। ভ-জা মানে ভগবান জানে। কথাটা বস্তি এলাকায় খুব চলছে। চালু করেছে খোকা-ই। বুড়ি শুনেছে–কামারশালের আড্ডায়। আড্ডা বসে সাঁঝ পেরিয়ে। কাজকাম সারা হয়। নাওয়া-নাস্তা হয়। মানুষ আড্ডায় বসে। কিছুকাল রোজই বসছে। আড্ডা পেতেছিল খোকার বাপ। বলেছিল–দিনকে দিন হা-ভাত বাড়ছে। পাহাড়পর্বত দিন ঠেলে মানুষ কূল-কিনারা পাচ্ছে না। আড্ডা থাকবে না। ভেঙে যাবে।

তখন গল্পগুজব হতো। হাসি-ঠাট্টা চলতো। বুড়িও বসতো আড্ডায়। খাটা-খাটনি শেষে মানুষ তাজা হতে আসতো। এক পুরুষের বস্তি। আজ বলে-তুলে দেবে। এখন নিত্যনতুন মানুষ আসে জ্বালায়। দিন দিন মানুষ বাড়ছে। ষাট-সত্তর ঘর মানুষ কোথায় যাবে? ঘর ভেঙে রাস্তা বসবে। শহর সাজবে। বাবুদের ঘর ভর্তি আলো হবে।

হাসি-খুশি ঘরকরনা! আর এতগুলো মানুষ উচ্ছিষ্ট!

–রেশনকার্ড আছে, ভোটার লিস্টে নাম আছে, আমাদের কোন রাইট নেই? তাজ্জব?

–শোন, হাইওয়ের স্বদেশ দালাল, ঝুলবারান্দার ইজিচেয়ার পেতে বসে আছে সকাল থেকে। এস.ডি.ও, ও.সি বুলডোজার নিয়ে বাড়ির চারপাশে ঘুর ঘুর করছে। স্বদেশ দালালের উকিল গেছে ইনজাংশান আনতে। আমরা তো ছারপোকা।

–ভৈরব দত্ত দেখলাম সাইকেলে মাল এঁটে হাটে যাচ্ছে।

–হি-হি-হি, অতবড় দোকানটাকে বুলডোজার এক থাপ্পড়ে পুঁটুলি বানিয়ে ছেড়েছে।

খোকা ধমক দেয়–ছিঃ, হাসির কী হলো? আড্ডা গম্ভীর হয়।

–আমাদের কী হবে?

–ভ-জা।

বলে খোকা নিজেই হেসে ওঠে।

হাপরের গনগনে আঁচেও মুখগুলো কালিবরণ। হই-চই না হলে বুড়ির ভাললাগে না। কামারশালের মুখে ভারিক্কি বকুলগাছ। বাপের হাতে পোঁতা।

বাবলাগাছের গুঁড়ি ছড়ানো। মানুষ বসে। রাত বাড়ে। মানুষ বাড়ে। বুড়ির মনে হয়, কমিশনার সাহেবের বাড়ি মিটিং বসেছে। হাপরের আগুনে বসে খোকা যখন বাপের আধমনি হাতুড়ি তোলে, বুড়ির চোখ জুড়িয়ে যায়। খোকা কত বড় হয়েছে। বকুল গাছের মত চেহারা। হাতুড়ির মত শক্তি। হাপরের মত বুকের ছাতি। নেড়িও দিন দিন তাগড়াই হচ্ছে। যেইসা হুজুর ওইসা মজুর।

তার আর কেউ নেই। খোকাই তার বাপ। খোকাই তার মা। গোটা বস্তির মা-বাপ। খোকাদা, খোকাদা বলতে অজ্ঞান।

সেবার ঝড়ে চাল উড়ে গেল। গোটা বস্তি হাঁ-খোলা। খোকা একাই বাইশখানা ঘরের মটকা মেরে দিল। চাল ছাইতে অনেকেই পারে। মটকা? কি টালি, কি খড়, পিচের ড্রাম কাটা সিট–সব রকম চালের মটকা এক খোকাই মারতে পারে। নেড়ি তখন কচি। অষ্ট-প্রহর খোকার কাঁধে। হাইওয়ে থেকে নেড়ির মুখ দেখা গেলে, মানুষ জানতো–খোকা চালের মটকা ছাইছে। বাঁশের বাতা দিয়ে চালের ফ্রেম বাঁধতে হবে, সেও খোকা।

অতবড় বিপদের দিনে কোনো মামুর টিকি দেখা যায়নি। চেয়ারম্যান, এম.এল.এ কেউ না। কমিশনার সাহেব একদিন এসেছিল। একদলা শুকনো লেকচার আর একটা রুপোর

পিকদানি ফেলে—সেই গেল আর এল না। একবার চেয়ারম্যান এসেছিলেন। ভদ্রলোক। স্কুল মাস্টার। লেবার কার্ড নিয়ে খোকার সাথে কথা কাটাকাটি হল। খুব ঝামেলা সেবার। আসার মুখ নেই। পাড়ার সবাই বুঝে গেছে। কোনো মহাজন নেই। যেটুকু করবে, আমার খোকা। বাপ বলেছিল—দেখো, খোকা আমাদের খুব বড় হবে।

সে বাড়ি নেই। খুব মনে পড়ছে। পাড়া জুড়ে বলাকওয়া চলছে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গাঁ সুদ্ধ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বস্তির পাখিটাও বলছে—খোকা কৈ? নেড়ি মাচার নীচে কেঁউ কেঁউ করে উঠল। বুড়ি শুয়েই থাকলো। সারাদিন খেতে দেয়নি। হয়ত, জোটেওনি। জলে জলাকার। কোথায়ই বা জুটবে। মাচার নীচে খুটখাট করতে করতে নেড়ি আবার ছুটে বেরিয়ে গেল।

পেটের মধ্যে একটা চিনচিনে ব্যথা ঠেলে ঠেলে বুকে উঠছে।

সূত্র-দুই

খোকা গেছে পরশুদিন। সকালে, রবীন—ভাইসব, বন্ধুসব বলে বক্তৃতা ফাটালো। কেউ শোনেনি। খোকা বক্তৃতা দিতে পারে না।

—হেই। বলে হাঁক পাড়তেই মেয়ে, মরদরা এসে দেওয়াল গেঁথে দাঁড়াল। পুলিশের নাক ভোঁতা। ওসি আর খোকা। মাঝখানে রবীন। পুলিশ এসেছে বস্তি ভাঙার নোটিশ দিতে। মামার বাড়ি! কুড়িজন ল্যাকপেকে পুলিশ। এদিকে শতখানেক জোয়ান-মদ্দ। ওসির ডোন্ট কেয়ার গোঁফ একসকিউজ মি হয়ে গেল। হাতের নোটিশ হাতে নিয়ে মানে মানে সরে পড়ল।

খোকাকে কাঁধে তুলে মানুষের মাতামাতি। নেড়িও দুপায়ে নেচে নেচে বেড়িয়েছে।

—হু। বলে রবীন গম্ভীর।

মাতামাতি খোকার পছন্দ নয়। দুহাতে মুখ ঢেকে বকুলতলায় বসেছিল। নেড়ি পায়ের কাছে। লেজও নড়ছিল না। রবীন হাত-পা নেড়ে জনে জনে বোঝাচ্ছে। এম.এল.এ বলে কথা। এবারের মতো বস্তি বাঁচালো খোকা, পাড়ার মানুষ। আর রবীন নিজের ঢোল পেটাচ্ছে। খোকা না থাকলে এম.এল.এ হওয়া ঘুচে যেত। অসহ্য।

বুড়ি বলেছিল—হেই বাবা রবীন, তো অনেক করেছো, চাড্ডি খেয়ে বাড়ি যাও।

বুড়ি বোঝে—কিসে আর কিসে। কোথায় এম.এল.এ কোথায় খোকা। ষাট-সত্তর ঘর ভোটে কেউ এম.এল.এ হয় না। অনাচারও চোখে সহ্য হয় না। তিনশ ভোটই বা কম কিসে?

রবীন ছেঁচেই বসে সেদ্ধ-শুকনো দিয়ে খেয়েছিল। বুড়ি পাতার বাতাস দিতে দিতে

বলেছিল—

—পুলিশ এলে আবার এসো বাবা রবীন, ভুলে যেও না।

রবীন যাওয়ার সময় খোকাকে বলল—একটু সাবধানে থেকো। অত বোল্ডলি অপোজ করা উচিৎ হয়নি। আজ হোক, কাল হোক, বস্তি তুলে দেবেই। যে ক'দিন ঠেকিয়ে রাখা যায়। বিপদ হলে খবর দিও। মাসিমাকে কথা দিয়েছি।

নেড়ির মাথায় হাত বুলিয়ে রবীন চলে গেল। খোকা বসে ছিল। ওঠেনি। নেড়িও।

সূত্র-তিন

ঘুম নেই। ঘুম নেই। বৃষ্টি ঝরছে। কচি কদমগাছটা আকুলিবিকুলি করছে হাওয়ায়। কান্নার মতো ফুলগুলো ঝরে ঝরে একশা উঠোনে। পেটে বাতাস পাক মেরে মেরে উঠছে। বুকে চাপ। নিশ্বাস নিতে কষ্ট। খুট খাট্-কুঁই কুঁই—

কুকুরটারও নিদ নেই। ছেঁচা বাঁশ। দরমার বেড়া ভেঙে ঘরগুলোতে জল ঢুকছে। কত ঘরের চাল খসে গেল, কে জানে? খোকাকে আবার চালে চালে ঘুরতে হবে। ফি বছর একই হাল।

পরশুদিনও ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর। চাঁদিফাটা রোদ্দুর। বুড়ির সই 'চোখের বালি'র হাতনে থেকে নেমেছে। চোখ-মুখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ঘোমটায় মুখ ঢেকে হাঁটা ধরেছে—

—মাসিমা, ও মাসিমা।

—কোন্ মুখপোড়া?

দুজন ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক। বুড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে বলে—

—অ, বিশা, তা কী মনে করে বাবা। ভোট-ফোটতো নেই।

বিশা হাসে।

—কেন, আসতে নেই?

—তা, সঙ্গে ওটি কে?

—রহমত, নাম শোননি।

—কত রহমত শুনেছি, কোন রহমত?

বিশাল চেহারার রহমত, দাড়ি গোঁফের ফাঁকে হাসে।

সোনার দাঁত দেখা যায়।

—তা মোছলমান বলে দাড়ি গোঁফ না মুখ চাপা? চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, মাসিমা, এই বস্তিতেই বাস করে গেছে। তোমার ঘরের ছেলে।

—তা খুনের দায়ে পালিয়ে ছিলে তো।

রহমত হাসে—হাঃ! হাঃ! হাঃ!

গমগমে গলায় বলে—সে সব ভুলে যান মাসিমা।

—কোথায় যাওয়া হবে?

—তোমার কাছ ছাড়া কোথায় যাবো?

—কী, খোকার কাছে দরকার?

—বেড়াতে আসতে নেই?

বুড়ি আপাদমস্তক দু'জনকে চোখের আগায় তুলে মাটিতে নামিয়ে দেয়। তর্জনীর মাথায় কামারশাল দেখিয়ে ঝুপড়িতে ঢুকে পড়ে।

খোকা গাড়ির হাল পোড়াচ্ছিল।

বিশু হাঁক পাড়ে—কিরে খোকা কেমন আছিস?

বিশু খোকার স্কুলের বন্ধু। গতবার এম এল এ ভোটে হেরেছে। বুঝেছে, আসছে ভোটে খোকা ছাড়া, এ বস্তি কব্জা হবে না।

খোকা দরাজ গলায় সাড়া দেয়—বিশু, আরে রহমত যে। এসো, এসো, দুপুর মাথায় করে!

রহমত সোনার দাঁতে হাসে।

—চা খাবে তো?

কামারশালায় বসে হাঁক পাড়ে। —মা, চারকাপ চা। চেঁচাবার দরকার হয় না। কামারশাল থেকে ছ্যাঁচবেড়ার ঘরে সবই শোনা যায়, দেখা যায়। অসহ্য গরম। হাপরে আগুন। নিঃশব্দে লাল দগদগে হচ্ছে হাল। সাঁড়াশ দিয়ে টেনে তুলল ডাঙায়। খোকা, আর সাগরেদ ঘেমে নেয়ে একশা। দুজনেই সাঁড়াশ দিয়ে গাছ লোহায় পাত চেপে ধরে। তারপর ছন্দ তুলে পেটায়। পাতা বৃত্তাকার সরল হয়ে আসে।

বিশু রহমত একটুতেই ঘেমে জবজবে। না পেরে রহমত বলে—খোকা, চলো গাছতলায় যায়।

গম্ভীর বকুলবৃক্ষ। উঠোনজুড়ে রোদ নেই। বাবলা গাছের ছোট-বড় গুঁড়ি। রহমত বিশু বসে। হাল পেটানো প্রথম দফায় শেষ হলো। খোকা বাইরে এসে বসে। নেড়ি পায়ের কাছে। জিভ বের করে হাঁপায়। চা দিয়ে গেল মা।

বিশু—তখন হাজারবার বললাম, খোকা, জজকোর্টের কাজটা নিবি? উঃ, একি মানুষের কাজ?

খোকা—বকিস্‌নে, আমিই তো বলেছিলাম, কাজটা হয় কিনা দ্যাখ।

বিশু—বুঝলে রহমত, আমি, খোকা তখন ক্লাশ এইটে পড়ি। শরৎবাবুস্যরকে নাকাল করার কথা মনে পড়ে, খোকা?

খোকা নেড়ির মাথায় স্থির হাত রাখে।

—নে-নে তাড়াতাড়ি বল, হালটা ঘুঁটের আঁচে চড়াবো।

—সকালে পুলিশ এলো, কেন রে?

—যেন তুই কিছু শুনিসনি?

—ডি.এম-এর সঙ্গে বসবো, ডিটেলস্‌ না জানলে—

—তুই কী জানিস তাই বল।

—বোকামি করছিস কেন? রাইটার্সের অর্ডার। হাঁদার মতো পুলিশের সাথে লড়ছিস? এই ক'ঘর লোক নিয়ে কী করবি? হাইওয়েতে স্বদেশ দালাল খাবি খাচ্ছে।

—এক পুরুষের বাস। বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে। তুই কি ছেড়ে দিতে বলিস?

—পুলিশ তোকে টার্গেট করেছে।

খোকার মুখের ভাব নড়ে না। শুধু নেড়ির মাথার চামড়া খামচে ধরে।

—তু—ই কী বলছিস?

—রহমতকে তো চিনিস?

রহমত হাসে।

—বল।

—ও এখন বিল্ডারের ব্যবসায় নেমেছে। এলাকাটা তুই খালি করে দে।

খোকার মুখখানা হাতুড়ির মতো উপরে উঠে যায়। হাতের মুঠোয় ছিঁড়ে নেয় নেড়ির মাথার এক গোছা লোম। নেড়ি বিশুর দিকে মুখ ফাটিয়ে ডেকে ওঠে—ঘেউ।

খোকা বলে—আর কিছু বলবি?

—আরে শোন শোন—

—শোনার কিছু নেই। ঘরে ঘরে রেশনকার্ড। ভোটারলিস্টে নাম। বেশিরভাগ মাটির পাট্টা হয়ে গেছে। তোদের ন্যাকড়ামিতে আটকে আছে।

বিশু শব্দহীন কাত-চোখে হাসে। রহমতও হাসে।

খোকা বলে—বাপ ঠাকুর্দার ভিটে, ছাড়লেও মরবো, থাকলেও মরবো। উদ্বাস্তু হয়ে লাভ কী?

—দ্যাখ খোকা, তোর ভালোর জন্যে বলছি। ঝি-চাকর, চোর-ছ্যাচোড় ছাড়া ভাল লোক

এখেনে বাস করে না। ওদের জন্যে তুই মরবি কেন?

ধক করে এক জোড়া ফুলকি খোকার চোখ থেকে ছিটকে উঠলো। পায়ের নীচে নেড়ির লেজ। পা শক্ত হয়ে চাপ পড়ল। নেড়ি জঙ্গলের হিংস্রতায় হুঙ্কার ছাড়ল। বিশু, রহমত চমকে গেল।

খোকা জল-ঠান্ডা গলায় বলল— বিশু, অন্য কথা বল। —দুপুরবেলা, তোর কাজেরও ক্ষতি হচ্ছে। শোন, তুই যদি আমার হয়ে কাজ করিস, সামনের ভোট পর্যন্ত এলাকাটা বাঁচিয়ে দেবো। তাছাড়া তোর কোয়ালিটি আছে। ভাল ঘর পাবি, বউ পাবি, ভদ্রলোকের মত শহরে বাস করবি। যদি চাস আমাদের ব্যবসায় পার্টনার করে নেব। বাঁচতে হলে রাজার মত বাঁচ। এ একটা জীবন হলো?

—তোদের ব্যবসা মানে বুঝি, ভোটও বুঝি।

এবার রহমত বলে—বাঁচতে হলে আমার মত বাঁচো। তোমার ক্ষমতা কম কিসে?

—না ভাই, দিব্যি আছি।

—বললে তো হবে না। তুমি আমাদের বন্ধু, তোমাকে এভাবে বাঁচতে দিতে পারিনে।

—তোমরা এসো। আমার কাজ আছে।

খোকা উঠে পড়ে। সেই কুকুরের লেজে পা। নেড়ি ঘেউ ঘেউ করে লাফিয়ে ওঠে।

বিশু বলে—ভেবে দেখিস্। পরে আসবো।

রহমত বলে—কুকুর ভাই জাঁহাবাজ। তোমার মত একটা কুকুর আমার চাই।

দু'জন ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক রোদ মাথায় ফিরে যাচ্ছে। নেড়ি ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গেল। একটা বিষ পিঁপড়ে কোথা থেকে খোকার বুকে কামড়িয়েছে। বাঁ হাতে পিঁপড়েটাকে ডলে দিলেও, জ্বালা বাড়ছে। খোকা বুকে হাত বুলোয়।

বুড়ি সবই দেখেছে, শুনেছে। চায়ের দাগ বসে যাওয়া কাপ নিতে এসে বলে—

—বুঝলিনে, শাসিয়ে গেল।

খোকা বলে—বেঁচে থেকে, কী মরে গিয়েও ওদের জেতাতে হবে। ওয়াক থুঃ!

বুড়ি বলে— ষাট-বালাই।

সূত্র-চার

বস্তি গম্ভীর। আড্ডা ভেঙেছে রাত করে। অন্ধকার মাথায় খোকা বেরিয়ে গেছে। খায়নি। বলে গেল, এসে খাবে। নেড়ি সঙ্গে ছিল। একা ফিরেছে। খোকা ফেরেনি। চুল্লির চাপা আঁচে, কটা চাল ফুটিয়ে নিচ্ছে বুড়ি। গাছ লোহায় কুপি জ্বলছে। বুড়ি একা বসে। চারিদিক বড় ফাঁকা। অন্ধকার।

কামারশালে ঢুকলো রবীনের চ্যালা দিবাকর।

—খোকাদা, বাড়ি নেই?

বুড়ি চমকে ওঠে।

—কে, কোন্ অনামুখো, সাড়া দিয়ে ঢুকতে পারো না। মানুষ ভয় পায়।

—চেঁচিও না, মাসি। খোকাদা কোথায়?

বুড়ি আরো গলা ছাড়ে—কেন, কী হয়েছে কী? বাবুদের কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছে। তিন বেলা পথ পাড়িয়ে দিচ্ছ?

—আস্তে, মাসি আস্তে—

দিবাকর পারলে বুড়ির মুখ চেপে ধরে। বলে—

—রহমত বিশা কিছু না। সরকারি বিপদ। খোকাদা কোথায়?

হাত ফসকে যায় ঝুরি। হাপরের ঝুরি দোলে। ঝুরির ভয়ার্ত ছায়া কামারশালাময় ভাঙে। ভেঙে ভেঙে ছড়ায়।

বুড়ি চিৎকার করে ওঠে—আমাদের মা-বাপ নাই বিপদ সব ঠাঁই। তুমি কী ভয় দেখাচ্ছ?

—মাসি কি যা-তা বকছ? আমরা আছি কি কর্তে? খোকাদা থাকলে ভালো হতো।

—বলার হলে বলো বাছা। নয় পরে এসো। তোমাদের সর্বদা গোপন শলা। কী এমন ছেলের কথা মাকে বলা যায় না।

বুড়ি ভাতে মন দেয়। দিবাকর বুড়ির কাছে ঘনিয়ে আসে। ফিসফিসিয়ে বলে—খোকাদা রাতে যেন বাড়ি না থাকে।

একটা কাঠকয়লা ফাটলো। বুড়ি চমকে ওঠে।

—কেন, বাড়ি থাকবে না কেন? পুলিশে কেস হয়েছে?

—কেস দিতে পারেনি বলেই ভয়। তুলে নিয়ে যাবে।

—কী করবে কী?

—বুঝতে পারছ না মাসি, ওরা রহমতের চেয়ে খতরনক। রবীনদা খুব চেষ্টা চালাচ্ছে।

কিছুতেই চাল গলছে না। বুড়ি অস্থির খুন্তি নাড়ে।

—আর রহমতের হাতে খবর্দার যেন বস্তি তুলে না দেয়। জানিয়ে দিও, আমি এসেছিলাম। আমাদের হাতে রহমতের চেয়ে বড় প্রমোটার আছে। অনেক বেশি সুবিধে। রবীনদার কথাটা যেন রাখে। অবশ্য আজ রাতেই ফয়সালা হয়ে যাবে।

—কী, কিসের ফয়সালা?

দিবাকর অন্ধকারে যেমন এসেছিল, তেমন চুপিসারে বেরিয়ে গেল।

বুড়ি ভাবে, কীসের ফায়সালা?

আধসিদ্ধ চালই সরা ঢেকে নিয়ে গেল ঘরে। বুড়ি ছুটল, ঘরে ঘরে খবর দিতে। নেড়িও ছুটল সঙ্গে। খোকাকে পুলিশ তুলে নিয়ে যাবে।

পুলিশ এল গভীর রাতে। খোকা এখনও ফেরেনি। এলাকা তছনছ করে, দুরাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে, খালি হাতে ফিরে গেল। ক্লান্ত বুড়ি শ্রান্ত নেড়ি ফিরে এল ঘরে। খোকা এল না। বৃষ্টি নামল তারপর। ঝড়-বৃষ্টি। দুর্যোগ একা আসে না।

—দুর্ভোগ কবে থামবেরে নেড়ি?

নেড়ি ভারি কিছু বয়ে আনল মুখে। ধাক্কা খেল শূন্য বালতিতে। ঠং। বুড়ি কেঁপে উঠল। কী যে বয়ে আনছে! নেড়িই জানে। বুড়ি অন্ধকারে আছে।

শুয়ে আছে।

সূত্র-পাঁচ

তুমুল বৃষ্টি ঝড়ে পথ ঘাট মুছে গেছে।

জলে-জলান্ধকার। ঘরকে ঘর নৌকা। ঘরের ছাউনি, হোগলাচাপা টঙগুলো নৌকার ছই। জলে জলে ভাসছে। হাঁটুজল, বুকজল, যোগাযোগ নেই। বাঁশের মাচাটুকু দ্বীপ, ঘুম আসছে না।

ঘর বার করছে নেড়ি, সারারাত। উত্তেজনায় টান টান বুড়ি। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, দুর্বল।

বৃষ্টি পড়ে। কারা যেন ফিস ফিস করে।

ঝড় চলে। যেন কেউ নিশ্বাস ফেলে।

নেড়ির খুটখাট। মনে হয়, খোকা এল।

দূরে কোথায় হললা হচ্ছে। কখন ঘুমিয়ে পড়ে বুড়ি।

ঘুমের মধ্যে ভেসে ওঠে পথ। অ্যাশফল্ট মোড়া। ঝকঝকে। পথের দুধারে পুঞ্জীভূত স্ফটিক প্রাসাদ। দূর-দিগন্তে আলোময় গাছপালা। সবুজ সবুজ পত্রাবলী। স্থির। স্তব্ধ-জনহীন, রুপালি পৃথিবী পাক খায়। সুনসান।

ঘুমহীন ঘুমে কাতর বুড়ি। কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না। কানামাছি। হঠাৎ আবিষ্কার করে সে একটা ভ্যানরিক্সা টেনে নিয়ে চলেছে। পিচকালো পথ। ধোয়া মোছা। রিকশার গায়ে একটা ব্যানার টাঙানো।

—খোকাদা অমর রহে।

চোখ মরুভূমি। বুক বালির মতো ভার। প্রাণ নিংড়ে রিকশাখানা টেনে নিয়ে চলেছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, আর একটা ভ্যানরিক্সা। আর একটা ব্যানার।

—খোকাদার হত্যাকারীর শাস্তি চাই।

রিকশাখানা চালক শূন্য। প্রথম রিকশার সাথে দীর্ঘ শিকল দিয়ে বাঁধা। বুড়িই টেনে নিয়ে চলেছে। পিছনে আর একটা রিকশা। ব্যানার লেখা—নৃশংস হত্যার বদলা নিতে—ভোট দিন ভোট দিন। নীচে অস্পষ্ট প্রতীক চিহ্ন। দীর্ঘ শিকলে জোরা। তার পিছনে আর একটা। চালকহীন অনন্ত রিকসার সারি। যতদূর চোখ যায়, ব্যানারের মিছিল। বুড়ি একা টেনে নিয়ে চলেছে;

শহরের দীর্ঘকায় মানুষেরা ব্যস্ত। সই করে ব্যানার পাঠিয়েছে। অনন্ত রিকশার মিছিল—লোহার শিকলে বাঁধা বুড়ি, দিগন্তে পাক খায়। কানামাছি—ভোঁ-ভোঁ।

নেড়ি কই? অস্ফুট খুট-খাট কেঁও কেঁও—কে, কাঁদে?

মঞ্চ সাজানো মাঠটা দূরে। আয়নাবসানো সবুজ গালিচা। বুড়ির কানা চোখে, অস্পষ্ট ভেসে ওঠে। মাঠের মধ্যে খুঁটিতে খুঁটিতে ঝোলানো মাইক। নীল নীল ফ্ল্যাগে ছেয়ে আছে। জনশূন্য। কোথায় যেতে হবে, বুড়ি জানে না। গোটা শরীর জলহীন, মরুভূমি। যেন মরা খেজুর গাছ। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মালা। মাঠময় উড়ছে।

নেড়ির খুটখাট বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে এক সময় মাইক গমগম করে উঠল। স্টেজে কেউ নেই। টেপরেকর্ডার বেজে উঠল। বক্তারা আসতে পারেননি। ক্যাসেট পাঠিয়েছেন। —খোকাদা অমর রহে। খোকাদা জিন্দাবাদ।

ওই তো নেড়ি। মাইক্রোফোনের সামনে গলা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সে কাঁদছে। সে করুণ সুর। কাঁদতে কাঁদতে একসময় গলা ছেড়ে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠল—পরিষ্কার মানুষের গলায়।

বুড়ি কাঁদতে চাইছে। গলা পাষাণ হয়ে আছে। কাঁদতে পারে না। নেড়ির কান্না আর মাইকের চিৎকার বাড়তে বাড়তে বুড়িকে ছেঁকে ধরল। কান্না দলা বেঁধে পাথর হয়ে গেছে। পাথরটা বাড়ছে। তৈরি হচ্ছে টিলা। গলায় বাঁধা পাথর বুড়ি আর সইতে পারে না। দম বন্ধ হয়ে আসে। তলিয়ে যায় বলয়ের ঘূর্ণিপাকে।

একটি গল্পের জন্য ভূমিকা

না, চেখভ বলেছিলেন, সে কারণে নয়। সত্যিসত্যিই চোখের সামনে থেকে যা খুশি তুলে নিয়ে গল্প লেখা হয়। হতে পারে। যেমন, একজোড়া চটি, একটুকরো কানের সোনা কিংবা চুলহীন তেলচকচকে মাথা এই সব আর কি! যদি চটি দিয়েই শুরু হয়? মন্দ কি?

যে বস্তু নিয়ে গল্প শুরু হবে, তৎক্ষণাৎ সেটি বিশেষীকৃত হবে। অতএব লিখি

: 'চটিটা ছিঁড়ে গেল'।

আঙ্গিকের দিক থেকে এভাবে শুরু করার রীতিটা মন্দ। পাঠকের আগ্রহ হোঁচট খায়। ও হেনরীর কথায় বলি, গল্পটা মার্চ করে যাক মার্চ। চটি ছেঁড়ার নিজস্ব কষ্ট-ধ্বনি আঃ! আহা, ওহো, ইস্ ইত্যাদি প্রতিধ্বনি। ধ্বনি অপেক্ষা প্রতিধ্বনি কখনও দীর্ঘতর হয়— যেমন:

গলির জন্যেই এমন হলো।

—একেবারে এঁদো

—মধু স্যাকরা একটা ডেঁয়ো মাছি।

—যে পাতে খায় সেই পাতে শোচে

—গলিটা দিয়ে আলো-বাতাস...

—আদব কায়দা কিছুই ঢোকে না। লোকটা থাকে কী করে—একটু দ্যাখে না!

চটির নীচে মাটি, উপরে পায়ের ঐশ্বর্য এবং পায়ের চতুষ্পাশ গল্পে কেমন ভিড়ে যাচ্ছে দেখুন। অবশ্য মন্দ রীতি দিয়ে যে গল্প শুরু হয় তার মাঠে মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কী আর করা! চটিটা ছিঁড়লো বলেই তো কাদা প্যাচপেচে গলিটা এসে গেল।

ছোট যে গল্প রাতভাঙা আলোর মত শুরুতেই তীব্রগতিতে ছুটে যায়, সেও গলির মুখে বেঁকে দাঁড়াল। এতএব বলতেই হয়, গলির নাম, কুকুরে গলি। প্যাচপেচে কাদায় জলে অর্ধেক কুকুরের পায়খানা পেচ্ছাব, শেয়াল ঢুকতেও ঘেন্না পায়।

মন্ত্রী মশায় ঢুকবেন কী করে? ভারিতো একটা ভোট!

চটিজোড়া মন্ত্রীমশায়কে পরিয়ে দিলাম। দয়া করে আপত্তি করবেন না। এবং মন্ত্রীমশায় নয়, দাদা বলতে হয়। বিদ্যাসাগর বলেছেন, কানাকে কানা , খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই।

দাদা বললেন– উহু, একটা ভোট বলে অবজ্ঞা করা উচিৎ নয়। বিন্দু বিন্দু ধূলিকণা পড়ো নি? একটি ভোটেই দলের কপাল ফিরে যায়। আচ্ছা, মধু স্যাকরা লোকটির বয়স কত?

—তা আপনার বয়সি হবে। চটিজোড়া ছাড়েন দেখি, হাতে নিই।

—কৈ মধুদা বাড়ি আছ নাকি?

আমাদের মধু স্যাকরার আর একটা নাম আছে। ফতো-স্যাকরা।

লোকটা জীবনে ফতুয়া ছাড়া গায়ে দেয়নি, আট হাতি হাঁটু তোলা ধুতি নিখাদ মানুষ।

জীবনে কোনোদিন জুতো পরতে দেখেছিস?

উঠোনে আলো না সেঁধুতে ধোপদুরস্ত পোশাক আশাকের ঝলমলানি দেখে মধু বেঁকে ধনুক। গলে সাবু।

—হেঁ হেঁ, ক্যানো কষ্ট করে আসতে গেলেন। চিরটাকাল আপনাদেরই সেবা ক'রে এসেছি। এই গু-মুত মাড়িয়ে, ছিঃ ছিঃ সক্কাল বেলা, গরিবের ভিটে, কোথায়ই বা বসতে বলি।

মধুদা আমাদের জেনুইন ভোটার।

—মধুদা, তোমার তো হাতুড়ি ফাতুড়ি আছে। দ্যাখো দিকি চটিটার ব্যবস্থা হয় নাকি?

দাদার চটি।

—নারায়ণ, নারায়ণ, মা লক্ষ্মীর হাতুড়ি, অপরাধ নেবেন না।

দাদা মুখ খুললেন,– না না, কী যা-তা বলছ। কাজের হাতুড়ি নয়। যদি... তোমার ঐ কয়লা ভাঙা হাতুড়ি দিয়ে টিয়ে...

—কৈ দেখি, এ হে হে, এতো সেলাই না করলে হবে না।

দাদা বললেন—মধুসূদনদা, চটিজোড়া আমার বড় পয়মন্ত। কেনার পর থেকে... থাক। তবে হ্যাঁ পুরোনো হয়েছে।

মধুদা বেঁকতে বেঁকতে গোল হয়ে গেলেন।

—আজ্ঞে, ত্রুটি মার্জনীয়, মধুসূদন নয়, মধুবন কর্মকার। ভোট আমার বাঁধা রইল আপনার পায়ে। এই পাঁচমিনিটের পথ সুবল মুচির বাড়ি। যদি বলেন, এক দৌড়ে...

দাদার মুখ খুশিতে ভরে উঠল।

তোমাদের মধুদা বড় রসিক মানুষ হে। নিষ্ঠাবান। চরিত্রবান। বড় ভাল লাগল। মধুদা আপনি নাকি জীবনে জুতো পরেননি?

—না না, পরেছি বৈকি, পরেছি বৈকি,ওই যে– নাতো, ঘরের মধ্যে আছে। এনে দেখাব?

দাদা আরো খুশি হয়ে উঠলেন– মধুদা আপনি সত্যিই গুণী মানুষ।

—হেঁ হেঁ স্যার। কী যে লজ্জা দ্যান। আমার একটাই গুণ, আমি খুবই গরিব।

—আপনাকে চটিজোড়া দানই করলাম। রাজধানীর নাগরা, বুঝলেন। একটু সারিয়ে নিলে আপনার পায়ে সুন্দর মানাবে, চলো হে, চলো চলো।

—আপনার এত দয়া হুজুর। খেটে খাই। আর যাই হোক, চোর নই। লোকে অপবাদ দেবে।

দাদা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। মধু গলা চড়িয়েই বলে– ফেরার সময় নিতে ভুলবেন না।

দাদা কিছু বললেন না।

সামনেই ভোট।

বলতে পারেন না।

মধুর যেমন হাতুড়ি, দাদারও ভোট হলো গিয়ে লক্ষ্মী।

দাদার ডানদিক : তবে যাই বলুন দাদা, মধু স্যাকরার ভোট আমাদের সলিড। ঠগ জোচ্চুরি কথা ওর কাছে পাবেন না।

—হলেই ভালো।

বাঁ দিক উৎসাহে– হলফ ক'রে বলতে পারি, জ্ঞানতো ফতো স্যাকরা এক আনি তামা কারো মারেনি।

—রামচন্দ্র!

রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। রাজধানী তো আছে। রাজধানীর চটিও আছে। মধুবন কর্মকার, আমাদের ফতো স্যাকরা রামায়ণ-ভক্ত। শ্রদ্ধাপ্লুত দৃষ্টিতে চটিজোড়া দেখতে লাগল যেন ভাই ভরত। তখনই একটা বিশ্রী হাসি নিঃশব্দে ফিক করে গড়িয়ে পড়ল তার ঠোঁট বেয়ে। এবং নিশ্চয় বিনয়ের সঙ্গে।

দাদার চটি বলে কথা।

রোদ্দুর দ্বিধাহীন। বেলে মাটির উঠোন। রুপোর মত চক-চকাচ্ছে। তার মাঝখানে চটি জোড়া। জোড়া হাতির মাথার মত শুঁড় তুলে শুয়ে আছে। দেখে মনে হয় খুবই নিরীহ। মধু মাথা চুলকোয়। যখনই কোনো সমস্যায় পড়ে, মধুকে এ রকম মাথা চুলকোতে হয়। চুলকোতে চুলকোতে চুলহীন মাথা ঝরঝরে উজ্জ্বল এবং টকটকে টাক হয়ে গেছে।

চটিজোড়া উঠোন থেকে তুলে নিয়ে কুকুরে গলিতে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে সে থমকে যায়। কি যেন ভাবে। থাক। পা বদল নয়। মন্ত্রীর চটি, মন্ত্রীর রূপ রস ভাব নিয়ে বরং মালিকানা অর্থে হাতবদল হয়ে ভারতবর্ষের এককোণে মন্ত্রীর চটিই রয়ে গেল। দোকান ঘরের বারান্দার এককোণে চটিজোড়া মধু তুলে রাখল।

শুরুতেই বলেছি, মন্দ আঙ্গিক। চটি তুলে রাখতে গিয়েই মধুর সঙ্গে গল্পের প্রায় চটাচটি হওয়ার লক্ষণ। মধুর হাতে চটি। অতএব, মধুকে হাতে রেখেই একবার অন্যভাবে চেষ্টা করা যাক। অন্তত গল্পটাকে দাঁড় করানো যায় কিনা?

হাটের দিন খরিদ্দার আসে টাটে। গাঁয়ের খরিদ্দার আপন মানুষের মত শুধায়

:—ফতুদা, চটি জোড়া কিনলে বুঝি?

দিন যায়।

লোকে জিজ্ঞেস করে

—ফতুদা, এ নাকি মন্ত্রীর চটি?

—চটিজোড়া নাকি রাজধানী মেড?

মন্ত্রীর জোরে চটি এবং মধু বিখ্যাত জোড়। বার বার বের করতে হয় বুঝে, ঘরেও তোলে না। চটিজোড়া বারন্দার এককোণে শুয়ে থাকে। ঠিক মধুর চোখের সামনে। বার বার খরিদ্দারের হাতুড়ির ন্যায় জিজ্ঞাসা-জনিত আঘাতে মস্তিষ্কের কোন এক প্রত্যন্ত প্রদেশে মন্ত্রীর একজোড়া চটি নির্মাণ হতে থাকে। মনের মণিকোঠার স্থপতি সম্পূর্ণ হওয়ার পর মধু চটিজোড়ার প্রতি এক ধরনের মায়া অনুভব করে।

আজকাল বারান্দা ঝাঁট-পাট দেওয়ার সময় চটিদুটো ঝাড়মোছ করে। চটির শুকতলায় ন্যাকড়া বুলোতে গিয়ে মন্ত্রীর পায়ের ছাপ দেখে। মন্ত্রীর পা দুটোর অস্পষ্ট ছবিও সে দেখতে পায়। ফর্সা। পাথরকোঁদা নিখুঁত ভাস্কর্য। নিজের একখানা ভোঁতা পা চোখের সামনে এগিয়ে নিয়ে এসে সেই বিশ্রী হাসিটা নিঃশব্দে হাসে। ভাবে, আমি কি একটু বদলে যাচ্ছি। তিনকুলে যার কেউ নেউ, তার আবার মায়া কিসের?

রাগ দেখিয়ে চটিজোড়া ধপ করে হাত থেকে নামিয়ে রাখে। আবার একদিন আদর ক'রে চটি জোড়া পায়ে খাটিয়ে চমকে ওঠে।

বাঃ খাপে খাপ একেবারে।

সেদিনই সুবলকে ডাকিয়ে বলেদিল,—সুবল, চটিজোড়া ফাস্‌ক্লাস করে মেরামত করিস তো।

মেরামত তো করা থাক। এ ও আসে।

হাতে তুলে নেড়েচেড়ে সুবল চটি সেরে বেশ সুন্দর পালিশ দিল।

রাত্রে চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা মধু টুক টুক করে হেঁটে গেল, আবার ফিরে এল। মোমের আলোয় চটির পিঠ বেশ উজ্জ্বল হয়েছে। সুবল মিস্ত্রি বটে। শরীরের মধ্যে কেমন শিরশিরানির টান ধরেছে। উহু, এ টায়ারের চটি নয়। মনে হচ্ছে, মাটি ছেড়ে বেশ খানিক উপরে উঠে এসেছি।

এমনিতেই ছোট, চোখদুটো আরো খুদে হয়ে এল মধুর। চুরি করে দুধ খাওয়া বেড়ালের জিভের মতো দুবার ঘাড় দোলাল, হুম্, চটি জোড়ার ভেতরে বেশ আরাম আর গাম্ভীর্য লুকিয়ে আছে। মধু গম্ভীর হয়ে ঘরের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো আর একবার হেঁটে গেল। এবং আরাম ব্যাপারটা ভুলে গেছে মনে পড়ায়, ফেরার সময় গম্ভীরভাবে আয়েসী চালে ফিরে এল। এবার শরীরের সমস্ত ভর চটির উপর ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল। এ চটি পায়ে দেওয়ার একটা অহংকার আছে বটে। এ চেহারায় মানায় না। মধু নিজের শরীরের দিকে তাকায়। মোমের আলো পড়েছে ভুঁড়িতে। একটা বোতাম ছিঁড়ে ভুঁড়িটা বেরিয়ে আছে। বিশ্রী দেখাচ্ছে। সেই বিশ্রী হাসিটা ঠোঁটের কোণে এসে অসহায় ভাবে মিলিয়ে গেল।

গল্পটা ক্রমাগত ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আসছে। অন্ধকারে ঘোরাফেরা করছে। মাঠে মারা যেতে বসেছে। এ ঠিক নয়। বরং সকালের আলোয় চটি পরিয়ে মধুকে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া যাক। ধরা যাক লজ্জার মাথা খেয়ে মধুর চটিজোড়া পরে একটু বেরুবার শখ হয়েছে। সে মধুর দরকার মুদিখানা কিংবা কয়লার আড়ত যেখানে হোক,

—কী খবর ফতুদা। কোথায় চল্লে?

ফতুদার পায়ে মন্ত্রীর চটি। সুতরাং একটু গম্ভীর একটু একটু আয়েসী ফতুদার উত্তর না এসে পাল্টা প্রশ্ন এল : গোবিন্দ, এবার ভোটের হাওয়া কেমন বুঝছো?

গোবিন্দ অবাক। ফতোদা তুই তোকারি ছাড়া তো ডাকে না। হলো কী! একটু সমঝে নিয়ে বললে—সে যাই হোক, তোমার বাজার গরম।

—সে তো বটেই। দেখছিস না, মন্ত্রীর চটি পরে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি।

গোবিন্দ নামক প্রতিবেশী মধুর কোল ঘেঁষে এগিয়ে আসে। গলায় ওজন ঝুলিয়ে বলে—মধুবাবু, আপনার এই ফতুয়া আর ধুতি কিন্তু জুতোর সঙ্গে ম্যাচ করছে না।

কথাটা সত্যি। মধু হজম করে। গোবিন্দকে এখন বুঝতে দেওয়া চলে না। নিজস্ব ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে জবাব দেয়—মকশো বোঝো, মকশো? ইংরেজিতে বলে ট্রেনিং। তাই নিচ্ছি। বাজারে যখন ছাড়বো, দেখে নিস পাকা হাতের কাজ কাকে বলে। মুখে যাই বলুক, প্রথম দিন মধু কিন্তু বেশিদুর এগুতে সাহস পেল না। কাজ মিটিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এল। খানিক ভয়ে খানিকটা লজ্জায়। যদি আবার কেউ কিছু বলে বসে। গোবিন্দর ফিসফিসিয়ে বলা, 'মানাচ্ছে না' শব্দটি ঘুরে ফিরে কানের কাছে বাজতে লাগল। গোবিন্দ

মিথ্যা বলেনি। সে তার হিতৈষী। বন্ধু লোক। উঠতে, বসতে, নটেশাক দিয়ে ভাত মেখে খাওয়ার সময় কিংবা ভিজে গামছা পরে কাপড় শুকোবার সময়, মনে পড়তে লাগল: 'মানাচ্ছে না।'

এখন যদি হুটপাট ক'রে বেশ কিছু বিয়ের কাজকম্ম এসে যেত, তো একখানা সেনগুপ্ত কিনে দেখিয়ে দিত। তা শালা এই ভাত বিক্রির গাঁয়ে ভোটের খরিদ্দারই বেশি।

খরিদ্দারের কথা ভাবলে চোখে ভাসে উলো-ডুলো চালচুলোহীন কালো কালো নেংটি পড়া মানুষগুলো। মাথায় থাবা মারলে ধুলো ওড়ে।

গোবিন্দ প্রায়ই বলতো– মারো মারো। সবাই মারছে। তুমি মারলেই সোনা উঠবে।

মধুর দীর্ঘশ্বাস বড় একটা পড়ে না। মাথা চুলকে বলে,—কার জন্যে মারবো বলো? তিন কুলে যার কেউ নেই।

বলে– কার কাছ থেকে মারবো বলো? যাদের তিন কুলে কেউ নেই।

গোবিন্দ বলে– এখনও লোকে ফতুদা বলে, আর দু'দিন বাদে যে উদোমদা বলবে।

—ভোট দাদা, চোট দাদা তো বলবে না।

বলে মাথা চুলকোতে চুলকাতে সেই বিশ্রী হাসিটা ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে দিত মুখের দু'পাশে। আত্মপ্রসাদী করুণরসে সিক্ত।

এভাবে পূর্ব ঘটনা স্মরণ করা গল্পের দুর্বলতা। দ্বন্দ্বকে নির্দিষ্ট গতির মধ্যে ধরতে না পেরে এ কেবল সুবিধামতো এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে যাওয়া। ঘটনাগত দ্বন্দ্বে যখন গল্পটাকে কিছুতেই এঁটে ওঠা যাচ্ছে না, দেখা যাক অন্তর্দ্বন্দ্বে গল্পটিকে বাঁচানো যায় কি না? গল্পটা মার্চ করে যাক মার্চ।

শৈব মতে গোধূলি লগন ছাড়া বিয়ে থাওয়ার কোনো ডেট ছিল না। বৌ-এর সোনার দুল বন্ধক দিয়ে ব্যোমকালী রাজোয়ার নাতনির জন্যে রুপোর নূপুর বানাতে দিয়ে গেছে। গত তিন মাসে মধুর এই একটিমাত্র খরিদ্দার। নাতনি এসেছিল সঙ্গে। পায়ের মাপ যদি লাগে। মধু পা আর দেখেনি। দেখছে মুখখানা। মুখখানা ঘোর কালো। এত কালো যে চোখের মণিকে হার মানায়। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে চটিজোড়া পায়ে দিয়ে মধু মুখখানা ভাবছিল। ভোটের আর সাতদিন বাকি। চটিজোড়া পরে সে ভোট দিতে যাবে। এক সেট ব্রেসলেট ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি দরকার। মধু যেন দ্রুত ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটে গেল আবার ফিরে এল। মধু বুঝতে পারে না, কেন তার স্বাভাবিক গতি সে ধরে রাখতে পারছে না। কালো মুখের যে এত দীপ্তি থাকে মধু আগে কখনো দেখেনি। মুখখানা ভরাট, ডিমের মতো। তৈলাক্ত। ব্রেসলেট ধুতি একশউনিশ টাকা জোড়া। দু'ভরি রুপো দিয়ে না করে দিব্যি এক ভরিতে পায়ের তোড়া হয়ে যায়। ব্যোমকালীটা লেখাপড়াও জানে না। ওজনও বোঝে না।

মধু বেশ দ্রুত ঘরের এমুড়ো ওমুড়ো করছে। শুধু আদ্দির পাঞ্জাবি গড়ালে তো হবে না গেঞ্জিও নেই। ঘরখানা এত ছোট, যে মধু আর টানা লম্বায় হাঁটছে না। কেবল বৃত্তাকারে পাক খেয়ে পাক খেয়ে ঘুরছে। কালো মুখের রং এত উজ্জ্বল হ'তে পারে! একজোড়া নূপুরের খুশিতে একটা কালো মুখ এত মসৃণ হয়ে যায়? সেও তো কালো। তার মুখও কি ব্রেসলেট ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জবির আনন্দে এত উজ্জ্বল আর মসৃণ হয়েছে।

মধু নিজের মুখে হাত বোলায়। দোকানে টাঙানো আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চামড়া কুঁচকে গেছে। ভ্রূ ঝুলে পড়েছে চোখের উপরে। কতকাল সে আয়নায় মুখ দেখেনি। ঘামে সমস্ত মুখখানা ভিজে জবজব করছে। মধু নিজেকে চিনতে পারে না। সে বদলে গেছে। একেবারে বদলে গেছে। বুকের নীচে কিসের ব্যথা!

এই প্রথম মনে হলো, নাগরাজোড়া বেশ ভারি। পায়ের পাতা টন টন করছে। পায়ের শিরা উপশিরা বেয়ে ব্যথা উপর দিকে উঠে আসছে। কী আছে নাগরার ভিতরে? পায়ের আঙুলগুলো ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে। কেন? চটিজোড়া খুলে মধু চটির সামনে উবু হয়ে বসে। উঁকি মেরে দেখে। চোখে পড়ে একরাশ অন্ধকার। কেমন অন্ধকার? চটির মধ্যে হাত দিয়ে খোঁজে, বোঝার চেষ্টা করে। বোকা মধু। কিছু পায় না। আলো নিভিয়ে দেয়। অন্ধকারে ঘর একাকার হয়ে যায়। ছেঁড়া-ধুকড়ি বিছানায় এলিয়ে পড়ে। পায়ের ব্যথা যেন রক্তস্রোতে বুকের মধ্যে ভেসে আসছে। কেন? যন্ত্রণায় বুক মুচড়ে যাচ্ছে। কার ব্যথা, কিসের ব্যথা? অন্ধকারের মধ্যে এত যন্ত্রণা কিসের? মধু বোঝে না। সে বুক চেপে উপুড় হয়ে শোয়।

পঞ্চম কলমের গভীরে

হৃৎপিণ্ডের ভীষণ হাহাকার নিয়ে জেগে ওঠে চৈত্রের দুপুর। শিমুলের লাল ফুল যেন ছত্রিশ পয়েন্ট বোল্ডের প্রতিটি অক্ষর। ধু ধু চোখের ব্যাদানে জ্বলছে।

'পুলিশের গুলিতে মিস ডালিয়া গুরুতর আহত...'

অস্বস্তির পর অস্বস্তি আর অজানা বুলেটের অনাস্বাদিত যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ ফিরছে স্বর্ণ। থোকা থোকা রক্তের মত ফুল শিমুল, ঝরে পড়ছে ভুঁয়ে, পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। বিস্তীর্ণ মাঠের এপারে সে শুয়ে আছে। একা। ওপারে হাসপাতালের পাতাল-নিসঙ্গ বিছানায় ওই ভয়ংকর শিমুলচারাটা কি বারংবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে? গোখরোর ক্ষুদে বাচ্চার মতই ক্রূর, বিষাক্ত ছোবল তার অতীত বর্তমান ছিঁড়েখুঁড়ে ছারখার করে দিচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ! স্বর্ণর চোখে অজ্ঞাত, অন্ধকারময়, কম্প্রমান।

সে এক প্রাচীন যন্ত্রণার গহ্বর থেকে উঠে আসার জন্য সমস্ত বিছানার চাদর দলে-মুচড়ে ঠেলে এসে বসলো জানালার ধারে, পারলো না।

১১ এপ্রিল, প্রায় সমস্ত পাঠকের অলস চোখে যে সংবাদটি এড়িয়ে গেছে, চতুর্থ পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে, তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পিষতে লাগল। বুক ভরে নিশ্বাস নিতে গেল, হস্টেলের জানালা দিয়ে ঢুকে তপ্ত-হল্‌কা বাতাস ফিনফিনে চাবুক, চালিয়ে দিল স্বর্ণর গালে। সে বসে থাকতে পারলো না। চাবুক ঘর ছেড়ে বেরুবার আগেই সে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মেঝেতে। ব্রাকেটের গা থেকে শার্ট ছাড়িয়ে গলিয়ে নিল নিজের গায়ে। সামনের রাস্তাটুকু পেরিয়ে স্টেশনে আসতে ঘামে ভিজে গেল গেঞ্জি।

সিগ্রেটের চেয়ে বিস্বাদ এখন চৈত্রের তাপ।

চৈত্রের তাপের চেয়ে বিস্বাদ এখন সিগ্রেট।

মাত্র দুটানের পর সিগ্রেটটা ছুঁড়ে দিল পাশের নর্দমায়। খাঁ-খাঁ দুপুর। দ্রুত পাশ কাটিয়ে গেল সিনেমা হলের ছায়াটুকু। বাঁক ঘুরতেই তার মনে হল, সিগ্রেটের আগুন নেভার কোনো 'সাঁত্‌' শব্দ সে শুনতে পায়নি। সিগ্রেট নেভানোর মতো আর্দ্রতা গোটা শহরে হয়ত কোথাও অবশিষ্ট নেই। স্বর্ণর কৌতূহলী মন, যথার্থই কেন পেছন পথে ফিরে

আসে, সে জানে না।

কঙ্কাল বিকীর্ণ এক যুবতী, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তার পরিত্যক্ত সিগ্রেট টেনে যাচ্ছে। তার ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাকের ফাঁকে ইজ্জতের মতোই সে নির্বিকার।

—মা, একটি রাগপ্রধান গাও তো।

সন্ধ্যার ঠোঁটদুটো কেঁপে ওঠে। যেন সে কিছু বলতে চায়।

মা দ্রুত বলে ওঠে—মেয়ে আমার...

ভদ্রলোক ততোধিক দ্রুত বলে ওঠেন— আমার মাকেই বলতে দিন। এবার সন্ধ্যার বুকের ভিতরটা দপদপ করে ওঠে। কান্নার বাষ্প পাক খেয়ে উঠতে থাকে।

ভদ্রলোক স্নেহ আর্দ্রতায় কোমল— ভয় নেই মা, ভয় নেই। বুড়ো বাপকে ভয় কিসের।

সন্ধ্যার গলার কাছে একদলা কথার কষ্ট জমে শক্ত হয়ে আছে। —আমি এখন বিয়ে করবো না, মা।

এটুকু গলে বেরুতেই মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে।

সংগীত তার প্রাণ। তার হাতেই সে নাড়া বেঁধেছে। কেমন করে বলবে, কেমন করে বোঝাবে, অনাহুত এই আহ্বান সে কেমন করে ফেরাবে। কান্নায় ভেঙে পড়ে মায়ের কোলে। সংগীতের উপর যখনই আঘাত এসে পড়ে, ওস্তাদজির কথায় বারবার মনে পড়ে। বাবা নেই। ওস্তাদজিকে সে বাবা বলে ডাকে। এই মানুষটি ওস্তাদজিকে বাবা ডাকার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে।

বালিকা বয়সের কোনো এক সন্ধ্যায় সে অভিমানে কাঁদছিল। অন্ধকারে দীর্ঘ আগমন তার কান্নাকে সুরাচ্ছন্ন বিলম্বিত করে তুলেছিল। কেন কাঁদছিল আজ আর মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, সেই বিশাল উঁচু লম্বা মানুষটি সেদিন তাদের দুয়োরে দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন তার কান্না। বিদায়ীদিনের ব্যথা নাকি ফুটেছিল তার অদ্ভুত সুরসমৃদ্ধ কান্নায়। ইমন-পূরবি আর ভৈরবী নাকি আছড়ে পিছড়ে মরেছিল বিকেলের পায়ে। তার করুণ-কিন্নর কণ্ঠই পথ চলতি ওস্তাদজিকে টেনে এনেছিল তাদের ঘরে।

মায়ের কাছ থেকে তিনি চেয়ে নিয়েছিলেন সন্ধ্যাকে। সংগীতের পূজায় তাকে নিবেদন করবেন বলে।

প্রথম দিনই তিনি সন্ধ্যাকে বলেছিলেন—বল্ বেটি বল্, এই তানপুরা ছুঁয়ে বল, সংগীত কোনোদিন ছাড়বি না।

ওস্তাদজির ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে ছিল অনন্ত জিজ্ঞাসা আর অস্থির প্রতীক্ষা। নিশ্চুপ সন্ধ্যা অকস্মাৎ পাল্টা প্রশ্ন করেছিল—আপনার সংগীত যদি আমাকে ছেড়ে যায়?

এমন পাল্টা প্রশ্নের আঘাত ওস্তাদজি কস্মিনকালেও হয়ত আশা করেননি।

দু'এক মুহূর্ত অভিভূত এবং অসহায় থাকার পর ধীরে ধীরে সন্ধ্যার মাথায় হাত রেখে বললেন— আরে পাগলি, সংগীত কি আমার? আমি সংগীতের মাধ্যম, হয়ত প্রতিনিধি মাত্র।

সন্ধ্যা বালিকা মাত্র, ওস্তাদজির দুর্বলতা, আর কথার ফাঁকটুকু কিছুই বুঝলো না। সেদিনই ওস্তাদজি চিনে নিয়েছিলেন তার বালিকা-কন্যাটিকে।

—কন্যাটিও।

আজ সন্ধ্যা সংগীত ছাড়তে চাইলেও সংগীত তাকে ছাড়বে না। সন্ধ্যা এবং সংগীত একাকার হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, বাঙালি হিন্দু ঘরের মেয়ে, বিয়ে তো তোমাকে করতেই হবে, মা। স্বামীর ঘরই তো মেয়েদের ঘর। তুমি এখন পরের ঘরে আছ।

সন্ধ্যা এমন করে কোনোদিন ভাবেনি। নারীজীবনের অনুভূতি, তার সুর, তাল, লয়, রস ভাবের সহবাসেই তৃপ্ত। তবে, তবে কেন এই টান—তার জীবন থেকে ছিঁড়ে ফেলা?

মা বললেন— গান-বাজনা ছাড়া মেয়ে আমার কিছুই জানে না।

ভদ্রলোক বললেন— জানি, জানি, সব জানি। আর আমার মায়ের নাম জানে না, এদেশে এমন কে আছে? আমার মায়ের ওই যে গান আছে না, কী যেন-হ্যাঁ, ভোর হোল দোর খোল খুকুমণি ওঠ রে—ওই ছড়ার গান শুনেই আমার ঘুম ভাঙে।

সংগীতপ্রীতির কথায় সন্ধ্যা মুখ তোলে। সে ওই একখানিই রেকর্ড করেছে। একটি ছড়ার গানেই সে রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ভদ্রলোক বললেন, আমার ছেলেকে একবার দেখো। তুমি কিছুতেই না বলতে পারবে না। সে গান খুব ভালবাসে। আর এই বুড়ো বাপের যা আছে, তাতে সে তোমাকে তানপুরা দিয়ে শোবার ঘর তৈরি করে দেবে।

—ছিঃ ছিঃ ভদ্রলোক ও কি বললেন!

সন্ধ্যা চিৎকার করে উঠলো—না, আমি বিয়ে করবো না। ছুটে ঘরের বাইরে পালিয়ে গেল সে।

কিন্তু বিয়ে হয়েছিল। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর রেখে সে স্বামীর ঘরে ঢুকেছিল।

কিন্তু বিয়ে ভেঙেছিল। পায়ের বুড়োআঙুলে ভর রেখে সে স্বামীর ঘর ছেড়েছিল।

সন্ধ্যাই পরবর্তী জীবনে মিস ডালিয়া। স্বর্ণ হাঁটছে আর ভাবছে। ভাবছে মায়ের জীবন

প্রবাহ। একটানা হেঁটে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। গরমে, ঘামে জামা গেঞ্জি ভিজে গেছে। পথের পাশে একটু বসতে পারলে হতো। কিন্তু সে বসল না। অস্থির মনস্কতায় পথ হেঁটে চললো। এক প্রাচীন যন্ত্রণার গহ্বর থেকে ফুটে উঠতে লাগল ছবি, ছবির পরে ছবি।

—ওঠ, খোকা ওঠ।

'ছেঁড়া কাঁথার মধ্য হতে সদ্য জাগরিত দুইটি ডাগর চক্ষু মেলিয়া...।

—উঃ—উঃ—

—সোনা আমার তাড়াতাড়ি ওঠ। তোকে যে আজ হস্টেলে যেতে হবে।

স্বর্ণ একবার ভাবে বালক সোনাকে, একবার 'পথের পাঁচালি'র অপুকে।

'এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি যাহার শিখর দেশে সতত সঞ্চারমান...'

স্বর্ণর মনে পড়ে বালক সোনা তখন অপুর মতো ছোট নয় কিন্তু স্বপ্নালু, ছেঁড়া কাঁথা নয়, কোরা ওয়াড় আর নতুন তুলোর অদ্ভুত গন্ধে কুণ্ডলী পাকিয়ে লেপের নীচে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়েছিল।

সে কিছুতেই হস্টেলে যাবে না।

সন্ধ্যা একঝটকায় লেপ উল্টে সোনাকে কাতুকুতু দেয়।

—উঃ, হু-হু কাতুকুতু দিলে আমি যাব না।

—আচ্ছা, দেব না।

—আমাকে এই নতুন লেপটা দিতে হবে।

—হ্যাঁ দেব।

—দু-জোড়া জামা প্যান্ট দিতে হবে।

—হ্যাঁ, দেব দেব।

দিতে হবেই বা না কেন, নতুন লেপের সুখ পেয়েছে সোনা। এই সুখ ছেড়ে যেতে মন চায়! কোথাকার কে সোনা, কে তাকে চিনত?

পূর্ব পাকিস্তানের এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারতবর্ষে ছিটকে পড়া একটি বাপ-মা হারা বালক বইতো নয়। কোলকাতার মতো বিশাল শহরে যার ভিক্ষে করে আর শালপাতা চেটে দিন কাটছিল। চৌরঙ্গির ফুটপাথে একদিন সুরের অদ্ভুত বান ডাকিয়ে দেওয়া গান শুনে তার হাত থেকে শালপাতা খসে গেল।

রক্সি সিনেমাহলের মোড়ে যেখানে একটু আগে সে দেখেছে ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকের

ফাঁকে ইজ্জতের মতোই নির্বিকার এক যুবতী তার ফেলে দেওয়া সিগ্রেট টেনে যাচ্ছে, ঠিক ওইখানে শুনেছিল সেই গানের প্রস্রবণধারা।

অকূল-সমুদ্র—এই কোলকাতা শহর—অবাক বিস্ময়ে সে চেয়ে ছিল এই সংগীতের উৎস ধারার মুখে। কতদিন সে স্নেহময়ী মায়ের মুখ দেখেনি। মায়ের হাতে মাখা গরম দুধ-ভাত খায়নি। কতদিন সে মায়ের কোলের উষ্ণতায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়নি। মা, মাগো তোমার খোকা আজ আকাট রোদ্দুরে কুকুরের সাথে দুপুরের খাওয়া সেরে নিচ্ছে। তুমি কোথায়, একবার এসে দেখে যাও, একবার এসে দেখে যাও তোমার খোকাকে।

সেদিন সেই বালক, হয়ত এমন করে ভাবেনি, কিন্তু সেই হারিয়ে যাওয়া, অনেক রৌদ্র-সুখ চাপা পড়া দিনের কথা ভাবতে গিয়ে স্বর্ণর চোখে জল এসে যায়। এই বিশাল শহরে কেউই হয়ত স্বর্ণকে দেখছে না। তবু চোখের জলের লজ্জা সভ্যতা সহ্য করে না।

সে রুমালের খুঁটে চোখ মুছে নেয়। পথ হাঁটে। ভাবে, সেই অদ্ভুত স্নেহময়ী কণ্ঠস্বর। সুর। সংগীত। গান শেষে রুপোলি পয়সা ছড়িয়ে ছিল ফুটপাথে। বালকটি খুঁটে খুঁটে দুহাতের অঞ্জলি ভরে এনে, তুলে ধরেছিল সেই দেবীপ্রতিমার সামনে।

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা, যার মা নেই। ওস্তাদজি মৃত। এত বড় ব্যবসায় মত্ত শহরে সেও আজ ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যা তাকিয়েছিল, নিষ্পাপ ফুলের মতো বালকের ডাগর চোখের দিকে।

একসময় বালকের আঠাভর্তি চুলে আঙুল চালিয়ে বিলি কেটে জিজ্ঞেস করলো—তোর নাম কিরে—

বালক জানে না।

—তোর বাবা-মা আছে?

সে চুপ করে চেয়েছিল।

—তুই থাকিস কোথায়?

বালক নিরুত্তর।

—থাকবি আমার কাছে? খেতে দেব, জামা প্যান্ট দেব, ভালোবাসবো।

এবার বালকটি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরেছিল তার খুঁজে পাওয়া মাকে।

সন্ধ্যা তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে চুমায় চুমায় ভরে দিয়েছিল তার অশ্রুসজল মুখ।

বলেছিল—সোনা-তুই আমার সোনা।

আজ সোনাকে বিদায় দিতে হবে। সে পড়তে যাবে দূরে, অনেক দূরে। সে বড় হবে।

সে বড় হয়েছে। আজ স্বর্ণ। স্বর্ণকমল মিত্র। কলেজে পড়ে। থাকে হোস্টেলে।

সপ্তাহে একবার আসে মায়ের কাছে। ছুটি-ছাটাতো আছেই, বারো মাসে ন'মাস। আজও সে মায়ের কোলের মধ্যে শোয়।

—খোকা!

—উঃ

—আর দু'দিন পরে যে তোর বিয়ে হবে। তখনও আমার কাছে শুবি?

স্বর্ণ লজ্জা পায়। মাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে।

—যাঃ! আমি বিয়ে করবো না।

মা মুখে মুচকি হাসেন। বুকের মধ্যে থমকে ভাবেন, একদা সন্ধ্যা নামের যুবতী তার বুকের মধ্য থেকে চিৎকার করে উঠেছিল—না। আমি বিয়ে করবো না।

মা আরো জোরে চেপে ধরেন খোকাকে।

বলেন—তাই বললে হয়, সবাইকে বিয়ে করতে হয়।

—কেন, আমাদের চার চার জন মুখ্যমন্ত্রী চিরকুমার, বিয়ে করেননি। বিয়ে না করে ওরা কত বড় হয়েছেন।

—পাগল ছেলে—

মা ছেলের মুখে মাথায় নরম হাত বুলিয়ে দেন। —ওদের সাথে আমাদের তুলনা হয়?

ছেলের অভিমান হয়। —তুমি কিচ্ছু জান না, শিখতে হয় বড় মানুষের কাছে।

গর্বে মায়ের বুক ভরে ওঠে। ছেলে আজ কত বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তার যৌবনের মতোই। মানুষ যৌবনেই সবচেয়ে বড় স্বপ্নটি দেখে।

মায়ের বুকের অন্ধকারে মরা আশা-অতীত এবং বেদনাক্ত বর্তমান, মাঝে মধ্যেই চলার পথে মুখোমুখি দেখা হয়, সংঘর্ষ হয়, রক্ত ঝরে। বুকের গভীরে যে গভীর ক্ষত চিহ্ন, শুষ্ক রক্তের দাগ তার শব্দময় করুণ আর্তনাদ শোনা যায়। কোনো কোনো পাহাড়ের বুকে কান চেপে ধরলে শোনা যায় অন্তর্লীন প্রস্রবণের সুদীর্ঘ ডাক। যদি স্বর্ণ একবার শুনতে পায় যদি শুনতে পায় সেই করুণ সুদীর্ঘ আর্তনাদ।

সন্ধ্যা বুকের মধ্যে চেপে ধরে স্বর্ণর মুখখানা, আরো জোরে চেপে ধরে।

সন্ধ্যা আজ ডালিয়া মিত্র। মিস ডালিয়া। তিন তিন বার সে হোটেল পাল্টিয়েছে। স্বর্ণই যেন তার জীবনে ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছিল। যে দিন সে স্বর্ণকে কুড়িয়ে পায় সেদিন রাত্রেই তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল ঝকঝকে মার্সেডিজ।

—ভেতরে আসবো?

—আসুন, বসুন।

লোকটি বসে না, দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্ধ্যা বলে—আপনাকে চিনলাম না তো।

—পরে চিনবেন, রক্সির মোড়ে আপনি গান গাইছিলেন?

—হ্যাঁ।

—গান জানেন, মানে শিখেছেন?

—হ্যাঁ।

—কতদিন?

—ভোর হল দোর খোল ছড়ার গানের রেকর্ডটি আমার।

—ওঃ সেতো এক কেলেংকারি। রেকর্ডটি থেকে তো একপয়সাও আসে না?

—না।

—হোটেলে গান গাইবেন?

—না।

—ফুটপাথে গান গাইবেন, হোটেলে গাইবেন না?

—না।

—ভেবে দেখুন, ফুটপাথের চেয়ে হোটেলে আব্রু আছে।

—চা খাবেন?

—চা খেতে আসিনি, ভেবে দেখবেন, চলি। আবার আসবো।

ভদ্রলোক পিছন ফিরে কয়েক পা যেতেই সন্ধ্যা ডাকে।

—শুনুন।

ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়ান।

—কত দেবেন?

—সেটা পরের ব্যাপার। ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি, দেখা করবেন।

—না, কাল বিকেলে এসে নিয়ে যাবেন।

—লোক পাঠিয়ে দেব।

—না, আপনি নিজে এসে নিয়ে যাবেন।

—বেশ, তাই হবে।

সন্ধ্যা পরদিন রাত্রে মিস ডালিয়া হয়ে ফিরে এসেছিল। হ্যাঁ, ফুটপাথের চেয়ে হোটেলে আব্রু আছে। ফুটপাথে ছেঁড়াপোশাকের ফাঁকে শরম বে-আব্রু হয়। শেয়াল-কুকুরে

টেনে ছিঁড়ে খায়। হোটেলে মূল্যবান জরিদার পোশাক, রঙিন আলোর নীচে বে-সামাল হয়ে খুলে পড়ে, খুলে দিতে হয়। বাঘ সিংহে তাড়িয়ে তাড়িয়ে চেখে চেখে নরম মাংস খায়।

শত ক্ষতচিহ্নময় এই শরীরের মধ্যে স্বর্ণকে টেনে নিতে সন্ধ্যার দ্বিধা হয়। কেঁপে কেঁপে ওঠে শরীর। তবু শরীর আর হৃদয়ের স্নেহ বুঝি আলাদা। কলঙ্ক স্নেহকে স্পর্শ করে না। স্নেহের ধনকে পাবার জন্যই এই কলঙ্ক। এইসব বোধ, যুক্তির আড়ালে সন্ধ্যা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। স্বর্ণ বড় হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে। সেদিন সন্ধ্যার মুক্তি। আঃ!

মাঝে মাঝে হোটেলের ডায়াসে বসে বুক ভরে নিশ্বাস নেয়।

গান শুরু করার আগে মনশ্চক্ষুতে একবার দেখে নেয় সন্তানের মুখ। তবু যেন বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারে না। এক অপূর্ণতা, এক অতৃপ্তি জেগে ওঠে বুকের ভিতরে। তবু সে গেয়ে ওঠে গান। ঘন ঘন আলো বদল হয় নাচ ঘরে। বিচিত্র সব মানুষ-মানুষী, পান করে, মাথা দোলায়, ঢোলে, নাচে, মাতলামি করে।

এতসব নামী-দামি মানুষ দেখে সে আর বিচলিত হয় না। প্রথম দিকে ভয় পেত। গলা দিয়ে সুর বেরতে চাইত না। অসহায় ভাবে তাকাত ব্যান্ড-মাস্টারের দিকে। ব্যান্ড মাস্টার বলেছিল—দূর, ওগুলো মাতাল, মানুষ নাকি? শুয়োরের জাত। যখন গান গাইবেন, ভাববেন, সামনে সব সারি সারি ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে।

ভেড়ার সামনে মানুষ ভয় পায় নাকি?

—কিন্তু গান?

—ওরা শোনেই বা কী, আর বোঝেই বা কী? যা গাইবেন তাই শুনবে। আসল হল বিজ্ঞাপন।

কিন্তু আজ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন তাদের হোটেলে। সন্ধ্যা নিজের ভিতরে একটু দুর্বল বোধ করে। ব্যান্ডমাস্টার আড়াল থেকে আঙুল তুলে দেখালো—ওই, ওই যে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বেঁটে মানুষটি উনিই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

সন্ধ্যার হিসেবে কোথাও গরমিল হয়ে যায়। বোকার মত ফিস ফিস করে শুধায়—উনি এখেনে কেন?

ব্যান্ডমাস্টার কখনও নিরুত্তর থাকে না। জুতসই একটা উত্তর দিতও। কিন্তু আলোর রং বদলে গেল।

শুরু হল উত্তাল তরঙ্গময় যন্ত্র-সংগীত। সন্ধ্যার মনে হল, ছন্দতরঙ্গ, তরঙ্গে উঠছে নামছে ঘুরছে, ঘুরে ঘুরে নাচছে মুখ্যমন্ত্রীর চারপাশে। যেন সব, সবকিছু আজকের এই আলো, উদ্দাম নৃত্য, অগুন্তি মদ্যপান, কাচের গেলাস, সারি সারি মানুষ-মানুষীর আসা

যাওয়া সব মুখ্যমন্ত্রীর কারণে। শুধু হিসেবের গরমিল, প্রশ্ন, সন্ধ্যার বুকের ভিতরে রিদমে রিদমে উঠছে নামছে ধাক্কা মারছে—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমার খোকা বলেছে, বড় মানুষ তুমি, তুমি এখেনে কেন?

এখানে মদ্যপান হয়। এখুনি নারীর নৃত্যে লজ্জা খুলে পড়ার মুহূর্তে হাততালি মুখরিত হয়ে উঠবে সমস্ত হল ঘর।

মুখ্যমন্ত্রী আজ সুস্থ আছেন। বেশ উল্লসিত বোঝা যাচ্ছে। একমুখ খুশি নিয়ে চতুর্দিকে বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। ঘরের এপাশ থেকে দ্রুত ওপাশে চলে যাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে পড়লে পা ঠুকে ব্যান্ডমাস্টারের তালে তাল দিচ্ছেন।

সন্ধ্যার মনে হল—হয়ত উনিও নাচের শেষে হাততালি দিয়ে উঠবেন, এবং অসাবধান থাকলে হয়ত জিভ থেকে গড়িয়ে পড়বে ভাদ্র মাসের লালা।

সন্ধ্যা ভুলে গেছে, এইবার মিস ডালিয়ার গান।

নির্দিষ্ট সময়ে গান শুরু হল না। ব্যান্ডমাস্টার একবার ড্রামের কাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়েছিলো। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। ব্যান্ডমাস্টার অবাক। —কী ব্যাপার!

পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য মিউজিকের পরবর্তী কম্পোজ শুরু করে দিলো। মিস ডালিয়ার এমন কাণ্ড সে এ পর্যন্ত কোনোদিন দেখেনি। সে দেখছিল, হলের ভিতরে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন মিস ডালিয়া।

কাকে দেখছেন! পাথর হয়ে কাকে দেখছেন মিস ডালিয়া! অনুচ্চারিত প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। মিস ডালিয়া যেন এই ঝংকৃত কোলাহল, শব্দলোকের বাইরে, বহুদূর তিনি। এবারের মিউজিকও শেষ হল।

ব্যান্ডমাস্টার কৌশলে মিস ডালিয়ার শরীর ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন।

আগুন জ্বলে ওঠার হিস শব্দে মিস ডালিয়া জেগে উঠলেন।

—মদ খাচ্ছে! ওকে!! খোকা!!!

স্বর্ণ তার আদর্শ পুরুষকে সামনে রেখে মদ খাচ্ছে এবং একটু পরেই হয়ত ক্যাবারে ডান্সারের কোমর জড়িয়ে ধরে তার নাভিতে চুমু খাবে।

কেঁপে উঠলো সন্ধ্যার সমস্ত শরীর। কেয়ারলি কেয়ারলেস ড্রেসের আড়ালে টেনে নিল সমস্ত শরীর।

তারপর মিস ডালিয়াকে দেখা গিয়েছিল পথে, প্রায় পাগলিনী।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

স্বর্ণ তখন হসপিটালের চত্বরে পৌঁছে গেছে। সেখানে ছোটখাট ভিড়। গোল হয়ে সকলেই কী শুনছে। সম্ভবত এক সাংবাদিক ছোকরা, ঝাঁকড়া উসকোখুসকো চুল ঝাঁকিয়ে

বর্ণনা করে যাচ্ছে। স্বর্ণ কিছু বোঝার আগেই, ভিড়ের চাপ এসে তাকে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল বক্তার কাছাকাছি—

—সমস্ত কোলকাতার গতিকে স্তব্ধ করেছিল ওই এক মহিলা। আশ্চর্য, বাস, ট্রাম, ডবল ড্রেকার সব দাঁড়িয়ে গেল। কোনো হুঁশ নেই, উনি ছুটছেন তো ছুটছেন। আর হাত উঁচু করে, ঘুঁষি পাকিয়ে, চিৎকার করে যাচ্ছেন, কী চিৎকার, কেন চিৎকার, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। মহাকরণের কাছাকাছি একটি মিছিল যাচ্ছিল, উনি ঢুকে পড়লেন মিছিলের মধ্যে। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠলেন—ক্যাবারে ড্যান্স বন্ধ কর।

মিছিলের স্লোগান হকচকিয়ে গেল। নেতারা কিছু বোঝার আগেই মিছিলের একটা অংশ চিৎকার করে উঠল—ক্যাবারে ড্যান্স বন্ধ করো।

মহিলা চিৎকার করে উঠলেন—মদ বন্ধ কর।

মিছিল সাড়া দিল—মদ বন্ধ কর।

একজন নেতা হয়ত কিছু না বুঝেই কিংবা কিছু বুঝে নিয়ে হেঁকে উঠলেন—মদের লাইসেন্স বাতিল কর।

জনতা চিৎকার করে উঠলো।

মহিলা দ্রুতগতিতে মিছিল ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন, মিছিলের একটা অংশ ভেঙে বেড়িয়ে গেল সেই তেজি, দৃপ্ত মহিলার নেতৃত্বে।

মিছিল ঢুকে পড়তে চাইল মহাকরণের গেটের ভিতর।

সাংবাদিক এবার থামলেন। তারও গলা চড়ে গিয়েছিল। গলার স্বর একটু সামলে নিয়ে বললেন—এর পরে তো, আপনারা জানেন। গতকালের কাগজে বেরিয়েছে। চতুর্থ পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে—লাঠি চার্জ, গুলি—ইত্যাদি।

ভোটবিজয়া

মমতা কাঁপছে। আর পারল না।

বাঁশের খুঁটি ডান হাতের মুঠোয় চেপে দাঁড়িয়েছিল। পাকা বাঁশের খুঁটি, ঘরের মাথা ধরে আছে। মমতাও শক্ত করে ধরে ছিল। এবার কেঁদে ফেলল। হাতের মুঠি অবশ হয়ে এল। মুঠির ভিতর দিয়ে বাঁশখানা ধীরে ধীরে উঠে গেল উপরে। মমতা বসে যাচ্ছে মাটিতে, ঘরের দাওয়ায়। যেন বাঁশ তার শরীর মন ভেদ করে উঠে যাচ্ছে।

বাঁশের খুঁটিতেই ঠেস দিয়ে দম নিতে চাইল মমতা। বাড়িময় পোড়া ডালের গন্ধ। রঘুনাথতলার বাতাসেও যেন দুর্যোধন-দুঃশাসন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। শাড়ি ছেঁড়ার শব্দে এক আঁচল বাতাস বেরিয়ে এল বুক চিরে।

চিত্রসাংবাদিক ভিডিও ক্যামেরার ছবি নিতে নিতে পিছিয়ে যাচ্ছে। সে মমতার কালো রঙের ছায়া তার ফ্রেমে দীর্ঘতর করে যাচ্ছে। দীর্ঘতর ছায়াকে, মমতার প্রতীক করে; ক্রমশ অন্ধকারে মিলিয়ে দেওয়ার পজিশান নিচ্ছিল। এরপর যাতে ফেড-আউটকরা যায়। দেখতে দেখতে ভিড়ের অসংখ্য ছায়াও মিলিয়ে গেল ছায়াহীন উঠোন থেকে। মমতা একা।

ছবির একটাই মুখ। গল্প বিচিত্রমুখী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রাবণ কখনও গণেশের মতো। এ গল্পের অন্যমুখে তখন রাত্রি। পূর্ণিমা। জোছনা ছড়িয়ে পড়েছে মমতার মাথার ভিতরে। পাশ ফিরে শুলো সদ্য রতিক্লান্ত নিবারণ। ভোটে নমিনেশন পেয়ে গেছে। আর চিন্তা নেই। জিতলেই প্রধান। প্রধান শ্রী নিবারণচন্দ্র মণ্ডল, পাশ ফেরাও শেষ—সশব্দে ঘুম। ঘুমালে নিবারণ বিশ্রী নাক ডাকে। মমতার ঘুম আসে না। নমিনেশন পাওয়ার রাতেও একটু আনন্দ করে জাগতে পারে না। কেমন যেন মানুষটা। অন্ধকারে প্রিয় পুরুষের মুখখানা অনুভব করে হাত বুলিয়ে। পারে কেমন করে। মানুষটা ছুটছে। খাওয়া নেই ঘুম নেই। এই মিটিং তো ওই মিছিল। ডোর টু ডোর ক্যামপেন। খাটনির কাছে গরু মোষও ছেলেমানুষ। নাকের সঙ্গে খোলা ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে ঘুমের ডাককে আরো নোংরা করে তুলছে। হাতের প্রথম তিনটে আঙুল বুলিয়ে, মমতা বন্ধ করে দেয় খোলা ঠোঁট দুটো।

নিবারণ বলে—পাঁচ বছর অন্তর একবারই তো। বাঁধা গরু ছাড়া পাওয়ার মতো ছুটতে হবে, মম্। কষ্ট ভাবলে হবে না। তারপর পাঁচ বছর কি, সারাটা জীবন ঠ্যাং এর উপর

ঠ্যাং তুলে হাঃ হা হাঃ—

বলেই চকাশ শব্দে একটা চুমু। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ করার পর দ্রৌপদীর প্রথম চুম্বনের মতো লজ্জায় রাঙা হয়ে মমতা বলে—যাঃ। এই গভীর সুখ-স্বপ্ন একা মমতার।

প্রধান মাধব বিশ্বাসের ঘরে কী ছিল? ঘোড়ার ডিম। টিনের চাল ঢালাই হলো। খাট হলো, টিভি হলো। পাড়ায় প্রথম ফ্রিজ বলে কথা। মমতা দেখে এসেছে। গোদরেজ কোম্পানির। চেরি ফলের মতো টকটকে রঙ।

পার্টি থেকে এবার ওকে নমিনেশন দেয়নি। একটু রেখে ঢেকে ফুটানি কর। হাঁদার মরণ। ওর জন্যেই পার্টির হয়েছে কলঙ্ক। ওর জন্যেই নিবারণের হাত পা ভাঙা খাটুনি। হাড় মাস এক হয়ে যাচ্ছে মানুষটার।

টিভিটা মমতা শোয়ার ঘরে রাখবে। শুনেছি সনি কোম্পানিই সেরা। রঙিন টিভি। যতই দেখ চোখ ঠাণ্ডা থাকে। নিবারণ বলেছে, একটা ভিসিপি কিনবে। পাড়ার প্রথম ভিসিপি। রাতে নীল ছবি দেখবে। দুজনে। আর কেউ না। শুধু দুজনে। শহরে নিবারণের এক স্কুলমাষ্টার বন্ধুর বাড়ি সবাই মিলে নীল ছবি দেখেছে। একসঙ্গে। সে এক কেলেঙ্কারির রাত।

—ছিঃ।

এবার প্রধান হচ্ছে কে?

নিবারণ মণ্ডল আবার কে।

নিবিড় বিশ্বাসে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরতে ধরতেই অকস্মাৎ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ওরা। মাথায় ফেটি। মুখে কাপড়। চোখে চশমা। আধো ঘুম আধো স্বপ্নে মমতা বুঝতেই পারেনি ওরা কারা। হাতে পিস্তল, বন্দুক, পাইপগান। কেন? ওরা কেন? কী তছনছ করছে? কার সর্বনাশ। ওগো—

—নিবারণ, এই শ্লা, নিবারণ।

মমতা আর কিছু জানে না।

এ গল্পের অবশ্য দুটো মুখ। যে মুখ অন্ধকারে, যে মুখ দেখা যায় না, তার টান বেশি। তাকে ছোঁয়ার জন্য আকুলি বিকুলি। তাকে দেখার জন্য রাত ফোটে। জ্ঞান হয় মমতার। ধড়মড় করে উঠে বসে। বিছানা ফাঁকা। মানুষ নেই।

—ওগো, তুমি কোথায়? কঁকিয়ে ওঠে মমতা।

ভোরের গোয়ালে বাঁধা বলদের জান্তব আর্তনাদের মতো নিবারণ ডেকে ওঠে। মমতা দ্রুত মুক্ত করে নিবারণের বাঁধন। চেয়ারে বসা নিবারণের হাত পা মুখ প্রাণপণ শক্তিতে বাঁধা ছিল গরুবাঁধা দড়িতে। সারা গায়ে দাগা দাগা দড়া দড়ির ছাপ। ইস্,সারা শরীর যেন সাপের আস্তানা।

মমতা তখন নিচু হয়ে দেখছিল, নিবারণের পায়ের পাতায় ছুড়ে মারা চেয়ারের দাগ। ক্ষত চিহ্ন। ফেটে রক্ত জমে আছে। আহা! সে হাত বুলিয়ে ব্যথা অনুভব করতে চাইলো। নিবারণের চোখের জানালায় হঠাৎ উঁকি দিয়ে গেল, গল্পের অন্ধকার মুখখানা। কদাকার, হিংস্র। অকস্মাৎ নিচু হয়ে হাতের নখ দাঁত দিয়ে হাঁচড়ে কামড়ে, মমতার ব্লাউজ ছিড়ে, কাঁধের রক্ত বের করে দিল। যন্ত্রণায় অস্থির মমতা আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠার আগেই তার মুখ চেপে ধরল। ফর্‌ফর্ করে ছিঁড়ে দিল শাড়ি। বুকের মধ্যে চেপে ধরে হিস হিস করে বলল—চুপ, পুলিশ কেস শক্ত হবে। অসহায় মমতা নিস্তেজ হয়ে এল হবু প্রধানের বুকের ভিতর। নিবারণ মমতার মাথার মধ্যে ঝড়ো হাত ঢুকিয়ে এলোচুল তছনছ করে একটা চুমু খেয়ে বলল—লক্ষ্মী মেয়ে।

সিঁথির সিঁদুর পাল্টে মুখ কাঁধ সিঁদুরাক্ত করে দিল। উদভ্রান্ত মমতা স্বামীর সোহাগ বোঝার আগেই নিবারণ ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল—ওরে বাবারে। কে কোথায় আছিস্, শিগ্গির আয়, ডাকাত পড়েছে।

উনুনে ডাল চাপানো। জল কমে এসেছে। ডাল বলছে থ্যাকা, থ্যাকা। থ্যাকা, থ্যাকা।

মমতা কাকে ঠেকাবে। কাল রাত্রি পার হয়ে আটদিন। আজ অষ্টমী। মহাষ্টমী। ভর দুপুর। আজও বাড়িময় লোকজন হৈ চৈ। আর কত ঠেকাবে। আজও, আজও ছবি নিয়ে গেল এ টিভির চিত্র সাংবাদিক। মমতা আর পারছে না। দুহাতে মুখ ঢেকে এবার কেঁদে ফেলল।

—স্যার, দয়া করে এ পোড়ামুখ আর দেখাবেন না।

—আপনাকে যারা অত্যাচার করেছে তাদের কাউকে চিনতে পেরেছেন? মমতা বাঁশের খুঁটি বুক দিয়ে চেপে ধরে বলল, আর কতোবার, কতোবার বলবো, ওরা আমাকে কেউ ছোঁয়নি পর্যন্ত।

চোখ বন্ধ করে বলল—ভয়ে চোখ বন্ধ করেছিলাম আমাকে ছেড়ে দিন।

রান্নাঘরে ডালের বুক শুকিয়ে আসছে। বলছে,

—থাক, থাক। থাক, থাক।

—আপনার স্বামী বলেছে, ওরা অপোনেন্টের পোষা গুন্ডা। ভোটে নোমিনেশন তুলে নেওয়ার জন্য অত্যাচার চালিয়েছে। আপনি কাউকে চিনতে পারেননি? ঠিক বলছেন?

আর অত্যাচার করবেন না। দয়া করে ছেড়ে দিন আর কিছু জানি না। কিচ্ছু জানি না।

—আপনার ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টটা একবার দেখাবেন, প্লিজ।

কড়াইয়ে ডালের বুক জ্বলে উঠেছে। মমতা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে—কতোবার? আর কতোবার? আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। আপনারা যান।

মমতা আসলে বলতে চেয়েছিল—আর কতোবার দ্রৌপদী হয়ে যাবো।

ডালের বুক পুড়ছে—চটপট, চটপট্।

—সো কাইন্ড অফ্ য়ু, দিদি, আর একটা প্রশ্ন।

ভোটের খেলায় স্বামীর সাথে গটআপ খেলছেন না তো?

—আপনারা যাবেন কিনা বলুন? ঘটি বাটি ছুড়ে মারবো। ছোটোলোক কোথাকার?

হাতের কাছে বদনা ছিল। মমতা সত্যিই বদনা ছুড়ে মারলো ক্যামেরা লক্ষ্য করে। রাগে অপমানে তখন সে কাঁপছিল। বদনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। রাগ ছাপিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল মমতা।

ডাল পোড়া শেষ। গোটা বাড়ি শ্মশান। বাড়িময় পোড়া ডালের গন্ধে বাতাস নোংরা হয়ে আসছে। এই নিয়ে আটদিন জ্বলছে। একটা মানুষ আর কত ঝলসাবে? পুলিশ, পুলিশের পর পুলিশ, ভয়, লজ্জা, ডাক্তার, নেতা, নেতার নেতা, তার নেতা, ঘেন্না, পিত্তি, অম্বল, সাংবাদিক, ক্যামেরা—জঘন্য, ডাকাত গুন্ডাদের চেয়ে জঘন্য।

খুঁটিতে হেলান দিয়ে পড়ে থাকে মমতা। ডাকাতরা বন্দুকের বাট দিয়ে শুধু ধাক্কা মেরেছে। দেয়ালে মাথা ঠুকে ... না, আর কিছু মনে পড়ে না।

এরা দিনের আলোয়—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

মুখের ভাষায় নর্দমা উঠে আসে। পুলিশ কিনা জিজ্ঞেস করে—বুকের উপর ক'জন চড়েছিল?

গা'র মধ্যে পাকিয়ে উঠল। খালি পেট। মমতা দু'তিনবার তলপেটে ঝাঁকুনি দিয়ে দুর্গন্ধময় সামান্য বমি করল।

ডাক্তার কিনা জিজ্ঞেস করে—ধর্ষণকারী আমার পূর্বপ্রেমিক ছিল কিনা? শরীরে মা মিলনের চিহ্ন আছে। নিম্নাঙ্গে কোন অত্যাচারের চিহ্ন দেখছি না যে!

—মরণদশা! মা তোর চোদ্দপুরুষের মা। শয়তান ডাক্তার কোথাকার!

হাতের কাছে জল এগিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। বমি, কথা কিছুই ধোয়া যাবে না। বমি মুখে, মনের কথা মনে জড়িয়ে, চোখ বন্ধ করে থাকে মমতা। ঝিম লাগছে। মুখপোড়া ডাক্তার, জানিসনে, স্বামী পাশে শুয়ে ছিল। ডাকাতি হয়েছে শেষ রাতে। ঘরে বউ নেই? স্বামী স্ত্রীর চিহ্ন চিনিসনে? কিসের ডাক্তার? খাটা পাকাই তোর ডাক্তারি পরীক্ষার।

একের পর এক। দাদা, দিদি, কমরেড, মমতা একা কত সামলাবে? তিনি তো ভোট ভোট করে পাগল। বউ মরুক, সুইসাইড করুক, কিছু আসে যায় না। বাবু আসবেন, এক থাল বেড়ে দাও। কাঁচা, সেদ্ধ, ঘাস, খোল যা দাও দেখার অবসর নেই। গর্ত বোঝাই করে আবার বেরুবেন। ইনকিলাব, জিন্দাবাদ।

ঘরদোর নেই, সেই ভোটযজ্ঞ, নরক হয়েই পড়ে আছে। ঘরময় চেয়ার টেবিল বিছানা বালিশ তোষক তছনছ, কিছুই গোছানো যাবে না। সাতদিন সেই বাসি ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া ব্লাউজ পরে কেটে যাচ্ছে। পার্টির হুইপ। সবকিছুই এরকম ছবির মতো থাকবে বিজয়া দশমী পর্যন্ত। বাড়িঘরদোর এই মানুষ, সব নাকি ভোটের জীবন্ত পোস্টার। টিভি, রেডিও, খবরের কাগজ, এই এক্সট্রিম পিরিয়ডেও প্রচার করতে বাধ্য হচ্ছে।

সেক্রেটারি বললেন—এমনটাই চেয়েছিলাম।

মমতার হাড়-মাস-চামড়া সব ডুগডুগি হয়ে আছে। যে আসছে সেই বাজিয়ে যাচ্ছে। মাথা মনে হচ্ছে, পোড়া ডালের চেয়ে শক্ত কাঠ। স্নান হয়নি। রোদ্দুরে গোটা দেহ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। মুখ-চোখ চচ্চড় করছে।

রান্না সে আজ করবে না। যা অনাসৃষ্টি হয় হোক। দরকার হলে দু'চোখ যেদিকে যায় চলে যাবে।

নিবারণ বলেছে—এখন কোথাও যাওয়া হবে না। ভোটের প্রচার চলছে।

যেতে দেবে না, ভোটের প্রচার! ঝাঁটার বাড়ি, এমন প্রচারের মুখে। তোমার চারকুলের গুষ্টিরা যখন আসছে, ভিটেয় থাকতে পারছ না?

মমতা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে পড়ে থাকে। ওঠে না। কাঁদে না। রাঁধে না। বেলা যায়।

কোলকাতা থেকে নারীমুক্তি বাহিনি এসেছিলেন। বলে গেছেন—ভয় নেই বোন ... নারীদেরও গণতন্ত্র আছে।

গল্পের সে মুখ দেখা যায় না। গল্পের গভীরে থাকে, তারও একটা শরীর আছে। বেঁচে থাকা মানে জীবনযাপন, মানে একটা চরিত্র আছে। এ গল্পে সে চরিত্র হনুমানের হাতে রাবণের মৃত্যুবাণের মতো।

বেলা তিনটে নাগাদ নিবারণ সেই তিরের ফলার মতো বাড়ি ঢুকলো। নিবারণ কিন্তু নিজেকে তীরের ফলা ভাবে না। ভাবে, সে পালের গোদা। সঙ্গে একপাল লেজুড়। দুপ-দাপ শব্দে ভরে উঠল উঠোন।

খুব কষ্টে চোখের পাতা টেনে খুলল মমতা। মাথার চারদিক থেকে টিভি, ফ্রিজ, ভিসিডির মতো ঝুপঝাপ পড়তে থাকে আশা-ভরসার বাণী। তিতো বাতাসে মমতার মুখ চোখ আরও কূট ধোঁয়াশায় ভরে গেল।

—কী হয়েছে বৌদি?

—নতুন কিছু?

—এবার কিছু হলে শালোদের কুপিয়েই শেষ করে দেবো।

—কে এসেছিলো?

—এবার ভোটে কবর দেবোই দেবো।

মমতা কিছু বলে না। নতুন করে বলার কিছু নেই। নিবারণ হাত ধরে তুলতে গেল।

—একি জ্বর তো। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে!

—সত্যি মাইরি, তুমি পারও বৌদি, আজ আমাদের মহামিছিল, জ্বর বাধিয়ে বসলে? এল এস (লোকাল সেক্রেটারি) কি ভাববে বলোতো?

নিবারণ বাইরে খেয়ে এসেছে। রান্নাঘরে সকালের বাসি পান্তা পড়ে লাল হয়ে আছে। কড়াইয়ে দুপুরের ডাল পুড়ে কাঠ হয়ে গেছে। নিবারণ একগ্লাস জল গড়িয়ে খেল। এসব কিছুই নজরে এল না। বিকেলের টাটকা রোদ্দুর গড়াগড়ি খাচ্ছে রান্নাঘরের মেঝেতে।

নিবারণ হাত ধরে মমতাকে বিছানায় নিয়ে গেছে। শুইয়ে দেওয়ার সময় বলেছে—এখন ফুল রেষ্ট। নো চিন্তা। মহামিছিলে একটু কষ্ট হলেও আজ যেতে হবে মম্। উপায় নেই। পার্টির সিদ্ধান্ত।

থুতনি ধরে ছোট্ট করে নেড়ে দেয়।

—আমার দুষ্টু মম্। ভয় কী, আমি তো আছি। মমতার কোনো উত্তর নেই। জ্বরে বেহুঁশ।

কোলকাতা থেকে পার্টির বড় নেতা এসেছিলেন। গায়ে হাত বুলিয়ে বলে গেছেন,

—তুমি একা নও, মা। আমরা তোমার সাথে আছি।

পাড়ার মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে মিছিল চলছে। জল আর প্যারাসিটামল খাইয়ে দুষ্টু মমকে নিয়ে মিছিলে বেরুতে নিবারণের রাত হয়ে গেছে। মিছিলের মুখে হ্যাজাগের আলোয় সাজানো গরুর গাড়ি। গরু মোষেদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। গরু মোষের অভাব পূরণ করেছে ভোটকর্মীরা। নিজেরাই টেনে নিয়ে চলেছে নিজেদের কীর্তি। শহর থেকে ভাড়া করা মখমলের তাকিয়ায় আয়েস করে বিশ্রামের ভঙ্গিতে মমতা যেন ভোট-মাতা। নিবারণের একান্ত বিশ্বাস, অসুস্থ মমতার করুণ মুখচ্ছবি ভোটের হাওয়া তুলে দেবে। লোকাল কমিটির সেক্রেটারি খুব খুশি। মোড়ে মোড়ে বক্তৃতা। নির্বাচিত গান—কেন চেয়ে আছো গো মা ...

ভোটে হাওয়া কি, ঝড়ও উঠে যেতে পারে।

—এই অত্যাচারীদের চিনে নিন

—এবার ভোটে কবর দিন।

—নারীদের ইজ্জত রাখছে কে?

—নিবারণের দল আবার কে।

—মমতা বৌদির ইজ্জত

—উঁচা রহে, উঁচা রহে।

রাত বাড়ে। জ্বর বাড়ে। ভয়ও বাড়ে।

জ্বরের ঘোরে বেঁহুশ মমতা পড়ে থাকে মখমলের তাকিয়ায়। সকলেই শশব্যস্ত। মহামিছিল তখন উদ্দাম। জ্বরের ঘোরে মমতার মনে হয়, অন্ধকারে কেউ যেন তার শিয়রে। গা ঘেঁষে খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার বিশাল থাবা স্নেহের ভঙ্গিতে নামিয়ে আনছে মাথার উপর। তার হাতের ছায়া অসহ্য, অসহায় লাগছে।

মেঘনাদ হত্যাকারী লক্ষণ—অন্ধকার যেন গন্ধমাদন পর্বতের ভার। তার ভয়ঙ্কর দম বন্ধ করা আঠালো ছায়া। মমতা ভয়ে পালাতে চেষ্টা করে। মমতার পা দুটো ভারি, ভীষণ অবশ হয়ে আসছে।

কিছুতেই ছুটতে পারছে না।

কষ্ট বাড়ছে। পায়ের মতো মাথা, মুখ, বুকের ভিতর কেমন শক্ত দম-বন্ধ ভোটের পাথর জমে গেছে।

মনে হয় কারা যেন, সপ্তরথী চারপাশে ঝন ঝনাৎ অস্ত্রের বিপুল অন্ধকারে ঘিরে আছে। প্রথম মহারথী রক্তচক্ষু ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে, না বিকার। আসলে মমতা নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করে—মম্ তুমি কি ধর্ষিতা?

মমতা স্থির। মম্ তুমি কি ধর্ষিতা?

নিবারণ তখন অনেক দূরে। যুদ্ধক্ষেত্রে। সপ্তরথী-চক্রব্যূহে বন্দী। বক্তৃতায় ব্যস্ত।

না, প্রতিবাদ নেই। নিঃঝুম।

মমতার স্বর শক্ত হয়ে গেছে।

ঠোঁটের পাথর কোণে এক চিলতে ফাটল বুঝি হেসে ওঠে।

ধর্মরাজ।

রাত বাড়ে। মহা অষ্টমী শেষ হয় হয়।

মিছিল চলছে। বিকার বাড়ছে।

টিউমার

এক

... আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্র আমাদের মা। এই মা ধর্ষিতা। পুঁজিপতিরা তাকে ধর্ষণ করছে। ভ্রষ্টাচার করছে। কমরেডস্, একদিন গণতন্ত্রের গর্ভ থেকে জন্ম নেবে সমাজতন্ত্র ...

হাততালি। ময়দান হাততালির ফসলে ভরে গেল। আর দেরি চলে না। বক্তৃতা ভালই লাগছিল। কিন্তু মুশকিল, এটা বিয়ে বাড়ি না। বাচ্চারা এত কম আসে মিটিংএ। মিছিলে আসার সময় লক্ষ্য করেছে, মিছিল অনন্ত লম্বা, ছোট পা একদম নেই। মাত্র একজোড়া, তারই। বেঁটে হয়ে জন্মানোই অভিশাপ!

বছর দশেকের একটা মেয়ে, হাঁ-নয়নে বক্তৃতা গিলছে। ঠিক পিছনে, সোনালি জরির কাজ করা একজোড়া জুতো। হাতের ইশারায় পাশের কমরেডদের বলল—দাদা, একটু সরে সরে। টুপ করে বসে গেল রবি। শেষ পর্যন্ত মেয়ের জুতো! তা হোক, মেয়েছেলে ও তো হতে পারে! —না, বক্তৃতার গরম শুনে মনে হচ্ছে, সমাজতন্ত্র একটা সিংহের বাচ্চাই বটে। আমার ব্যাটাছেলেই হবে। সিংহের বাচ্চা।

রবি উঠে পড়ে। পাশের মানুষ বিরক্ত হয়।

—এ্যাই খোকা, চুপ করে বসো না!

উত্তর দেয় না, রবি উঠে পড়ে। মাত্র সাড়ে চার ফুট লম্বা সে। পাড়ায় ডাকে বেঁটে রবি। কেউ আদর করে রবিউল। মানুষেরা কি মেয়েমানুষেরা পর্যন্ত তাকে খোকা ভাবে।

একটু আড়ালে রবি খিক খিকিয়ে হাসে। এখন অবিশ্যি হাসার সময় নয়। কাঁচুমাচু মুখে খানিকটা এগিয়ে যায়। ঢোল্লা হাফপ্যান্টের কিনার একজনের নাকে ঘষে গেল। সে একটা থাপ্পড় চাপিয়ে দিল রবির পাছায়। সে আসলে বলল—জলদি হট্ ব্যাটা। সবাই মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনছে। কথা বলা কঠোর নিষিদ্ধ। পয়মন্ত সময়। এক ঝলক হাততালির হাওয়া বয়ে গেল বক্তৃতার ফসলে। আঃ একেবারে আনকোরা! শালোর ছেলেকে বুটজোড়াই পরাবো। রবি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে জুতো জোড়ার দিকে চেয়ে থাকলো। ফর্সা এক জোড়া পা ... কালো বুটজুতোর মধ্যে ... থপ্ ... থপ্ ... হাসিটা আর একটু হলে গলায় এসে গিয়েছিল। ইচ্ছা দিয়ে খপ করে চেপে ধরল হাসিটা।

নিজেকেই বলল—ব্যাটা হাসির সময় হলো এটা! জুতোর মালিককে কোথাও দেখা যায় না। এত ছোট পায়ের মুখখানা কৈ? রবিউল ভিড়ের মধ্যে খোঁজে। মালিককে না পেলে চুরি হয় নাকি! তাহলেতো কুড়িয়ে পাওয়া হয়। তাছাড়া আশপাশ থেকে মালিকের গার্জেন হয়ত কড়া নজর রাখছে। বিপজ্জনক ব্যাপার। তারপর পায়ে খাটবে কিনা ঠিক নেই। পরা অভ্যেসও নেই। তাড়লে ছোটা মুশকিল।

রবি টুপ করে আবার বসে পড়ল, জুতোজোড়া আড়াল করে। যতদূর চোখ ঘোরে, কেউ নজর রাখছে না। তবু যেন অন্যের জুতোই। খেলাচ্ছলে পরছে-খুলছে—পায়ে খাটে কিনা দেখছে। আবার জুতো জোড়া কেউ দেখছে কিনা সে পরখও হচ্ছে বটে। বেশ খেটেছে। ফিতে বাঁধা হয়ে গেছে। এবার পিটটান। নিচু হয়ে কারো অসুবিধে না করে সোজা ভিড়ের বাইরে। আরও একদফা হাততালি।

এতক্ষণে বসন্তের বাতাসে বক্তৃতা আর হাততালি দুটোই বেশ খুলেছে। বাব্বা! এর চেয়ে বিয়ে বাড়ি চটি সাইজ করা অনেক সহজ। পকেট থেকে ভেলিগুড়ের টুকরো বের করে একবার আরাম করে চাটলো।

শালা, ম্যানিয়া। ম্যানিয়া থেকেই চোর ধরা পড়ে। ভেলিগুড়ের টুকরোটা আঙুলের ফাঁকে। একবার দেখলো। রাংতা জড়ানো। চকচকে রুপোলি কাগজ। বৌ-এর মুখই বটে।

—রাংতা দেখলি আমার কতা ভেবো।

বৌ বলেছিল।

না জড়ালে বকে। অনেকেই ভেলিগুড়ের আঠায় লাগা ছাইভস্ম গিলে ফেলে। সেও খেতো। বিয়ের পর একদম বন্ধ। রবিউল ফিক করে হাসে।

জুতো জোড়া বেশ মজবুত হয়েছে। নটি বয়-ফয় হবে। দ্রুত হাঁটে। বাড়ি পৌঁছে তবে নিরাপদ। মঙ্গলবার। মালিকের দোকান বন্ধ। সামনে চার স্যাঙাত। নির্ঘাত বিড়িতে গ্যাঁজা টানছে। ওরা চোখ নাচালো। স্টিয়ারিং-এ দু'বার ঝুল দিয়েও সামলে নিলো। সেও কড়ে আঙুল তুলে বাহ্যে দেখাল। পায়ের দিকে তর্জনী ফুটিয়ে ওরা দাঁত বের করে। কোন কথা নয়। সোজা বাড়ি। ভেলিগুড়টা আর একবার চুষে নিল। সাধারণ ভাবে সে হাঁটে না, দৌড়ায় না। এখন হাফ-দৌড়।

বেরুবার সময় দেখেছে, বৌ পেটের ব্যথায় কঁকাচ্ছে। —বিনিকষ্টে ছেলে? অতটা গুড় আধসের না, হিঃ! তবে পা দুটো ফুলেছে। ক'দিন কাজে যায় না। যাই বলো, পা ফোলাটা বেশি বেশি। ঘোড়া রোগ। কেমন ভয় করে।

—বৌ! ও বৌ!

রবিউলের মেয়েলি চিকন গলায় আদর ফোটে না। ঘরের মধ্যে একটা জান্তব গোঙানি

গড়িয়ে গড়িয়ে এল ঝাঁপের দিকে।

অন্ধকার পুরু হয়েছে। এপাশ থেকে বোঝা হল না। ওপাশে কখন ঠেসানো ইটখানা সরে গেল। আঁধার ঘর। রবি টেমি খুঁজে পেল। দেশলাই পেল না। দেলকো উল্টে গেল। গাঁথনি কাঁধায় রাখা চুরি করা জুতো। সব হুড়মুড় করে ছড়িয়ে পড়ল। একটু হলে, চোরাই গামবুটটাই উল্টে যাচ্ছিল। রাগে গামবুটখানা অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল। গিয়ে লাগল বৌ-এর পেটে।

বৌ যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল—গেনু, গেনু, গেনু ... রবি খিস্তি করল—বেবুশ্যে মাগি, টেমির তেলটুকুও গিলে রেখেছো!

দুই

বারো বেজে রাত তেরোর কাঁটায় ঝুল ঝুল। রবিউল ভ্যান রিক্সায় বৌ চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে। বিশাল বৌ। ভ্যানের মাচায় আঁটছে না।

নিশুত পহর। এত অন্ধকার হাতের গা দেখা যায় না। দূরের শেষ মাথায় কুকুর কাঁদছে। অপয়া রাত্রি।

বুড়ো প্যাডলার, ছাই টানতেও পারে না। এতক্ষণে সাডেন ক্লাব। দ্বিগুন রাস্তা পড়ে। শালা, আল্লাও মেরে রেখেছে। নইলে ফন ফন করে হাসপাতালে পৌঁছে যেতো গাড়ি। বেঁটে রবি প্যাডেলে পা পায় না। হাত কোলে নিয়ে বসে থাকো! স্যাঙাৎ আসে চারজন। হেঁটে। অনেক পেছে।

—হ্যাঁ চাচা, খেইচো কি? খিচো, খিচো, পায়ের ডিমে তাগদ দাও। বৌটাকে মারবা নাকি?

ফদে চাচার প্যাডেল হড়কে যায়। পা আবার টেনে তোলে প্যাডেলের পাতায়।

—হু, চাচার শ্বাস বয়, কথা বয় না।

শুনশান। এ রাতের সাকিন নেই। ঈশান কোণে শেয়াল কঁকায়।

—মিলনের ডাকগো চাচা।

ভ্যান রিক্সায় তেল নেই। রুক্ষ চেনের মত রবির বুক টনটনায়।

—বৌ গো।

—উঃ!

বৌটা আর কাতরায় না। পারে না। চুপমারা। ছেলে হবে। সেই ভেবে শরীলের কষ্ট পিছলাচ্ছে। যদি না বাঁচে! রবিউল শরীরে টান দেয়। কি হবে! হিঁদুর মেয়ে। কলমা করেনি। চন্দ্রা পুড়বে না মাটি নেবে? —হা আল্লা! নাম বটে। ফুটফুটে। বাবুর ছেলে

নষ্ট করলো। নইলে বড় ঘরের বৌ হতো। কিন্তু ... গনাই বাড়ির কাজ কেন, কেন ছাড়ল না বৌ? বলেছিল—আনবাড়ি কাজ মিলছে না।

সাচ্‌তো, না বাবুর ছেলের সাথে আশনাই আছে! ভ্যানরিক্সার চেন কটকটায়। রবি টান হয়। ঠিকই তো। নইলে ওই বাড়িতে জমবে কেন?

কিন্তু ... রাতে যে গলা জড়িয়ে কেঁদেছিল। সে রাত। সারারাত কেউ মিথ্যে কাঁদতে পারে?

মুদি দোকানের কাজ। রাত হয়। সেদিন নিশুত একটু বেশিই ছিল। গনাইবাবুর বারদুয়োরে লাশটা পড়ে ছিল। দোকান ফেরত কুড়িয়ে এনেছে রবি। মালিক ছিল না। চন্দ্রা তার কুড়িয়ে পাওয়া-হকের জিনিষ। চুরির মাল নয়।

বলেছিল—আঃ খুব কষ্ট! একটু জুড়িয়ে দাও না গো। বাবুর জানোয়ারটা খুবলে খেয়েচে। রাক্ষসটার দাঁতে মুখে এখনও কাঁচা রক্ত লেগে আচে। আমি হাঁ মুখ দেখতে পাচ্ছি।

ভয়ে চিল্লাতে চেয়েছিল। সে দেয়নি। দু'হাতে চেপে ধরেছিল চন্দ্রার মুখ। জানাজানি হলে খুন করে ফেলবে। বাবুদের পোষা গুন্ডা আছে।

পরদিন কেউ চন্দ্রাকে চাইতে আসেনি। চন্দ্রা তার। একেবারে। এক্কেবারে নিজস্ব। শুধু লোক জানাজানির ভয়ে—চাঁদেরে অমাবস্যায় পাঠানোর মতো বাবুর বাড়িতেই পাঠিয়ে দিল কাজে। পাঁচহাতে ঠুকরে খাওয়ানোর চেয়ে এক হাতে খুবলে খাওয়ানো ভাল।

সেদিন ফিরে, রবিউল চন্দ্রাকে খুব ভীষণ অত্যন্ত আদর করেছিল। চন্দ্রার বিশাল আদুল শরীরে খেলা করেছিল, সারারাত। যেন কবুতর। ছোট্ট।

ক্লান্ত শীতল আরাম লেগে আছে শরীরে। রবি চন্দ্রার গায়ে হাত রাখে। নিথর লাগে। আহা! ঘুমিয়েছে। গায়ে হাত বুলোয়। মাথা, বুক পেট, চন্দ্রার—ছে-লম্বা দশাসই বিশাল শরীর। কেমন মা-মা বোধ হয়। তার বুকের মধ্যে ছোট্ট রবি শিশুর মতো। ক'দিনেই দরমা-বেড়ার ঘরে পাথরের ছাদ হয়ে গেছে।

মরে যাবে নাতো!

এতক্ষণে রবি নিঝুম রাতের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে কেঁদে ফেলে। পাথর রাত।

—ওরে, সিংহের বাচ্চা তুই কোথায়! ঘরের আলসেয় সারি সারি সাজানো জুতো, তোর জন্যে। মাটিতে পা রেখে হাঁটতে দেবো না তোকে। তুই আয়। মাকে জীয়ন্ত নিয়ে আয় বাপ!

রবি ফুঁপিয়ে ওঠে। ঘোরে রিক্সা চালায় চাচা। ঢলা রাতে আঁধার বাড়ে। বেঁটে রবির কান্নায় রাত্রি ভেজে না, আঠালো, গাঢ় হয়।

রাজপ্রাসাদের মতো হাসপাতাল বাড়ি দেখে হতভাগীর শখ হয়েছিল—একদিন খোকা কোলে রোদ ঝলমলে সকালবেলা—ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে। জুটেছে লাশকাটা ঘর। ভ্যান রিক্সাতেই নাকি মরেছিল। রবি বিশ্বাস করে না। স্ট্রেচারে যখন নিয়ে যায়—চন্দ্রার হাত নড়ে উঠল। তাকে ডাক দিয়ে গেল। স্পষ্ট দেখেছে সে। ইশারায় যেন পা দেখিয়েছিল। জুতোর কথা বলেছিল। সবাই মিথ্যে কথা বলছে। রবিউলকে না বলে সে মরতেই পারে না।

সিংহের সোনালি বাচ্চা পেটে নিয়ে কোনো মা মরে না। ঘর ভর্তি রঙ-বেরঙের জুতো সাজানো। কে পরবে সে সব জুতো? আল্লাতালার দুনিয়ায় তাহলে হাঁটবে কারা? সিংহের বাচ্চা। লোভ সামলাতে পারেনি। ওরা চোর। তার ছেলে চুরি করেছে। সুন্দর বৌকে গুম করেছে। স্যাঙাতরা কেউ বোঝাতে পারছে না—রবির বৌ মরে গেছে।

—না, ওরা মেরে ফেলেছে।

খিস্তি খেউড়, কান্নাকাটি। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, একদিনেই বেঁটে রবি—আরো ছোট্ট, শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেল।

তোরা জানিসনে, হাসপাতালে এসব হয়। সিংহের বাচ্চা আমার। কোথায়? মরা বাচ্চাই দেখাক আমাকে! লাশকাটা ঘরে ঢোকানো হয়েছে চন্দ্রাকে। রবি শুনেছে। একচুল এখান থেকে নড়বে না। স্যাঙাতরা পড়েছে মুশকিলে। নিয়ে যেতেও পারছে না, ফেলে যেতেও পারছে না। বিকেলও যায় যায়। চাদ্দিকে জঙ্গল। ঝোপঝাপ। লাশকাটা ঘরের দুর্গন্ধ ফুঁড়ে কোত্থেকে বেরিয়ে এল এক ডোম। বিশাল চেহারা। পাকানো গোঁফ। বাবুদের গুন্ডা। সে চেনে। একটা ডাবের চেয়ে বড় টিউমার হাতে ধরিয়ে দিল। তার মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেংচিয়ে বলল—এই নে ধর, সিংহের বাচ্চা।

—একি, কী দেখছে! রবিউল!

শরীর কম্প হলো, ঝাঁপিয়ে উঠল চোখের আলসে। চোরাই জুতোগুলো ঝর ঝর ঝরে যাচ্ছে। আর ভেসে চলল চোখের ঝাপসা জলে।

তিন

গল্পের টানে পাক খাওয়া উচিত হবে না। ঠিক সে সময়, আন্তর্জাতিক শহর কোলকাতার মেডিকেল কলেজ সেমিনার হলে—ক্যানসার বিষয়ে সভা চলছিল। ডাক্তার মহিমা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলছিলেন— ... যে উদ্দীপনার ফলে এই ধরনের টিউমার সৃষ্টি হয়—প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাসে তার কোনো মূল্য নেই।

ডাক্তারদের সভা-সমিতিগুলো চার্চের মতো অদ্ভুত স্তব্ধ হয়। না, ভুল হলো, গহন প্রকৃতির মতো।

কম্বল

রবিউল জ্বর জ্বর ভাব নিয়ে সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে এল। যখন পুলিশেরা অপরাধীর মতো ওভারকোটের কলার উঁচু করে বুলেট বাইকে রাতের শহর চুঁড়ে ফেলে; গরিব মানুষের বউগুলো ঝগড়া ঝুড়ি চাপা রেখে স্বামীর দিকে পাশ ফেরে বুঝতে হবে শীতকাল এসে গেল।

রবিউল সাড়ে চারফুট লম্বা। ছোট্ট শরীরে শীতের আদরও ছোট। সে প্যান্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে নেয়। কাঁধদুটো উঁচু করে ঘাড়সুদ্ধ মাথাটাকে ঢুকিয়ে নেয় গলার মধ্যে। একখানা হাফকম্বলও যদি ঝাড়তে পারে এ শীত ফর্সা করে দেবে।

ইভিনিং-শোর হাফটাইমের গ্যাপে রবিউল টুক করে হলে ঢুকেছিল। পর্দায় পেয়ার দেখতে দেখতে বাবু-বিবিরা যখন বেঁহুশ হয়ে ফষ্টি-নষ্টি করে, গায়ের চাদর খসে পড়ে। একে অন্ধকার, দুয়ে বেঁহুশ, দেড়ে যদি একটা চাদর-মাদর ধান্দা হয়ে যায়!

নাবি বর্ষায় শীতটা হঠাৎ বাবুদের (যেমন সলমন খানের) গাড়ির মতো মজা-মর্জিতে চেপে গেল ফুটপাতের শহরে।

ব্যালকনির ভিআইপিতে এক জোড়া বকমবকম, তার পাশেই একখানা খালি সিট। কপাল গুনে এমন মেলে। জয় বাবা আল্লা-কালী। সিটখানা পেয়েছে দারুন। ইনট্রানসের ঠিক পাশে। হাত টেনে গেটের কালো পর্দায় খানিক, চাইলে পুরোপর্দায় ঢেকে সটকে পড়ার সিধে রাস্তা।

বন্ধুরা বলে—বেঁটে রবির গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি।

অন্ধকার সিটের সঙ্গে মিশে গিয়ে—চোখ কান খাড়া রাখে।

আরিব্বাস্! ঠিক খাপে সেট হয়েছে। তার পাশেই এমেলে মল্লিকের বউ। রবিউল কনফাম, লোকটা মল্লিকতো নয়ই—লোকও নয়। একটা ছোকরা। পর্দায় যখন নায়িকা সাপের মতো পাকিয়ে উঠে নায়কের ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নেওয়ার অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছে, মল্লিকের বউ ছোকরাকে একটা চুমু খেল—চকাস্!

আহ্! বউটার গায়ে গরদের দামি চাদর। কাঁধের দু'পাশ বেয়ে ঢলে পড়েছে। অন্ধকারে চক্‌চক্ করছে চাদরের সোনালি নক্‌শার কারুকাজ। সোনালি শরীর জুড়ে সুগন্ধ। রবিউল খানিকটা উদাস হয়। চাদরখানা তার খুব পছন্দ হয়েছে। চন্দ্রার শরীরে দারুন মানাত। নেহাত বৌটা মরে গেল। চন্দ্রারও গায়ের রঙ ছিল এমেলের বউ-এর মতো। সোনা

সোনা। এমেলের বউ-এর ঘষা-মাজা সোনা। ওর বউ-এর রোদে-জলে পোড়া।

এমেলেকে রবিউল চেনে। ওর বউকেও চেনে। এমেলের বাড়িতে কতোদিন সবজি বাজার আলু পৌঁছে দিতে গেছে। দেখেছে, অমন সুন্দরী বৌদিমণি। অমন মিষ্টি কথা।

—ছিঃ! ছিঃ!

সে ইচ্ছা করলেই বলতে পারে—বৌদিমণি, সামাদ আমাকে ফলো করতে পাঠিয়েছে। এমেলের নিশ্বাসের মতো বিশ্বস্ত বডিগার্ড হলো সামাদ।

—চাদরখানা দেখেই আপনাকে চেনা যাচ্ছে। ওখানা আমায় দিয়ে দিন। সামাদকে ম্যানেজ করে নেব।

না সে বলবে না। সে চোর। ব্ল্যাকমেলার নয়। চুরি করে খায়। দাদাগিরির মাগগ্যা খায় না। সে আরো সাঁটিয়ে গেল সিটের নরম গভীরে। উঠি উঠি করেও চেপে থাকতে হচ্ছে গদির আরামে। গেটে পাহারা দিচ্ছে পল্টুদা। বেরুলেই ধরবে খপ করে। সে জানে, রবিউল চোর।

তার পাশেই একখানা হাত সিটের পিছন দিয়ে সুগন্ধি নারীর নরম শরীর পাক দিয়ে আছে। অন্ধকারে রবিউলের চোখ বেড়ালের মতো জ্বলে। পাক দিয়ে আছে নয়, হাতখানা নরম শরীরে পাক খাচ্ছে। সুগন্ধি শরীর থেকে সুখ যেন হাতের ভিতর দিয়ে বহে যাচ্ছে পুরুষ শরীরে। রবিউল অনুভব করে সে পুরুষ। রমণী-শরীর ছুঁয়ে যে গরদ, তার আঁচলে লুটিয়ে আছে সে দিমণির বাহু। পর্দা মুক্ত হয়ে নায়িকা যেন তার পাশে এসে বসেছে। রবিউলের শরীর গরম হয়ে উঠল। চোখে মুখে রক্তের চাপ। কেমন জ্বর জ্বর লাগছে। সুখের জন্য শরীর মন আকুলিবিকুলি করে ওঠে। হঠাৎই মনে উদয় হল—সে চোর। চুরি করে খায়। ফোকোটিয়া নেয় না। হারামের সুখ সে ঘেন্না করে। অন্ধকার সিট ছেড়ে টুক করে বেরিয়ে আসে। বাইরে ঠান্ডা বাতাস।

—আঃ!

মগজ যেন না-পাকে জড়িয়ে যাচ্ছিল। ঘাম দিয়ে জ্বরের পারদ ধীরে ধীরে নামতে থাকে। শীতের কামড়টাও বসছে শরীরে। বসুক। অমন সুখে মাথা বাঁধতে নারাজ।

থুঃ!

দাঁতের ফাঁক থেকে খৈনি বেরিয়ে এসেছে মুখে। যেন জিভে জড়িয়ে থাকা ঘাম-নোংরা। আস্ত জানোয়ার ছোটবাবু চন্দ্রাকে খুবলে খেত। শেষরাতে যখন সে চন্দ্রার শরীর থেকে ময়লা, ঘাম, হিংস্রতা পাখির মতো খুঁটে খুঁটে সরিয়ে দিত। চেটে, চুষে, ঠোঁট বুলিয়ে মুছে দিত যন্ত্রণা। আদরে আদরে চন্দ্রার শরীরে ফুটিয়ে তুলত পূর্ণিমা, ওর মুখ ভরে যেত এরকম ঘিনঘিনে অনুভূতি আর নোংরায়।

—থুঃ!

হাত দুটো প্যান্টের পকেটে। ঘাড় ঝুঁকিয়ে মুখমন্ডল নামিয়ে দিয়েছে বুকের কাছে। শীত যেন নদী, পার হওয়ার জন্য একটা কম্বল-নৌকার খোঁজে, শেষ অঘ্রাণের রাস্তার পাড়ে দাঁড়িয়ে রবিউল বেশ চিন্তিত। এই সময় তাকে এঁটেপাকা বালকের মতো দেখায়।

রাস্তা বেশ গমগমে। ওভারকোট চাপিয়ে দু'জন পুলিশ বেশ আরাম করে হেঁটে আসছে। একজন ঢ্যাঙা-লম্বা, অন্যজন বেঁটে মোটা। রবিউল একটু আড়ালে সরে যায়। পুলিশের মুখোমুখি হতে রুচি হয় না। যেন পুলিশ ঠিক মনুষ্যপদবাচ্য নয়। পোষা দ্বি-পদ প্রাণী বিশেষ। বাঁ হাত পাবলিকের কাছে পাতে তো ডানহাত সরকারের সামনে। নিজেরা ইউনিয়ন করে অথচ অন্য ইউনিয়নের মিটিং মিছিলে বে-ধড়ক লাঠিগুলি ... সব চেয়ে ঘেন্না হয়, যখন চোরাইমাল সাফাই করে চোরেদেরই বেদম ঠ্যাঙায়।

পুলিশেরা সরকারি কম্বল পায়। কুটকুটে হলেও দারুন। পুরোনো হওয়ার আগেই নতুন নতুন পাওনা হয়। রবিউল পুলিশদুটোর পিছু নেয়। দূর থেকে দেখা যায়, ঢ্যাঙা হাড়োলের মতো পুলিশটা হাত-পা নেড়ে কী বোঝাচ্ছে আর বেঁটেটা মুরগির মতো ঘাড় নেড়ে নেড়ে বুঝছে।

সে পুলিশের ঘরেই কম্বল নিশানা করে। একখানা ঝাড়তে পারলেই শীত পার। ধরা পড়লে, জেলের ভাত-কম্বল দু'মাস—তাহলেও শীত কাত। এক চালে কিস্তিমাত।

কেয়াবাত! কেয়াবাত!

দ্বিপদ প্রাণীদ্বয় বাটার মোড়ে দাঁড়ায়। রবিউল প্রায় লাফ মেরে পাশের মুদিখানায় ঢুকে পড়ে। হাড়োলের হাত-পা এবং মুরগির ঘাড় সন্ধের মতো শেষ মোলাকাত সেরে নিচ্ছে।

—দেখি দশপয়সার ভেলিগুড়।

—দশ পয়সার গুড় হয় না।

—যট্টুকু হয় তট্টুকু দাও।

—যত্তসব্! এই নাও।

দোকানি একদলা গুড় রবিকে দেয়। বলে—যাও, যাও, পয়সা লাগবে না।

—মাগনা? খাইনে অমন গুড়।

রবিউল গুড়ের গাড্ডায় ছুঁড়ে দেয় গুড়টুকু। নেমে পড়ে রাস্তায়।

হাড়োলটা চলে গেল ব্যারাকের দিকে। মুরগিটা সোজা। মনে হচ্ছে এটা লোকাল প্রাণী। হন হন করে হাঁটছে। বামন রবির পাও বেঁটে। দূরত্ব রেখে সে প্রায় হাফ দৌড়ায়। হাত সাফাই করা ভেলিগুড়টুকু চাটে, চোষে আর প্রায় ছোটে। এইটুকু তার শখ।

মরে গেলেও বউ-এর কথা সে মনে রেখেছে। নোংরা ভেলিগুড় সে খায় না। খাওয়ার আগে গুড়ের টুকরোটা পাছার প্যান্টে ভাল করে মুছে নেয়।

আলুর বাজারে ফাই-ফরমাস খেটে আর হাত ঘুরিয়ে উদরপূর্তিটা চলে যায়। শোয় গিয়ে দরজা ভাঙা পোড়োকালী মন্দিরের নীচে। মন্দিরের আখড়ায় দু-এক ছিলিম গাঁজা সেজে দেয়। চাঁদাটা সিধেটা তুলে দেয়। তাতে শোয়া-কাজটা চলে যায়। তবে শীত জানান দিয়েছে, আসছি।

কালীপুজোর আলো ঝলমলে রাতগুলোতে রবিউল নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। নামী-দামি ভক্ত আর ভক্তের উপহারে তার শোয়ার জায়গা ডুবে যায়।

এমেলে মল্লিক সাহেব এবছর পুজোয় কম্বল-ধুতি-শাড়ি বিলি করেছেন। আকাশ প্রাসাদের বাসিন্দা রবিউলের একখানা কম্বল খুব দরকার ছিল। গভর্নমেন্টকে গরমেন্ট বলা বিল্টাদা বলেছিল—নে নে একখানা কম্বল নিয়ে রাখ। লিস্টে নাম তুলে দিচ্ছি।

রবি আকাশ থেকে পড়ল।

—লাইনে দাঁড়িয়ে? ঘাড় হেঁট, হাত জোড় করে?

সেই খিকখিকে ব্যাঁকা হাসিটা ছিটকে বেরিয়ে এল ছিলিমের মুখে।

বলল—পোষতো ফোষ। মাঘ আয়াতো গিয়া। ফাল্গুন আয়েগাতো কম্বল কেনেগা।

গরমেন্ট বলল—পাঁয়তারা না কষে তোর পুরো নামটা বল।

—পুরো নাম? ভুলে গেছি। হিঃ হিঃ। না-না, লেখো, মনে করি।

রবি গম্ভীর হয়। দু'বার দম নেয়। তিনবার কোঁথ পাড়ে।

—লেখ, জান মহম্মদ—

একটু থামে—শাহেনশা এমেলে এম পি আলেক জান্ডার—

একটু ভাবে, তারপর একদমে বলে যায়—

—রবিউল জাঁহাপনা কাউসার রাষ্ট্রপতি ক্যাপিটাল ক্যালানে।

বলেই ওর সেই অসহ্য খ্যাঁকখেঁকে হাসিটা হেসে ওঠে। রবিউলের তীক্ষ্ণ সাইরেনের মতো হাসি থেমে থেমে বাজতে থাকে। কখনও জোরে কখনও আস্তে। শেষে কাশিতে গিয়ে থামে। ছিলিমের টানটা বেশ জমে উঠেছে। বউ বলেছিল, চুরি ভাল তো দান ভাল না। চুরির ইমান আছে দানের ইমান নাই।

রবিউল গরমেন্টের খাতায় নাম তোলেনি। বরং ছিলিমে আর এক কষণ দিয়েছিল। ছিলিমে তবু অঘ্রান ঠেকান যায়, পৌষ ঠেকান দায়। আল্লা-কালীই রবিউলকে মেরে রেখেছে। ভিড়ে-ভিড়াক্কার রামনগর রোডের মোড়ে এসে খেই হারিয়ে ফেলল। পুলিশের বাচ্চাটাকে আর খুঁজেই পেল না। শালা মুরগিটা হারিয়ে গেল।

লোকজনের মধ্যে ছোটা যায় না। এমনিই জোকার সাইজ। মানুষের নজরে লেগে থাকে। ছুটলে ভিডিও ফ্রেম হয়ে যায়।

রবিউলের ক্ষুদ্রত্ব গল্পকেও বিব্রত করে। গল্পটা চলতে চলতে উদভ্রান্তের মতো রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অনুগ্রহ করে রবিউলের সঙ্গে একটু অপেক্ষা করুন। দেখি কম্বল রবিকে কোন দিকে নিয়ে যায়।

মোড়ের মাথায় মির্জা মল্লিকের বাড়ি। বাড়ি নয় অট্টালিকা। এলাকার প্রাচীন এমপি। গেটের সামনে বন্দুকধারী সিকিউরিটি গার্ড। সামনে বন্দুক, পিছনে নাকি একে ফর্টিসেভেন-এইট-ফেইট আছে। এমপি-র মহান জীবন। বর্ডার এলাকা। জঙ্গিদের যা উৎপাত। রবিউল এগিয়ে যায়। রহমতের আশায় বহু ক্ষুদ্র মানব এই অট্টালিকার নীচে দু'হাত পেতে উর্ধ্বমুখে দাঁড়ায়। পাহারাদারকে কড়া নজর রাখতে হয়।

রবিউল ক্ষুদ্রতর। পাহারাদারের হাঁকের চুম্বকে এগিয়ে চলল।

—কি চায়?

সোনাদানা, লেপ, কম্বল কিছু নয়। ঠোঁটের উপর জোড়া আঙুলের টান টান নিরাপদ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়—বিড়ি।

পাহারাদার মুচকি হাসে।

রবিউল মুচকি হাসে।

পাহারাদার যেন সঙ্গী পেল। রবিউল গম্ভীর দুলকি চালে পাহারাদারের বসার স্তম্ভটায় গিয়ে বসে। হাতির পায়ের চেয়ে মোটা স্তম্ভটা নাকি ফাঁপা। ভিতরে কিছু নেই। কেউ বলে, স্তম্ভের গোপন কুঠুরিতে নাকি মরণফাঁদ আছে। সেখানে মারাত্মক সব অস্ত্র-শস্ত্র বোমা-টোমা জমানো আছে। অপূর্ব, উপাদেয় সব সত্যি, কিংবা গল্প।

—গার্ডদা, তোমার রেহাই নেই। দুনিয়া উল্টে গেলেও তোমাকে ঠিক পাহারা দিতে হবে। তোমাকে ওই পৃথিবী কাঁধে লোকটার মতো লাগে।

রিক্সার হর্নের মতো গলার আওয়াজে গার্ড ঠিক চিনেছে।

—অঃ রবিউল, তা কী ধান্দা শুনি?

—ধান্দা-মান্দা কিছু নেই। একটা বিড়ি ছাড়ো না, টানি। ঠান্ডা ঠান্ডায় একটু ওম করতে এলাম। পুরিয়া আছে নাকি? দম দিতাম।

গার্ড একটা বিড়ি দেয়। কানে ঘুরিয়ে, নাকে শুঁকে, ঠোঁটে ফুঁ দিয়ে রবি আরাম করে বিড়িটা ধরায়। ছোট্ট একটা কাশির ধমক সামলে নিতেই গার্ড জিজ্ঞেস করে—ঝেড়ে কাশ রবি, ঝেড়ে কাশ। বিনি লাভে পথ বইবার ছেলে তুই নোস।

—এমন বলছ যেন ম্যারিকা থেকে এলাম। মালিক পাঠিয়েছে। ছোট মল্লিক সাহেবের

সাথে একটা নিরিবিলি অ্যাপো চাইছে। মালিক শতখানিক একস্ট্রা ছাড়তে রাজি।

—খুব টাকার গরম মনে হচ্ছে, ছাড় দেখি পঞ্চাশ।

রবি আরাম করে সুখটান দেয়। চালটা লেগেছে।

—পকেটে পঞ্চাশ থাকলে চোখ লাল থাকতো। বিড়ি চেয়ে খেতাম না।

—বিশটা টাকা ছাড়।

—আমার মতো গেরিলা ফাইটটা শিখে নাও, গার্ডদা।

—আচ্ছা, রবি ভাই আমার, শ'দুই ধার দিবি? সুদ দেব।

অন্ধকারে রবি গার্ডের চোখ দেখতে চেষ্টা করে। দেখা যায় না। জ্বলন্ত বিড়ির শেষটুকু আঙুলের ডগায় রেখে, টোকা মেরে ছুড়ে দেয় দূরে।

আগুনটা ঘুরতে ঘুরতে ছুটে যায় বিশাল অট্টালিকার দিকে।

বলে—হাতে নিউকিলিয়ার বোমা থাকলে সুদের কারবার করতাম।

বলেই হেসে ওঠে। অন্ধকারে ওর সে ধারালো খিক খিক হাসি হায়েনার হাসি মনে হয়।

—না, রবি, সত্যি বলছি ভাই।

মল্লিকবাবুর ফিয়াট গাড়িখানা হুস করে গেটের মধ্যে ঢুকে গেল। কোথায় বন্দুক, কোথায় বিড়ি গার্ডদা স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে স্যালুট ঠুকে দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল গার্ডদার চোখ দুটো ভিজে ভিজে। এই সময় বাতাসে শিশির জমে থাকে।

না, এক্স এমপি নয়। এমপি পুত্র বর্তমান এমেলে শ্রীমান মল্লিক নয়। গাড়িথেকে ড্রাইভার নেমে দরোজা খুলে ধরতে গাড়ি থেকে নেমে এলেন শ্রীমান মল্লিকের প্রিয়তমা পত্নী। তার বৌদিমণি। একটু আগেই চেনা ড্রাইভারকে দেখে রবিউল নিজেকে খুব সামলে নিল। একটুও না চমকে জিজ্ঞেস করল—ড্রাইভারের সাথে বৌদিমণি একাএকা যে কোথায় যায়?

—তা তোর বাপের কী? যা শালা ফোট! মুহূর্তে বদলে গেছে গার্ডদা।

গাড়ির হেডলাইটের আলো ছড়িয়ে পড়েছে অট্টালিকার সিংদরোজা পর্যন্ত। পাথর বিছানো মসৃণ পথে জমকালো শাড়ি, ইন্দ্রাণী চলন—স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল দূরে। রবির শরীরে ওম লাগে। কাঁটা দেয়। বৌদিমণির সেই নায়িকার মতো মুখখানা এবারও দেখা হলো না। কেমন অতৃপ্তির কষ্ট। কম্বলটা না পাওয়ার কষ্ট। খানিকক্ষণ বসার স্তম্ভটার মতো ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইল রবিউল। বৌদিমণি তাকে টানছে।

হারামি ড্রাইভারটা এই শীতে একটা কম্বল জুটিয়ে ফেলেছে।

অন্ধকারের গল্প

অন্ধকার রাত্রি। গল্প যখন শুরু হচ্ছে, দরমার বেড়া, গোলপাতার ছাউনি, ঘরে কিছু দেখা যায় না। ঘর-বার অন্ধকারে সব একাকার। গল্প শুরু হচ্ছে, তবু হোক, কোনো জীবন যেন, হে পাঠক/পাঠিকা, শুরু না হয় এই অন্ধকারে।

হে রজনি বন্ধ্যা হও।

নিজের শরীর পর্যন্ত দেখা যায় না, এত অন্ধকার। হাঁটুর অনেকখানি উপরে তখনও উঠে আছে শাড়ি। টেনে নামাবার হুঁশটুকু নেই। গোরের শয়তানও বুঝি লজ্জায় অন্ধকার হয়ে ঢেকে আছে রজনির শরীর। পিশাচও বুঝি রাত-বোবা হয়ে গেছে। দিন-দুনিয়ার কোনো খবর নেই।

একম শেখের বল এবং বুলি শকুনের নখের মতো শরীর জুড়ে হাঁচড়ে কামড়ে চরে বেড়ায় রজনির শরীরে।

—খা, খা-না। অমেত্য, সুরা। হিদুরা খেয়ে দেবীর তপ করে, কালীও খায়। কালীচরণও খায়। হিঃ হিঃ হিঃ। তুইও খা। আমিও খাই। এই নে ফুল, আমিও দিলাম তোর চরণে।

রজনির বুকে গোলাপ আর মুখে গোলাপি তরল সেঁটে দেয় একম আলি। কনুয়ের ফাঁকে গলা সাঁড়াশির মতো আটকে, মুখ মুখের কাছে টেনে আনতে আনতে বলে, —রজনি, আমার রজনিগন্ধা!

মনে করুন, বিশত্রিশ বছর আগের কোনো যাত্রা পালা সোনাইদিঘি। ভাবনাকাজির সেই ডায়ালগ, সোনাইকে আমার চাই, তবেই আমার নাম ভাবনা কাজি। হিঃ হিঃ হিঃ!

যেনো নাটক কিংবা সিনেমা। বিশ্বাস করুন, এটা কোনো জীবন হতে পারে না। এটা কোন বেঁচে থাকা নয়। স্রেফ গল্প। সত্যি বলতে কি, এত অন্ধকারে কোনো গল্পও যেন শুরু না হয়। কিছুই দেখা যায় না।

রজনির মরদ ফড়িং, মধ্যরাতে ঘরে ফিরে কিছুই দেখতে পায় না। তখন অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকে রজনি, অন্ধকার মাটিতে। ফড়িং আজ ঘরে ফেরেনি। একা রজনি একমের হাতে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে দরমার ঘরে। তাঁর আত্মা, তাঁর মুখ, শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ অন্ধকারে তীব্র আঁধার হয়ে ছড়িয়ে আছে।

হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, ফড়িং-এর নিজে হাতে। গল্পে এরকম হয়। মরদ ফড়িং-এর

ফুলের দোকান। ফুলের ঢাকি সাজিয়ে বসে ফুটপাথে। ফুলে আলো হয়ে থাকে পথের দুধার। ফুটপাথ, দাদা-একম আলির দখলে। একম আলিকে ফুল-টুল ভেট দিতে হয়। রজনি, জুই, সন্ধ্যাতারা, কিংবা গোলাপ বালা। তার ইচ্ছে হলেই দিতে হয়। ফড়িং না দিলে টড়িং দেয়। ফুটপাথ বদল হয় মধ্যরাতে।

মধ্যরাতে একম আলি, তার ভিতরে একম আলি তার ভিতরে একম আলি যখন ফেরে, গাঁয়ের কবরখানার মুখে আসে, বিড়ি ধরায়।

বাঁ দিকের বাঁশবাগান শেয়ালীকে আদর সেরে শেয়াল-ভায়া তৃপ্তির তীক্ষ্ণ ঢেকুর তোলে। ছিঁচকে চোরেরা ডানদিকের ভাঙা স্কুল ঘরে, পুকুরের টাটকা পাঁক দু'হাতে মেখে কেবলই পাঁয়তারা কষে। গেরস্তেরা ভয়ে ভালমানুষের মতো আধো ঘুম, আধো জাগরণে তখন বেঁহুশ।

একম ডানদিকের পকেটে হাত ঢোকায়। বিড়ি বের করে। বাঁদিকের পকেট হাতড়ায়, দেশলাই পায় না। হাতড়ায়।

দূরে কবরখানার মাঠ। দু'একটা জোনাকি জ্বলছে, উড়ছে নিভছে, যেন পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণস্পন্দন। কে যেন, হ্যাঁ, বেঁটে রবিউল ভাবুকের ঢং-এ বেশ বলেছিল, —দুনিয়া জুড়ে কবর আর কবর। জীবিতের চেয়ে মৃত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। মৃত্যুর শেষ নেই। অন্ধকারেরও আদি-অন্ত নেই। যতদূর দেখা যায় মৃত মানুষের গোর, মাটি আর অন্ধকার। কিতাবে লিখেছে—দুনিয়া জুড়ে আঁধার শুধু আঁধার ছিল। আল্লাহ ফতোয়া দিলেন, —আলো হোক।

আলো হ'ল। আল্লাহ বলেননি,

—অন্ধকার দূর হোক।

অন্ধকার রয়ে গেছে। সুযোগের অপেক্ষায় আছে। রাত যায়, মৃতেরা গোর থেকে উঠে আসে। ঘন থেকে ঘনতর মৃতের অস্তিত্বে অন্ধকার গাঢ় হয়। মৃত মানুষের ছিন্ন শরীর, বিচ্ছিন্ন হাত, ভিন্ন ভিন্ন পা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় মনকির, নকির, ওদের গুর্জর।

মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে। শরীর যেন মাটিতে বসে যাচ্ছে। যেখানে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে, যে মাটি তার ভার সহ্য করে আছে, সে হয়ত মৃত কোন মানুষের হাতের তালু। যে হাতের হাড়-মাস-চামড়া বহু যুগের পুরোনো। মাটি হয়ে গেছে। মাটির মতো দু'খানা শক্তিশালী হাত সে দেখতে পায়। মাংস খসে খসে যাওয়া হাতের কঙ্কাল, সাঁড়াশির মতো লম্বা হাড়ের সাদা শক্ত আঙুল। এক হাতের তালুর উপর যেন সে দাঁড়িয়ে আছে। সে কি এইখানে একটু বসবে? হাতখানা—ইচ্ছে করলে অন্য হাড়ের কনুইয়ের ফাঁকে তার গলা সাঁড়াশির মতো আটকে, মুখ, করোটি-মুখের কাছে টেনে

আনতে পারে। এই হাত বুঝি এককালে শাসন করেছিল ওই ফুলেল ফুটপাথ। ফড়িং-এর দল, কিংবা গোটা শহর।

তার শরীর কেঁপে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে থাকে একখানা কঙ্কাল হাত এবং দীর্ঘ কঙ্কাল শরীর, পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘতর অন্য এক কঙ্কাল হাতের তালুতে। কার তালু? কে সে?

একম মাথা ঝাঁকুনি দেয়। এত ভারি লাগছে, মাথা নাড়াতে পর্যন্ত পারে না। চোখে ভেসে ওঠে অসংখ্য কঙ্কালের হাত, হাতের উপর পা, পায়ের উপর হাত, যুগের পর যুগ, সারি সারি যেন পৃথিবীর হৃদপিণ্ড পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা নরকঙ্কালের সিঁড়ি।

একম খোঁজে। দেশলাই খোঁজে, বুকপকেটে। নাকি আলো? নাকি বুকের কাছে হৃৎপিণ্ড! হাতড়ায়। ধক ধক। ধক ধক। হ্যাঁ সে বেঁচে আছে। সে হারিয়ে গেছে।

নিজেকে কঙ্কাল মনে হচ্ছে। ডানহাত দিয়ে বাঁ-হাত খোঁজে। বাঁ হাতখানা কঙ্কাল হয়ে গেছে কিনা পরখ করে। না, হয়নি। মানুষ। সে মানুষ আছে।

সে মানুষ খোঁজে। নিজের মতো কাউকে খোঁজে। যার সাথে লড়াই হবে। তাকে হারাবে। মাটির উপর দাঁড়িয়ে হাতের মাসল ফুলিয়ে, আগুনের নল উঁচু করে বলবে —আয়, কে আছিস্, বাপের বেটা।

দেশলাই খুঁজে তাকে পেতেই হবে। আলো নেই। একবিন্দু আলো নেই, এ হয় না। হতে পারে না। হাতের অস্থির খোঁজে ছিঁড়ে ফেলে প্যান্টের পকেট। মাটির উপর দুপা শক্ত রেখে দাঁড়াতে হবে। আকাশ ছিঁড়ে আলো আনতে হবে। তর্জনী তুলে মাটিকে কড়কাতে হবে। না হলে মাটিই ওকে কবর বানিয়ে দেবে।

এ বড় ভয়ঙ্কর খোঁজা। ডান হাত দিয়ে বাম হাত খোঁজে। দু'হাত দিয়ে বুক, হৃদপিণ্ড। এই অন্ধকারে সে নিজেকেই খোঁজে। কোথায় একম। একমের মধ্যে একম। তার মধ্যে একম। তার মধ্যে... কোথায় সে? সে নিজের সাথেই লড়াই চাই। লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই। এ খোঁজের শেষ নেই।

একম দু'হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরে। সামনে অনন্ত কবরখানা। সে আর চলতে পারে না। পা দুটো ভারি হয়ে আসছে।

কবরখানার মাঝবরাবর কী ওটা? কারা? এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, এগিয়ে আসছে। জোনাকি নয়। আগুনের চোখ। মনকির, নকির জেগে উঠল নাকি? ওকি ওদের জ্বলন্ত গুর্জর? দুটো আগুনের চোখ। স্থির এগিয়ে আসছে। হিংস্র বিশাল মুখমণ্ডল। তার মুখের মধ্যে আগুন। আগুনের চোখ। বুকের দু'পাশেও জ্বলজ্বল করছে, ভাঁটার মত। এগুচ্ছে, পিছোচ্ছে, ওর পায়ে আগুনের চোখ।

একম নিজের চোখ, চোখের মধ্যে চোখ, তার মধ্যে চোখ রেখে সে আগুন জ্বালাবার

চেষ্টা করে। স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ রাখে।

নাকি ও কালপুরুষ। আবার আগুন মুখমণ্ডল, কোমরবন্ধে তারা। হাতের তিরে তারার আগুন জ্বেলে এগিয়ে আসছে। পায়ের কাছে জ্বলছে কুকুরের শিকারি চোখ। আকাশ ভেঙে কিংবা কবর খুঁড়ে নয়, মাঝবরাবর কবরের অন্ধকার ভেদ করে উঠে আসছে। একটা গাছের সামনে উঁচু, কালপুরুষ নেমে এসেছে কবরের দোজখে। হাঃ! বুকের শেষ বাতাসটুকু বেরিয়ে গেল।

একম হাঁক দেয়—কে ওখানে?

অন্ধকার গলা চেপে ধরেছে। স্বর বেরলো না।

—ওকি, মনকির, নকির?

একমের চোখের আগুন ধিকিয়ে আসে। ধিক ধিক। নিভে আসছে। গলার স্বর কফে জড়িয়ে ধরে। সে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে,—হৈই হৈই সাড়া দাও, কে তুমি?

কবরের মাঝ বরাবর পিশাচের অট্টহাসি ফেটে পড়ে।

—হাঃ হাঃ হাঃ। খিক্, খিক্, খিক্ ...

নিস্তেজ হয়ে আসে একম। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে পথের উপর। আল্লার পায়ে। দু'হাত, মুখমণ্ডল বেহেস্তের পানে তুলে মোনাজাত করে।

—আল্লা, রহম করো।

শক্তিহীন একম অজ্ঞান হয়ে আসে। অজ্ঞানের অন্ধকারে দোয়া মাঙে—

—আল্লা, মালেক, মেহেরবান, জমি, জমা, বিবি আওলাদ, ক্ষমতা আমার সর্বস্ব নাও। ভোগ করো। মালেক তুমি ভোগ করো। আমাকে রেহাই দাও।

জ্ঞানহীন একম গড়িয়ে পড়ে মাঝপথে।

মনকির, নকির আসলে গাঁয়ের ফড়িং আর রবিউল। দুই জিগরি স্যাঙাত। সরে আসে আঁধারের আড়ালে, যেন ডার্করুমে। ঢ্যাঙা লম্বা ফড়িং-এর ঘাড় থেকে নেমে আসে বেঁটে রবিউল। রবিউল দুই কানে, ঠোঁটের দু'পাশে, দু'পায়ে বুড়ো আঙুলের ফাঁকে, দু'হাতে গোঁজা জ্বলন্ত টকটকে আগুনে আভার পাটকাঠি এক এক করে গুটিয়ে নিতে নিতে বলে,

—কী গুরু, কেমন আদিম একখানা গল্প তৈরি করলাম বলো?

অন্ধকারে ফড়িং আগুনের চোখগুলো শরীর থেকে খুলতে খুলতে গল্পের অবশিষ্ট হাসিটুকু হেসে জিজ্ঞেস করে, গল্প কি এখেনেই শেষ, কমরেড ইবলিশ?

—আমার সাথে অন্ধকারে মিশে থাক। সবে কলির সন্ধে।

রবিউল নিজেই ট্রাফিক, নিজেই পথিক সেজে হুইশিল বাজিয়ে, ডান হাত দক্ষিণ দিকে

টার্ন করে, নিজেই বামদিকের অন্ধকারে মিশে গেল দু'হাত মেলে।

তার পিছনে ফড়িং।

রাতের অন্ধকারে দিশাহীন একজোড়া বোরাক যেন উড়ে গেল ডানা মেলে।

যুদ্ধ জারি আছে

সাদামাটা দিনু মিত্তির তখন কবি এখন খরিদ্দার। বাজার ফিরে থেবড়ে গেল দালানে। রোদ্দুর আর রাজনীতি বাজারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আলু দশ টাকা কিলো।

দিনুর বউ ভবানী কাজ হাতে বাজার তুলতে এল। দিনু বলে—মানুষের কাঁধে কটা হাত থাকে? হ্যাঁ, ক'হাতে রোজগার করে বলতে পারো? মানুষ কি টাকার মেশিন হবে? এক গেলাস জল দাও দিকি।

—হাত জোড়া, নিয়ে খাও।

দীননাথের পিত্তি জ্বলে গেল। গুষ্টির পিন্ডি গেলাতে জীবন জেরবার। একগেলাস জল, তাও হাতের কাছে পাওয়া যাবে না? নিকুচি করেছে হাত জোড়ার। উঠে পড়ে দিনু।

—রাখো তোমার কাজ।

হাত থেকে ঘর মোছা ন্যাতা কেড়ে নেয়।

—এক গেলাস বিনি পয়সার জল খাওয়াতে পারো না—ঘরকন্না! হুঃ!!

ঘরবাজার এক করো না। বসো, দিচ্ছি।

ভবানী গড়গড়িয়ে টিউবওয়েল চেপে এক গেলাস জল দীননাথের পাশে খটাশ শব্দে থোয়। চলকে পড়ে খানিকটা।

—জল খায় মানুষ বুক ঠান্ডা করতে, এ-জল খেলে বুক জ্বলে যাবে।

—তো খেয়ো না।

ভবানী নির্বিকার। ঘর মোছে। দিনু জ্বলে ওঠে। বুক অস্থির হয়। পাঁচ-পাঁচখানা দশপাত্তি উড়ে গেল। দু'বেলার মাছ-আনাজ জুটলো না। মাছের দোকানে বাকি। সর্বাঙ্গ চুঁইয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। পোখরানে এ্যাটম ফাটার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার আকাশ ভাঙা সূর্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে দিনুদের বাজারে। মনে হচ্ছে, মাসমাইনের মতো শরীরের সব নুন আজই বেরিয়ে যাবে। গতকাল ছিল বিয়াল্লিশ ডিগ্রি। আজ বেশি ছাড়া কম না। ব্লাস্ট-ফার্নেস দিনের গায় কম্বল জড়ানো লোডশেডিং রাত। রাতে ঘুম নেই। দুশ্চিন্তা আর ভ্যাপসা গরমে মানুষ ক'দিন না ঘুমিয়ে পারে! এখন এখানে থাকলে

মার-কাটারি হয়ে যাবে। তেষ্টার জল থাকলো পড়ে। সংসারের কর্তা মুখে কুলুপ এঁটে বেরিয়ে পড়ল।

কোথায় যায়? ঘরে রাগ পথে রোদ্দুর। জল খায়নি বেশ করেছে। যদি খানিক দরদ জন্মায়। গরমে আক্রায় দিশেহারা মানুষটা জল না খেয়ে বেরিয়ে গেল, একবারও কি কষ্ট হবে না? ভালবাসলে নিশ্চয়ই হবে। হোক। কষ্ট পাক।

বাড়ি চোখের আড়াল হতে সে একটু থিতু হলো। হাঁটার গতি আপনিই নরম হয়ে এল। গোঁফের মতো গম্ভীর, মাকুন্দে পঞ্চায়েত প্রধান, ভালো মন্দ রা কাড়লো না। দিনুকে পেরিয়ে গেল ঘোড়ার মতো। গুনিনকাকা দিনুকে গাছড়াও ভাবলেন না। তেলের মতো সরে গেলেন ক্রশিং-এ। কেউ কাউকে চেনে না। কেউ কারো নয়। দিনু কোথায় যায়?

অতঃপর মায়ের মন্দির ও বেঁটে রবিউল। এই মাটিতে গেঁথে বসানো দুয়েরই শিকড় খনিজ স্নেহের গভীরে। কারোরই পালাবার জো নেই। বউ মরার পর রবি মন্দিরে পড়ে আছে রাতদিন। গাঁজা টানে। দিনু হাফপ্যান্ট পরা রবির পাশে বসে পড়ে। শীতল ঠাঁই। শরীরের জল-জ্বালা ঝিম পায়। ভাল্লাগে। প্রাচীন মন্দিরে হেতেড় দেওয়াল। মেঝে ফেঝে পাথরের মতো ঠান্ডা। কেউ বলে পাড়ার কোল। কেউ বলে মায়ের। এ মন্দির একদা দিনুদেরই ছিল, দেবীদালান। এখন বারোয়ারি। মাথাছাওয়া বুড়ো বটগাছটুকু মায়ের করতালু। অবিরল ছায়া ঝরে। ঠ্যাং তুলে নাটা রবিউল বিশ্রী শুয়ে আছে। খাকি হাফপ্যান্টের ফাঁকগলিয়ে আলো ঢুকছে। আড় হয়ে ঠেকল চোখে। টেনে হাঁটু নামিয়ে দেয় দিনু। ইয়ত্তাহীন মানুষ মেয়েমানুষ আসছে। বে-শরম বেয়াদব কোথাকার। দিনু ঘাড় ফেরায় গর্ভগৃহে। মায়ের মুখ। মায়ের চোখে বেয়াদবি হচ্ছে নাতো?

আড়ত যাওয়ার মুখে নবকান্ত এল সাইকেলে। সেই বাইশটন হাম্বার। যত ঝরঝরে তত ভারি। সাইকেলখানা বটের ঝুরি কান্ডে হেলান দিল। অতঃপর মন্দিরের মুখে সাট-পাট।

সেই নবকান্ত। হদ্দসরল। উস্কোখুস্কো চুল। ক্লাশের শেষ বেঞ্চে বসতো। মাইনে আনতো খুচরো পয়সা। গুনতো আর ছড়াতো। হারাতো আর হাসতো ঝন ঝন শব্দে। দিনু তখন দীনেন্দ্রনাথ মিত্র। কতবার নবর হারানো পয়সা পূরণ দিয়েছে। এখন দিনুর তখন বন্ধু নব।

কষ্টিপাথরের মা যেন মোনালিসা। একমুখে শত হাসি। শত প্রণাম। কত মানে। দিনুর ঠোঁটে মায়ের হাসি।

নব এখন আলুঅলা। আলুর আড়তদার। মায়ের দৃষ্টিতে দিনু তাকিয়ে আছে সাটপাটের দিকে। সেই নোংরা পোশাক, উস্কোখুস্কো চুল। মন্দিরের চৌকাঠে হাজারবার মাথা ঠুকছে। অবাক। কী চায় ও? তিন লরি আলু ঢুকিয়েছে হিম ঘরে। দোচালা, দোতলা

করেছে। আলুর চটি থেকে আড়ত। লোকে ওর নাম ভুলে গেছে। ডাকে, আলুঅলা। মাঝেমধ্যে মদ খায়। মেয়েমানুষের সুখও নেয়। দিনুর জ্বালা ধরে। আজ সে কোথায়? আর নব?

নব সাষ্টাঙ্গ ছেড়ে উঠতেই দিনুর মুখোমুখি

—দিনু, তুই এখেনে?

দিনুর মন ভাল নেই। ম্লান হাসে।

নব সেই পয়সাছড়ানো শব্দে হেসে ওঠে।

—কী রে বৌ এর সঙ্গে ঝামেলা?

দিনুর অসহায় ভাব ফুটে ওঠে।

—আলুর দর আর কত বাড়াবি রে?

নব হাসিতে সিকি আধুলি ছড়ায়। রবিউল পাশে নড়েচড়ে ওঠে।

—তোর অসুবিধে কি? আমি তো আছি। আড়তে যাস। রবিউল লাল চোখ বের করে। জিজ্ঞেস করে।

—আমি?

রবির চিনচিনে মেয়েলি গলায় আহ্লাদ। নব পাঁচ-দশ পয়সা ছড়িয়ে খানিক হেসে নিল।

—তিন কুলে কেউ নেই তোর আবার কি? হ্যারে, তুই নাকি মুদিখানা ছেড়ে দিইছিস?

রবিউল 'হ্যাঁ' বলে না। মাথা ঝাঁকায়।

—কাজ করবি?

রবি মাথা ঝাঁকায়।

—আড়তে যাস।

বাইশটন হাম্বারে চেপে বসে আলুঅলা। সাইকেলও ঝনঝন শব্দে হেসে ওঠে। নবরা ভিনদেশি। উদ্বাস্তু। সম্পত্তির মধ্যে সাইকেলখানা পাচার করে এনেছে। নব বলে—ইমপোর্টেট। বলে—যোগাযোগ মন্ত্রী। দিনু বলে—বাইশটন হাম্বার। অকস্মাৎ রবি সিটি দিয়ে গান ধরে।

—সামনে চাকা পেছনে চাকা/ মধ্যিখানে ফাঁকা/ আলুঅলা চেপেছে প্রেমের সাইকেলে/ ...

দিনু রাগ ভুলে রবির মাথায় এক চাট্টি কষিয়ে দেয়। পান-দোক্তার দাঁত বের করে রবি হাসে। হাসিতে এক পয়সাও ঝরে না। ভালবাসার চাটিতে শুধু কষ্ট আর কষ ঠোঁট গড়িয়ে পড়ে।

বউ মরার পর রবিউল এখেনেই পড়ে থাকে। মন্দিরের ফাই-ফরমাস খাটে। ভোগ প্রসাদ জুটলো না জুটলো গাঁজা টানে। রবিউল কি বউকে ভীষণ ভালোবাসতো?

ভবানী কি করছে কে জানে? ওহো। আলুই তো কেনা হয়নি। ফড়ের সাথে বচসা। কী রাঁধবে? রাঁধবে কি? শুয়ে শুয়ে কাঁদছে হয়তো? আলুর দামের সাথে দিন দিন রাগও চড়ে যাচ্ছে। দুম করে বেরিয়ে পড়া ঠিক হয়নি। হাফডজন মুখ হাঁ করে আছে। দুপুরের মতো আগুন-খিদে হারে-রে-রে এগিয়ে আসছে।

—এই রবি।

রবিউল মুখ তোলে।

—দৌড়ে তোর বৌদির কাছ থেকে বাজারের থলেটা নিয়ে আয়তো।

রবিউল এদিকে কাত হয়, ওদিকে কাত হয়, ধনুক হয়, চিঁচিঁ গলা ঠেলে দেয় সামনে—খিদে পেয়েছে।

—যা না, বৌদির কাছে খেয়ে নিবি।

রবিউল পায়ে প্যালা লাগিয়ে উঠে পড়ে। টলতে টলতে চলে। দিনু গলা ছাড়ে—গাঁজা খাওয়ার দেশলাই নিবিনে কিন্তু।

দিকচিকা ঝাপাচ্ছে এখুনি। আস্ত দিন পড়ে আছে। উড়িষ্যার রোদ্দুরে আগুন জ্বলছে। চোখ কচলাতে কচলাতে রবিউল দাবানলের দিকে চলল। দিনু মানিব্যাগ হাতড়ায়। নেই! হল্কা এসে লাগে। আর একটু মন্দিরগর্ভে ঢুকে যায়। আলু কিনবে কী দিয়ে? অর্ধচন্দ্র খেতে খেতে রবিউল মায়ের গর্ভে ঠাঁই নিয়েছে। ওর হাতটান আছে। দিনু কী করে? সেদ্ধ আলু হয়ে হয়ে মানুষ মরছে উড়িষ্যায়।

শহরের সোল আলুঅলা নব। বাঁধের জলের মতো দেনার সেচ দিয়েই যাচ্ছে। সেচের ঝাপটায় নাকের ফাঁক বন্ধ হয়ে আসে। যত ভাবে দেনা আর করবে না ততই সেচের পাঁকে ডুবে যায়। চার দোকানে খাতা লিখতো। এখন পাঁচ দোকানে। তবু চলে না। পেঁয়াজ পনের। আদা ত্রিশ। কাঁচা যে লঙ্কা সেও ষাট টাকা কিলো। মা বলে—লঙ্কা আক্রা হলে দেশে আকাল হয়।

কোথায় আকাল! লাল-সবুজ ঢাকি ঢাকি ফুলের মতো লঙ্কা শুকিয়ে যাচ্ছে,। বিক্রি নেই। ব্যাপারীরা ফেলে দিচ্ছে। মানুষকে খেতে দিচ্ছে না। দাম কমাচ্ছে না। এ কোন আকাল! লঙ্কা-ছাড়াই মানুষের চোখমুখ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। যা দেখছে যা শুনছে সব অন্ধকার।

পাঁচ মালিকই তার বন্ধু। হিতৈষী। পাঁচরকম সাহায্য করতে চায়। জোর খাটায়। দিনু নিতে বাধ্য হয়। সাহায্য মানেতো দেনা। কত নেবে? আর কত ডোবে সে, আর কত?

রবিউল আসছে। নবর দুয়োরে যেতেই হবে। নেই নেই করে পাঁচ জন। অতগুলো মুখে কী দেবে? গোদের উপর বিষফোঁড়া জুটেছে নবর এক কর্মচারী, বিপদে এমন পাশে দাঁড়ায় 'না' করা যায় না। অথচ মূর্তিমান আপদ। আপদ বলে আপদ। খুনে, মাস্তান। ব্যবসায় শান্তি-কল্যাণের নামে নবকে পুষতে হয়। থাকে তার চিলেকোঠায়। একটা শয়তান, একটা টিকটিকি, একটা পাহারাদার একটা পেরেকের মতো বাড়িময় চলাচল করে। অসহ্য। মেয়েদেরতো পাত পেড়ে খাবার দিতে হয়।

নব বলেছে,—তোর সুদ লাগবে না।

দিনুর ভয় করে। নব তেললাগানো লম্বা স্ক্রুর মতো দিনুর বুকে একপাক একপাক করে বসে যাচ্ছে। মাসে মাসে সুদও কম নয়। সুদ মকুবের ভরসায় দিনু ভয় বয়ে বেড়ায়।

রবিউল বাজারের ব্যাগ ধরিয়ে দিল। এখন নবই ভরসা। এই ভয়-ভরসার দোলাচলই পথ। দিনু পথিক।

—কী রে, বৌদি কী বললো?

গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে—আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলো?

—বললো, বেলা তিনটেয় খেতি দেবে।

রবিউলের ফুর্তি এসেছে। বারদুয়েক সিটি মেরে গান ধরলো।

দিনু ধমকে জিজ্ঞেস করে—হেই, বৌদির রাগটাগ দেখলি?

রবি উত্তর দেয় না। গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করে—

—কোথায় যাবে?

—যাবি? নবর কাছে।

রবি গান ধরে। দিনু ফের জিজ্ঞেস করে।

—একটা কথাও জিজ্ঞেস করেনি?

রবি উত্তর দেয় না।

মানুষটা তেষ্টার জল পেলো কি পেলো না। বুক ফেটে মরলো না বাঁচলো। খোঁজ নেওয়ার কেউ নেই। দূর! এ ছাইপাশ বাঁচা। পরের জন্য বাঁচতে একটুও ইচ্ছে করে না। কে আপন? বিবি থেকে বাবু নাকে দড়ি দিয়ে তেল ছেঁচে নিচ্ছে।

—আঃ গেলো যা! বেহুঁশো নাকি?

পড়েই যাচ্ছিলো দিনু।

—উঃ!

এবার পড়েই গেলো নর্দমায়। পচা পাঁক। তিন চার জন হুড়মুড়িয়ে ছুটে গেল সাইকেলে।

ছুটে হেঁটে দল বেঁধে মানুষ ঝেঁটিয়ে পালাচ্ছে। একখানা পা পচা নোংরা—দুর্গন্ধে মাখামাখি হয়ে গেছে। পাশের দেওয়ালে ঘষা লেগে কাঁধের খানিক ছাল-ব্যাকলা উঠে গেল। জ্বলে যাচ্ছে। কোথাও ঝামেলাফামেলা হচ্ছে। রবিউল নিখুঁত অন্য পাশের পাঁচিলে সাঁটিয়ে গেছে। টিউবওয়েলটা কৈ? হাঁটুতে বেশ লেগেছে। দিনু খোঁড়ায়। চোট লাগেনি বলে রবিউল লজ্জা পায়। দিনুর চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করে। জিজ্ঞেস করতে চায়—লেগেছে? মুখে বলে

—মতির ঠেকে পানি মিলবে।

দিনুর উত্তর নেই। রবিউল ভেন্না কচার আঠা ফটাফট ফেনিয়ে কাঁধে লাগিয়ে দিতে যায়। ঠেলে সরিয়ে দেয় দিনু। রবিউল হড়কানো দিনুর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে দেয়। দৃষ্টি-আদর করে। কাঁধের রক্তপাতে ভেন্নার আঠা মাখানো দৃষ্টি যেন চেপে ধরে।

টিউবওয়েল বড় রাস্তার মুখে। দিনু পথিক। হাঁটে। নর্দমার গন্ধে মাছি জুটেছে। অসহ্য ভনভন। দিনু পড়ে গেছে। দিনু পুড়ে যাচ্ছে। একা। টিউবওয়েল শুকনো। জল নেই। দিনুর হাত ছাড়িয়ে টিউবওয়েলের হ্যান্ডেল সরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে। দিনুর কেউ নেই। হল্লা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে গেল দিনুর পাশে। কালো জাল বিছানো গাড়ি থেকে নেমে এল খাকিপুলিশ। দিনু হাঁ। দিনুকে তুলে নিল গাড়ির ভিতর। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে, গাড়ির মেঝেয়। পাঁজরায় পর পর বুটের গুতোয় কোঁক কোঁক আওয়াজ বেরুলো তার গলা চিরে। জ্ঞান হারাবার আগে মনে পড়লো—সে এক সময় কবিতা আবৃত্তি করতো।

—যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ / তোমাকে তুলে নিয়ে যায় / কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি তার ভিতরে আবার কালোগাড়ি।/ সার বন্দি জানলা দরজা, গোরস্থান—ওলোট পালোট কঙ্কাল...

আল্লার কিরে রবিউল তখন পেচ্ছাব করছিল। হল্লা দেখে ঝোপের মধ্যে বসে পড়েছে। হল্লার আড়ালে বুঝতেই পারেনি দিনুকে তুলে নিল। কিন্তু কেন?

ঝোপ আর রবিউল অনড় রয়ে গেল। ভয় সরে গেলে গাছ-গাছড়া সাবধানে নড়ে উঠল। রবিউল হাঁটা ধরলো, সোজা আলুঅলা।

পথে রোদ্দুর আর আকালের হাহাকার। কিছুকাল মিটিং নেই, মিছিল নেই, ধু ধু। নেতারা মরে গেল? মাকুন্দ প্রধানের ফরমাস রবি কম খাটেনি। দিনকে দিন, রাতকে দিন পেছন পেছন ঘুরেছে। তিল সুরাহা নেই। বউ মরার সময় লোকটা উল্টে বাঁশ দিয়েছিল। শালা! চাঁদিফাটা রোদ। আলুঅলাই ভরসা। নিজেকেই বলে—হাঁট রবি, টেনে হাঁট।

এখেনে ওখেনে জটলা। হল্লা গাড়ি আবার বেরিয়ে গেল। তার মানে বাজারের মোড়

থেকেও আদমি তুলেছে। কাদের কপালে মামার ঘানি জুটলো কে জানে? আলুঅলার আড়তেও জটলা।

নাটা রবি জটলায় সেঁধিয়ে যায়। গোপন আঁচ করে। আড়তের ভেতরে বাইরে আলু আর কথা গড়াগড়ি যাচ্ছে। পুলিশ ডেকেছে আলুঅলা। সেকেন্ড অফিসার–আলুঅলা বৈঠক হয়েছে। নাটার বুদ্ধি খুলে গেল।

–নিশ্চয় আলুলুঠ।

আদমির ফাঁক গলিয়ে আলুঅলার চোখ খোঁজে রবি। চোখে চোখ। ব্যস! হাঁক এল।

–রবি, আলু কুড়ো।

পুরানা আদমি সে। আড়ত নখদর্পণে। ঝুড়ি বস্তা ঝাঁটা আনে। নাটা রবি আরও বেঁটে হয়, ছড়ানো আলুর কাছে। কান উঁচু রাখে। ঝেঁটিয়ে আলু গোটায় আর আদমি খেদায়। টাট ফাঁকা না হলে বলতে পারছে না। রবি অস্থির ঝাঁটা চালায়।

ফাঁকা হলে রবি খাড়া হয়।

বলে–দিনুকে হল্লা নিয়ে গেল।

ব'লে আলুঅলার মুখে তাকিয়ে থাকে।

ডান পাশ জিজ্ঞেস করে–তুললো কোত্থেকে?

–বড় রাস্তার মুখে।

বাঁ পাশ শুধায়–কোথায় যাচ্ছিলো?

–এখেনেই আসছিলো, আলু নিতে।

রবি উত্তেজিত। চিনচিনে গলা তীক্ষ্ণ শোনায়।

–ঘরে একদানা আলু নেই। বৌদি বসে আছে। নিয়ে গেলে রান্না চাপবে। আজ ওদের খাওয়া হবে না। আলুঅলা চুপচাপ। কোন উদ্বেগ নেই। রবি অস্থির হয়। হঠাৎ টাটে উঠে পড়ে। আলুঅলার পা জড়িয়ে ধরে।

–আলুঅলা কিছু একটা করো। ওরা পেটাবে।

আলুঅলা ধমকে ওঠে।– যা, আলু কুড়ো।

রবি উত্তর দেয় না। গোঁ ধরে টাটে দাঁড়িয়ে থাকে।

আলুঅলা রবি একসাথে প্রাইমারিতে পড়তো। রবি এককেলাশ নিচুতে। নবকে আলুঅলা ভাবতে রবির কষ্ট হয় না। টাটের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। আলুঅলা বাধ্য হয়ে ফোন তোলে। ডায়াল ঘুরিয়ে কথা বলে। থানার সাথে বলছে। রবি কান লম্বা করে। ফোনে ওপাশের ফিসফাসতো শোনা যাবে। টেলিফোনে দারুণ অভিনয় হয়। মাকুন্দ প্রধানকে দেখেছে। বউ মরার সময় মরা ফোনে অভিনয় করতো। এই আদেশ

দিচ্ছে হসপিটালে, অর্ডার করছে ডাক্তারকে, ধমকাচ্ছে নার্সকে। আসলে সব ভোঁ-ভাঁ। আলুঅলাকেও চিনতে চায়। আলুঅলা ধূর্ত। ফোনে হাত চাপা রেখেছে। টেলিফোনে অভিনয় করছে।

অভিনয়ের শেষে বলে–খোলা বস্তার আলু পাঁচ কেজি পৌঁছে দি আয়।

রবি বোঝে, নবকে সরিয়ে দিল। ধরা দিল না।

রবিও মনে মনে বলে–ঠিক হ্যায়, আলুঅলা, দিন জরুর আয়েগা।

আলু নিয়ে বেরুবার মুখে আদেশ হলো,

–বলে দিবি, দিনুকে নিয়ে চিন্তা নেই। সন্ধের পর আমি যাবো।

একটু থেমে দ্বিতীয় আদেশ;

–আলু নামিয়ে চলে আসবি। কাজ আছে।

রবিউল অর্ডার পছন্দ করে না। হেলে দুলে চলতে শুরু করে। আলুঅলা হাঁকে,

–শোন।

রবি দাঁড়ায়।

–এদিকে আয়, এখেনে থুতু ফ্যাল। শুকুবার আগে আসবি।

গাঁজার টানে গলা শুকিয়ে গেছে। অক টেনেও থুতু বেরুলো না।

–যা গালগল্প করিস নে।

রবি বলল–চা খেয়ে আসবো।

আলুঅলা কিছু বলে না। মুচকি হাসে।

অনেক লুঠেরার সাথে দিনু তখন লক-আপে। প্রাণপণে কবিতা আওড়ে যাচ্ছে। রাত সাড়ে ন'টা।

'সারবন্দী জানলা, দরজা গোরস্থান–ওলোটপালোট কঙ্কাল / কঙ্কালের ভিতরে সাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে মৃত্যু–সুতরাং / মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু / আর কিছু নয়।

দিনুর শোয়ার ঘর।

ঘরে আলুঅলা, বিছানায়। ঘরের মাঝখানে পিলার হয়ে দাঁড়িয়ে ভবানী। ভবানীকে জড়িয়ে ঝুলে আছে দিনুর বোন, তারা। সদ্য যুবতী। নব দিনুর ল্যাংটো বয়সের বন্ধু। সেই নবর ভরসা আর বীরত্বে নিশ্চিন্ত দিনুর বাবা ফিরে গেছেন, লোলচর্ম-ন্যুব্জ বৃদ্ধের অপেক্ষা শুধু রাতটুকু। সকালেই ছেলে ফিরে আসবে। থানার মেজো বাবুর সাথে

নবর খুব দহরম মহরম। পাশের ঘরে অন্ধকার। শয্যাশায়ী বৃদ্ধার মাথায় হাত রেখে বৃদ্ধ ভোরের আলোর কথা বলছেন। নবর ভরসার কথা বলছেন।

—ঘুমোও, আরতো ক'ঘণ্টা। খোকা ফিরে আসবে। এ ঘরে ভবানী আলুঅলার মুখোমুখি। মুখ খোলে ভবানী—আসল খবর বলো।

আলুর মতো গোল চোখ মেলে নব তারার পটলচেরা চোখ দেখছিল। চোখ টিপে ডাক দিল সদ্য যুবতীকে।

দূর নৈনিতাল!

মুখে বলে—সত্য নিবেদন করিয়াছি দেবী।

জীবনের প্রথম ইঙ্গিতে কেঁপে ওঠে তারা। শরীর দিয়ে ভবানী বুঝতে পারে এই শিহরন।

ভবানীর গলা আছড়ে পড়ে—তারা বাচ্চা মেয়ে। অসভ্যতা করো না, আলুঅলা।

আলুঅলা নিঃশব্দে হাসে। নবর দাঁত টিউবের আলোর মতো স্থির আর শক্ত। হাতের মুঠোয় চাবুকের বাঁটের মতো ভবানির বুক ওঠে নামে। চাবুকের বাতাস হিস্ করে ওঠে—তুই ভেতরে যা, তারা।

ভবানীকে না মানার ক্ষমতা তারার নেই। তারা ভিতরে চলে গেলো।

নবর দাঁতে ঠোঁটের ছায়া পড়ে। হাসে। হাসিতে তলোয়ারের কিনার তলোয়ার, চাবুকের লড়াই শুরু হয়। দেখা যায়।

—আমি মাইরি খাইনি। বিশ্বাস করো না খেয়ে থানায় গিয়েছিলাম।

—আমার কাছে খবর আছে, যাওনি।

নব তলোয়ার একবার শূন্যে ঘুরিয়ে নেয়, ফিস্‌ফিস।

—শালা রবিউলটা হারামি।

পাড়ার মেয়ে ভবানী। প্রেম করে বিয়ে। তার চাবুকের শিকড় মাটির অনেক গভীরে।

—আমি থানায় গিয়েছিলাম। তুমি ফোন করোনি।

নবরা উদ্বাস্তু। টাকার জোরে মাটি কামড়াচ্ছে। একপাক চাবুকের তীব্র শব্দ তার কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। নব তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে পড়ল চাবুকের ঘাড়ে।

—একা মানুষ কী করে যাই বলো তো? আর কেন যাবো? কিসের ফয়দা?

ভবানী এবার চাবুকটা এলেমেলো চালিয়ে দিল।

—ফয়দা আমাদের বাড়ি, ফয়দা আমি। চিলেকোঠায় গুন্ডা বসিয়েছ। রবিউলকে স্পাই রেখেছো।

নব বুঝে নেয় চাবুকের লক্ষ্যভেদ ভোঁতা হয়ে গেল। সুযোগ বুঝে কিরিচে কেটে

ফেলল চাবুকের তেজ। সে হাসে। হাসিতে তলোয়ার শান্ত দেখায়। ব্যবসাদার নব এক ভেলকিতে সুনীল। যুবক হয়ে ওঠে। প্রেমিক নব তলোয়ারকে কবিতা বানিয়ে ফেলে।

—সত্যি, ভীষণ সত্যি বলেছ ভবানী। তোমাকে চাই। আমি তোমাকে চাই। অসম্ভব বুদ্ধিমতী তুমি। তোমাকে পেলে শহরের সমস্ত আলু-ব্যবসা এক চেটিয়া দখল নেবো।

নব হাসে। হাসিতে ভরি ভরি কয়েন ঝরে পড়ে। ভবানী তলোয়ার চিনতে ভুল করে না। সে কবিতাকেই পুঁজি করে। চালিয়ে দেয় কাটা চাবুক।

—থানা অফিস-খরচা চায়। সকালেই দিনুকে ছাড়াতে হবে। নইলে কেস হয়ে যাবে।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নব।

তখন থানার সেকেন্ড অফিসার ব্যাটন হাতে লক-আপে ঢুকলেন। দিনু এখন কবি। কবিতার লাইনগুলো মুঠো ছাপিয়ে রাইফেল বুলেটের মতো এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ছে মাথার ভিতরে। কিছুতেই গুছিয়ে তুলতে পারছে না। আওড়াতে চাইছে। পারছে না।

অস্থির চাহনি। অভাবী ক্ষুধার্ত মানুষগুলো ভয়ে কাঠ। দিনু কবিতা হাতড়ায়। তার গলা শুকনো। তামাদি বুলেটগুলোর জন্যে মায়া হয়। কবেই কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে। একঝাঁক শুকনো বুলেট গলার কাছে ভালবের মতো আটকে আছে, দম সরছে না। সেকেন্ড অফিসার ষণ্ডা মানুষটাকে ব্যাটন দিচ্ছে। সে চিৎকার জুড়েছে পরিত্রাহি। দম বন্ধ করে শরীর শক্ত রেখেছে। কবিতার বুলেট কোনো কাজে এলো না।

নব আঙুলের ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে—নীচতলার হলঘরটা কি কাজে লাগে? আমি গুদোম করবো।

—দিনু স্টকবিজনেশের জন্য রেখেছে।

নব আকাশ থেকে পড়ে।

—পুঁজি কোথায় দিনুর। জানো, আমার কাছে তোমাদের দেনা কত?

জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো চাবুকের চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়।

—হল ঘরতো ছাড়, তুমি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যাবে।

ভবানি চাবুক সুদ্ধ কেঁপে ওঠে।

দিনু এমএ পাশ করে চাকরি জোটাতে পারেনি, বিশাল প্রাচীন বাড়ি, জমি, বাগান ভাঙিয়ে চলছে। ভিতরে ফোঁপরা হয়ে গেছে, ভবানি জানে। কিন্তু ধার দেনা! ভাবেনি। মুহূর্তে জিজ্ঞাসার চিহ্নটাকে টেনে দাঁড়ি তৈরি করে।

—দিনু আসুক, এসব ব্যাপারে সেই কথা বলবে।

নব ভবানীর খুব কাছে সরে আসে। প্লাবিত গলায় বলে—দিনুকে ছাড়াতে যে খরচ হবে, সেও বাকি থাকবে? নব হাসে। হাসিতে রুপোর জড়ি উড়ে উড়ে যায়। স্থির দাঁড়িয়ে থাকে ভবানী, পিলার।

যুদ্ধ শেষে সন্ধির মতো বিশাল দুখানা হাত ভবানীকে জড়িয়ে ধরে। ভবানী পিলার। প্রাকযুদ্ধের ভঙ্গিতে স্থির। নব ভবানীর ঠোঁটে মুখ রাখে। হঠাৎ সিটি বেজে ওঠে। ছন্দ কেটে যায়। ভবানীর মনে হয়, সন্ধি নয়, আসলে বিশাল ফাঁদ। গভীর জালের মধ্যে সে জড়িয়ে যায়। আবার সিটি। নব ছিটকে যায়।

ভবানী চমকে ওঠে—রবিউল?

—হ্যাঁ, পাহারা আছে।

নব নির্দিষ্ট জানলার কাছে এগিয়ে যায় দ্রুত। তলোয়ারের দাঁতে ঝিলিক ওঠে—কে?

—রবিউল সংকেত দেয় দিনু মিত্তির।

নবর তলোয়ার আবার ঝলমলিয়ে ওঠে।

—ভালো করে দ্যাখ।

জানালায় উঁকি দেয় রবিউল।

—দিনুই তো।

দিনু তখন লকআপে অজ্ঞান।

কোলাবরেশন

ঘরে ঘরে আজকাল হাড় জ্বালানে ডাকসাইটে বউ আর নাকি ঘরজামাইদের আবির্ভাব ঘটছে। শাশুড়িদের নাকিসুরে কান্না আর চোখের জলের বিরাম নেই। কাগজওয়ালারা শাশুড়িদের পক্ষ নিয়ে খবরগুলো বেমালুম চেপে যাচ্ছে।

নইলে উমার মায়ের এত বাড়বাড়ন্ত!

হাড়হাভাতে বেকার ছেলেদের উৎপাতে পাড়াটা নাকি উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। নবকার্ত্তিক হবুজামাইদের বিগড়ে দেওয়ার জন্য—যেন ওৎ পেতে আছে।

উমার মার খানিক শিক্ষা হওয়া দরকার। গরুর পেটে গোবর আছে—ভাবখানা যেন কিছুই জানে না। দেখলে, রাজার দুলালি সীতা বনবাসে যায়। গানটা, আপনার মনে পড়বে। বউ যখন শাশুড়ি বাছাধনকে পেটাই করে, আমার মতো আপনি যদি বার ঘর এক উঠোনে বাস করতেন—হাঃ! শীতকালে বেহারিদের তুলোধুনা দেখেছেন?

স্বনিযুক্তি প্রকল্পে, আমি একটা ভাঙা ঝর ঝরে অটোরিকশার মালিক কাম ড্রাইভার। গাড়িখানা মাসের মধ্যে কুড়িদিন থাকে গ্যারেজে।

নালু আমার বন্ধু। বিটি মিলের ছাঁটাই লেবার। বাঁ-হাতখানা নুলো। ছাঁটাইবাবদ ব্যাঙ্কে কিছু মাল-কড়ি আছে। এপাড়ায় হাড়-হাভাতে আমরা দুই আইবুড়ো হতভাগা। উমার মা তল্লাটে থাকতে, আমাদের বিয়ে? উমার মার পলিটিক্যাল অত্যাচারে, অসম্ভব!

নালুর মার হাড়ে-বাতাস লেগেছে। ধরুন, উনুনে, তরকারি চাপিয়ে নালুর মা গিয়েছে পুকুরে—চাল ধুতে। উমার-মা চুপিসাড়ে একখাবলা নুন মিশিয়ে গেল তরকারিতে। কিংবা শাড়ি-কি-শায়া বেড়ার গায়ে শুকুতে দিয়ে ঘরে একটু শরীর এলিয়েছে—লুকিয়ে তুলবে ঘরে। তারপর নালুর বাবা এলে,

—ওমা আমার কি হবে! এ কী বউ ঘরে এলো ...

বলেই, লাগানি-ভাঙানি।

হাড়ভাঙা খাটুনির পর এসব মানেই—উত্তমমধ্যম ঠেঙানি আর পিত্তিজ্বালানো খিস্তি।

আর মিটমিটানি হাসি। উমার মা অনেকদূর সম্পর্কে নালুর মায়ের জা-জাউলি, নালুর আপনদাদা কালু, উমাকে বিয়ে করে ঘরজামাই হবে, শুনেছি। উমার মা শাশুড়ি হলে—কালুর হাড়-গোড়ের ঐকিক নিয়মটা একবার কষুন!

নালু আর কালু দুই ভাই। ওদের নৈহাটিমেড একটা রিকসা আছে। মালিক উমার মা। অলওয়েজ ঝকঝকে। আপটুডেট নার্গিস। দেখলেই চড়তে ইচ্ছে করে। উমার মা রিকশা আর মেয়েকে মেজেঘষে আমাদের চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখে।

রিকশাখানা কালু চালায় দিনে। নালু রাতে।

ফাঁকে ফোকরে দু-একদিন বরাতে জুটে যায় ফাঁকা। সেদিন আমি আর নালু। বাবুদের মেয়ে দেখে বেড়াই। রিকশাখানার মালিক যেহেতু উমার মা, ভয়ে পাড়ায় আপটি দিইনে। সকালের তাজা-রোদ্দুরে থানায় যখন সাইরেন বাজে—আমরা দুই স্যাঙাৎ, মেয়ে কলেজের মোড়ে—বান্দা হাজির, ইয়োর হাইনেস, অলদা রানি সাহেবা।

আমাদের সামনে বুকচিতিয়ে মাথা উঁচু করে পাথরের ক্ষুদিরাম। পাশে ঢাউস লালমার্কা লেটার বকস্। এক কানকিতে চাররাস্তা ফ্রেমে বাঁধা ছবি।

—হায়, হায়, সাতসকালে টুনটুনি, দেখবি নাকি?

জিজ্ঞেস করি। নালু গম্ভীর। বচ্চন টাইপের গলা করি। —আজ ঢিলে লাগছে।

—রিলে কর।

বলি, কিছু একটা হয়েছে। আচ্ছা নাড়াকাতুরে। কিছু হলেই ভাবে হাবুডুবু খায়।

পাত্তা না দিয়ে রেডিওর পুষ্পেনদা হয়ে গেলাম।

—আমাদের ছোট ফ্রেমে বিপুল বিক্রমে ঢুকে পড়েছে টুনটুনি। হিন্দি ফিল্মের টুনটুনি নয়। বহরমপুর শহরের। ফ্রেম ভেঙে চুরমার।

নালু রেগে উঠল—ইয়ার্কি হচ্ছে, শুয়োর। হাতি ব্যাঙ যা ইচ্ছে তাই ঢুকে পড়ছে ফ্রেমে।

—গুরু, সাইজটাতো জানো।

—রিলেতে স্লিম করে দে।

—গল্প হয়ে যাবে যে।

নালু ঘাড় হেঁট করে ট্যাঁক থেকে লম্বা দুটো বিড়ি আর গাঁজার পুরিয়া বের করে। নুলো হাতখানা আকাশে তুলে পুরিয়া দেখায়—গলা ছেড়ে বলে দুনিয়া সাচ হো যায়ে গা।

গুরু মাঝেমধ্যে ফিলোসফার বনে যায়। আজ সুরটা দুঃখের রাগিনীতে চাপানো আছে। কিন্তু মেয়ে-কলেজের মোড়ে এখন চেঁচালে, পুলিশের লাঠি কেউ ঠেকাবে না।

—কী হয়েছে গুরু? আওয়াজ বেতালা লাগছে।

—অভাবের সংসারে যা হয়। নে তোর কাজ তুই কর।

অভাব মানেটা আপনাদের জানা দরকার। এক ফুল দো মালিকা কাহানি। উমার মা জাহাঁবাজ মহিলার আঁচলে একটাই উমা। এদিকে হবুজামাই কালু। আর বেচারি নালু, অন্যদিকে উমাকে ভালবেসে বসে আছে। বহুদিনের পুরোনো গল্প। ওকে চাঙ্গা করার

জন্য বলি—

—উফ গুরু, রোককে রোককে—চোখের বাঁদিকে মণি রেখে ডানদিকে তাকাও নইলে জীবনের মতো ট্যারা হয়ে যাবে। মিনাক্শি শেষাদ্রি।

নালু বিড়ি শিল্পে ব্যস্ত। মাথা তোলার সময় নেই। গম্ভীর মুখে ফতোয়া দিল—

—এসব মাল ভিজিয়ে দেখতে হয়।

গুরু বেড়ে বলেছে।

সব ভুলে চেঁচিয়ে উঠলাম।

—দ্যাখ, দ্যাখ তোর রাজহংসী নামছে রিকসা থেকে। দুধে-আলতা পা। আহ্ ইচ্ছে হয় সারাজীবন বুকে জড়িয়ে রাখি। সেই গল্পটা বল না গুরু।

নাঃ! গুরু জোর ধাক্কা খেয়েছে। কিছুতেই সামলাতে পারছে না। মনে হচ্ছে, ফ্রেম ভেঙে গল্পটা আজ দুঃখের দিকেই গড়িয়ে যাবে। দুঃখটাকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করি।

—না, গুরু, গল্প শোনার সময় নেই। এখন পিক—আওয়ার। কোন দিকে দেখি, চারদিকে সোনালি কলার ছড়ির মতো ঝাঁক ঝাঁক যুবতীরা ঝলমলে রোদ মেখে চলে আসছে। এ বলে আমাকে দ্যাখ, ও বলে আমাকে—

গুরু আজ কাউকে দেখবে না। উমার মুখ দেখছে। ভালবাসার মার দুনিয়ার বার।

নালু ধরা গলায় বলে—

—রাজহংসীর সাথে একই রিকসায় ফরেন নায়িকা আসত—মনে আছে!

নালু যত মচকায় আমি টগবগ করি।

—শহরের তাবৎ সুন্দরী আমার অন্তরস্থ। তারচে বলো, ফরেন কোলাবরেশান। সোফিয়া লরেন টাইপের, ছত্রিশ চব্বিশ চেহারা। শকুন্তলার মতো হাটু পর্যন্ত চুল—একদিন পেনসিল-হিলে চড়ে রিকসা থেকে নামতে গিয়ে হিঃ হিঃ উল্টে লটপট—সেই তো?

নালুর হৃদপিণ্ডটা মনে হলো খানিক ঝুলে গেছে।

—হুম, তাকে আর দেখতে পাবি না। গান ফট্। নুলো হাতখানা মাথার উপরে তুলে, আঙুলের কলা-কৌশলে বুঝিয়ে দেয়, গান ফট—মানে, সোফিয়া লরেন নামের ছাপ্পামারা মেয়েটা উপরে চলে গেছে।

উমার কিস্‌সা গুরু কিছুতেই ভাঙছে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—চল্, ভাল্লাগছে না।

সোফিয়া লরেনের সাথে উমার মুখের কোথায় যেন মিল আছে—আদলে? চোখে? না। তবে বিদ্যুৎচাহনিতে! হাসিতেও হতে পারে কিংবা ভ্রুভঙ্গিতে—কী জানি, দু'জনের হৃদয়ে, ইচ্ছায় গহন লিপ্সায় হয়ত গভীর মিল আছে।

নালুর চোখে কি ধরা পড়েছে?

উমার দুঃখে গুরু আজ সোফিয়া লরেনের গল্পে মজে যাবে। উমা আর সোফিয়া লরেন একাকার হয়ে যাবে। কোথায় যাবে?

জিজ্ঞেস করি—গঙ্গার ঘাটে যাবি?

মেয়েদের স্নান করার দৃশ্য। আমাদের সেকেন্ড স্পট।

—না। ডাললেক।

থার্ড প্লেস। গ্যাঁজার আড্ডা।

নালু রিকসার সিটে বসে। প্যাডেলে চাপ দেয়। ভি-টাইপের চওড়া পিঠখানা। নৌকার বৈঠার মতো দু'দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে চালায়। মাঝে মাঝে হ্যান্ডেল ধরে সোজা হয়। নুলো হাতখানা জিরোয়। একহাতে ঝুল সামলানো বেশ দায়।

বলল—কাকাতুয়াটা দেখেছিস্?

—কোন্ কাকাতুয়া?

রিকশায় চড়ে নালু যেন কোথায় ভেসে চলেছে।

—সাদা ধবধবে। বিচুলিহাটার দোতলা বাড়ি—ঝুলবারান্দার দাঁড়ে বসে থাকে।

সবাই চেনে। শ্বেতপাথরের মতো সাদা, ফটফটে বিশাল বাড়ি। দোতলা। নীচে ডাল লেক—সবাই বলে। আসলে কালো জলের মস্ত দিঘি। ছায়া পড়ে চারতলা হয়। ওটা সোফিয়া লরেনদের বাড়ি। দিঘি পাড়ের রোড থেকে দেখা যায়। টানা ঝুলবারান্দা। গোল দাঁড়ে কাকাতুয়াটা বসে থাকে। মানুষের মতো অদ্ভুত কথা বলে। বক বক করে। চিৎকার করে সারাদিন।

ভোরেরবেলা ফরেন কোলাবরেশান যখন শকুন্তলার মতো এলোচুলে, কাকাতুয়াকে ভিজে ছোলা খাওয়াতে আসে পাটভাঙা সূর্যের রক্ত ছড়ানো আলোয় ফুটে ওঠে সোফিয়া লরেনের অদ্ভুত লালচে ফর্সা রঙ।

যেন পৃথিবীর তিনভাগ জলের নীল আকাশি চূড়োয়—শ্বেতপাথরের মত সাদা বাড়িটার রোদ ঝলমলে ফ্রেমে—চোখ ঝলসানো ফরেন কোলাবরেশানের লালচে মুখ আর খাড়া ঝুঁটি কাকাতুয়া বাঁধানো ছবি ঝুলে থাকে। একটা ঝুলন্ত ছবিতে দুটো অদ্ভুতের জন্য ইয়ং-বহরমপুর বাড়িটাকে চোখে রেখে আদর করে। আমিও করি।

গুরু এখন বলে যাবে। শুনতে হবে। গল্পটা অনেকবার শুনেছি। নালুর আশ মেটে না বলে। রিক্সা টিকিয়ে টিকিয়ে চলছে। কান্নার ফুঁপিয়ে ওঠার মতো ঝুঁকে ঝুঁকে চালাচ্ছে নালু। দু'তালুর বেড়ে ধরা যায়, সরু কোমর থেকে উঠে গেছে—ওর 'ভি' কাট পিঠ। ওর রিকশায় চড়ে সোফিয়া লরেন একদিন মুখ ফসকে রাজহংসীকে বলেছিল—দারুণ

ব্যাকসাইড! নালু গল্প বলে। পিঠখানা দোলে। সত্যিই পুরুষালি। বারবার গল্পটা বলে, আর একটু একটু বদলায়। রাজহংসী বলেছিল—

—কেন, তোর লোভ হয়?

—যাঃ!

সোফিয়া লরেনের কাছে ভাঙানি ছিল না। ভাড়া নিতে নালু, সেদিন সিঁড়ি দিয়ে প্রায় কাকাতুয়াটার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। আর হাত পেতে টাকা নেওয়ার সময় স্বপ্নের মধ্যে যেন ছুঁয়ে ফেলেছিল নায়িকা লরেনের আশ্চর্য আঙুল আর একটু হলে।

উমার রুটিবেলা খটখটে আঙুল একদিন তুলো দিয়ে তৈরি হবে। আমারও খুব ইচ্ছে হয়।

নালুকে বলি—গুরু, সেই গল্পটা আর একবার বলো।

বাস্তবে উমার সাথে নেলোর দূরত্ব যত বাড়ে, গল্পে কাকাতুয়ার সাথে প্রতিদিন কমে। প্রতিবার গল্পে একধাপ দু'ধাপ সিঁড়ি বেশি উঠে যায় নালু।

লেকিন সোফিয়া লরেন–দিল্লী বহুত দূর!

অন্তত কাকাতুয়াটার সাথে, গঙ্গার ঝড়ো বাতাসের মতো গল্প করবে, কবে?

আমার শুনতে ভীষণ ইচ্ছে হয়।

মোজেইক সিঁড়ি দিয়ে উঠে লম্বা বারান্দার শেষে বিশাল কাচের দরজা লাগানো ঘরে ঢুকে পড়বে। ওই ঘরে ডানলোপিলো গদির নরম বিছানা। ওই বিছানায় শকুন্তলার মত চুল, লরেন দেখেছিল, তার প্রেমিকের সঙ্গে শুয়ে আছে মা। হ্যাঁ, তার গর্ভধারিণী মা। বিলেতফেরত প্রেমিক। উঃ! নেলো স্লো করে রিকশা। নুলো হাতখানা সোজা হয়। বলে—মেয়েটা কি বোকা, নারে? কাচের ভিতর দিয়ে দেখে সঙ্গে সঙ্গে তিন-তলার ছাদে! ঝাঁপ!

জীবনটা কোথায় রে বাপ!

কাচের দরজার এপারে, না ওপারে?

নালুর গলা ভেঙে পড়েছে।

—কী গুরু, দু'টানেই কাত? চালাও চালাও অনেক পথ।

—না, যাবো না। বাড়ি যাবো। তুয়াকে দেখবো। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। এই বিছানা, বালিশ, ঘাম, স্বপ্ন, ইচ্ছা, কাকাতুয়া সবশেষ!

—তুয়াটা কে?

—সোফিয়া লরেন মারা যাওয়ার পর উমার গোপন নাম রেখেছি তুয়া। নামটা কেমন, ইয়ার? কাকাতুয়া থেকে তুয়া!

আমি জানি, নামটা ও এখুনি তৈরি করল মনে মনে।

—দারুণ, তোর তুয়ার সাথে তো কালুর বিয়ে।

—তা হোক, দাদা তো।

গঙ্গানদীর মতো বিষাদটাকে লম্বা করে দিয়ে বলে—আমি কাকাতুয়াটাকেও কোনোদিন ছুঁতে পারবো না। আয়, রিকশা চালা। আমার কান্না পাচ্ছে।

অদ্ভুত, কোনোদিন খেয়াল করিনি, কোমর থেকে ছেঁটে দিলে, পিছন থেকে নালুর ঊর্ধ্বাংশ-ঠিক যেন ভারতবর্ষ।

—কার জন্যে পাচ্ছে গুরু?

—কেন, সোফিয়া লরেনের জন্য, তুয়ার জন্য, কাকাতুয়াটার জন্য। আচ্ছা, কাকাতুয়াটা এখন খুব ছটফটায় না?

বেচারি জানেও না, সোফিয়া লরেন মরেনি। তবে হাসপাতালে, কাকাতুয়াটা তেমনি নির্বিকার—কথা বলে। ভিজে ছোলা ছাড়া কাউকে চেনে না।

২

হৃদয়ের দিক নিয়ে কথা উঠলে, নালুর ছিঁচকাদুনে চোখ দুটো উথলে ওঠে। আমার বিশ্রী লাগে। সাতসকালেই মেঘলা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। মিনি বেড়াল ঘুমটা আমার চটকানো সারা। ফোঁতর-ফোঁত নাকে মেঘ ডাকছে। ঘরখানাকে বর্ষাকাল বানিয়ে ছাড়বে।

মনে হচ্ছে, ওদের বাড়িতে এখন কঠিন গ্রীষ্মকাল। আবহাওয়া আর নারী সংক্রান্ত বিষয়ে নালুর সঙ্গে আমার নীতি একদম মেলে না। নেহাত বহুদিনের বন্ধুত্ব, পাশাপাশি বাস!

আর ওই উমার মা—শাশুড়ি হবে, অর্থাৎ কালুকে কব্জা করবে, এই দেমাকে, নালুর পা মাটিতে রাখতে দেয় না—শূন্যে তুলে ঝুলিয়ে রাখে দাঁড়ে; বাড়ির বাইরে। সোফিয়া লরেনদের কাকাতুয়াটার মতো।

মাপ করবেন, আগের পরশুদিন আপনাদের বলছিলাম উমার চিন্তায় নালুর হাল খারাপ। না, ওই দিনই উমার মা ওকে ঘর থেকে উৎখাত করে দিয়েছে। নালু আর কালু, দুইভাই একঘরে এক চৌকিতে থাকত। শুতো। দুইভাই মিলে ভাড়াও দিত। নালু এখন উদ্বাস্তু।

সোফিয়া লরেনের মার কথা ভাবুন। যত রকম শাশুড়ি তত প্রকার ফাঁদ। মেয়ের বয়স আর রিকশার আয় দেখিয়ে দুইভাইকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। যে উমাকে বিয়ে

করবে সেই যৌতুক পাবে রিকশাখানা।

আজ আবার নালু-কালুর ভবিতব্যে কী ঘটবে, কে জানে? উমার মা-শাশুড়ি পিছনে—ওদের আবার ঝাঁপ মারার দোতলাও নেই। বিষম বিপত্তি।

গা থেকে লেপ সরিয়ে উঠে বসি।

যত্তসব ছোটলোকি চাল।

যে সংসারে দুই ভাইয়ের জন্য একখানা রিকশা, রুটি-রোজগারের গাছপাথর আর বিয়ের জন্য একজন যুবতী বরাদ্দ—সে বাড়িতে ঝগড়া মারামারি সম্পর্ক কাটাকাটি হবে নাতো, ফ্রিজ থেকে আইসক্রিমের প্রজাপতি বেরিয়ে সবার গায়ে গায়ে উড়ে বেড়াবে?

তাছাড়া, জামশেদজিটাটার মতো উমার মা—রিকশাখানার মালিক, বিড়লার মতো সাবালক উমা। চিতে-বেড়ার ডালে ডালে তুমি আর উমা কবে মধু খেয়ে বেড়িয়েছো, কবে গায়ে গা লাগিয়ে কিতকিত খেলেছ—সে বেহালা আজ কেন? তুমি আজ নুলো, পা খোঁড়া গরুর গাড়ি। দিল দিওয়ানা করে বাহারি শার্টপ্যান্ট থেকে উমা পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছ। এখন হিমালয় হওয়ার সাধনা করো, বাবা, নালুনাথ!

ভাবতে হয় ভাবো, আমার বিবেক বলে কিচ্ছু নেই। উমার মা তো পরিষ্কার বলে দিয়েছে—যে রিকশা চালাতে পারবে তাকেই আমার মেয়ে আর রিকশা দেব। উমার মার রিকশা চালানো মানেই নোট-কাহানি। মুখে বললাম—নুলো হয়ে বেঁচে গেছিস। উমাকে বিয়ে করতে হলো না। নইলে, হারামির হাড় ঐ উমার মা, ঠেঙিয়ে তোর দুহাত নুলো করে দিতো। এ্যাদ্দিনে উমার কাছে ভিড়তে পেরেছিস কোনদিন? ঠ্যালা বুঝবে কালু। ডেলি পঞ্চাশ ছাড়ো, ফুর্তি করো।

বুঝবে কিরে, বুঝতে চলেছে। আজই তো বিয়ে। বলে, একদলা কফ আর কান্না জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল, নালু।

—এ্যাঁ!

ভড়কে গেলাম। চৌকির স্বর্গ থেকে নেমে এলাম মাটিতে।

—এতক্ষণ বলিসনি কেন? তবেতো, বাড়িতে বসন্তকাল।

—বলতেইতো এসেছি, তোর গাড়িখানা লাগবে।

—সে কিরে, তোদের নার্গিস কি হলো?

—তুয়ার শখ।

—শখ হলেই হলো। উমার বাপ বলেছিল, তুই আর উমা ওই রিকশায় চেপে বিয়ে করতে যাবি।

নালুর চোখদুটো ঘোলা হয়ে এল। আজই বিয়ে। ভারি হৃৎপিণ্ডটাকে সামলে নিয়ে

বলল—আমি তো বিয়ে করছি না।

পিছন ফিরে দৈনন্দিন পেস্ট-ব্রাশে ঢুকে গেলাম। পাত্তা দিলেই কাপড়ে চোপড়ে শ্রাবণ মাস করে ফেলবে। কড়া গলায় বললাম—

তুই না করিস, উমাতো করছে।

—তুই যেন উমার চাঁদমুখ দেখে, আহা! করিসনি? যা না তোর রথ নিয়ে।

কি কথার কী উত্তর। ওর হৃদপিণ্ডটা একেবারে গেছে। ভিজে সপসপ করছে।

—যাবোইতো, ফেল কড়ি মাখো তেল, উমা কি আমার পর? তা, বিয়ের ফর্দটা শুনি?

—বিষ্ণুপুর কালীবাড়ি সিঁদুর তুলে বিয়ে হবে। উমার বাপের কথা রাখার জন্য উমা আর উমার মা রিকশায় চেপে যাবে। আমার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কালিকান্ত বাবাজীবন রিকশা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া করতঃ শুভপরিণয় সুসম্পন্ন করিবেন। আর আমি, মান্যবর নুলো নীলকান্ত তোর গাড়িতে যাবো এবং বিবাহবাসরে উপস্থিত থাকিয়া নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করিব।

বিবাহ অন্তে তোর গাড়িতে শহর ঘুরে সবাই ঘরে যাবে। আমি খালি রিকশা নিয়ে ফিরবো।

হাততালি দিতে ইচ্ছে হলো। মুখ ফসকে বললাম—দারুণ!

নালু আমার কথা পাত্তা দিল না। আপন মনে ঘরের দেওয়াল কিংবা জানালার বাতাসে কথা বলছিল। দেওয়ালে তাকিয়েছিল, যেন শকুন্তলার এলোচুলে, অসংখ্য সাপের জড়াজড়ি, শঙ্খ লাগালাগি দুর্বাসার ক্রুদ্ধ নিশ্বাস লেগে দেওয়ালে মাথা কুটছে। কিংবা বাতাসে তাকিয়ে ছিল যেন সোফিয়া লরেনের রোগ ক্লান্ত হাসপাতাল বেডের সাদা চাদরখানা এখুনি উড়ে আসবে জানালা দিয়ে।

—জানিস, কালরাতে তুয়া আমাকে খেতে দেওয়ার জন্য জেগে ছিল।

আমি উসকে দিই। — অন্যদিন?

বলুক। কথা বলুক। কথার বাষ্প উড়িয়ে ঝুলে পড়া হৃদপিন্ডটা খানিক শুকিয়ে নিক।

অন্যদিন রুটি ঢাকা থাকে—নিজেই খেয়ে নিই। কাল খেতে দিয়ে চুপ করে বসে থাকলো। ওর মা হয়ত কোথাও ঘাপটি মেরে পাহারা দিচ্ছে। বললাম—যাও শুয়ে পড়ো।

উঠল না। লক্ষ জ্বলে যাচ্ছে। এক সময় পুরোনো গল্প শুরু করলো। একদিন নদীতে ডুবে যাওয়ার ভণিতা করে তুয়াকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে রেখেছিলাম বুকের মধ্যে। দুপুর বেলা। নদী সুনসান। কেউ দেখেনি। তোকেও বলিনি সেইসব গল্প। গল্প করতে করতে রাত শেষ করে দিল। পাতের এঁটো কুড়িয়ে ভোরের পাখিকে দেওয়ার জন্য

উঠে গেল। একবারও বলেনি, আজ ওদের বিয়ে।

নালু হৃদপিন্ড খুঁড়ে আজ বেদনা টেনে তুলছে।

রিকশাটা যেদিন কেনা হলো। নতুন ঝকঝকে। বাড়ি আনন্দের ঢেউ। আমরা দু'ভাই রিকশার সিটে বসেছি। উমা আমাদের কোলে। উমার বাবা চালিয়ে নিয়ে চলেছে বেড়াতে। সেদিন উমার বাবা বলেছিল—তোরা তিনজন রিকশার তিনখানা চাকা। উমা সামনের তোরা দুই ভাই দু'পাশের। আমি আর উমার মা বডি, সব মিলিয়ে সংসার—টেনে নিয়ে যেতে পারবিনে?

কাকে বলেছিল, কে জানে? নাকি তিনজনকেই? উমারা আমাদের কেউ না। গাঁয়ের ভিটেমাটি চাটি করে উঠে এসেছিল আমাদের পাশের ঘরে, বারোঘর এক উঠোনে। আমার গুণধর বাবা ওদের সর্বস্ব মেরে পালিয়ে যাওয়ার পর—ওর বাবা থানায় ডাইরি, পাড়ার ক্লাব ডাকা, কোন শত্রুতাই করেনি। উল্টে আমাদের দুই নাবালকের দায়িত্ব নিয়ে দুটো সংসার এক করে নিলেন, অদ্ভুত। আমাদের মা-মরা মুখ দেখার জন্য বাবা কোনোদিন ফিরে আসেনি।

গুরু আস্তে আস্তে ঐতিহাসিক হয়ে উঠছে। কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করি— খাওয়া দাওয়া কী হবে রে?

নুলোতো নুলোই। কথার হ্যান্ডেলে বিয়ারিং ভেঙে বসে আছে। ক্যাঁচ করে কথার ঘোর ভেঙে বলে ওঠে—আরে হ্যাঁ, তোকে তো নেমন্তন্ন করতেও এসেছি। রাতে মুরগির মাংস ভাত। নেমতন্ন বলতে আমার আর তোর।

বলে, মুখখানা একই সংগে হাসি হাসি আর করুণ ভঙ্গি করে আমার দিকে তাকায়।

আমি চনমনে গলায় বলি—কুছ পরোয়া নেই। বিয়েতে যাচ্ছি। তবে কাগজের মালা ফালা চলবে না। রজনিগন্ধা চাই। খরচা আমার।

বিয়েতে আমার উৎসাহ দেখে নালু হতাশ।

ভেবেছিল, সান্ত্বনার লৌহবর্ম দিয়ে ওর বুকজোড়া মুড়ে দেব এবং ঠ্যাঙ ছড়িয়ে...

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

হৃদপিন্ড ঝুলেপড়া নেলোটার জন্য অপেক্ষা করার কোনো মানেই হয়না। এখন আমার হাতে মুখে কাজ।

ঘন্টা দুয়েক পর ফিরে দেখি, বোল্ডআউট হয়ে ছিটকে যাওয়া উইকেটখানা আমার বিছানায় পড়ে আছে। খাড়া করতে বেশ বেগ লাগল।

শুধু অটো রিকশার মালিক নই, ঘনিষ্ট প্রতিবেশীও বটে। কিছু দায়িত্ব পালন ছিলই। কনে আর কনের মাকে গুছিয়ে রিকশায় তুলে দিলাম। নার্গিসের সিটে বসার কথা ছিল

নালুর। ফ্রেমটা ভেঙে শ্রীমান কালুকে বসিয়ে দিলাম। পরির ডানার মতো হ্যান্ডেল দুটো ছুঁয়ে খুশিতে ডগমগ কালু বিয়ে করতে গেল, যেন উড়ে।

প্রেমের নতুন একটা ছবি চলতে শুরু করলো।

গুছিয়ে বেরুতে বেশ দেরি হয়ে গেল। এখনও পাম্পে তেল ভরতে হবে। নালু এখন আমার পাশে, বেশ শান্ত। অটো রিকশার সামনের কাচ ভেদ করে অতীত দেখার চেষ্টা করছে। পা-রিকশার যা স্পিড, চালাতে চালাতে, হামেশা পিছন ফিরে দেখা যায়। এই অভ্যাসেই বড় হয়েছে নালু, কালু। তাছাড়া নালু এখন পদাতিক। যত খুশি পিছন ফিরে দেখতে পারে। গাড়ির কাচের জানলাকে এতক্ষণে কাচের দরজা বানিয়ে নিয়েছে। কাচের দরজা খুলে হয়ত সোফিয়া লরেন দেখছে। একটু নাড়িয়ে দিলাম। —কি গুরু, কী ভাবছ?

—ইয়ার, তুমিও বিট্রে করলে! ফরেন নায়িকা মরেনি, তুমি জানতে। সেদিন কিন্তু বলো নি।

যা ভেবেছি ঠিক তাই।

—মরেনি?

অবাক হওয়ার ভান করি।

—ফাইবারের পা আর প্লাস্টিকের বুক নিয়ে ফিরে এসেছে। সেই প্রেমিকের সাথেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—ঘুরে বেড়াচ্ছে? সেই প্রেমিক?

সত্যিই অবাক হই। লোকটা নাকি বিলেত ফেরত। আমেরিকা থেকে প্রেম করা শিখে এসেছে। নালু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে— ফাইবারের পা, প্লাস্টিকের বুক এখন মারুতি করে ঘুরে বেড়ায়।

আমাদের, মানে ইঞ্জিনের ড্রাইভারদের পিছনে তাকাতে নেই। সামনে দেখো, এগিয়ে যাও। স্পিড শুধু স্পিড। নালুকে ঠেলা দিই।

—সামনেটা দেখো, গুরু সামনেটা।

গাঁজার বিড়িতে দম মেরে গুরু কেমন ঘোরের মধ্যে। মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে রিলে শুরু করে।

—সামনে শুধু রাস্তা। রাস্তা পার হয়ে যাও। ফিতের মতো চাকায় গুটিয়ে যাও রাস্তা। দেখতে পাচ্ছিস রিকশাখানা?

কোথায় রিকশা? খোয়াব নাকি?

—রিকশায় বসে তুয়া, তুয়ার মা—চালাচ্ছে দাদা, শ্রীমান কালীকান্ত।

বুঝলাম, গুরু অতীত দেখার চশমাটা উল্টে পরে নিয়েছে।

—রিকশাখানা, রানওয়েতে এরোপ্লেনের মতো, বিষ্টুপুর কালীবাড়ির সামনে ল্যান্ড করলো।

হ্যাঁ, আমিও দেখতে পাচ্ছি; ইঞ্জিন গাড়ির ড্রাইভারদের সামনের দিকটা পরিষ্কার দেখতে হয়।

—নিশ্চয় পুরোহিতকে খবর দেওয়া ছিল। বাইরে এসে দাঁড়ালো। বেঢপ মোটা, কালো, লোমভর্তি ভল্লুকের মতো লোকটা, লাল চোখ, কপালে সিঁদুর, লাল কৌপীন জড়ানো। খড়মের শব্দ তুলে নেমে এল রিকশার পাশে। তুয়ার হাত ধরে নামাচ্ছে।

নালু উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল—ইয়ার, খুব অন্যায় হচ্ছে। পুরোহিত তুয়ার হাত ধরে টানছে কেন?

আমার হাসি পেল। বললাম—গুরু ভুল দেখছো। তুমি কপালকুন্ডলার কাপালিককে দেখছো। আমাদের পুরোহিত বামপন্থী রাজনীতি করে। রোগা আর ফর্সা।

—ভুল বোঝাবার চেষ্টা করো না ইয়ার। ওকে আমি চিনি।

—গুরু তর্ক করো না। রিলে করো। বিয়ে শুরু হয়ে গেল।

মন্ত্রপড়ার মতো হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল নালু।

—ইয়ার তুমি দাদার দোস্ত হয়ে গেলে। আমার কথা ভাবলে না।

বাঁ হাত দিয়ে নালুর পিঠ চাপড়ে দিলাম।

স্টিয়ারিং-এ ডানহাতখানা কেঁপে উঠল।

পাম্পে তেল ভরে মন্দিরে পৌঁছতে বেলা হয়ে গেল। রজনিগন্ধার ফুল-মালা কোনো কাজে এল না। বিয়ে হয়ে গেছে। নতুন বর-বৌ পাশাপাশি মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। উমার সিঁথি কপাল সিঁদুর মাখামাখি। ভ্রূর টিপ যেন ভোরের সূর্য্য, ভেঙে চুরে ছড়িয়ে পড়েছে উমার মুখময়। প্রভাতে ফরেন নায়িকার মতো লালচে হয়ে আসছে মুখখানা। পেছনে উমার মা। মন্দিরের বাইরের দরজায়, বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরের শেষে মন্ত্রীদের বিদায়ের ভঙ্গির মতো, পুরোহিত দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে। নতুন বর-বৌ পুরোহিত প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াল।

রাস্তা থেকে নামিয়ে, গাড়িখানা ওদের পাশেই দাঁড় করালাম। কিছু বলার আগেই নালু, ওর অসহায় নুলো হাতখানা পকেটে ঢুকিয়ে নেমে গেল। পিছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে খালি রিকশার দিকে। ওকে বড় নিঃসঙ্গ লাগছে। ওর ছায়াটাও ওর সঙ্গী নেই। কালীবাড়ির প্রাচীন বট, সুবিশাল। ওর ছায়াটাকে গিলে ফেলেছে।

চারিদিকে গভীর জঙ্গল। দূরে একটা আয়না-মাফিক বিল। তপোবন-তপোবন ভাব।

পরিশ্রম, কোলাহল পাখির ডাকের মতো। সাঁই সাঁই দিনের বেলা। শন শন হাওয়া এখানে সমীরণ হয়ে আছে। নালু ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। নতুন বউ-বর, কনের মা উঠে এল গাড়িতে। গাড়ি ঘুরিয়ে তুলে দিলাম রাস্তায়। ঘোরাতে গিয়ে রাস্তায় রাখা রিকশার সঙ্গে ধাক্কা গেল লেগে। রিকশার সামনের চাকা ফর্ক থেকে খুলে বেরিয়ে গেল—যাক। ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে দিলাম গাড়ি।

কালু আর উমার মা স্প্রিং এর একখানা উইকেটের মতো ছিটকে নেমে গেল মাটিতে। ওদের হায়, হায়, শোনার মতো সময় নেই।

গাড়িতে বসেই নালুকে ডেকে নিলাম। মুহূর্তে নালুর চোখদুটো ঝকঝক করে উঠল। পাশে এল। বললাম—একজন মহিলাকে দুই বন্ধু বিয়ে করার রীতি আজও চালু হয়নি। তোকে এখনও কিছুকাল আইবুড়ো থাকতে হবে। বুঝলি!

পকেট থেকে, একখানা পাত্তি বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম।

—রিকশাখানা সারিয়ে নিস। আর আমার খালি ঘরখানা তোকে দিয়ে গেলাম।

ভারত সরকার যতই চেঁচাক, প্রতিবন্ধী বলে, এর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া চলে না। কালু আর উমার মা রিকশার সামনের চাকাখানা সরোজমিনে তদন্ত শেষ করার আগেই ঘাড় ঘুরিয়ে উমার দিকে তাকালাম। উমা ডাগর চোখ তুলল। আমার পিছনে সিটে বসে, ইশারায় বলল গাড়ি ছেড়ে দিতে।

মাটির রাস্তা। গাড়ির পেছন দিক নিশ্চয় ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেছিল। আমরা, ইঞ্জিনের ড্রাইভাররা পেছনে তাকাতে অভ্যস্ত নই।

আমার সামনে আয়নায় ফুটে উঠল উমার মুখ। সোফিয়া লরেনের মতো লালচে। ডাগর চোখ।

উমার মুখ আড়াল করে, দেখি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেগে একটা বিয়ের মারুতি ছুটে আসছে। একটা মুহূর্ত তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না, ফরেন কোলাবরেশন। সোফিয়া লরেন, বউ, আমেরিকা ফেরত জামাই। গাড়িতে পাশাপাশি বসে। পাশ কাটাবার কোনো উপায় নেই। সরু গলি আঁকড়ে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিলাম গাড়ি। আয়নার ফ্রেমে থর থর করে কাঁপছে উমা। সামলাতে পারলাম না। উমা ছিটকে বেরিয়ে গেল ফ্রেমের বাইরে। চোখের সামনে ভেসে উঠল—ফাইবারের পা, প্লাস্টিকের বুক।

মেকানাইজেশান

খুব ইচ্ছে গল্প শোনায়। কে শোনে? একে ছোট্ট, দুয়ে দিদিমণির বাড়ি কাজ করে। কেউ শোনে না। দাব্বু মাথায় সাপ বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। স্বপ্নের ভিতর ইনকিলাব জিন্দাবাদ করে। ডুকরে কেঁদে ওঠে। যেন ঘুমের মধ্যে মিটিং-মিছিল সেরে নেয়। সময় নেই। গল্প শোনে কখন? হিমা শোনে। ধান্দায়। পেট কাড়িয়ে কথা বের করে। মজা নেই। গল্প শোনে? কে?

পাখি কাজের মেয়ে। কাজের মেয়ে আজকাল ঘরে ঘরে। পাখিদের নাকি খুব দাম। আগুন-জল তোলপাড় খবর পাখিদের নিয়ে। ঘরে ঘরে। অফিসে অফিসে। মজলিসে মজলিসে। এ বাড়ি ঝড় তো, ও বাড়ি দমকল। হিমা ছুটছে। হিমার কাজ বাড়ি বাড়ি মেয়ে সাপ্লাই দেওয়া। সেট করিয়ে দেওয়া। গেরস্থকে সিকিউরিটি দেওয়া। সংক্ষেপে শান্তি মৈত্রী ও চুক্তি বজায় রাখা। হিমাংশুর মা সংক্ষেপে পাখির হিমা। হিম হিংস্রতা। এর মধ্যে গল্প কোথায়? গল্প হয়। কাজের মেয়ে-মাসিরা করে। এই ঘরে। দিন শেষ হয়। বাবুর বাড়ির গল্প পেটে গাছা হয়ে ওঠে। হিমার মজলিসে উগড়ে না দিলে ঘুম হয় না। চেয়ার টেবিলে বসে থাকা হিমা। হল ঘর। টিউব জ্বলে। কালী বলে—থোর নাইট। ঘরময় সাদা আলো। পাখি তবু আঁধার দেখে। বাবুর বাড়ি কাজ করে ওর এক মাসি। মাসির মাসি হিমা। সেয়ানা দি গ্রেট। কাগজের আড়াল দিয়ে শোনে। ভান করে। যেন কিছুই শোনে না। পাখিও শোনে। গল্প গাছা আগাছা পাখির আড়াল। সে ভুলে থাকতে চায়। গাছা আগাছা হিমার খবর।

হারার মা কথা তোলে।

—শুনলে তোমার পরাণঠান্ডাবাবুর কাণ্ড? হিমা পানের রস সামলায় জিভ হামলে। খবরের কাগজে ঘনিষ্ঠ হয়। হাফগ্লাস চশমা। নাকে ঝোলে। চোখে তুলে মুখ ঝামটায়—কইরে পাখি, দেনা, পিঠটা খুঁটে। কাগজ এসেনশিয়াল। না দেখলে ব্যবসার হালচাল সামলানো যায় না।

হাজার হোক পরাণ কুণ্ডু ক্লায়েন্ট। হ্যাঁ, বউটা ছোট লোক। হাতে মুখে ঝাঁটা লাথি। কাজের মেয়ে সাঁজো ছাড়া বাসি হয় না। লাগসই কাজের মেয়ে! বাঘের দুধ। পরান কুণ্ডু বাটনা বাটে। গরম খুন্তির ঝাড় খায়। হিমার দুয়োরে ধর্ণা ছিল তিন দিন। শেষে

হিমানীবালাকে পেয়ে বলে ওঠে—আঃ বুকটা ঠান্ডা হলো।

সেই থেকে পরাণ কুণ্ডু আড্ডায় হলো পরানঠান্ডাবাবু। এবারে কালীর পালা। ভুজঙ্গ হালদারের গল্প। লোকটা খুব বদ। সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। ওকাসা ট্যাবলেট খায়। কালী ঘর মোছে। ভুজঙ্গ ভিজে গামছা পরে ঘোরাঘুরি করে। চেয়ারে ওঠে। ঘড়ি পাড়ে। কালী নাকি চোখ বুঁজে কাজ করে। ভুজঙ্গ একদিন ইশারায় ডেকেছিল। ভয়ে দুহাতে বুক চেপে ধরে। গল্প বন্ধ করে দেয় কালী।

বলে—কাজ ছেড়ে দেবো।

খবরের কাগজ বলে—কাজও আকাল হচ্ছে দিন দিন। ঘরে ঘরে মেসিন। রুটি সেঁকা, কাপড় কাচা, ঘর ঝেঁটানো। মেসিনে ছেয়ে গেল দেশটা। তিননম্বর পাতা থেকে হিমা পাঁচনম্বর পাতায় উল্টে যায়। গম্ভীর খস খস শব্দ।

—বেঁহুশ করিসনে কালী।

হিমা বলতে চায়—ভুজঙ্গ নেহাৎ নিরাপদ। ছোবল মারে না। দুটো পয়সা বেশি দেয়। বীজহীন শাঁস কালীর শরীর চষে যায়, যাক না।

পাখি কেঁপে ওঠে। হাত নড়ে যায়।

হিমার পিঠে সুড়সুড়ি ওঠে। খবরের কাগজ নড়ে না। পাকা মাসিরা হাসে। হিমা হিস্যা খায়। খাক!

—তবুতো মেয়েগুলোকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার দায় নিয়েছে।

বলে হিমানীবালা।

হিমা বক্তৃতা দেয়।

—পেটের দায়ে সতীর যন্ত্রণা যুগে যুগে। এতকাল বাইজি নাচিয়েছে। এখন মেসিন নাচাচ্ছে। তখনও মেয়েরা লড়েছে। আজও লড়ছে।

রীতিমত গা গরম হয়ে যায়। বুঝুক না বুঝুক পাখি মন দিয়ে শোনে। লোকে বলে—মেয়ে সাপ্লাই সেন্টার। হিমা ভেবে রেখেছে, সাইন বোর্ডে লিখবে—'কর্ম নিপুণার গৃহ'।

সন্ধে নাগাদ আড্ডা জমে ওঠে। ঘরের কোণে স্টোভ। দু-এক রাউন্ড চা-চানাচুরে সন্ধে বেলাটা চুরচুর হয়। পাখির মনে হয়, ভাঙা কাঁঠালের ভনভনে যেন মজে যায় ঘরখানা। তখন ইচ্ছে করে গল্প বলি। সবাই মুখিয়ে। বাবুদের কেচ্ছা উড়ছে। কে আগে ছাড়বে। দিদিমণির গল্প জমে উঠতে পারে, এই আখড়ায়। কিন্তু কে শুনবে! একে কনিষ্ঠ দুয়ে হিমার মেয়ের বাড়ি কাজ করে। কেউ না। হিল্লি-দিল্লি কেচ্ছা কোথায় নেই? কি বলতে কী বলে ফেলবে। শুনে কে বাছা হিমার গোঁসায় পড়ে! শোনে না। বুকের ভিতর কথা ভারী হয়।

সব্বার বাবু। পাখির দাদাবাবু।

পাখি গল্পটা ভাবে।

সবাই বাবুর ব্যাপার নিয়ে সঙ করে। দাদাবাবু একটু আলাদা। তার দাব্বু একটু আলাদা। দিমণি তার হাতে দাব্বুকে একতিল ছেড়ে শান্তি পায় না।

দিমণির গলা নয় ভাঙা কাঁসি।

—দাব্বুর ঘরে কি রূপ উঠেছে? আর মুছতে হবে না। ইদিকে আয়।

পাখি ন্যাতা টানে। করুণ ঠোঁটে উত্তর দেয়।

—দাব্বু ঘরে নেই।

—নেইতো কি হয়েছে? ঘরতো আছে।

একটু থেমে কাঁসি বেজে ওঠে—আয়, মুছিয়ে দিচ্ছি! কথা নয়, বিষ। দম বন্ধ হয়। ঘর মোছা হয় না। জড়োসড়ো হয়ে পাখি বাইরে এসে দাঁড়ায়। কখন চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হবে। কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠবে। নড়তে সাহস হয় না।

অনাথ পাখি। কেউ নেই। দিমণির হাতে, হিমার পায়ে বাঁধা। পাখি হাঁটে, এ বাড়ির ধুলোও নড়ে না। কথা বলে, বাতাস সরে না। দিমণির বাড়ি থেকে হিমার বাড়ি-শিকলের মতো বালতি বাসনে বাজতে বাজতে প্রাণপণ শক্তিতে খেটে মরে। দাব্বু ছাড়া দুনিয়ায় ওর গল্প শোনার কেউ নেই।

দাব্বুর মুখ ভেবে সারাদিন দিমণির বাড়িতে ক্ষইয়ে দেয় নিজেকে। রাতে অফিসঘরে ভেঙে পড়ে হিমার ভয়ে। সন্ধের পর অফিসঘরে সবাই আড্ডা মারে। পাখি পেট-ছেঁড়া ফ্রকটার সেফটিপিন লাগানো জায়গাটা চেপে ধরে চা তৈরি করে।

দিমণির বাড়ি টিউবয়েল। পেট চেপে টানতে টানতে পেটের কাছটা ছিঁড়ে যায়। দাব্বু জামা কিনে দেয়। টিয়ারঙের জামাটায় অনেক কাপড়। কোমরের নিচে ঢেউয়ের মতো কুঁচি। পরলে ঘাঘরা পারা দেখায়। পাখি জামাটা তুলে রেখেছে। একা একা গাঁয়ের ঘরে কিংবা কোথাও বেড়াতে গেলে পরবে।

দিমণি বলে—আমার ছেঁড়া ব্লাউজগুলো পরতে পারিসনে?

দাব্বু বলে—বড় হচ্ছে, লজ্জা করে না।

দিমণি ঝম করে ওঠে—কার, তোমার?

দিমণির অভ্যেস, মতে না মিললে ঠোঁট দুটো মুচড়ে গালের এক পাশে নিয়ে যাওয়া; এক ঝটকায় ঘুরিয়ে চলে যাওয়া! দিমণি দুম দুম করে রান্না ঘরে চলে গেল। দিনে কতবার শোয়ার ঘর থেকে রান্না ঘরে, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যায় তার ইয়ত্তা নেই। দাব্বুর স্বভাব হচ্ছে, মাথা নিচু করে নীরব হয়ে যাওয়া। উপায় কি? দিমণি এমন

অসভ্য ভঙ্গি আর চীৎকার করে।

দিমণি ওবাড়ি চলে গেলে, নিরীহ নির্বিবাদী মানুষটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় পাখি।

বলে—ছেঁড়া ব্লাউজ পরে আমার যতখানি লজ্জা, তারচে বেশি তোমার মাথা নিচু হওয়া। আমি ব্লাউজই পরবো।

শব্দহীন খুশিতে মানুষটা চোখ বুলিয়ে দেয় পাখির মুখে। পাখি আদরে ফুলে ওঠে। চোখ বন্ধ করে। মাথায় টিকটিকি খসে পড়লে পাখি ভাবে, দাব্বু ঠোনা মেরেছে।

ছ'ফুট লম্বা মানুষটা। আজকাল ঘাড় হেঁট করে ঘর থেকে বেরুতে হয় না। কুঁজো হয়ে গেছে। দিন দিন বাড়ি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। পাখি বুঝতে পারে না, কখন সে আসে কখন সে যায়। এঁটো থালা কোনো দিন পায়, আধ খাওয়া; কোনো দিন পায় না। অর্ধেক দিন বিছানা ঝাড়তে হয় না। এলোপাথারি বেঁচে আছে মানুষটা। দাববু বলে—যা মাইনে পাই, মাস চলে না। দিমণি পিষে দেয়—পুরুষ মানুষ! মুরোদ নেই বিয়ে করা কেন? মেয়েমানুষ পোষা? হু! দুম দুম শব্দ শুনে বোঝে, দিমণি রান্নাঘরে চলে।

পাখি দেখে—দিমণি অভাব তৈরি করে। দাব্বুর পকেট মেরে ফাঁক করে দেয়। সমস্যা তৈরি করে। চুপচাপ পাখি। একবার অনটনে মুখ ফসকে বলে ফেলল—দাব্বু আমার মাইনে লাগবে না। দুমুঠো খেতে দিও তাতেই হবে।

কথা মাটিতে পড়তে পায়নি, রা রা করে উঠল দিমণি। ঝাঁঝ, কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠল।

—তোর মাগি, সুদ খাওয়ার ইচ্ছে, কেন? চাঁদ হওয়া! ঘুচিয়ে দেব! মাইনে আমার কাছে নিবি!

দাব্বুর দিকে বাঁহাত ছুটে গেল! এক নম্বর আঙুল দিয়ে বন্দুকের গুলি বেরিয়ে এল অনর্গল।

—এমাস থেকে পাখি আমার। মাইনে আমি দেব। এমাসেও সুদ দিতে পাল্লে না। আসলের ঘরে ঢুকে গেল। হিসেব দেখে নিও। পাখির হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। ঘরের এককোণে সরু হতে হতে লাঠির মতো দাঁড়িয়ে। পাখি হাতবদল হলো। দিমণি শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরে গেল। এখন শুধু কড়ি না। সুদও গুনতে হয়। কারখানার লোকজন বন্ধু-বান্ধব মাঝে মধ্যে দাব্বুর ঘরে আসে। চা দিতে গিয়ে একদিন শুনেছে। দাব্বু বলছে—বৌ-এর কাছে ধার নেওয়া অপরাধ নয়। শোধও দেওয়া যায়। সুদ দেওয়াটা অপমানকর।

সেবারই প্রথম! হাতের হাতঘড়িটা বেচে দিমণির ধার শোধ করতে চেয়েছিল। পাখি দেখেছে, দিমণির কি ঝাল। ঝাঁঝ, কাঁসর, ঘণ্টা বেজে উঠল। ধুনুচি নাচ শুরু হয়ে গেল। —সব গোল্লায় দেবে। আগুন লেগেছে সংসারে। সব খুইয়ে দেবে গো। জলে

দেবে। হাউমাউ করে কেঁদে, পাখির সামনেই, দাববুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে, সোহাগে, রাগে একশা।

—বলো, বলো আর কিছু বেচবে না। আমাকে বলবে, আমি কিনে নেব। ঘরের জিনিস ঘরে থাকবে। বলো।

কথার প্যাঁচে কথা বের করে তবে দাব্বুকে খালাস দিল।

দাব্বু একজোড়া শক্ত নিশ্বাস ফেলে বলেছিল—তাই হবে।

ধুনুচির ধুনো ফাটার শব্দে দাব্বুর বুকে কিল বসিয়ে বেরুবার মুখেই পাখিকে দেখে খিঁচিয়ে উঠল—

—ধিঙ্গি মাগি, এখানে কী? দুর হ! দাব্বুর দিকে হাত বাড়াবি তো নুলো থেঁতো করে দেবো।

ঘরের মেঝে যেন নুলো। দিমণি থেঁতো করতে করতে চলে গেল।

থ' পাখি। চোখ কানের সামনে দিয়ে বয়ে যেতে লাগল ধার দেনা সুদ শোধ কেনা বেচার গল্প। পাখি থ। এই গল্প পাখি কাউকে বলতে পারে না। হিমার আড্ডায় সে একে নিঃসঙ্গ দুয়ে দিমণির ভাত খায়। মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। অন্য বাড়ির কাজের মাসিরা দিমণির মত হাঁক দেয়—এই বুঁচি সাত কাপ চা করতে সাত ঘণ্টা লাগিয়ে দিলি, খাবি কোন গতর ভাঙিয়ে?

পাখির নাক থ্যাবড়া, তাই বুঁচি।

চা বিতরণ শেষ হয়। হিমা ডাকে—আয়, পিঠটা খুঁটে দে।

পাখির কাজ শেষ হয় না। কাজ শেষ হলে ভয় শুরু হয়। পাখি উড়ে যেতে চায় ভয়ের বাইরে। পাখি কাজ আর ভয়ের একটা সুতোয় আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। দিমণির বাড়ি থেকে হিমার অফিসঘর। এখান থেকে দাব্বুর কারখানা মিটিং, অনুবীক্ষণযন্ত্রের দৃষ্টি পথের মতো। একটা লম্বা সুতোয় সে আপনার গল্পে আপনি ভয়ে কাঠ।

দিমণির সন্ধ্যারতি বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে।

—সবেতো কলির সন্ধ্যে। দেনার সুদ ঘোচাতে সাতঘাটের জল খাওয়াবো। আসল? হু! সাতপুরুষ তলিয়ে যাবে। হাড় খাবো মাস খাবো চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবো।

দাব্বুর মিটিং হুঙ্কার ছাড়ে।

—বন্ধুগণ, ওরা আমাদের ভাত-রুটির মাঝে মেসিন বসিয়েছে। মেসিন দিয়ে পোশাক ছিঁড়ে দিচ্ছে। আমার আপনার বেঁচে থাকার মাঝখানে মেসিন বসিয়েছে। কত মেসিন বসাবে? কত লক-আউট করবে? তার আগেই কাম বন্‌ধ্ হো যায়েগা।

হিমা ট্রেনিং দেয়।

—বাবু বিবিদের কুঁড়ে করে ফেলতে হবে, বুঝলি। গায়ে গতরে মনে অসুখ বাধিয়ে ছাড়বি। যতটুকু কাজ আছে দখল নিতে হবে। নইলে সব খাবি কি? বাবু বিবিদের এমন একলষেঁড়ের হাল করে ছাড়তে হবে, শুধু কথা বলার জন্যে কাজের লোক রাখতে হবে। শুধু চোখের সামনে জ্যান্ত মানুষ দেখার জন্যে কাজের লোক রাখতে হবে। সবাই যখন পা ছড়িয়ে সুড়ুত সুড়ুত করে চা টানে, পাখি হিমার চুল তোলে, পিঠ খোঁটে, আঙুল মটকায়। ভয় পেতে তার একদম ভালো লাগে না। ঘরে বাইরে অন্তরে অষ্টক্ষণ লড়াই চলছে।

পাখি আজকাল এখন-তখন দিওয়ানা হয়ে যায়। একটা ভয়ের গল্প সব সময় আটকে থাকে বুকের কাছে। গল্পের টুকরোগুলো ফাঁদে আটকানো খাবারের মতো টেনে নিয়ে যায়। পাখি উড়ে চলে। হিমা ধমকে ওঠে—হেই নেকি, দে। হ্যাঁ, হ্যাঁ কোমরের কাছে বিজগুরি বিজগুরি, এ্যাঁ, এ্যাঁ, ওইখানে। আর! পাখির নাকি বুদ্ধি কম, তাই নেকি। বুড়ি কোমরের বাঁধন ঢিল দেয়। শরম-ভরম কিছু নেই, পাখি লজ্জা গোপন করে ডাগর চোখে। বাবুদের মজার গল্প শুনতে চোখ দুটো বক্তার দিকে মেলে ধরে। বলে ফেলে : —তারপর?

—দ্যাখ দ্যাখ মাগির রসে কত নোলা! এ ওর গা টেপাটিপি করে। চোখ-হাসাহাসি করে। করুক, মাগি বলবে কেন? দিমণিও বলে, মুখের ওপর অনেক জবাবই হয়।

হিমা বলে—মেয়ে সন্তান, পরের বাড়ি কাজ করিস, চোপা করিসনে।

পাখি আপন মনে বলে— নিজের মেয়েতো একখান যন্তোর, মুখে কুলুপ এঁটে থাকে।

হিমা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে—কিরে, তোর দাব্বুর ঘরে মিটিং বসে?

দাববুর ঘরে কলিগ কমরেডরা আসে। সাতপাঁচ দুর্দিনের আলোচনা হয়। একদিন হিমা আর দিমণির নাম শুনেছিল। ভুলে হিমাকে বলেও ফেলেছিল। এখন বুড়ি ওৎপেতে থাকে। চান্স পেলেই জিজ্ঞেস করে—কালকের মিটিংএ ক'জন এসেছিল?

পাখি কিছুতেই বোঝাতে পারে না—হিমা, ওটা মিটিং নয়। দিমণি, তোমাকে নিয়ে ওরা আর কোনো কথা বলে না। দাব্বুর খুব বিপদ। নাকি ছাঁটাই করে দেবে। দু-একদিন ঝাঁঝ দেখিয়ে বলে—দাব্বু হলোগে ইউনিয়নের নেতা। দু'চারজন লোকতো আসবেই, নিজের মেয়ের কীর্তির খোঁজ নাও না তো? দাব্বুর অত খোঁজ কিসের?

—দাব্বুকে ভালবাসিস তাই।

পাখি বুঝল, হিমা তাকে অন্য ভাষায় মাগি বলল।

দাব্বুকে নিয়ে কোথাও একটা অন্য হিসেব চলছে। বুড়ির কলাগাছের মতো বিশাল দাবনা দাবাতে দাবাতে একদিন বলে ফেলল — মেয়ে নাতো একখানা যন্তোর। ঝাড়ের বোগ, আর কত হবে?

বুড়ি একটু থমকে হেসে ওঠে। ঠাণ্ডা গলায় বলে—তোর দাব্বুর সংসার মেকানাইজ করে দেবো। সংসার থেকেও ছাঁটাই করে দেবো তোর দাব্বুকে। নে নে পা দুখানা একটু হাত বুলিয়ে দে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

পাখি নিশ্চিত। মা মেয়েতে মিলে একটা ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। সে নিরুপায়। দিমণির হাতে আর হিমার পায়ে বাঁধা।

কাজের মেয়েরা এক এক করে কেটে উঠছে। আড্ডা গুটিয়ে আসে।

পাখি এখানে শোবে। দিমণির কাছে যাবে না। ওর বুঝি রাগ নেই! নিজস্ব ইচ্ছা নেই! ও দিমণির কাজের লোক হবে না।

—হেই নেকি, দাব্বুর ভাবে মজে আছিস নাকি? হাতে একটু জোর লাগা।

—হিমা আমাকে অন্য কোথাও কাজ দেখে দাও। ওখানে আমার ভাল্লাগে না।

—হুম!

বিটকেল গন্ধওয়ালা একটা তেল বুড়ি হিমার হাঁটু কোমরে সর্বাঙ্গে মালিশ করতে হয়। বুড়ির বাত আছে। এক সেকেণ্ড ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। থলথলে শরীর দলাই মলাই করতে পাখির কেমন গোপন ভাল লাগে।

তার কেইবা আছে? কাজের মেয়েরা জানে, এ শহরে হিমা ছাড়া গতি নেই! বুড়ির কোলের কাছ ঘেঁষে সরে যায় পাখি। আস্তে আস্তে বলে—দিমণিরও পিঠ, পিছন, দাবনার ব্রন ঘামাচি মেরে দিতে হয়।

দিমণির গলা নকল করে বলে

—পাখি কুঁচকিটা একটু দেখে দে।

গরমে কুঁচকি চুলকে দিলে দিমণি আমার চুল খামচে নিজের বুকের মধ্যে আছড়ে ফেলে। আমাকে চেপে মেরে ফেলে। দমবন্ধ হয়ে আসে। আমার ভয় করে।

হিমা আমাকে ওবাড়ি পাঠিও না। আমি মরে যাবো।

হিমা জিজ্ঞেস করে, কখন?

—রাতে।

—দাব্বু কোথায় থাকে?

—পাশের ঘরে।

—কেন, পাশের ঘরে কেন?

—অনেক দিন। ঝগড়ার পর থেকে দিমণি আলাদা শোয়। দিমণি মাইনের টাকা দিয়ে আমাকে নিয়ে নিয়েছে। আমি দিমণির কাজের লোক হবো না। আমাকে চটকে চাপড়ে মেরে ফেলবে। তুমি অন্য কোথাও কাজ দেখে দাও। আমার গা ঘিনঘিন করে। লজ্জা

করে।

হিমা সামান্য টলে ওঠে। সাদা শুয়োরের মতো দুবার ঘোঁতঘোঁত করে। আপনমনে হিসিয়ে ওঠে—মুখপুড়ি, ঘর-পর জ্ঞান থাকছে না। একটা ব্যর্থশ্বাস পড়ে।

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—

—হুম, বেশ বড় হয়ে গেছিস দেখছি। অনেক কিছু বুঝে ফেলেছিস। একটা ছোট মিনসেওয়ালা বাড়ি দেখে তোকে কাজে ঢুকিয়ে দিতে হবে। দিমণির মতো লটকাতে পারবিনে?

পাখি গলে হিমার বুকে ঢুকে পড়তে চায়! শিকল যেন নূপুরের মতো ঝম করে বেজে উঠল।

—না পারবো না, যাও।

পাখির এই ছলনাটুকুর তল হিমাও পায় না। মনে মনে উত্তর দেয়—তোমার মেয়ে একখানা যন্তোর।

আড্ডার পুরোনো মাসি, দিদি, পাড়ার লোকজন সব্বাই জানে—দিমণি, দাব্বুর বাড়িতে ঝি হয়েই ঢুকেছিল। ফষ্টি-নষ্টি করে দিমণি হয়েছে। আমেরিকান সরকারের মতো হিমা ব্যাক করেছিল। হিমার মাসচুক্তি মাস্তান আছে। রাতবিরেতে পাখি আঁচ করে, হিমার কাছে ওরা আসে। সেই রাতে ওরা দাব্বুর ঘরে শিকল তুলে দিয়েছিল। মাঝরাত পর্যন্ত। তারপর সবাই জানে। দাব্বু-দিমণির বিয়ে হয়।

পাখির নজর ভেঙে ফুটে ওঠে দিমণির বেপরোয়া ভাব। কেমন বুক চিতিয়ে হাঁটে। পা ফাঁক করে বসে। এত অসভ্য রোয়াব আসে কোত্থেকে! হিমাই তো সাপ্লাই দেয়। নইলে দিমণি ধার দেওয়ার অত টাকা পায় কোথায়? দাব্বুর পকেট মেরে অত টাকা দাব্বুকে ধার দেওয়া যায় না। টি.ভি., ফ্রিজ, গ্রাইণ্ডার, ওয়াশিংমেশিন, মেসিনে মেসিনে দিমণির ঘরদোর ছাপিয়ে উঠছে। পাখি সব বোঝে।

দাব্বু সেদিন টিভিতে হাত দিতেই দিমণি ফোঁস করে উঠেছিল

—দিন নেই, রাত নেই টিভিটিভি। বাতিক হয়ে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টা ঘ্যান ঘ্যান বিরক্তি ধরিয়ে দিল একেবারে। এবার থেকে টিভিতে বলে হাত দিও।

পাখি জানে, দাব্বু খবর ছাড়া কিছুই দেখে না। বুঝল, দেনার কিস্তি দাব্বু শোধ করতে পারেনি। টিভির মালিক এখন দিমণি।

কী করে করবে! দাব্বুতো কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়ে গেছে। ছোট খাট নেতাদের মরণ। দিমণির মতো ডানে জমা বাঁয়ে জমা করতে করতে ছাঁটাই বাবদ দাব্বুকে কারখানা কিছুই দেয়নি। ফাঁকি দিয়েছে। দিমণিও ড্রেসিংটেবিল, খাট, আলমারি, ফ্রিজ এক এক

করে সব বাঁয়ে জমা করে নিয়েছে। এবার বলেছে, পাখি আমার, অসহ্য ভয়, ঘুম আসে না। হিমার কোলের মধ্যে সাঁটিয়ে যায়। বেতো বুড়ি ঘুমোয় না। জিজ্ঞেস করে—কী রে? ভয় করে! —আয়, বুকের মধ্যে আয়। পা ছড়িয়ে দে। হ্যাঁ, চিতিয়ে শো। মাগি শুতেও জানে না।

বুড়ির ভারি হাত উঠে অসে পাখির গায়ে। শরীরে এক ধরনের চাপ অনুভব করে। এই চাপের মধ্যে তবু আশ্রয় ভাবটুকু আছে।

দিমণি হিংস্র। চুল, গায়ের মাংস ছিঁড়ে খায়। শরীরে মনে নোংরা আঠালো ব্যথায় কষ্টে তলপেট টনটন করে। আতঙ্ক হয়, আতঙ্কে নেশা হয়। সে আর দিমণির কাছে ফিরে যাবে না। হিমা জোর করলে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাবে। হিমা বুড়ি ঘুমিয়েছে। নড়লেই ডেকে উঠবে। বুড়িও শয়তান।

দিমণির বাড়ি কাজ করতে করতে দাব্বুর কষ্ট সে বোঝে। একদিন ঠিক ওবাড়ি থেকে চলে যেতে বলবে দাব্বুকে। বাড়িটা পাপের বাড়ি। ওর চেয়ে পথে শান্তি। আশসিঙরে ঢোড়ামারি গ্রামে পাখির ছেঁচা-বাঁশের একটা ঘর আছে, ঘরখানা সরকারি খাসে। সেখানে কেউ নেই। কেউ থাকে না। বাবা নেই, মা নেই, ঘরখানা অনেকদিন খালি পড়ে আছে। হয়ত উইয়ে শেষ করে দিয়েছে, মাকে মনে পড়ে না। রোগগ্রস্ত বাবা চৌপহর ডাকত।

—পাখি মা—কৈ কোথায় গেলি, জল দে, মা আমার। দাব্বু একদিন তাকে মা বলে ডেকেছিল। সে ভুলতে পারে না।

বলেছিল—পাখি, মা জানিস, আমার মাকে ছোটবেলায় ঠিক তোর মতো দেখতে ছিল।

এ্যালবাম খুলে দাব্বু মায়ের একটা ছবি দেখিয়ে ছিল। অস্পষ্ট, ঝাপসা। পাখি কিছুই দেখতে পায়নি। তবু আয়নার সামনে দাড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। দেখেছিল নিজেকে। নিজেকে দেখার, নিজেকে ভাবার একটা মানে খুঁজে পেয়েছিল।

ঘরখানা দাব্বুকে দিয়ে দেবে।

পাখি আজকাল ওবাড়ি যায় না। হিমাই আড়াল করে। দিমণি এলে পালিয়ে বেড়ায়, হিমার কথা মতো। দাব্বু কেমন আছে, কোথায় শোয়, ঘরদোর কে গোছায়, পাখির জানতে খুব ইচ্ছে করে। তৈরি করা এই আড়াল সহ্য হয় না। এর চেয়ে দিমণির অত্যাচার ভাল। আড়াল কিছু নেই। দাব্বুর সাথে দিনান্তে একবার অন্তত দেখা হবে। পাখি হিমার কাছে আড়াল শিখছে।

দুয়োরের পিছনে দাঁড়িয়ে হিমা আর দিমণির কথা শোনে। কিছুই শোনে না। দাব্বুর কথা ভাবে। কেঁদে ফেলে। আবার শোনেও। যদি ওরা দাব্বুর কথা যদি কিছু বলে। কিছু জানতে না পারা পর্যন্ত পাখির বুক ফেটে যায়।

হিমার কাছে কাজ প্রায়ই নেই। ফাঁকা দুপুরে বুকের ভিতর আনচান করে। পাখি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

বাজারের দিকে যায়। চায়ের ঘুপচিগুলো নজর রাখে। ছাঁটাই হয়ে গেছে জানে, তবু কারখানার দিকে যায়। খোঁজে। যদি দেখা হয়! ভাবে, কী কী বলবে। কত কথা জমা আছে। থেমে আছে কথার জেনারেটর। দরোজার আড়াল থেকে শুনেছে, দেনার দায়ে দিমণি নিজের নামে লিখে নিয়েছে বাড়িখানা। তৈরি করা দেনা। তৈরি করা অভাব। ওরা মানুষটাকে ভিটে ছাড়া করেছে! চোদ্দপুরুষের ভিটে।

দাব্বু আর ওবাড়ি আসে না। পাখি অস্থির হয়ে গেছে। কোনো খবর নেই। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, যদি দেখা হয়। আসবেই বা কেন? পরের বাড়ি। ও বাড়ি এখন দিমণির। একবার চোখের দেখা। এতবড় একটা শহরে পাখি খোঁজে কোথায়? দু-একদিন ফিরতে সন্ধে নেমে যায়। রাত হয়ে আসে।

হিমা শাসায়—পাখা বেশি উড়লে, দূর করে দেবো। ভয় হয়। কোথায় যাবে। কোথায়? রাতে হিমার বুকের মধ্যে শুয়ে আদুরে গলায় বলে— হিমা, কাজটা তাড়াতাড়ি ঠিক করে দাও না। দেরি করছ কেন? কাছাকাছি বাড়িতে করবে কিন্তু। দিনান্তে যেন তোমায় দেখতে পাই। তোমায় না দেখলে আমার মনখারাপ করে।

পাখির ছলনা বাসি হয়ে আসে। হিমা বলে—তাই হবেরে তাই হবে। কাজ পাওয়া বললেই পাওয়া, যুৎসই ফ্যামিলি না পেলে তোকে দেওয়া যায়! হিমাও ছল করে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। পাখি হিমার ছল বুঝতে পারে না।

কতদূর যায়—পাখি কতদূর যায়। ডানাকাটার মতো ফিরে আসে। দাব্বু ওর ডানা। যদি খুঁজে পায়। একদিন দুপুর থেকে বিকেলের দূরত্বে হঠাৎ থমকে যায়। —কে?

কারখানা থেকে অনেক দূরে—গঙ্গার ঠিক উপরে একটা বটগাছ। বেদি করে গোড়া বাঁধানো। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা একজন লোক। অবিকল দাব্বু। নোংরা পোশাক, চারপাশে পোঁটলা-পুঁটলি। দাড়ি-গোঁফের আড়ালে চেনা যায় না। দাব্বুর মতোই করুণ, মায়াবী দুটো গভীর চোখ। থুতনির কাছে লম্বা কাটা দাগ ছিল। দাড়ি-গোঁফে হারিয়ে গেছে। আর চেনা যাবে না।

পাখি একঠেরে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটা তার দিকে তাকাল যেন চেনেই না। দাব্বুর মতো ঠান্ডা। বুকে হাঁটু তুলে বসে আছে।

লোকটার চারপাশে পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানারে ছড়াছড়ি। যেন মেলা বসে আছে। একটা মিছিলের সমান ব্যানার। বটগাছের গায়ে মানতের ভারার মতো অসংখ্য ঝুলে আছে। পাখি যতটুকু পড়তে জানে, প্রাণপণ শক্তিতে পড়লেও সন্ধের আগে কয়েকটা মাত্র পড়তে পারবে।

পাখি পড়তে লাগল: জেকব এ্যান্ড টারসন কোম্পানিতে মেকানাইজেশানের ফলে আমি কর্মচ্যুত। আমাকে একটা কাজ দিন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাব্বুর কোম্পানির নাম জেকব এ্যান্ড টারসন। আগ্রহ নিয়ে পাখি পড়ে: আমি কোনো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নই এবং নেতৃত্বহীন।

পাখি ভাবে—না, এটা মিলছে না। পাখি হতাশ হয়। পরের পোস্টারখানা কষ্ট করে পড়ে: আমি আপনার চেয়ে পরিশ্রমী এবং কম বুদ্ধিমান। বুকের কাছটায় কেমন বাষ্প জমে ওঠে। চোখদুটো ছলছল করে। দাব্বুর কাছে শুনেছে শুধু এই শহরে হাজার হাজার মানুষ ছাঁটাই হয়েছে। দাব্বুর হাতের লেখা সে চেনে। পোস্টারের লেখা প্রায় সে-রকমই। লোকটা একটা পুঁটুলি হাতড়ে আধপোড়া বিড়ির টুকরো বের করে। বেদির মেঝেতে দেশলাইকাঠি ঘষে নিখুঁত ধরাল। আপনমনে ধোঁয়া ছাড়ছে। ও এত সময় কোনদিন দাব্বুর দিকে তাকিয়ে থাকেনি। থাকার সাহস কিংবা সুযোগ হয়নি। পাখি আবার পোস্টার পড়ায় মনোযোগ দিল: আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউ নেই। আমার কেবল আমিই ক্ষুধার্ত। আমাকে একটা কাজ দিন।

পাখির বুক ভার হয়ে গেছে। চোখের নিচের পাতা ঝাপসা লাগছে। পাঁচ নম্বর পোস্টার পড়ে পাখি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। কেঁদে ফেলল। পোস্টারে লেখা ছিল: আমাকে মানসিক সুস্থ এবং ক্ষুধার্ত ভাবুন।

তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সে আর পোস্টার পড়তে পারছে না। পোস্টারে পোস্টারে বটগাছের প্রাচীন আশ্রয় ছয়লাপ হয়ে আছে। এখনও অনেক অনেক কান্না বাকি রয়ে যাচ্ছে। পাখি বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মোছে।

অকস্মাৎ একজন সাঁড়াশি-কঠিন তালুতে তার ডান কব্জি চেপে ধরল। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল পাখি—জল ভরা চোখে তাকিয়ে দেখে হিমা।

সে ফুঁপিয়ে উঠল—হিমা!

হিমা উত্তর দিল না।

হিমা কিংবা হিমার মতো কেউ এক হ্যাঁচকায় পাখিকে টেনে নিয়ে চলল— ঝাপসা চোখে পাখি কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কোথায় যাচ্ছে!

হাতের যন্ত্রণা ভেদ করে পাখি চিৎকার করে উঠল—হিমা, আমাদের দাব্বু!

হাতুড়ির চেয়ে কঠিন গলায় হিমার স্বর উচ্চারিত হল—নো। ইন্ডিয়ান মঙ্ক।

গেরিলা যুদ্ধ

পাখিটা মরেছে। ছেলে ন্যাড়া হবে। টানা বারান্দা পেরিয়ে, নীচে তুলসীতলায় গেল। আমি জানি, ও এখন কাঁদবে। একটা গাঙশালিক মরে গেছে।

কেমন অস্থির লাগছে। একটা পাখি বৈ তো নয়। তখন রাত পেরোয়নি, সেই থেকে এ বাড়ির চোখে ঘুম নেই। রোদ এসে গেছে পেঁপেগাছটার মাথায়। এই সেই গাছ। পাখিটা প্রথম বসেছিল ওর ডালে। রোদ্দুর এসে পড়েছে গাছটার ঝাঁকড়া মাথায়। তরতাজা লাগছে। গাছটায় এখন কোন পাখি নেই। গাঙশালিকটা ছিল পুরুষ। গাছটাও পুরুষ। কোনো ফল নেই। নিষ্ফলা গাছ বাড়িকে একটা পাখি দিয়েছে। শূন্যগাছ থেকে বাড়ির নীচতলা পর্যন্ত ভীষণ শুনসান।

কেউ একজন ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এই সকালবেলা। তুলসীতলায় মা বসেছে। কাছাপরা ছেলে, গিয়ে বসল মার কোলে। ছেলেও আমার মাও আমার। অথচ আমি যেন অনেক দূরের কেউ। দোতলার জানালা আঁকড়ে চিত্রার্পিত।

বাড়ির নীচে নদী। সবুজ ইছামতি। নদীর ঘুম নেই, ইচ্ছা নেই, অনিচ্ছা নেই, দিগন্ত-বিদারী যাত্রা, নিরবধি। জীবনের মতো কোনো শূন্যস্থান নেই। খিড়কিমুখে ঘাট। আমাদের নিজস্ব। প্রতিদিন স্নান করি। অথচ কতদিন নদীকে দেখিনি।

ঘাটের পাড়ে বিস্তীর্ণ মাঠ। সেও সবুজ। মাঠের উপরে বাঁশবন। বাঁশের কষাড় জঙ্গল। গাঢ় সবুজ। গাঢ় সবুজের অভ্যন্তরে গলিপথ। সাপের মতো ঢেউ তুলে নদীর সঙ্গে চলে গেছে। ছেঁড়া রোদ্দুর, ছেঁড়া ছায়ার মিশ্রণ পড়েছে পথে। ওই পথে জগা নাপিত আসছে। ওর বগলে যন্ত্রপাতির কাঠের বাক্স। আদ্যিকালের। ওর মধ্যে ব্লেড লাগানো আধুনিক ক্ষুর আছে, যে ক্ষুরে আজ আমি দাড়ি কামাবো না। সেই ক্ষুরে ও আমার ছেলেকে ন্যাড়া করবে। জগার পিছনে আমার ছোট ভাই আসছে। জানালার গরাদ বেশ জোরে চেপে ধরি।

এত বড় বাড়ি। মানুষ-জনও কম নেই। উপর ফাঁকা। চোখের সামনে একটা শূন্য-খাঁচা, আর আমি। খাঁচাটায় পাখিটা থাকত। পুরোনো বাড়ি। গরাদের শিকগুলো খাঁচার মতো সমান্তরাল। পাখির ঠোঁটের মতো নাক জানালার বাইরে। চোখ দূরে, নদীর স্রোতে, দাঁড়িয়ে আছি।

মা বলেছিল—জগন্নাথ বয়ে বাড়ি আসছে, দাড়িটা কামিয়ে নিস্।

কোন উত্তর দিইনি। পাখিটা মারা গেছে এগারো দিন। বাবা মারা গেছেন আজ এক বছর পূর্ণ হল। হিন্দুরা এই দিনের শ্রাদ্ধকে বলে বছরকি। আজ বাবার বছরকি হচ্ছে। বাড়ি ফাঁকা। গত বছর তিনদাদা একভাই দাদাদের পাঁচ ছেলে সব মিলিয়ে আট দশটা ন্যাড়ামাথা ইছামতির জলে ভেসেছিল এইদিনে। এবার ওরা আসেনি। মা বলেছে, আমার দুর্ব্যবহারে কেউ এবাড়ি মাড়াবে না।

—দুর্ব্যবহার তো করিনি মা।

সেদিন মাথা ন্যাড়া করিনি। আমার ছেলে দোদুলও না। কাছা নিইনি। তোমার চোখে এই আমার দোষ। আসল অপরাধ কোথায় জানো মা? শ্রাদ্ধে আমার অংশের টাকা পার্টি ফান্ডে জমা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—টাকাটা দেশের কাজে লাগুক।

আমার অপরাধটা কোথায় জানো মা? পৈতৃক ভিটে আমি ভোগ-দখল করছি। বাবা আমাকে বেশি ভালবাসতেন। সত্যি কথা বলবো? সেই জন্যে তুমিও আমাকে হিংসে করতে। আজও করো। এই কথা যদি আমি উচ্চারণ করে বলি—তোমরা বলবে—দুর্ব্যবহার।

তোমরা বাবাকে চিনতে পারোনি। বাবা ছিলেন আদর্শবান। তোমরা জানো, কোনদিনই বাবার সাথে আমার মতের মিল হতো না। অশান্তি হতো, ঝগড়া হতো। আমার আদর্শের সাথে মিলতো না বলেই তিনি নির্বাসন নিয়েছিলেন। দিনরাত বাঁশ বন, বেড়াবাঁধা, আর গাঙশালিক নিয়ে পড়ে থাকতেন। আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, অথচ ছিলাম অসহ্যকর। বাবাকে যদি মেনে নিতাম, হয়ত তিনি আরো কিছুদিন বাঁচতেন। এই আমার অপরাধ। তোমরা ঠিকই বলো, আমার জন্যে বাবা মরেছে। পরোক্ষে আমিই বাবার হত্যাকারী। শাস্তি আমার প্রাপ্য। কিন্তু ভুল শাস্তি দিও না।

তিনি রাতে ঘুমুতে পারতেন না। আমার জ্বালায় ছটফট করতেন। ওইখানে ওই ঘাটপাড়ে রাত থাকতে পায়চারি করতেন। ভোরের আলো এসে পড়ত তার মুখে। জানালা দিয়ে দেখতাম। বিষণ্ণ সে মুখ। বাবার চারপাশে গাঙশালিকের ভিড়। কিচিরমিচির করতো আর পায়ে পায়ে ঘুরতো। কাঁধে মাথায় হাতে বসতো। বাবা ওদের খেলার সংগী হয়ে যেতেন। শান্তি পেতেন।

তুমি একদিন মাথার দিব্যি দিয়েছিলে। মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছিলে না। তোমার সংস্কার নিয়ে বাবার কাছে বিচার চাইতে গিয়েছিলাম ভোরবেলা। পাখিগুলো সব উড়ে গেল। ওরা আমাকে পছন্দ করেনি।

বাবা বলেছিলেন—তোমার মায়ের বয়স বাহান্ন আমার বাষট্টি। তুই আমাকে নিড়িনটা দিয়ে যা, হলুদ গাছের গোড়াগুলো খুঁচিয়ে দি। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। নিস্প্রাণ চাহনি। পরিষ্কার আমাকে অস্বীকার। গোপন অবহেলা। আমি নিড়িন দিতে যাইনি। ঘরে কেঁদে ফেলেছিলাম। বাবা যেন সমাজ থেকে কবেই সরে গেছেন।

আমাদের আদর্শে চোখের জলকে আগুনে পরিণত করার কথা বলা আছে। ভালবাসার কথা বলা আছে কি না জানি না। বাবা ছাড়া কেউ আমাকে ভালবাসতে শেখাইনি। যে ভালবাসার জোরে বাবা বলতে পেরেছিল—

—মরে গেলে কাছা নেবে কি নেবে না, ন্যাড়া হবে কি হবে না তোমার ব্যাপার। পারিবারিক সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলিস নে।

সেই সম্পর্ক রাখতে পারছিনে। একা হয়ে গেছি। এর চেয়ে বড় কষ্ট আর কী আছে?

আমি এখন বাবার মতো তোমাদের থেকে দূরে। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। এক জেলখানা থেকে অন্য জেলখানায়। শাস্তি দু'রকমের। শারীরিক, মানসিক। এই শাস্তি আমার প্রাপ্য। এই শাস্তির শেষে একটা মানসিক ক্র্যাচ আমার চাই। অথচ বাবা মারা গেছেন।

জগা নাপিত নয়। বাবা বলতেন—জগন্নাথ কাকা বলবে। জগন্নাথ কাকা দোদুলের মাথায় জল, সাবান মাখাচ্ছেন। দোদুল চুপ করে বসে আছে ঠাকুমার কোলে। ছেলেটা ন্যাড়া হবে। ঠাকুর্দার কামানে বাইনা ধরেছিল। দুঃখ পেয়েছিলো। আমি হম্বিতম্বি করেছিলাম। ন্যাড়া হতে পারেনি। বাড়িসুদ্ধ একসাথে ন্যাড়া হওয়ায় আনন্দ আছে। ছেলেটা পায়নি। একটা গাঙশালিক মরেছে। সেই দুঃখে ন্যাড়া হচ্ছে। কিন্তু সেই আনন্দ ফিরে আসবে না। কী করে বোঝাই। আমি একজন খোঁড়া মানুষ।

পাখিটা মারা যাওয়ার পর ছেলেটাকে কাছা দিল। বললাম—মা, এটা কী করছো?

মা বললেন—নিক, তোর বাবার আত্মা শান্তি পাবে।

বাবার আত্মায় বিশ্বাস করি না। মায়ের অন্তর সুখী হোক। জেলখানায় দু'হাত বেঁধে ওরা আমাকে ঝুলিয়ে রাখতো। রুল দিয়ে পায়ের তলায় মারতো প্রতিদিন। মেরে মেরে পায়ের তলা থেঁতো করে দিয়েছে। একটু একটু করে খোঁড়া করেছে আমাকে। মা আমাকে মারছেন। প্রতিদিন। তিল তিল করে, প্রতিহিংসা নিচ্ছেন। মায়ের প্রতিহিংসা জ্বলছে, ধিক ধিক করে, ঘরচাপা আগুনের মতো।

একটা বাঁশের মাথা তিনভাগে চিরে উঠোনে পোঁতা থাকতো। স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে তার মাথায় সরা চাপাতো বড়দা। সরায় থাকত আতপচাল, পাকাকলা, দুধ, গঙ্গাজল। গুরুদশায় হিন্দুদের এই রীতি আছে। পাখিটা এসে বসত পেঁপেগাছটায়। তারপর নেমে আসত সরার উপর। চালকলা খেতো। প্রতিদিন। পাখিটাকে ধরে আলতা মাখিয়ে দিল মেজদার ছেলে, টোটা। ওই পাখিটাই রোজ আসতো।

মা বলত—তোর বাবা গাঙশালিক হয়ে আসে। বড়দা বলেছিল—বাবা, গাঙশালিক খুব ভালবাসতো। দোদুল বলল—টোটাদা, আমাকে ধরে দাও, আমি পুষবো।

শ্রাদ্ধের দিন পাখিটাকে ধরা হলো। খাঁচাটায় ভরে দোদুল ঝুলিয়ে দিল দোতলার

বারান্দায়। আমার সামনে দুলতে থাকল, একটা খাঁচা, একটা পাখি।

দোদুল ওর নাম দিল—দাদু।

সবাই ডাকল—দোদুলের দাদু।

আমি যখন টানা বারান্দায় পায়চারি করি। খোঁড়া পা দুটোকে টান করি, পাখিটা খাঁচার ভিতর নাচে। ছন্দ তোলে। আমি শক্তি পাই। পা দুটো ল্যাংড়া। অনেকটা গাঙশালিকের মত দুলে দুলে হাঁটা অভ্যেস করি।

একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমুতে ভালবাসি। জ্বালা হয়েছে। দোদুলের দাদু ডাকে—খোকা বেলা হলো। ওঠ, খোকা ওঠ।

ছোটবেলায় রোজ ভোরে বাবা ডাকতেন—

খোকা ওঠ, খোকা ওঠ, বেলা হলো।

মশারির মধ্যে বাসি বিছানায় বসে কৃষ্ণ নাম গাইতেন—

—হরেকৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম।

রাখালরাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীদাম॥

আমরা ক'ভাই-বোন ঘুমভর্তি চোখে-কানে শুনতাম। সেই সুরে কেমন নেশা হতো। বাবা মাঝে মাঝে আচমকা বলে উঠতেন—হরিবোল বলো মন, হরিবোল বলো।

পাখি বলে—হরিবোল বলো হরিবোল বলো।

আমাদের ঘুম ভাঙে।

গাঙশালিক এত পরিষ্কার বুলি বলে! বিশ্বাস হয় না। পাড়া ভেঙে মানুষ আসে।

পাখি বলে—কে এলো? কে এলো?

দোতলার আলসে ঝুঁকে দেখি, কে এলো

দোদুলের দাদু বলে—বসো, বসো, কথা বলো, কথা বলো।

মানুষ বলে—দাদু কথা বলো, কথা বলো।

পাখি বলে—দাদু, কথা বলো, কথা বলো।

পাখি বলে—কেষ্ট, কেষ্ট বলো।

মানুষ হাতজোড় করে বলে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

পাখি বলে—হরিবোল বলো, হরিবোল বলো।

মানুষ বলে—হরিবোল, হরিবোল।

ফিরে যাওয়ার আগে মানুষ পাখিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।

দোদুল ওকে এইসব কথা শেখায়। দোদুলকে শেখাতো আমার মা।

মানুষ বলে—গাঙশালিক নয়। দোদুলের দাদু পাখি হয়ে এসেছে।

দোদুল একদৃষ্টে পাখিটার চোখে তাকিয়ে থাকতো। বলতো—দাদুর চোখদুটো আমার দাদুর মতো, না?

আকারে কোথাও মিল নেই। কিন্তু বাবার চোখদুটো ছিল নারীসুলভ, মায়াবী প্রকৃতির। হলুদ জমির নিচে কাজলপরা দাদুর চোখদুটো বাবার আদলের। দোদুলের চোখে ধরা পড়েছে।

সকালবেলা আমি ভিজে ছোলা খাই। পাখিটাকে ছোলা দিই। দোদুলের দাদু খায়।

খোঁড়া মানুষ আমি। নিষ্কর্মা লোক। পাখিটাকে দেখি। পাখিটাকে নিয়ে থাকি। বাবাকে দেখিনি। পাখিটাকে দেখি। দোদুলের দাদু নামটায় হয়ত কোন তৃপ্তি লুকিয়ে আছে। নাহলে, নিষ্ঠুরভাবে একদিন পাখিটার নিচের ডানা ছেঁটে দিলাম। আর উড়ে যেতে পারবে না। দোদুলের দাদুকে নিয়ে এখন টানা-বারান্দায় হাঁটা অভ্যেস করি। আর উড়ে যাবে না। পাখিটার দেখাশোনা করি।

দোদুল ভোরবেলা দাদুকে নিয়ে ঘাটপাড়ে যায়। বাবা যেতেন। ওই মাঠে পায়চারি করতেন। নতুন রোদ্দুর এসে পড়তো সেই মুখে। উদার ছিল সেই মুখ। ভালোবাসার একটা মায়াবি ক্ষমতা ছিল বাবার। গাঙশালিকের ঝাঁক তাকে ঘিরে ধরতো। তার পায়ে পায়ে পায়চারি করতো। তিনি চাল, ডাল, মুড়ি প্রতিদিন বিলিয়ে দিতেন পাখিদের। দোদুল পাখিটাকে সবুজ ঘাসে ছেড়ে দেয়। দোদুলের দাদু পায়চারি করে। দুলে দুলে হাঁটে। দোতলার জানালা দিয়ে দেখি। গাঙশালিকের ঝাঁক আসে। দোদুলের দাদুকে ঘিরে ধরে। দোদুল চাল, ডাল, মুড়ি ছড়িয়ে দেয়।

আলাপচারিতা শেষ হলে গাঙশালিকেরা উড়ে যায়। ঝকঝকে রুপো রোদ্দুর মেখে নদীকে লম্বালম্বি পাড়ি দেয়। দোদুলের দাদু উড়তে পারে না। চেয়ে চেয়ে দেখে সেই উড়ে যাওয়া। দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ। প্রকাণ্ড শিরীষ বৃক্ষ। নদীর বুকে চুমু খাওয়া দীর্ঘ খেজুরগাছ।

দোদুল ফিরে আসে। ঘাড় হেঁট করে ফিরে আসে দোদুলের দাদু। পিছন পিছন। ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটে। ক্লান্ত ফিরে আসা।

দেখি। অষ্টক্ষণ দেখি। চোখের আড়াল করি না। পাখিটাই আমার সঙ্গী। পাখিটাই আমার বাবা। ভাবতেই কেঁদে ফেলি। চোখে জল আসে। মুছে নিই। খাঁচাটা শূন্য। বাবা নেই। অনন্ত শূন্য। অসীম ভারতবর্ষীয় নীলাকাশ। নীচে তাকাই। দোদুলের মাথার বাম পাশ ফর্সা হয়ে গেছে। ঝিম মেরে বসে আছে ছেলে।

আমার চোখে জল, কেন?

খুঁজি, নিজেকেই খুঁড়ি। কেন?

এ জলের কোনো উত্তাপ নেই, কেন?

এ জল কি আগুন হবে না?

কাকে জিজ্ঞেস করি? আমার পূর্বপুরুষ কেউ জানে না। লেনিন,স্তালিন, মাও-সে-তুঙ বলে দাও এই জল কবে আগুন হবে? কেমন করে হবে?

জগন্নাথ কাকাকে কি বলবো, দাড়িটা কামিয়ে দিতে? না, মায়ের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ থেকে যাবো? বলে দাও কমরেড!

এই সমাজে আমি একা। আমার কেউ নেই। ওরা বলে—আমি একা হয়ে গেছি।

আমি বলি—ওরা আমাকে একঘরে করেছে। হিন্দুত্বের মতো বাবার বুক ছিল দরাজ। জগন্নাথকাকা, ফরিদচাচা, হরুঠাকুর, এমনকি গাঙশালিক, সকলের জায়গা ছিল ওই বুকে। সেখানে আমিও ছিলাম। বাবার মতো করে। বাবার মতো করে থাকতে পারিনি, ছিটকে গেলাম।

জেলখানায় একদিনই দেখতে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এ শাস্তি তোমার পাপে। আরও সমর্থ হও। শাস্তি সহ্য করতে শেখো।

সেদিন চোখ ফেটে আগুন বেরিয়ে এসেছিল। বুক চিতিয়ে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ফরিদচাচা খুনের মামলায় জেলার কোর্টে হেরে গেলে হাইকোর্টের খরচ জুগিয়ে ছিলেন বাবা। হরুঠাকুরের মেয়ে মরে গেলে, প্রতি সন্ধেয় গীতার ব্যাখ্যা শোনাতেন তিনি। আমার জেল হলে উনি আর কিছু করেননি। স্বনামে, বেনামে বাবা ছিলেন দেড়শ বিঘে জমির মালিক। আমাদের চোখে জোতদার। সন্তান বলে নয়, বিরুদ্ধপক্ষ বলে উনি আমাকে হাতে রাখতেন। শস্যের গুদোম ঘরে শালিক পাখির মতো পা টিপে টিপে চলা আমি সহ্য করতে পারতাম না। সবার অলক্ষ্যে পাখিটার ডান পা মুচড়ে ভেঙে দিলাম। আমার মুখ দেখে কেউ বুঝতে পারে না। দোদুলের দাদু কাত হয়ে পড়েছিল খাঁচায়। কেঁদে ফেলেছিল দোদুল। ছেলেমানুষ। পাখিটাকে কোলে বসিয়ে আয়োডেক্স মালিশ করেছে। ব্যান্ডেড পরিয়েছে। দোদুলের দাদু আর সোজা হয়নি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে আমার মতো।

বলেছিলাম—বাবা, সারা বছরের খাবার রেখে বাকি ফসল বিলিয়ে দাও।

বাবা গাঙশালিক ছাড়া কাউকে ফসল বিলিয়ে দেননি।

বাবার মায়াবি চোখে কুটিল ভয়ার্ত দৃষ্টি, ছেনির মতো হাতুড়ি দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে সারারাত আমাকে রক্তাক্ত করে তুলতো। শুধু আমার বাবা বলে অনেক ছাড় পেয়েছেন। পাখিটার ডান চোখে একটা পেরেক ঢুকিয়ে দিলাম। সামান্য রক্তপাত। যত্ন করে মুছিয়ে দিলাম। পা ভাঙার পর দোদুল ওর দাদুকে নিয়ে আর ঘাটপাড়ে যায় না। দোদুলের দাদু হাঁটতে

পারে না। আমি দেখি দোদুলের দাদু এক চোখের কুটিল ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে আমাকে দেখে। ডান চোখে কষানি ঝরে। খাবার নিয়ে দোদুল আসে না। মা আসে। বুড়ি মানুষ। চোখে পড়েনি। দোদুলের দাদুর ডান চোখ দিয়ে রক্ত কষানি ঝরে ঝরে চোখটা মরে গেছে। দোদুল যেদিন দেখল, পাখিটার একটা চোখ নেই, আমি তখন সন্দেহের অনেক বাইরে।

কেন, কেন আমি পাখিটাকে মেরে ফেলবো না। ফতিমা বানুকে বিয়ে করেছিলাম বলে—জেল থেকে ফিরে, আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে, দোদুলের মাকে আর খুঁজে পায়নি। কে? কে? সেই গুপ্তঘাতক?

দশ দিন আগে পাখিটার খাবারে আমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি। আমি আমার বাবাকে হত্যা করেছি। আমি শাস্তি চাই।

কিন্তু এই রাষ্ট্রব্যবস্থা কেন আমাকে শাস্তি দেবে? কেন? ক্ষমতা ছাড়া কি অধিকার আছে তার? এই কোর্ট, এই জেল, এই পুলিশ আমি মানি না।

আমি গলা ছেড়ে ডাক দিলাম—মা ... আ... আ ... দুই ক্র্যাচ বগলে আলসেয় ঝুঁকে চিৎকার করে উঠলাম—জগন্নাথকাকাকে যেতে বারণ করো। দাড়িটা কামিয়ে নেবো।

ওরা কাল মিছিলে যাবে

ওরা কাল মিছিলে যাবে।

পিয়া ভাবলো। এবং পাশ ফিরে শুলো। বাঁ পাশ। ডান পাশে পিয়ার স্বস্তি হয় না। কাল মিছিলে পুলিশের ব্যারিকেড থাকবে। লাঠিচার্জ হবে। পিয়া লেপের ভিতর থেকে হাতদুটো টেনে বের করে। বগলের নীচ দিয়ে লেপ চাপিয়ে নেয়।

সামান্য গরম লাগছে। কেমন অস্বস্তি মনে হলো।

ওদের একটা খবর দেওয়া উচিৎ।

ওরা সভাসমিতিতে আসে না। আড্ডা মারে। মদনার চায়ের দোকানে। বিড়ি টানে। ধোঁয়া তোলে। পাঁচকে সাত চা খায়।

কেউ কি খবরটা পাবে না? পাবে কী করে? যতো সব লম্পট, বোম্বেটে। এসব খবর রাখবে কেন?

পিয়া শুয়ে শুয়ে টেবিল ঘড়ির দিকে তাকায়। দম কম দেওয়া হেরিকেনের নির্জীব আলো। টেবিলে ডাঁই করা বইপত্তর। রাত দশটা কুড়ি। এখন খবর দেওয়া সম্ভব নয়। মর গিয়ে লোফারগুলো। ওদের জন্য অত ভাবনা কিসের। পিয়া চোখ বন্ধ করে। কাল ভোরের বাসে জোছনপুর যেতে হবে, তার মানে পাঁচটা চল্লিশ। পিয়া ভ্রূ-পল্লব দুচোখের জমিতে চেপে ধরে। ঘুম আসে না।

জোছনপুর ভাবলেই জোছনপুরের মাঠ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জ্যোৎস্নারাতের রোমান্টিক সেই মাঠ একবার পার হয়েছিলো কমরেডদের সঙ্গে। ভুলতে পারে না। ধু ধু জ্যোৎস্না। উদ্দাম গান। হাসি। স্বপ্নিল কথাবার্তা তাকে টানে। সেই জ্যোৎস্নাভেজা রাত। কুয়াশামাখা মাঠ। আবছা দু'একটি খেজুরগাছের পাশ দিয়ে বালি ছড়ানো বাঁওড়ের স্রোত ফিরে ফিরে আসে চোখের সামনে।

জোছনপুরের পার্টি-অফিসে খবর দিতে হবে।

ওরা কাল মিছিলে যাবে। মিছিলে পুলিশ ব্যারিকেড থাকবে। লাঠিচার্জ হবে। গুলিও চলতে পারে।

মোমিনডাঙা, বসতপুরও যাবে।

— ওরাও যাবে। নীল। নীলের সাঙ্গপাঙ্গ। নীল নামটা বেশ। কেমন বহুদূরের নাম বলে মনে হয়। পুরো নামটা কী? নীলকমল—নীলরতন—নীল...নীল...নীল দিয়ে আর কি হতে পারে? দূর—পিয়া বিরক্ত হয়ে উঠে। বুক থেকে লেপ আরো খানিক নীচে নামিয়ে দেয়। যতো সব মোদোমাতালের দল। মদনার দোকানের সামনে দিয়ে সন্ধের পর কোনো ভদ্রমেয়ের যেতে গেলে কান ঝাঁ ঝাঁ ক'রে ওঠে। মুখ লাল হয়ে যায়। পিয়ার মনে পড়ে, জোছনপুর থেকে ফেরার দিন। এক কলি গান ভেসে এসেছিলো চায়ের দোকান থেকে : পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে, মায়াময় এই মধু সন্ধ্যায়...

মুখে চোখে সেদিনের রক্তের চাপ আজও অনুভূত হয়। তবে হ্যাঁ, নীল ছেলেটি গায় ভালো। গলা আছে। সব নষ্ট প্রতিভা।

সঙ্গে নীতিনদা ছিলো। আর ছিলো জোছনপুরের সেই রোমান্টিক উন্মাদনা! উদাসীপনা।

এতবড় শহরে একজন মানুষ নেই যে, ওদের মুখের ওপর কথা বলে। যা খুশি তাই করছে।

পালের পাণ্ডা ওই নীল।

কেচ্ছা-কেলেংকারি আর নোংরা কথায় ওদের চোখে মুখে খৈ ফোটে। যে কেউ কিছু বলতে যাক, তার চৌদ্দপুরুষের কেচ্ছা গেয়ে দেবে। আশ্চর্য! ওই পালের গোদাটা সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁধে নাকের ডগায় ঘুরে ঘুরে নেচে গেয়ে শুনিয়ে দেবে।

পিয়ার হাসি পায়।

ওই বিকট লম্বা, চোয়াল চড়ানো ছোঁড়াটা রাস্তায় নেচে গেয়ে লোক জমিয়ে ফেলবে।

চোখ বন্ধ রেখেই পিয়া ঠোঁট টিপে হাসে।

তার চারপাশে দোয়ারকি ইয়ারের অভাব নেই। কে যাবে ওদের পিছনে লাগতে।

হাসতে গিয়ে সশব্দে নিশ্বাস বেরিয়ে আসে তার। চিৎ হয়ে শোয় সে। মনে হয়, শোয়া ঠিকঠাক হচ্ছে না বলেই ঘুম আসছে না। এবার চিৎ হয়ে যুত হওয়ার চেষ্টা করে।

একটা গানের তিন লাইন পিয়ার মনে পড়ল—

সুন্দরী লো সুন্দরী
ফাঁস করবো নাকি কেলেংকারি,
প্রেম করি আর ল্যাং মারি।

পিয়া আর থাকতে পারলো না, ফিক করে হেসে ফেল্লো। আর হেসে ফেল্লে চোখ বন্ধ রাখা যায় না। সে খুব ধীরে ধীরে চোখের পাতা খুলে দিল।

এক ফাংশানে শহরের অন্যতম সেরা সুন্দরীকে নীল পিয়ার সামনে যেভাবে নাকানি-চুবানি দিল—

নীল যখন স্টেজে গান গাইছিল, মেয়েটি নাকি অনুরোধ পত্রের নাম করে প্রেমপত্র পাঠিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পিয়ার মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ নীল—দলের পাণ্ডাটার নাম নীলাঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।

স্বস্তি হলো। নামটিই যেন খুঁজছিল। আলো-আঁধারি অন্ধকারে আবছা দেওয়াল। তার চোখে পড়ল চুন বালি খসে পড়েছে। জানলার মাথা থেকে ফেটে গেছে। সে প্রথম দেখার মতো স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মূল ফাটলটার দুপাশ থেকে সরু সরু দুটো ফাটল এসে মূল ফাটলটার সঙ্গে মিশেছে। চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় বহুদিন বহুকালের পুরোনো অন্ধকার ঐ ফাটলগুলির মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। চোখের সামনে আবছা আঁধার যেন বহুদূরের অচেনা কোন প্রাচীন দেশে সে এসে পড়েছে, একা, আর কেউ নেই। শুধু দূর থেকে একটি গানের সুর ভেসে আসছে ওই ফাটলগুলোর মধ্যে দিয়ে। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এ সুর, এ গলা নীলের। সুরের এঁকেবেঁকে ওঠা, নামা—সরলরেখার মতো বিস্তার ঐ ফাটলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘরের মধ্যে, তার দিকে। পিয়া আবেশে চোখ বন্ধ করে। পাশ ফিরে শোয়। এবারও বাঁ পাশ।

সুর, সুরের কথা বহুদূর থেকে জেগে উঠছে তার মনের ভিতরে— বিলম্বিত লয়ে—

উই আর নট এ্যালোন—উই আর নট এ্যালোন—উই আর নট এ্যালোন— টুডে—এ—এ

ওহো—হো ডিপ ইন মাই হার্ট—

নিঃশব্দে গানটি বাজতেই থাকলো তার বুকের ভিতরে। গানটি কাল মিছিলে গাইতে হবে। মিছিলের অগ্রবর্তী অংশ গাইবে। গতকালও পাঠ এবং আলোচনার শেষে গানের রিহার্সাল হলো।

তার কথা মতো গতকাল নীল এসেছিল। আজ আসেনি। আসলে খবরটা পেয়ে যেত। আসবে কেন— আজ শুধু আলোচনা ছিল! সে কি ভাল্লাগে! নীল গতকাল রিহার্সাল সেরে বেরিয়েই চুপি চুপি পিয়ার কানে বলেছিল তোমাদের এখানে মাইরি এলেবেলে মেয়েছেলে—ভাল্লাগে না। তোমার জন্যেই আসি। পিয়া ঠোঁট টিপে আবার হাসে। চোখ খোলে না। হাত বাড়ায়। বিছানা খালি খালি ঠেকছে। বাড়ির বিছানায় কোল বালিশ আছে তার। শূন্য হাত বুকের কাছে ফিরে আসে। ছেলেটি সরল। সাহস আছে বলতে হয়। নীতিনদা এই কথাটাই বলতে চেয়েছে বহুবার। সোজা কথা আঁকিয়ে বাঁকিয়ে পাণ্ডিত্ব ফলিয়ে, তবু বলতে পারেনি : পিয়া তোমাকে ভাল লাগে। সুযোগও সে দেয়নি। অথচ নীল—

ইচ্ছে হয়েছিল ঠেসে একটা চড় বসিয়ে দেয়। পারে নি— শাসনের ভঙ্গিতে চোখ পাকিয়ে বলেছিল—ভদ্র ভাষায় কথা বলতে পারো না—ছি! পিয়া বুঝেছিল-এর একটা অন্যরকম মানে করেছে নীল। —করুক গে—। কী আসে যায় তাতে। তাই কি? তবে সংশয়ের

একটা চোরাস্রোত কেন ঘূর্ণির আকার নিতে চলেছে। যদি মিছিলে নীলের চ্যালাচামুণ্ডার দল না যায়। কম করেও বিশ-পঁচিশটা ছেলে হবে। সব ছেলেকটাই ষণ্ডা-গণ্ডা।

পুলিশের লাঠি খেয়েও ওরা গান গাইতে গাইতে ব্যারিকেড ভেঙে ঢুকে পড়তে পারে।

পিয়া শুনেছিল, কোন একটা ফাংশান প্রচণ্ড গণ্ডগোলে ভেস্তে যাওয়ার মুখে, নীল উঠেছিল গান গাইতে।

শহরের উঠতি মস্তান মায় পুলিশগুলোকে ওর দল ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে তারপর জমিয়ে গান গেয়ে স্টেজ থেকে নেমে আসে। হ্যাঁ, ওরা পারে। লাঠিচার্জের মুখোমুখি পতাকা উঁচু করে ধরে এগিয়ে যেতে। পুলিশের লাঠি-বৃষ্টির মধ্যেও নীলের কিছু হবে না। সে এগিয়ে যাবে। ওর দেখাদেখি গান গাইতে গাইতে এগিয়ে যাবে সংগীতের গ্রুপ। উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে যাবে সমস্ত মিছিলের।

আজকালকার ছেলেগুলো কেমন পান্তাভাত মার্কা। ন্যায় অন্যায় কোনো ব্যাপারেই তেড়ে ফুঁড়ে উঠতে জানে না।

পিয়া ঠোঁট টিপে চোখ বন্ধ রেখে আবার হাসে। এমনিতে হাসার সময় তার চোখগুলো ছোট হয়ে যায়। সে জানে তার হাসি বেশ মিষ্টি। নীল সেদিনই বলেছে—তোমার হাসিখানা মাইরি বাঁধিয়ে রাখার মতো। দেখলেই বুক জ্বলে যায়।

নাকি অন্য ভয়ে কিছু বলে নি, যদি একটা কুৎসিৎ গান গেয়ে উঠত। তা অবশ্য উঠত না। সে জানে—নীল মজেছে।

পিয়া যেদিন প্রথম ওদের আখড়ায় গিয়ে মিছিলে গান গাইবার প্রস্তাব দেয়—সেদিন এক চ্যালা বলেছিল—মালটার গাল ধরে একটু নেড়ে দিলে না গুরু। নীল চটাস করে চড় কষিয়ে দিয়েছিল তার গালে। গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিল—গুরু তুমিই ত বলেছ— সব মেয়েমানুষই মাল, আর ব্যাটাছেলে মাত্রই মাতাল।

পিয়ার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। কানে আঙুল দেওয়ার মতো অবস্থা। তাড়াতাড়ি গায়ে শাড়ির আঁচল টেনে সরে পড়ার উপক্রম করছিল।

কানে এল—নীল বলছে—বলেছি তো বলেছি হয়েছে কী? সব কথা—সবদিন সত্যি হয় নাকি?

পিয়া ততক্ষণে অনেক দূর চলে এসেছে। নীল দৌড়ে এসে ক্ষমা চেয়ে গান গাইতে রাজি হয়েছিল। পিয়া কোনোরকমে ম্যানেজ দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

সেদিনই পিয়া বুঝেছে—নীল মজেছে।

সেদিনের কথা ভাবতে গিয়ে সে তাড়াতাড়ি বুক থেকে খসে পড়া আঁচল বুকে জড়িয়ে নেয়।

হাজার হোক ঘরের মধ্যে আট দশজন কমরেড মেঝেতে শুয়ে আছে। সে দ্রুত চোখ

খুলে ঘাড় তুলে একবার দেখে নেয়। না। সকলেই ঘুমুচ্ছে। সারাদিনের মিটিং আর কালেকশনের পরিশ্রম! শুধু শেষ দুজন, ওর মনে হলো, ফিস ফিস করে কিছু আলোচনা করছে।

আজকে কমরেডদের মধ্যে সেই একা মহিলা পড়ে গেছে।

আশ্চর্য লাগে তার এই পার্টির ছেলেগুলোকে দেখে। কী ধাতু দিয়ে যে তৈরি। এতগুলো পুরুষমানুষের মধ্যে সে একা একটা মেয়ে তবু কত নিশ্চিন্ত। যেন একটা পরিবার, এক ঘরের মধ্যে ঘুমুচ্ছে। অথচ কত দূর দূর থেকে ওরা এসেছে। নানান পরিবার, সমাজ থেকে। দু-জনকে তো সে চেনেই না। আজ প্রথম আলাপ হলো।

লেপের নিচে খানিকটা শাড়ি পায়ের উপর উঠে এসেছিল, নামিয়ে দিয়ে আবার বালিশে মাথা রাখে। রাত দেড়টা বেজে গেছে। অথচ ওরা? নীল? লম্পট, মাতাল, নষ্ট ছেলে। পিয়া খবর পেয়েছে গানের রিহার্সাল সেরে—সেদিন রাতে মদ খেয়ে টলতে টলতে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরেছে নীল।

পিয়ার সাথে দোস্তি হলো।

মোস্তি একটু হোক না বেশি।

ছি ছি কথার বাঁধন নেই। এরকম অভদ্র অসামাজিক ছেলে মেয়েদের নিয়ে মিছিলে যাওয়া উচিৎ নয়। মিছিলের নিয়মশৃঙ্খলা আছে, তা দুদিনেই রপ্ত করা যায় না। মদোমাতাল, লম্পট। সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে বসে পিয়া। তার শরীরে জ্বলুনি ধরে গেছে। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

সে ডাক দেয়—নীতিনদা— নীতিনদা। শেষ প্রান্তে নীতিন বোধহয় জেগেই ছিলেন। ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

— কী হলো পিয়া?

এদিকে শোন।

নীতিন উঠে আসেন।

পিয়া বলে—নীলদেরকে বারণ করতে যাবো।

—কী বারণ করতে যাবে?

—ওরা মিছিলে যাবে না।

—কেন?

—না যাবে না

— কেন? কী হলো? রাত দুটো বাজে। এখন কোথায় যাবে? শুয়ে পড়ো।

—এখনই যাবো।

—তোমার মাথা ঠান্ডা করো।

—মাথা আমার ঠান্ডা আছে। তুমি চলো।

—এখন রাত দুটো। তাছাড়া নীলের ঠিকানা জানো?

পিয়া এবার অসহায়ের মতো ভেঙে পড়ে। —না—আমি নীলের ঠিকানা জানি না। কিছুই জানি না।

ততক্ষণে আরও দু-একজন কমরেড জেগে উঠেছে। ঝড় বইছে পিয়ার বুকের মধ্যে। ভাবনার প্রবল আবেগ তাকে ওলট-পালট করে দিচ্ছে। —শরম ভরম সব গেল। কোনো ভদ্রতা শালীনতা নেই। বিছানায় বসেই সে আঁচল চাপা দিয়ে মুখ ঢাকে। অজ্ঞ, মূর্খ, কালাপাহাড়— আপন মনে গালাগাল করে। বুকের মধ্যে কিসের যেন কষ্টে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যায়। মস্তিষ্ক তোলপাড় করে তোলে।

সে কাদের নিয়ে মিছিল যাচ্ছে? যারা কিসের মিছিল, কেন মিছিল, কিছুই জানে না?

ইতিমধ্যে জেগে ওঠা কমরেডদের মধ্যে একজন যেন হেরিকেনের আলো দিয়েছে বাড়িয়ে। সে আলোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে পিয়ার আঁচলচাপা মুখ। কমরেডরা তার মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারলো না। পিয়ার মনে পড়ল গতকালের মিটিং-এর একটুকরো কথা। —কমরেড এইসমস্ত ছোটোখাটো আন্দোলনগুলির অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, জয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা সর্বাত্মক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাবো। এ একদিনের কাজ নয়। ছিঃ ছিঃ, নীল তার হাসি, তার রূপ, তার শরীর ছাড়া কিছুই বোঝেনি মিছিলের। সে কি তার রূপ ভাঙিয়ে মিছিলের লোক বাড়াচ্ছে? রূপোজীবী!

জেগে উঠে দাঁড়িয়ে থাকা কমরেডরা কিছুই বুঝলো না। শুধু শুনতে পেল—পিয়ার হাহাকার—কেন জানি না—নীলের ঠিকানা কেন জানি না। কেউ দেখতেও পেল না—পিয়ার দু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া দুটি জলের ধারা।

এক মরণে দু'জন মরে

—বলো হরি, হরি বোল।

অশুভ সূচনায় একটি গল্প শুরু হলো। এর জন্যে অবশ্য আমিই দায়ী। যখন স্কুল ছুটি হয়, দল বেঁধে ছেলেরা ঘরে ফেরে। ধুলো ওড়ায়। কমলা রোদ্দুর ধুলো ভেদ করে গণশার মার উঠোনে পড়ে, ঠিক তখন হুল্লোড় তুলে ছেলেরা গল্পের দ্বিতীয় লাইন উচ্চারণ করে :

গণশার মাকে খাটে তোল।

হাতের ধুলো, পায়ের ধুলো, ইট পাটকেলে উঠোন নোংরা হয়ে যায় চোখের পলকে।

তবে গল্পটি বর্ষার কোনো এক বিকেলেও শুরু করা যেত। যেমন, বৃষ্টি হয়ে গেছে। জলের স্রোত বইছে রাস্তায়। মেঘভাঙা রোদ্দুর এসে পড়েছে গণশার মার উঠোনে। স্কুল-ফেরত ছেলেদের দু'পায়ে জল উড়ছে, ছুড়ছে ইট, পড়ছে মাটির দেওয়ালে। কোরাস গাইছে :

হরে কৃষ্ণ হরে রাম

গণশার মার দেওয়াল ভাঙ।

এক্ষেত্রেও গণশার মার অনিবার্য চিৎকার শোনা যাবে :

অনামুখো নির্বংশের দল। যমরাজের দেওয়াল ভাঙতে পারিস নে!

হাতের ঝাঁটা সাঁ করে ছুটে যেত ছেলেদের দিকে। পালা ওরে পালা। ডাইনি-হাতের শলা।

ছড়া কাটতে কাটতে ছেলের দল হুটপাট করে পালাত ছুটে। যতক্ষণ দু-চোখে দেখা যেত গণশার মার গাল পেড়ে তৃপ্ত হতো না। ফের নিকোতে বসে বিড় বিড় করে আপন-মনে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতো। দু' একদিন ঝাঁটাগাছ খোওয়াও যেত।

গণশার মার স্বস্তি নেই।

আমারও স্বস্তি হচ্ছে না এভাবে গল্প'টি শুরু করে। ঘোষ বুড়ি ঠিকই বলেছিল :

যার নেই কোনো গতি,

সে করে হোমিওপ্যাথি।

সকাল বিকেল রুগি দেখে

সন্ধেবেলা গল্প লেখে।

ঘোষবুড়ি যেটা বলেনি, সে আমার অক্লান্ত অবসর।

টানা মাটির পথ। পথের ধারে জানালা। ‘—চেয়ারে অর্থহীন বসে শুধু দেখা। অগত্যা লেখা। পথের ঠিক ওপারে আয়তাকার উঠোন। এককোণে দোচালা গণশার মার মাটির বাড়ি। একখানি ঘর। পথের দিকে পিছন-ফেরানো ছোট্ট দুটি জানলার চোখ সে দেওয়ালে। ভিতরদিকে একফালি গোপন দাওয়া। গঙ্গার ঘাটের দিক দিয়ে আসার সময় কিয়দংশ দেখা যায়।

ছোট্ট বেড়ার গেট বাদে চতুর্দিকের সীমানায় বুক উঁচু চিতে কচার বেড়া। কাঁচি-ছাঁটা। যেন জমাট সবুজরঙের দেওয়াল, মধ্যে ঝকঝকে উঠোন। গোবর নিকানো। দু'বেলা গোবরজলে মেজে হলুদবরণ রঙ। একচিলতে খাপরা ঘুঁটি কি ছেঁড়া কুলের পাতা পর্যন্ত পড়ে নেই। ঘরের দেওয়াল, দাওয়া অনুরূপ। পড়ন্ত বিকেলে দেখি গণশার মা আপনমনে ঝাঁট দিচ্ছে। কিংবা গোবর-নিকানো মাটির হাঁড়ির পাশে বসে নিকোচ্ছে। তখন হৈ হৈ করে এসে যায় স্কুলফেরত ছেলের দল। কুলের সময় হোক বা না হোক, শিল-পড়ার মত ইট পড়ে দাওয়ার সামনে দাঁড়ানো ঝাঁকড়া কুলগাছে। ঝড়ের মত বয়ে যায় গণশার মার খেউড়। তারপর আবার শান্ত ঝকঝকে হয় উঠোন। গণশার মাকে দেখা যায়, কাঁচি হাতে চিতেবেড়ার ডাল ছাঁটছে। কিংবা উঠোন থেকে খুঁটে খুঁটে পিঁপড়েগুলো ফেলে দিচ্ছে। মৃত মানুষের স্তব্ধতা, পবিত্রতা নিয়ে পড়ে থাকে এক বৃদ্ধা এবং তার ঘর, আঙিনা।

উচিৎ ছিল এরকম পটভূমি তৈরি করে গল্পটি শুরু করা। অবশ্য উচিত অনুচিতের প্রশ্ন না তোলাই ভাল।

তাছাড়া আমার সতর্ক হওয়ার কিছু নেই। এ গল্পে গণশার মার চরিত্রে লুকোবার মত কোনো উদ্দেশ্য নেই। জ্ঞান-বাণীও কিছু নেই। আজকাল গল্পে স্মৃতিচারণ গল্পকে বয়ে নিয়ে যায়, সে ফ্যাসানের ভার বইবার মত বয়সও গণশার মার নেই।

গণশার মা ঘাটের মড়া।

কাল হবে শেষ চৌকি চড়া।

তার বর্তমান আছে, সাপের মাথার মণির মতো ভূত ভবিষ্যত নেই। কোনো সঙ্গী নেই। সে একা। সাপের মাথায় মণি হয় না। হয় একধরনের শক্ত আঁশ। যা থেকে আলো প্রতিফলিত হয়। সান্ধ্যকালীন সেই ভৌতিক আলোয় গণশার মা বেঁচে আছে। ভীষণ একা। তাকে নিয়ে লুকোচুরির সমস্যা আমার নেই।

বুক ফুলিয়ে বলতে পারি—দেখুন, ওই গণশার মা। বাড়ি, কুলগাছ, উঠোন, বাড়ির ধারে এই টানা মাটির পথ।

পথের এক মুখ গেছে গঙ্গার ঘাটে। ঘাট তিনটি। ত্রিশূলের মতো তিন ভাগ হয়েছে পথ। খেয়াঘাট। শ্মশান! চর যেখানে ধুধু করে। শ্মশানের পাশে, বালিয়াড়ি সীমাহীন। তার নীচে আঘাটায় গণশার মা স্নান সেরে নেয়। সূর্য তখন পাটে বসে। কমলারঙ ছড়িয়ে পড়ে রুপালি বালিয়াড়ির জনশূন্য চরে। সারাদিনের হাঁপ-তাপ ক্লান্তি, গঙ্গার জলে জুড়িয়ে, গণশার মা ঘরে ফেরে। দূরে খেয়াঘাট। কোলাহল। সে ঘাটে বুড়ির জায়গা নেই। স্নানের ঘাটেও না। পাছে কেউ ডেকে ওঠে :

মাছ গণশার মা

গণশা মাছের ছা!

শ্মশানের চিতা জ্বলে। আগুনের আভা লাগে গায়ে। দিনের চিতা জ্বলে পশ্চিম আকাশে। সে আভাও গায়ে মেখে জনহীন, পথহীন বালিয়াড়ির বিশাল শূন্যতায় গণশার মাকে দেখা যায়। ভিজে থানে আবৃত। ঋজু বৃদ্ধা। মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলেছে। হাতে একটি সছিদ্র কৌটো, জলভর্তি। জলপতনের ধৌত পথের রেখা ধরে চড়াই-উৎরাই ভেঙে চলেছে। সমাজ-পরিত্যক্তা এক বৃদ্ধা। নত নয়। ঋজু। বার বার ঋজু বলি। কারণ জীবিত কিংবা মৃত মানুষেরা কোনোদিন এই বৃদ্ধাকে নত হতে দেখেনি। প্রণাম করতে দেখেনি। না অস্তগামী সূর্যকে, না গঙ্গাকে, মৃত্যুকে তো নয়ই। আশ্চর্য!

গণশার মা—

হরি বলতে জানে না।

গণশার মাকে নিয়ে অসংখ্য ছড়া পুবালি গাঁয়ে ছড়িয়ে আছে। একজন মানুষ নেই, যে অন্তত একটি ছড়া জানে না। ছড়া বাঁধার লোকেরও অভাব নেই। স্কুলের ছেলেরা বাঁধে। বৃদ্ধরা বাঁধে। সবচেয়ে বেশি বাঁধা হয় মহিলামহলে। ছড়া বেঁধে যিনি অমর হয়ে আছেন তিনি নিলুর মা। মহিলামহলে যিনি মধ্য-মণি ছিলেন।

জনান্তিকে বলে রাখি, মহিলামহলটি বসে আমার পাশের ঘরে। মহিলামহল না বলে বিধবামহল বলা উচিৎ। এর মধ্যে নিলুর মা-ই একমাত্র সধবা। প্রতি দুপুরে তিনি ছড়ার ঝাঁপি উজাড় করে পাড়ার কর্ম, কেলেঙ্কারি, রহস্য শোনাতেন। পাড়ার বুড়িরা অবাক হয়ে শুনতো তার সৃষ্টি ঐশ্বর্য। না শুনে উপায় ছিল না। নিলুর মা বলে কথা।

নিলু, সরকারের বড় দারোগা। দোতলা বাড়ি হেঁকেছে। সব ঘরে বাঘ-থাবা পায়া খাট। সে গাঁয়ের রত্ন বিশেষ। তার মা—

সুতরাং ... ...

থাক অতিকথনে কাজ নেই। মহিলামহলে যা স্বাভাবিক, মুখরোচক তাই চলতো। পরচর্চা।

পরনিন্দা। সঙ্গে চলতো তাসখেলা। ছড়া-তৈরির প্রতিযোগিতা। আমার ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে আছড়ে পড়ত ছন্দলহরী :

ডাকাত গণশার মা

নিলুর মায়ে জা

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ

ডাকাত নাকি বিপ্লবী।

প্রথম কথা চার লাইনের ছড়া। তা বাদে এটা তৈরি করেছিল ঘোষ বুড়ি। যার প্রতিষ্ঠা নেই। ছেলে ঘোল-ঘি বিক্রি করে। তা বাদে, সে নাকি আইবুড়ো বয়সে গণশার মায়ের সখি ছিল! সেই অপরাধে এ ছড়া নাকচ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

একজন অন্যমনস্ক আর একজনের গা ধরে নাড়া দিলে:

—ওলো মুখপুড়ি

শুনেছিস্—

ছড়া বেঁধেছে ঘোষ বুড়ি।

নিলুর মা জুড়ে দিলেন—

চাঁদে আর পোঁদে ইস,

কোথায় ডাকাত কোথায় পুলিশ!

ঘোষবুড়ি চুপ করে যেত। তার জোর নেই।

গোপনে সে—ভাইভাই, ঠাঁইঠাঁই— প্রবাদকে ঘুরিয়ে বলত, জায় জায়, ঠাঁই ঠাঁই।

এককালে গণশার মা এ আসরে আসত। শোনা কথা। দেখিনি। তখন নাকি, রামায়ণ পাঠ হতো। ত্রৈলোক্যনাথের শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠ হতো। দেশকাল অভাব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হত। ভক্তি গাম্ভীর্য সে আসরে আড্ডার অলংকার ছিল। নিলুর মায়ের প্রবল প্রতিপত্তিতে সে আসর অন্য চেহারা পেয়েছে।

সেবারই নিলু বড় দারোগা হলো। নিলুর মায়ের হাঁক ডাক গেল বেড়ে। ছড়ার খ্যাতিতে নিলুর মা তখন বিখ্যাত মহিলা। সেইজন্য হৈ চৈ প্রশংসার আড়ালে হারিয়ে গেল গণেশের মা। মানুষের স্মৃতি বড় দুর্বল। গাঁ তাকে ভুলে গেল। দীর্ঘদিন জেল ভোগ করার পর নিখোঁজ হয়ে গেল গণেশচন্দ্র পাল। মানুষ তাঁকেও ভুলে গেল। গণেশের মা'র অনুপস্থিতি দীর্ঘতর হতে হতে আসরে আর দেখা গেল না। হায়! গণেশের মা কেমন করে যে গণশার মা হয়ে গেল।

ঘোষবুড়ি ছড়া বাঁধলে :

সতীন মায়ের সৎ ছেলেটি

দেশ, জননী ভেবেছিল

জেলখানাতে জীবন দিল

দেশ-গিরামের প্রাণ কাঁদে কি!

নিলুর মা উত্তর দিলে—

হোক না জা, সত্যি কথা বলতে কি

সতীন মায়ের লোক দেখানো দরদ বেশি।

গণশার মা বাড়ির বাইরে আসে না, সারাদিনে একবার ছাড়া। সদ্য স্নানার্দ্র থান পরিহিতা ঋজু বৃদ্ধা অস্তগামী সূর্যকে পেছনে ফেলে শ্মশানের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে। দেখা যায়। ধুধু বালিয়াড়ির জনহীন শব্দহীন শূন্যময় জগৎ থেকে শূন্যময় জগতের দিকে। একা। সমাজ-সংসারে প্রয়োজনহীন, ভূমিকাহীন, সঙ্গীহীন ছড়ায় আর ছড়ানো অত্যাচারে ভীষণ একা।

এই পর্যন্ত লেখার পর মনে হচ্ছে, গণশার মার প্রতি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছি। জগৎ সংসারে আর কি গল্পের চরিত্র নেই? গণশার মাকে নিয়ে পড়লাম কেন?

মনে পড়ছে :

সেদিনের কান্না, শোক হাহাকার ছাপিয়ে যে শব্দ-বল্লরী উপরে উঠছিল, যেন উৎসব। ঘাড়ি তোলা ময়ূর-লাগানো খাট। রজনীগন্ধার ফুল, ধূপের ধোঁয়া, পয়সার মিশেল ছড়ান খৈ-এর বৃষ্টি। তখনও মনে দাগ কাটেনি। কত ধনী লোকের মা-ই তো মারা যাচ্ছেন। হরিনামের বন্যা বইছে। নিলুর মা মারা গেছেন হতেই পারে।

রুগি দেখে ফিরছিলাম। শবযাত্রার মিছিলের চাপে গণশার মা'র চিতেবেড়ার কোণে ঠাঁই পেয়েছিলাম। দুর্ঘটনা কিংবা কাকতালীয় হতে পারে! সেই অবহেলিত প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল গণশার মা। হাজার হোক জা তো। যেন চুরি করে দেখে নিচ্ছিল নিলুর মায়ের সৌভাগ্য। তার দিকে তাকালাম। যে মানুষ অষ্টক্ষণ বিড় বিড় করে বকেই চলে, সে চুপ। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। চোখদুটো লোভাতুর নির্নিমেষ। যেন মৃত্যুর সৌভাগ্যকে সমস্ত অন্ত:করণ দিয়ে কামনায় শুষে নিচ্ছে। অভাবী ঘরের ছেলে! এ দৃষ্টির ভাষা বুঝতে বোধহয় ভুল হয়নি।

—বলো হরি, হরি বোল।

আমার কানে বাজছে—গণশার মাকে খাটে তোল।

পথের দুধারে সতীসাধ্বীর ভিড়। গলায় আঁচল জড়িয়ে শেষবারের মতো প্রণাম করে নিচ্ছে।

—বড় সতী নারী গো।

গরদে জড়ানো শরীর। সিঁদুরে টকটক করছে মাথা। আলতা-ডুবানো পা। কেউ কেউ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। গণশার মা শুধু লোভনীয় মৃত্যুর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে। সে বয়সে বড়। স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষ হ'লেও নিলুর মা'র চেয়ে সে বয়সে বড়। কার যাবার কথা কে যাচ্ছে।

—আহা! স্বামীর হাতের সিঁদুর নিয়ে যাচ্ছে গো।

—ছেলে বড় দারোগা হ'লো। নাতি, ছেলে, বৌ'র কোলে মাথা রেখে মরলো।

এক বৃদ্ধা থানের খুঁটে চোখ মুছলেন! দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন—এমন মরণ কি আর আমার কপালে আছে? কত পাপ যে করেছি। পাশে একটি কচি বৌ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো :—হুঁ, মরণ আর কাকে বলে! বাঁচতে দিলো না দানা পানি/মরলে দিচ্ছে ছানা চিনি। দু-বেলা বিষয় সম্পত্তির জন্যে জা'কে নিয়ে লাঠালাঠি। দুটো ঘুষের পয়সা হয়েছে কিনা, তাই এত গরম।

আমি গণশার মার দিকে চেয়েছিলাম। এত বড় ভুল হয়ত আর কখনও করিনি! গণশার মা একপলকের জন্য কচি বৌটিকে দেখে নিল। মুখাবয়বে ফুটে উঠল যথার্থ মুল্যায়নের তৃপ্তি। ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের বাঁকা হাসি। গণশার মাকে এই প্রথম হাসতে দেখলাম। নিলুর মার মৃত্যুর দিকে স্বপ্ন নয়, লোভ নয়, সে কতখানি করুণা করে দাঁড়িয়ে ছিল, বুঝতে পেরে লজ্জা পেলাম। গণশার মার চোখ আমি দেখেছি। স্কুলফেরৎ ছেলেদের দিকে যখন সে গাল পাড়ে, সে আর কতটুকু। তার চেয়ে সহস্র গুণ ঘৃণা যেন চোখের কোণে জ্বলে উঠলো।

সত্যিকথা বলতে কি, ওই জ্বলে ওঠার উষ্ণতা আমি আজও অনুভব করি, ভুলতে পারিনে। আজও যখন কারো হাত টিপে নাড়ি দেখি, অনুভূত হয়, সেই ঘৃণার উষ্ণতা। তীব্র ঘৃণা। বারবার ঘৃণা শব্দটি না লিখে বলি, সেই মুখামৃতের অনুভূতি থেকেই এই গল্পের জন্ম। এবং এখান থেকে শুরু করলেই যথার্থ সত্যকথন হতো।

সেদিন কিছু না বলে, ঘটনাটা চেপে গেলাম। চেয়ে দেখি, গণশার মা নেই। অত্যন্ত পরিচিত একটি দৃশ্যে গণশার মা দিব্যি উঠোন নিকোতে বসে গেছে। আর আপনমনে বিড় বিড় করে বকে চলেছে।

মৃত্যুকে তার সহজ অস্বীকার আমাকে বিস্মিত করে। প্রতিদিন শ্মশানের পাশ কাটিয়ে সদ্যস্নানার্দ্র থান পরিহিতা ঋজু এক মৃত্যুকালীন বয়স অস্তগামী সূর্যকে পেছেনে ফেলে, ধুধু বালিয়াড়ির জনহীন, পথহীন, শূন্যময় জগৎ থেকে কোন্ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, একা! আমাকে বিস্মিত করে!

এ হেন বৃদ্ধার মৃত্যুকে আমি দেখেছিলাম। গল্পে যদি প্রয়োজনহীন হয় তবু আমাকে লিখতে হবে। সে আর এক দিনের কথা। স্বপ্নময় রাত্রির শেষে ঘুম ভেঙে গেল। কে

যেন ঘরের কড়া নাড়ছে। তাড়াতাড়ি উঠে বললাম—কে?

দরজা খুলে দেখি, ঘোষবুড়ি। —ডাক্তারবাবা, একটু এসোতো।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকলাম। অন্ধকার তখনও কাটেনি। পুবের আকাশ সবে ফর্সা হয়েছে।

—গণশার মা মনে হচ্ছে আর নেই।

ঘুম ছুটে গেল। শরীর সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

—এ্যাঁ!

—হ্যাঁ।

প্রাক-ভোরের শুকতারার নীচে দাঁড়িয়ে ঘোষবুড়ি স্তব্ধ হয়ে গেছে। আলোহীন, অন্ধকারহীন বিবশ এক মুহূর্তে ঘোষবুড়ি প্রায় বুঁজে আসা গলায় স্বগোতোক্তি করলে— তারা এক মরণে দু'জন মরে। এমন মরে কয়জনা।

—কৈ চলুন। জামাটা গায়ে চড়িয়ে নিলাম।

ঘোষবুড়ির কথা শেষ হয় না। —শরীর খারাপ ছিল বলে, রাতে গণশার মার কাছে ছিলাম। ভোররাতে ঘুমিয়ে গেছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে ...

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। খুলে দেখি, ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। চৌকি শূন্য। মেঝেতে একটি জল চৌকি। সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। তার উপর পিলসুজে প্রদীপ বসানো। প্রদীপের নীচে চৌকির উপরে খোলা একটি খেরোর খাতা। তার সামনে বসে আছে গণেশের মা, মাথা শরীর ভেঙে পড়েছে। খেরোর খাতায় আঁকা একটি ছবি। ছবির নীচে লেখা: গণেশচন্দ্র পাল। গণেশের মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। কে এই গনেশজননী? কে এই গণেশ?

মাথা নিচু হয়ে এলো। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম বাইরে। রোদ চড়ে গেছে বেশ। জনা দুই বুড়ি আর জনাচারেক বালক এসে দাঁড়িয়েছে গণশার মার উঠোনে। চুপচাপ।

আজ আর কেউ বলছে না :

বলো হরি হরি বোল

গণশার মাকে খাটে তোল

আমার কানে বাজছে ঘোষবুড়ির সেই ছড়াটি :

তারা এক মরণে দু'জন মরে

এমন মরে কয় জনা—

জাগরণে একা

লোহার বালতির ভিতরে এনামেল মগের ঠোকাঠুকি চলছে। ছড়ছড়িয়ে জল পড়ছে বাথরুমে। শমি রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো : বিল, জল মাখিস নে বাবা একটু দাঁড়া।

বাথরুমে বিলের এলাহি স্নানের হৈ হৈ হচ্ছে। গোটা পাঁচেক গুন্ডা, যেন মগ বালতিতে ফুটবল পেটাচ্ছে। অতিষ্ঠ শমি ছুটে বেরিয়ে চিৎকার করে উঠলো—দাঁড়া, যাচ্ছি।

ভীষণ শব্দে উলটিপালটি খেতে খেতে বালতি বাথরুমের এ-মুড়ো থেকে গড়িয়ে ও-মুড়ো চলে গেল।

—বিল, বিল।

বিল খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল। পিঠ-পিঠ ছুটলো শমি। তেলমাখা গা বিলের। হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। শমি গেটের দরজায় থমকে দাঁড়ায়। বিল দূর থেকে জিভ ভ্যাঙায়। শমি হেসে ফেল্লো। পরে নিজেও জিভ ভেঙিয়ে বাড়ির ভিতর ফিরে এলো। বিল দরজায় উঁকি দেয়। শমি ইচ্ছে ক'রে হাতের তালুতে মুখ ঢেকে বসে ছিলো। বিল দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে।

—মা, মাগো তুমি কাঁদচ?

শমি বিলকে পাকে-পাকে জড়ায়। দুই তালুর মাঝখানে বিলের মুখখানা তুলে ধরে। কাকভেজা স্নানের এলোমেলো চুল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল মসৃণ মুখে ঝুলে ঝুলে আছে। ব্যাকুল দুটি চোখ আগ্রহে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে মায়ের মুখে। কত লক্ষবার এই মুখ শমি দ্যাখে। দেখে দেখে আশ মেটে না।

শমি বিলকে টেনে বাথরুমে নিয়ে যায়। বলে, জ্বালাতন সহ্য হয় না। তোকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

বিল নেচে ওঠে—তুমি আর আমি, হ্যাঁ মা, কবে যাবে? শমি কড়া গলায় বলে—না। তুই একা যাবি।

বিল শমিকে জড়িয়ে ধরে—উঁহু একা যাবো না।

শমির রাগ পড়ে না, বলে, ছাড়, তাড়াতাড়ি নে আঁচ বয়ে যাচ্ছে। জ্বালাতন করলে আজই পাঠিয়ে দেব। শমি টিউবওয়েল পাম্প করে। বিল আঁচল ধরে থাকে। শমি

বলে, আজ সুনু মামা আসবে। তুই সুনু মামার সাথে চলে যাবি। তোর শাস্তি।

টিউবওয়েলের হাতল চেপে ধরে বিল। পাম্প করতে দেবে না। আবছা ভয়ে নরম আদুরে গলায় বলে—আমি তুমি আর বাঘা মামা, হ্যাঁ মা। দুই হাত দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। অসহায় আবেদনের আর্তি নিয়ে চেয়ে থাকে মায়ের মুখে। শমির বুকও ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে। ভয় পায়। দুর্বল গলায় বলে— না বাবা, তুমি আর সুনু মামা চলে যাবে, আমি তোমার বাবার কাছে থাকবো। আমার শাস্তি। শমির হাত ফসকে জলভর্তি মগ চাতালে পড়ে। স্বনন আসবে, আজই। শমি বিলকে পাঠিয়ে দেবে। সত্যি পাঠিয়ে দেবে। সত্যি সত্যি।

শমি বাথরুমের চাতালে হাঁটু রেখে দাঁড়ায়। খানিকটা আঁচল দাঁতে চেপে বিলের ছোট বুকে মাথা গোঁজে। স্নানের ঠান্ডা জলের ভিতরে দু-ফোঁটা গরম জল বিলের বুক বেয়ে নামতে থাকে। বিল কিছু না বুঝে মা'র চুলে হাত ঢুকিয়ে এলোপাতাড়ি চুল টানতে থাকে। আকুল স্বরে বলে— ওমা কী হয়েছে, মাগো, বলো না। আমি আর বদমায়েশি করবো না মা!

শমিও কি বিলকে পাঠাতে চায়! তার বুক যে খালি হ'য়ে যাবে। সে বিলকে জোরে চেপে রাখে।

সন্ধেবেলা বিল লক্ষ্মীছেলের মতো পড়তে বসে। রান্নাঘর থেকে শমি দেখতে পায়। শমির কষ্ট হয়। বিল মাকে দেখাতে চায় সে কতো ভালো। সে মাকে ছেড়ে যাবে না। শমি চ্যাচায়—খোকা, গলার আওয়াজ পাচ্ছি না কেন?

গম্ভীর উত্তর আসে খোকার,—লিখছি মা।

—জিজ্ঞেস করলেই 'লিখছি মা'। খোকার গলা নকল করে শমি! কঠিন গলা তুলে ডাকে—খাতা পেন নিয়ে আমার কাছে আয়।

বারান্দার নিয়ন আলোর নীচ দিয়ে পা টিপে টিপে আসে সাত বছরের বিল। যেন এক ঝাঁক কাল্পনিক পাখির মধ্য দিয়ে সে হাঁটে, পাখির মতোই। সন্তর্পণ পায়ে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে হঠাৎ মার চোখ টিপে ধরে— উঃ লাগে খোকা ছাড়।

বিল বাঘের গলায় কৃত্রিম গর-গর করে। শমি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—ও বাবা, আমার ভয় করছে। বাঘমামা ছাড়ো আমার ভাত পুড়ে যাবে যে।

—বলো আগে হাতের লেখা দেখবে না।

কেন?

—আমি যে ছবি আঁকছিলাম।

—তাহলে ছবি দেখবো।

বিল আব্দার ধরে,—ও ছবি তুমি দেখবে না। ওটা বাঘমামার ছবি। তোমাকে খেয়ে

ফেলবে।

—বদের যাসু।

শমি আদরের টানে খোকাকে বুকে টেনে নেয়।

মনে মনে কামনা করে, স্বনন তুমি কখন আসবে।

শব্দহীন সিঁড়ি পড়ে আছে। শমি বিলের মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বিল মায়ের গলা জড়িয়ে বলে, বাঘমামার গল্প বলো না মা। শমি বিলকে কোল থেকে সরিয়ে দেয়, —জ্বালাতন করিসনে, সর, হাতের লেখা কর।

বিল ঘাড় কাত ক'রে শুধোয়— বাঘমামার চিঠিটা নিয়ে আসবো মা, চিঠি দেখে হাতের লেখা করি।

বিল ছুটে যেতে চায় চিঠির দিকে।

শমি হাত বাড়িয়ে টেনে ধরে। বলে, না চিঠি আনতে হবে না। নিজে যা পারিস লেখ।

বিল খাতার মুখে ঝুঁকে পড়ে। শমি হাঁড়ির ভিতরে মন দেয়। খুন্তি নাড়ে।

বিল লেখে : 'প্রিয় শমি '

বিল ডাকে—ওমা দ্যাখো না, বাঘমামার মতো হয়েছে?

শমি হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। শেষে রেগে ওঠে, ওটা কী হচ্ছে। এ্যাঁ, ফাজিল ছেলে। নিজের পড়া লেখ।

স্বনন সেই লিখেছিল 'প্রিয় শমি'। আর লিখবে না। সে লিখতে পারে না। বিলের বাঘমামা পঙ্গু হয়ে গেছে।

স্পন্দনহীন দক্ষিণঅঙ্গ নিয়ে সে এখনও চন্দনপুর গাঁয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকে, আম-কাঁঠালের ছায়া গায়ে মেখে। চোখে গঙ্গাপাড়ের সবুজ বনানীর পাঁচালি তার অবশিষ্ট সম্বল। জল বেয়ে সূর্য ওঠে। জলে ডোবে। পাখি ডাকে। কখনও হয়তো কানে বহুদিনের পুরোনো সেই ডাক ভেসে আসে।

আম কাঁঠাল গাছের ভিতর দিয়ে লুকোচুরি খেলার মতো যে ডাক খুঁজে বেড়াত তাকে। একবার সেই ডাক বিশাল উঁচু পেয়ারাগাছের ফাঁকে আর্তনাদের মতো বিঁধে গেছিল।

বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে সপসপে গোটা বাগানখানা। দুটো কিশোর কিশোরী এসেছে ঝড়ের ফল কুড়োতে। ফল কুড়োনো শেষ হওয়ার আগেই কিশোরটি হঠাৎ উঠে গেল পেয়ারাগাছের মগডালে। কিশোরী চেয়ে ছিল ঊর্ধ্বে। বিকেলের শেষ রোদ্দুরে বর্ষার জল-মাখা পাকা পেয়ারাগুলি মাখনের রং পেয়ে ঝুলছিল। কিশোরটি পেয়ারা ছিঁড়ছে, আর ভরে যাচ্ছে কিশোরীর কোঁচড়। কখন যেন ছিটডালে পৌঁছে গেছে কিশোর, অকস্মাৎ ডালটির গোড়া সশব্দে ভেঙে গেল।

কিশোরীর আর্তনাদে ভরে গেল সমস্ত ফলের বাগান : স্ব-ন-ন।

স্বনন বাতাসের মধ্য দিয়ে হু হু নীচে পড়ে যাচ্ছে। হাতের কাছ দিয়ে মোটা ডালগুলো পলকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কিশোরী ভয়ে চোখ বন্ধ করলো।

তারপর আর একটা অট্টহাসিতে ভরে গেল ভিজে বাগানখানা।

কিশোরী চোখ মেলে চাইল; স্বনন মোটা ডালটায় আরাম করে বসে। শমি তখন কেঁদে ফেলেছে।

বিল মায়ের দুঃখ বোঝে না। চোখের জল বোঝে। নীরবে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে।

শমি নিঃশব্দে ভাতের হাঁড়ির সরাটা নামিয়ে দেয়! বিলের খাতা খোলা পড়ে আছে। হাঁড়ি থেকে উঠে যাওয়া ধোঁয়ার ছায়া পড়েছে খাতার উপর। 'প্রিয় শমি' শব্দদুটিতে খাতার পাতা এলোমেলোভাবে ভরে গেছে। বিল হাতের লেখা করেছে, শমি চেয়ে আছে। ছায়াময় ধোঁয়ার মধ্যে হাতের লেখার 'প্রিয় শমি' শব্দদুটি অসংখ্যবার ভেসে উঠছে। ভেসে উঠছে ছায়ামাখা অস্পষ্ট স্বননের মুখখানা। স্বনন আসবে।

বিলের মাথা লক্ষ্য ক'রে সে বাতাসের মধ্যে চুমু খায়।

ভাত ফুটছে থাক্‌থাক্‌।

শমি রান্না করছে। স্বনন আসবে।

সেদিন সে রান্না করেনি, স্বনন এসেছিলো। তখন রাত নিথর। শমি আঁচল বিছিয়ে মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো কুণ্ডলী পাকিয়ে।

দুয়োরে টোকা পড়ল।

ঘুমের পাতলা পর্দা ছিঁড়ে যায়।

শমি উৎকর্ণ হয়।

ঘরের মধ্যে হেরিকেন জ্বলছে। টিমটিমিয়ে।

ঘড়ি চলছে টিকটিক। বিষণ্ণ অন্ধকার দরজার ও পিঠ থেকে ফিসফিস শব্দ এলো, শমি দরজা খোলো, আমি স্বনন।

শমি ধড়মড় ক'রে উঠে বসে। স্বনন আবার ডাকে। শমি ভাল করে গায়ে কাপড় জড়িয়ে নেয়। নিঃশব্দে দরজা খোলে। স্বনন নিচু হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেই দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। ইশারায় তর্জনী তুলে জিজ্ঞেস করে— পাশের ঘরে কে?

'বাবা'। ফিসফিস ক'রে শমি উত্তর দেয়।

—এপাশের ঘরে?

মা, ভাই।

সে ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে ইঙ্গিত দেয়, চুপ!

এবার ফিসফিস ক'রে বলে, শমি চাট্টি খেতে দেবে? খুব ক্ষিদে পেয়েছে। শমি অবুঝ চোখে তাকিয়ে আছে। কতোদিন স্বননকে সে দেখেনি। পলাতক স্বননের গলার নিবিড় আবেগে শমির গলা ভারী হয়ে আসে। স্বনন তালুর মধ্যে আঙুল রেখে কটা-কট গাঁট ফুটিয়ে সমস্ত শব্দ নিঃশেষ ক'রে দেয়। জিজ্ঞেস করে, নেই?

কান্নাভেজা অস্ফুট গলায় শমি বলে—আছে, পান্তা ভাত।

—তাই দাও তাড়াতাড়ি।

আঁচলের খুঁট মুখে পুরে শমি রান্নাঘরে চলে এলো। একমুহূর্ত দেরি না ক'রে পান্তা ভাত, আস্ত একটা পেঁয়াজ, লাল লঙ্কা সাজিয়ে থালা নিয়ে ঘরে এসেই চমকে উঠল: স্বনন নেই। চলে গেছে। ঘর শূন্য। ভাতের থালা নামিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই বসে পড়ল। পেছনের বাগানে ভারি বুট পায়ে কারা ছুটে গেল, তারপরই—

শমি আর্তনাদ ক'রে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। নিস্তব্ধ হয়ে গেল রাত্রি। শুধু বন্দুকের নলের মধ্যে জেগে থাকা অন্ধকারের খাড়া রাত্রি জড়িয়ে উঠতে লাগল সাপিনীর ফোঁস-ফোঁসানি কান্না—আর টিকটিক—ঘড়ি চলছে।

শমি সে রাত্রির কথা ভুলতে পারে না। একটি রাত বাড়তে বাড়তে সংক্রমণের মতো ছড়িয়ে পড়েছে রাতের পর রাতের গহ্বরে। তার স্বপ্নের ভিতরে। তার ভাবনার ভিতরে। সেই গুলির শব্দ আতঙ্ক নিয়ে ফিরে ফিরে আসে।

হঠাৎ 'দুম' শব্দ হলো। শমি উল্টে গেল।

বিল দেওয়ালে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কখন তার ঘাড়ে এসে পড়েছে।

বিল জিভ বের ক'রে মরার মতো পড়ে আছে—শমি বিরক্ত হ'য়। জিজ্ঞেস করে—কী হচ্ছে কী?

বিল শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ রেখে উত্তর দেয়—আমি মরে গেছি। পুলিশ গুলি করেছে!

শমি রেগে ওঠে। ঘৃণামিশ্রিত গলায় বলে, পুলিশ গুলি করেছে, আর তুমি কি পালাচ্ছিলে?

বিল যেন মায়ের ভাষা বুঝতে পারে। তড়াক ক'রে লাফিয়ে ওঠে। হাতদুটো বন্দুকের ভঙ্গিতে বাড়িয়ে ধরে তীক্ষ্ণ জেদি গলায় বলে— আমি মরিনি মা, ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা-ঠ্যা দ্যাখো, সব পুলিশ মেরে ফেলেছি।

শমি বিলকে কোলে তুলে নেয়। আদর করে।

উনুনে ভাত বলছে—'নাবা'—'নাবা'।

শমি বিলকে নামিয়ে ভাত উপুড় দেয়। রান্না হয়ে গেছে। বিছানায় কোলের মধ্যে বিল ঘুমিয়ে পড়েছে। শমি জেগে আছে। বিলের বাবা এখনও ফেরেনি।

স্বনন আসবে।

সে ডালবড়া করেছে। কষা মাংস রেঁধেছে ঝাল ঝাল ক'রে। স্বনন ভালোবাসে। সে লংকা দিয়ে চাট্টি পান্তা ভাত তাকে খাওয়াতে পারেনি। আজ নিজে বসে তাকে খাওয়াবে।

কতোদিন সে খেতে পায়নি, শুতে পায়নি, অন্ধকারে মিথেন গ্যাসের মতো জঙ্গলে, লোকালয়ে ছুটে বেরিয়েছে, পুড়িয়েছে, নিজে পুড়েছে, একটা দুরন্ত জীবন সে বেছে নিয়েছিলো। চেয়েছিলো একটা বিশাল মুক্তি। পায়নি। শমির চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা খোঁড়া, ক্রাচসম্বল পঙ্গু মানুষের ছবি। ঠক্‌ঠক্ শব্দ।

শমির দীর্ঘশ্বাস নামে।

একটা দুরন্ত জীবন—একটা বিশাল মুক্তির কথা যে বলেছিলো—সে স্বননের বন্ধু, বিলের বাবা, অতীন বোস। শমির বাবা দেখেছিলেন, ঘর বর, চাকরি। শমি দেখেছিল; সে স্বননের বন্ধু, রাজনৈতিক কর্মী, তারও চোখে আঁকা আছে একই মুক্তির স্বপ্ন।

সিঁড়িতে ভারি পায়ের আওয়াজ। অতীন আসছে। অতীন আসে মধ্যরাতে। অন্যদিন শমি ছুটে যায়। আজ ইচ্ছে করে না। অভ্যাসবশত স্বনন আসবে তাই আজ জেগে আছে। ইদানীং গেটের দরজা বন্ধ, দু-একটা জানলা খোলার শব্দ অথবা নিঃশব্দে জ্বলে ওঠা জানালায় আলো ছাড়া মানুষটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। ব্যস্ত। মিটিং মিছিল, স্ট্রাইক, বক্তৃতা আর কথার ফাঁকে চিন্তামগ্ন।

অতীন আজ একটু সকাল সকাল ফিরেছে। শমি অফিস যাওয়ার সময় ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে বারবার বলেছিলো—খোকার বাঘমামা আসবে, তাড়াতাড়ি ফিরো।

শমি মশারি তুলে ধীরে মেঝেতে নেমে দাঁড়ায় অতীনের কাছাকাছি। বলে, এতো রাত হ'লো?

অতীন হাই তোলে, বলে ঘুম পাচ্ছে।

শমি হাত পাতে। অতীন জামা খুলে শমির হাতে দেয়। শমি জিজ্ঞেস করে,—তোমার বন্ধু এলো না?

লুঙ্গি কামড়ে প্যান্ট ছাড়ছে অতীন। শমি অতীনের নির্বিকার মুখ দেখে নিয়ে বলে—খাবে চলো।

অতীন দুটো প্রশ্নের একসাথে জবাব দেয়,—না ট্রেন গণ্ডগোল। মিটিং-এ খেয়ে এসেছি।

শমি লক্ষ্য করলো অতীনের চোখ মুখ আজও রুক্ষ। ঘুমে ঢুল ঢুল। বিলকে আদর করলো না।

শমি আহত হ'লো। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে অতীন ঢুকে গেল বিছানায়। বিলকে টেনে নিল বুকের ভিতরে!

বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো শুয়ে থাকা মানুষটির দিকে। শমির চোখ গেল খাটের মাথায়; দেওয়ালে রাখা স্তালিনের ছবি। ছবির ফ্রেমে অতীনের হস্তাক্ষরে লেখা– কমরেড স্তালিন, তুমি সুখে নিদ্রা যাও/রাত শেষ হয়ে এল,/দাও/ এবার আমরা রাত জাগি।

শমি চোখ নামিয়ে নেয় নীচে মানুষটির দিকে। অলস ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া মানুষটিকে দেখলে মায়া হয়। সে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় খাটের কাছে। হাঁটতে গিয়ে বুঝতে পারে, সে একটা দীর্ঘ সময় স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। মশারি উঁচু ক'রে স্বামীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। লোকটা বেহুঁশ পড়ে থাকে।

সে একটা রাত, তার স্বামী প্রোজ্জ্বল মুখে বাড়ি ফিরেছিলো। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তার স্বামীর দল।

একটা দীর্ঘ কর্মক্লান্তি অবসাদে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলো অতীন। শমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। স্তালিনের ছবির দিকে নিস্পলক চেয়ে অতীন বলেছিলো, দুরন্ত জীবনের একটা আধ্যায় শেষ হ'লো। শমি রেডিওর উন্মুখ শ্রোতা ছিলো সারাদিন। সে শুনেছিলো, তাই স্বামীর মুখের দিকে আগ্রহে চেয়ে চুলে বিলি কাটছিলো।

অতীন তারপর বলেছিলো—একটা বিশাল মুক্তি ডানা মেলে দিলো। শমি খুশির আতিশয্যে বলেছিলো,—এই মুক্তি তোমার আমার খোকার সবার সব্বাইয়ের তাই বলো গো। অতীন বলেছিলো—আমাদের হাতের মুঠোয় একটা দুরন্ত জীবন, চোখে একটা বিশাল মুক্তি, খোকা হবে উত্তরাধিকার। শমি দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখে। বেহুঁশ লোকটার ঘুম ভেঙে যাবে এই আশঙ্কায় নয়। খোকার অমঙ্গল হবে এই ভয়ে। ঘুমন্ত বিলকে শমি বুকের উপর তুলে নেয়। বিল বড় হয়েছে। সে আর সামলাতে পারে না, তার কষ্ট হয়। সে মশারি নামিয়ে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ায়। শোয়ার ঘর থেকে রান্না ঘরে যাওয়ার পথটুকু আজ রাতে অনন্ত দীর্ঘ। মনে হয় সে শরশয্যায় ভীষ্মের চেয়ে নি:সঙ্গ একা। অতীন প্রথম ক্লান্ত হয়ে ফিরছে না। আসলে সে কেমন হয়ে যাচ্ছে। বিল যখন ছোট্ট ছিলো, অতীন ফিরলে, বাড়িতে উৎসব বলে মনে হত। দল ক্ষমতায় আসার পর ও নেতা হয়ে গেল। মিছিলে একরকম যায়-ই না। মিটিং-টিটিং একটু বেশি করতে হয়। বক্তৃতা করতে হয়। কিন্তু পরিশ্রম কমে গেছে। তবু মানুষটা কেমন স্থবির হয়ে যাচ্ছে, কেন? কতোই বা বয়স হলো। স্বননের বয়সী হবে।

স্বননের রাজনৈতিক জীবন দেখে শমি ভেবেছিলো, স্বামীর ঘর কষ্টের কিন্তু সুখের হবে। তা হয়নি। বাবার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। অতীন বাড়ি করছে। সেদিন, সে, বিল আর অতীন গিয়েছিলো, বাড়ি দেখতে। পূর্ব খোলা, দক্ষিণদুয়োরি বাড়ি। চারখানা

প্রমাণ ঘর, রান্না ঘর, বাথরুম, সামনে টানা বারান্দা।

অতীন বলেছিলো, বারান্দাটা বেশ বড়, এখানেই মিটিং ডাকা যায়। কী বলো?

শমি হেসেছিলো। নিঃশব্দ হাসি। বাড়ি দেখতে গিয়ে কেমন কষ্ট হচ্ছিলো। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা। হিসেবে কোথায় যেন গরমিল। কোথায় যেন রুদ্ধশ্বাস ব্যথা।

—বিল, এ্যাই বিল, চোখ তাকা।

বিল ঘুমে ঢুলছে। শমি বিলের শরীর ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

—এ্যাই দ্যাখ, মেটে। হাঁ—হাঁ—হাঁ কর বাবা।

শমি নিজে হাঁ করে। বিল, চোখ বন্ধ করে বলে—ঝাল, উঃ, বাবু কৈ, আমি খাবো না।

শমি অন্যমনস্ক হয়।

অতীন বলেছিলো– মিটিং-এর জন্য রোজ রাত হয়।

শমি ফের হেসেছিলো। মিটিং পার্টিঅফিস ছেড়ে ঘরপানে ধাওয়া করছে! অতীন শমির মনের কথা পড়তে পারেনি। বলেছিলো, দ্যাখ্যো, কী সুন্দর মাঠটা, ইজিচেয়ারটা নিয়ে সকালবিকেল বসা যাবে!

বুকের ভিতরে কান্না ডুকরে ওঠে।

বিল কাঁদে, উঃ, কী ঝাল। আমি খাবো না।

শমি নিজেকে সামলে নেয়। —এটুকু ঝাল খেতে পারিসনে, একেবারে ননীর পুতুল হয়ে গেলি বাবা।

—বাবু কৈ, আমি বাবুর কাছে শোব।

—এই, হয়ে গেছে বাবা আর একগাল।

—আমি আর খাবো না।

বিল মায়ের কোলে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে।

আধ-খাওয়া থালা সামনে নিয়ে শমি স্থির বসে থাকে। বাঁ হাতখানা বিলের মাথায়। এঁটো হাতখানা হাঁটুর উপর। শমি আনমনা। বিল বড় হয়ে কি বাবার মতো হবে? অন্তরাত্মা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। না না, এ তো সে চায় নি। এই বাড়ি, এত আদর, এই স্বচ্ছলতা। এ তো সে চায়নি। স্বপ্ন ছিলো একটা দুরন্ত জীবন, একটা বিশাল মুক্তি, চোখের পাতা দুটো অকস্মাৎ পরিপূর্ণ খুলেই আবার নুয়ে পড়ে চোখের অবিচল ভাঁজে।

নীল মশারির ভিতর মানুষটা ঘুমুচ্ছে, আসাড় নিস্পন্দ।

রাত কতো হলো?

শমি জানে না।

স্বনন এলো না।

'আমি তোমাদের কাছে আর যাবো না, কোনদিন ফিরবো না'। জেলখানা থেকে পাঠানো চিঠিখানায় স্বনন লিখেছিলো, বারবার মনে পড়ছে। ফিরে ফিরে মনে পড়ছে।

সে লিখেছিলো :

আমি এখন অন্ধকারের প্রাণী। সে খুপরি শুয়োরের খোঁয়াড়ের চেয়েও স্যাঁৎসেতে, বহুকালের নোংরা পেচ্ছাবখানার চেয়ে দুর্গন্ধময়, সেখানে আমাকে রাখা হয়েছে। কতোদিন আছি জানিনে। অন্ধকার শুধু অন্ধকার। ছারপোকো, ছুঁচো, ইঁদুরের ছুটোছুটি। নখের আঁচড়ে আর কামড়ে কামড়ে সারা শরীর ঘা হয়ে গেছে।

জানিনে শমি, আর কতোকাল এইভাবে বেঁচে থাকতে হবে। একদিন পায়খানা যাওয়ার পথে আবিষ্কার ক'রলাম, দিনের আলোয় অন্ধকার-বৃত্ত দেখছি, কিন্তু অন্ধকারে বেশ দেখি। বুঝলাম দিনকানা হয়ে গেছি। এ পোড়া চোখে তোমাদের আর দেখতে পাবো না।...

শমি এইপর্যন্ত পড়ে প্রথমদিন হাউমাউ ক'রে কেঁদেছিলো। বিল তখন পেটে। গাঁয়ের লোক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলো : কী ব্যাপার? কেউ রা কাড়ে নি।

অতীন বোসের বৌ বলে কথা।

গাঁয়ের মানুষ ভুলে গেছিলো, স্বনন নামক যুবকটির কথা।

শমির সে কান্না কেউ শোনেনি।

একা সে কেঁদেছিলো। আজও সে যন্ত্রণাদগ্ধ একা।

ঘুমন্ত ছেলে কোলে শমি কাঁদছে।

সেইদিন থেকে সে কাঁদে। গোপনে। কেউ জানে না। চিঠিটা পড়তে পড়তে চিঠির প্রত্যেকটি লাইন, প্রত্যেকটি শব্দ, দাঁড়ি, কমা মুখস্থ হয়ে গেছে। অন্তরাত্মায় মিশে প্রত্যেকটি লাইন যন্ত্রণা হয়ে অসম্ভব বিস্তার লাভ করেছে। স্বননের ছবিও যেন বিলুপ্ত হয়েছে। তার ভাবনা, চিন্তার বিশাল পরিধি জুড়ে একটি চিঠি। প্রত্যেকটি শব্দ অর্থবহ, চিত্রময়, ভীষণ ভীষণ জীবন্ত হয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে তার অর্ধভুক্ত জীবন।

... এখন, মাঝে মধ্যেই আমাকে ক্রস করার জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয় কড়িকাঠে। তখন আমার হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা থাকে আর বগলের নীচ দিয়ে ঢোকানো থাকে মোটা লোহার রড। এই লোহার রডে ঝুলন্ত অবস্থায় মাঝে মধ্যে খাকি রং-এর খগেনরা এসে খোঁচা মেরে দুলিয়ে দেয়। মজা লোটে। কখনও মাইকের মতো গনগনে মেকি আওয়াজে কখনও অমায়িকের মতো ভালোবাসার কথা বলে।

গোপনে খবর পেয়েছি এ রকম ঝুলন্ত অবস্থায় কাল আমাদের কমরেড গোকুল নাগ মারা গেছে। লাল সেলাম। আমি এতোদিন মারা যেতাম। যদি না অচিন কোনো কমরেড

আমার সামনের দেওয়ালে মহান নেতা মাও-সে-তুঙের ছবি এঁকে রাখত।

আমার সমস্ত যন্ত্রণা কষ্ট অত্যাচার ওই মহান শিক্ষকটির ছবির ভিতর পাঠিয়ে চোখ বুজে ঝুলে থাকি।

তবে বায়োলজিকাল অর্গানগুলো হয়তো আর টিকবে না। এক্সপায়ার করে যাবে।

শমি, আর দু-একদিনের মধ্যে হয়তো আমি মারা যাবো। আমি তোমাদের কাছে আর যাবো না। কোনোদিন ফিরবো না।

শব্দহীন অশ্রু অনর্গল গড়িয়ে যায় শমির দুচোখ বেয়ে।

বিল এঁটোমুখে ঘুমে অচেতন।

শমির হাতের এঁটো হাতে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

শোবার ঘরে অতীন নীল মশারির টোপে ঘুমুচ্ছে।

স্বনন মারা গেছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু বিল, বিলকে তো বাঁচাতেই হবে।

একটা দুরন্ত জীবন।

একটা বিশাল মুক্তি!

শমি বিলের চুলে হাত বুলোতে বুলোতে ডাকে—বিল বিল, ওঠ বাবা, আর খেয়ে কাজ নেই।

বিল ধড়মড় করে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে মায়ের মুখে।

শমি বলে—চল্ বাবা।

শমি উঠে দাঁড়ায়। বিলকে তুলে ধরে।

বলে, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নে, আমাদের যেতে হবে।

বিল আড়ষ্ট ঘুমচোখে মায়ের মুখের দিকে তাকায়।

—কোথায়? বাঘমামার কাছে?

শমি অশ্রুরুক্ষ চোখ তুলে তাকায় বিলের দিকে। হাতের মুঠোয় শাড়ির আঁচল তুলে নিয়ে সুদীর্ঘ চোখের জলের শুকনো স্রোতরেখা নিশ্চিহ্ন করে দেয় আঙুলের চাপে। আর যা কিছু সহ্য হয় হোক, কিন্তু এই অথর্ব নিঃসহায় চোখের জলের ভার সে কিছুতেই সইবে না।

পরাজিত, মৃত, দিগচিহ্নহীন ভালোবাসার কোলে এই কচি সম্ভাবনাময় খোকার প্রতি স্নেহকে সে তুলে দিয়ে যেতে পারবে না।

শুকনো কাপড়ের রগড়ানিতে চোখের নীচের চামড়া হু হু করে জ্বলে যাচ্ছে। তবু বিলের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়ে সে একটু কঠিন স্বরে উত্তর দিল, না।

না। কিন্তু কোথায়? শমির মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রী লাফিয়ে ছুটে গেল এক অন্ধকার, বর্ণহীন, রাত্রির পর্দায়।

তখনও শব্দহীন সিঁড়ি জীবন্ত হয়ে ওঠার অপেক্ষায় জেগে আছে।

চটি

স্ট্রাইক। খাঁ খাঁ করছে শহর। বন্ধ দোকানগুলোর পাড় বেয়ে যে লোকটা হন হন করে হেঁটে আসছিল, মুখ তুললেই তাকে চেনা যেত। সে কারো বাপের শ্রাদ্ধশান্তির মন্ত্র প্রায় চেঁচিয়ে জপতে জপতে আসছে। তার দু-এক টুকরো ছিটকে যাচ্ছিল রামকিংকরের কানে।

—শালা, শুয়োরের পাল, ঘরে ভাই-বোন নাই! তাদের পেটাতে পারিস নে।

আঃ—ছ্যাঃ- ছ্যাঃ ছ্যাঃ হাতি হাতি। বুনো মোষ তাড়ানের পালও বলিহারি, হুঁস ছিল না তোমাদের, হাটের বাজারটা মাটি করে দিলি।

—বলি, ও রামকিংকর—

রামকিংকর চমকে উঠে।

—তোমার বলদটা ফিরেছে? শুনেছ, কানাই পালের ছেলের মাথা ফেটেছে! ঢোল-সারাইয়ের গলিতে পড়েছিল মুখ থুবড়ে! জানোয়ার, জানোয়ার, সব শুয়োরের পাল। এইরকম মার মানুষ মারে! হাসপাতালে দেখে এলাম।

রামকিংকর শিউরে ওঠে। মুখ তোলে। কোনো উত্তর দেয় না। উত্তর না পেয়ে সে ঠোঁট ওল্টায়, কে জানে বাবা, কীভাব! একটু দাঁড়ায়, যে দিকে যাচ্ছিল সে দিকেরই পথ ধরে।

—বলদ—বলদ সব—খেটে তো খেতে হয় না।

—রাম কিংকর দেখল বিশ্বম্ভর চলে যাচ্ছে। হাঁটুর উপর কাপড় তোলা। চটির শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। যতদূর চোখ যায় রামকিংকর দেখল— একসময় নিজেকেই বলে উঠল : উচ্ছন্নে যাক সব উচ্ছন্নে যাক, বেচে বিলিয়ে আমিও একদিকে চলে যাবো। তার চোখের সামনে বকাটে বিশ্বম্ভর ক্রমাগত ছোট হতে হতে রাস্তার বাঁকে হারিয়ে গেল।

রামকিংকর একা।

নিজের দোতলা বাড়ির সামনের ফুটপাতে সে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া তাকে ঢেকে রাখলে কি হয়, বুকের ভিতরটা চ্যালাকাঠের মতো জ্বলছে। চোখদুটো সামনে স্থির। রাস্তা

ফাঁকা। জন-মনিষ্যি নাই—ধুধু।

রামকিংকর এক-পা দু-পা করে চলতে শুরু করলো।

শহর থেকে রোদ্দুর ফুরিয়ে গেছে। দীর্ঘ বিলম্বিত ছায়াগুলি শুয়ে পড়তে পড়তে পা দুটোকে জড়িয়ে ধরেছে। আর কেউ নেই। নিরম্বু পথে একজোড়া চটির শংকিত পদযাত্রী রামকিংকরকে তাড়া দিচ্ছে। সে চটপট পদক্ষেপে চলল। দূর থেকে সাইরেন বাজাতে বাজাতে ঝাঁ করে একটা পুলিশভ্যান বেরিয়ে গেল।

রামকিংকরের কান মাথা ঝালাপালা করে উঠলো। নিঝুম শ্মশানঘাটে নেড়িকুত্তার শাসনের মতো পুলিশভ্যানটা তর্জন করে চলে গেল। যতদূর দেখা গেল উদোম শহর, যূথচারী ছায়ার নীরব সঞ্চরণ। রামকিংকর আবার শব্দহীন হ'ল।

একা।

কেবল নিজের চটির ফটর-ফটর কানে বাজছে। বাজছে তো বেসামাল ভাবেই বাজছে। জুতোর ব্যবসাদার রামকিংকর, বিশবছর জুতোর বাজনা বাজাতে বাজাতে, শুনতে-শুনতে আজই প্রথম কেঁপে উঠল।

কাঁপুনিটা বুকের থেকে গড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে পৌঁছে গেল।

পা-জোড়া যেন ভারি-ভারি ঠেকছে!

পায়ের পাতা কি কেঁপে উঠলো! চটির ভিতরে!

আনজানে একজোড়া চটির আওয়াজ তাকে বয়ে নিয়ে চল্লো।

একটা মাছি জ্বালাচ্ছে। কোত্থেকে উড়ে এসে তার লোমশ হাতে বসছে।

উড়ে এসে আবার বসছে। মনস্কতা বারবার ছিঁড়ে গেল। রামকিংকর দাঁড়ালো। মাছিটা যেন হাত ধরে টানছে। সে খেয়াল করলো, মাছিটা উড়ে নীচে গেল। নীচে পথের উপর একঝলক রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেছে। মাছিটা সেখানে বসলো।

বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। রামকিংকর বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তরল অবস্থায় রক্ত গড়িয়ে অদ্ভুত আকৃতি ধরেছে। এইখানে লাঠি পড়েছে। রক্ত ঝরেছে।

গড়িয়ে নেমেছে পথে যেন অনাবিষ্কৃত কোনো দেশের মানচিত্র এঁকেছে। স্কুল-কলেজের ভাব ভাষায় তার ছেলেকে মানায়। তার মন কেন উদাস হল। নিজের ভিতরে নিজেই অবাক হলো। আস্তে আস্তে সামনে উবু হ'য়ে বসলো। মনটা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে।

—যত উদ্দণ্ডই হোক, যত বখেই যাক, নিজের ছেলে তো। স্মৃতির পাতাল-পুরীর কোন নিঃশব্দ স্রোতস্বিনী থেকে মন্থনজাত কিছু স্নেহ উঠে আসছে। নচেৎ যে রক্ত জমে শুকিয়ে গেছে, কোন শুকনো ট্যান-করা ঠিক চামড়ার রং। জানোয়ারের গা থেকে চামড়া টেনে ছাড়িয়ে নিলে এরকম মানচিত্র হতে পারতো।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। যেন পেরেক পুঁততে গিয়ে দেওয়ালের গা থেকে খানিকটা পলেস্তারা খসে পড়লো।

সন্ধ্যা এলো ভিড় করে। ছায়া ঘননিবিড় হলো। রামকিংকর ভয়শংকিত চোখ পেতে রাখে পথের উপর! অদূরে কয়েকজোড়া ক্ষত-অক্ষত চটি-জুতো সন্ধ্যার অন্ধকারে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে।

একটি সাইডব্যাগ, একটা ছেঁড়া তুষ-চাদর, তাদের ছোট্ট ছোট্ট ছায়াগুলি রামকিংকরের ছায়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। রামকিংকরের মনে হলো, বিক্ষিপ্ত অন্ধকার মাখা ছিন্ন বস্তুগুলির মতো কেউ বা কারা তাকেও ফেলে গেছে। লাঠি কিংবা গুলির আঘাতে ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে তারা।

এ এক শ্মশানভূমি।

দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা গলিয়ে পথের উপর ঝুঁকে পড়ে রামকিংকর। রক্তের গন্ধ, রক্তের রং, তার ঘনত্ব, তার পরিচয় খুঁজছিলো। স্নেহবশত খুব আদর করে দুটি হাতের আকুতি দিয়ে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিলো রক্তের গায়ে।

কতকাল যে তার ছেলেকে আদর করেনি, খোঁজ নেয়নি। মা-হারা ছেলেটা কোথায় থাকে, কোথায় খায়। সে খোঁজ রাখে না। তার দোষের অপরাধের অন্ত নেই।

সে রক্তের অন্তর্গত স্পর্শ মেখে নিতে চাইছে, চিনতে চাইছে। সে ভুলে গেছে, এই রক্ত থেকে কিছুতেই তার ছেলের পরিচয় পাওয়া যাবে না। খোঁজ মিলবে না। ছেলেটা হারিয়ে গেছে।

বখাটে ছেলেটার জন্য বুকটা দু'দিন খালি হয়ে আছে। বুকের অন্দর-বাহির খাঁ-খাঁ করে।

খোঁজ নেই। খোঁজ নেই।

সে খুঁজে পেল একটি সুদীর্ঘ চুল। কোন মেয়ের হবে! ঢেউ-খেলানো। চুলটি রক্তের গায়ে লেপটে ছিলো, এখন রামকিংকরের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মধ্যে ধরা পড়ে কাঁপছে।

অন্ধকার ঘনতর হলে, ছেঁড়া তুষ চাদরটায় বিক্ষিপ্ত চটি জুতোগুলি, ব্যাগখানি, বইয়ের কয়েকটি ছেঁড়া পাতা ও লিফলেট, একটি চশমার ভাঙা ডাঁটি বেঁধে নিয়ে রামকিংকর বাড়ির পথ ধরলো।

শহরে আলো নেই। নিকষ-অন্ধকারে কালো বোঁচকা কাঁধে ফেলে দীর্ঘদেহী রামকিংকর স্থবির পায়ে আসছিলো। বাড়ির দোরগোড়ায় কেউ নড়ে উঠলো।

রামকিংকর অবাক হলো।

সে জিজ্ঞেস করলো—কী হে কোন খোঁজ খবর পেলে?

রামকিংকর কোন উত্তর দিলে না।

—অকর্মার ধাড়ি কাজকর্মে ভাস্যি নাই। জ্বালিয়ে খাবে। রামকিংকর সোজা এগিয়ে যায়। চুপচাপ।

—বলি থানায় কি হাসপাতালে একটা খবর নিয়েছ? মানুষটা, নিঃশব্দ অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে সরে দাঁড়ায়। রামকিংকর বোঁচকাটিকে কাঁধে চেপে ধরে বাড়ি ঢুকলো।

লোকটি গলা বাড়িয়ে বলে—মিটিং মিছিলের সর্বনেশে ছেলে বাপের মন কি বুঝবে?

কথা শেষ হলো না। রামকিংকর ধীরে ধীরে তার মুখের উপর সদর দরজা বন্ধ করে দিলো।

লোকটি হতাশ স্বরে বলে ফেললো—যাচ্চলে, কাকে কী বলছি।

ফিরে যাওয়ার মুখে হেঁকে উঠলেন—শুধু ভেবো না রামকিংকর, কিছু করো, কিছু করো—

তারপর গজগজ করতে করতে লোকটা চলে গেল—আমাদেরও ব্যবসাপাতি আছে। ছেলেটার দুদিন পাত্তা নেই, একবার খোঁজ পর্যন্ত নিলে না। স্থবির চটি তখন দোতলার ঘরে ঢুকলো।

অন্ধকারে বোঁচকার ভার নামিয়ে দিলো মেঝেতে। আহা বলার কেউ নেই ঘরে।

একা রামকিংকর কুঁজো হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বোঁচকার দিকে। যার কেউ নেই সে অন্ধকার দেখলে সাহসী হয়। রামকিংকর দেশলাই খুঁজে হেরিকেন আর একটা বিড়ি ধরায়। কানা হেরিকেনের ঝাপসা আলোয় বিড়ির মুখে আগুন জ্বলছে নিভছে। রামকিংকরের ভুতুড়ে ছায়া মাখা ছবি পড়েছে সামনের আয়নায়।

হাত-পা বিছিয়ে বোঁচকার পাশে বসে আছে। কতকাল সে নিজেকে দেখেনি। ভাঙা গালে খোঁচা দাড়ি। কপালের দুই প্রান্তে টাক পড়েছে, কালো ভ্রূর নীচে চোখদুটো জ্বল-জ্বল করছে। রামকিংকর চোখ বন্ধ করে।

যার কেউ নেই, যার জন্য কেউ ভাবে না সে রামকিংকর। চোখদুটো সত্যিই জ্বলছে, যাকে বলে জ্বালা করছে।

বাঁ হাতের তালু দিয়ে ডলে খানিকটা জল বের করে দেয়। চোখের জলে হাতের তালু ভিজে গিয়ে রক্তের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

—কার রক্ত? এ খুন কার?

হাতের আংটিতে বাঁধা দীর্ঘ চুলটি বাতাসে কাঁপে। চোখদুটো খুব জ্বালা করছে।

কান্নার আগে হয়তো এরকম হয়। রামকিংকরের দুই হাতের তালু চোখের দিকে এগিয়ে যায়।

এই বাড়ির নীচের তলায় সাজান ব্যবসায়, 'শ্রীচরণকমলেষু' কোন কাজে লাগবে! কার

কাজে লাগবে!

নিয়ন আলোর নীচে, দোকানের গদিতে বসে কেবলই জুতোর মাপ কষেছে, হেঁকেছে—দেখি কুয়োভ্যাদিস তিন নম্বর!

—দেখছেন কি, চামড়ার কিছু বোঝেন, এটা কচি গরুর নরম চামড়ার মাল—সুতো আর জুতো চেনা বড় গুঁতো—দিচ্ছি নিয়ে যান। ছমাসের আগে ছিঁড়লে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন।

জুতোর মাপ আর পায়ের মাপ এক করতে-করতে কেটে গেছে অনেক বছর। অনেক বছর হ'লো খোয়া গেছে খোকার মুখ।

খোঁজ নেই মাত্র দুদিন।

খোকার ইদানীং মুখ রামকিংকর কিছুতে মনে করতে পারে না। একটা হারিয়ে যাওয়া মুখ বুকের মধ্যে হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাজার হাজার জুতোর বাক্সের মধ্যে একপাটি জুতো রামকিংকর খুঁজে পাচ্ছে না।

শহর জুড়ে লোডশেডিং।

বাড়িগুলো অন্ধকারে জমাট বেঁধে আস্ত হয়ে গেছে। তার দোতলায় একটি ফাঁপা ঘরে রামকিংকর চোখে রাত জ্বেলে জেগে আছে।

তার 'শ্রীচরণকমলেষু' আজ বন্ধ।

স্ট্রাইক। শহরের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা আজ অন্যত্র সংহত। স্তব্ধ শহর। বাসভাড়া, ট্রেনভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলনের মিছিলে লাঠিচালনার প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরবাসী সমস্ত দোকানপাট স্তব্ধ করে রেখেছে। বন্ধের ডাক দিয়েছে বাজার সমিতি।

রামকিংকর জুতো মাপছে।

এবার বোঁচকা থেকে একটি স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া হাওয়াই চটি বেরুলো। চটিটা ডান পায়ের। নোংরা। গোড়ালির বাঁ-দিকটা ক্ষয়ে-ক্ষয়ে সবুজ রং বেরিয়ে গেছে। প্রায় ফুটো হওয়ার জোগাড়।

সমস্ত হাওয়াই চটি প্রায় একই রকম। চেনা যায় না। বিফলতার দীর্ঘশ্বাস পড়ে চটির উপর। চটিটা তার বাঁদিকে জমা হয়।

কুড়ি বছর সে জুতোর ব্যবসা করে। শহরের প্রায় অর্ধেক জুতো চেনে। জুতো দেখে সে মানুষ চেনে।

আজ একটি মানুষকেও সে চিনতে পারছে না, এক এক করে জুতো বের করছে, আর হতাশ ভাবে জমছে তার বাঁ দিকে। ডাঁই হচ্ছে। পরাজয় জমা হচ্ছে। অপরিচয়ের আঘাত জমা হচ্ছে। বুক ভারি হয়ে উঠছে। এই জুতোগুলো আজ মিছিল করে গেছে তার দোকানের সামনে দিয়ে। তখন কত চঞ্চল, সুশৃঙ্খল ছিল, শব্দ-উল্লাস মুখর। এখন

এলোমোলো, স্থির মৃতের স্তূপের মতো জমে আছে বাঁদিকে, অথচ প্রত্যেকটি জুতো বুকের ভিতরে সযত্নে লুকিয়ে রেখে ছিলো প্রত্যেকটি পা, যেন শালপ্রাংশু দৃঢ়।

অসংখ্য পায়ের মিছিল ভেসে ওঠে তার চোখে।

প্রত্যেকটি কঠিন পা যেন জুতোর ভিতর থেকে ঋজু উঠে গেছে দেহের শাখা-প্রশাখা উদ্ধত হাতের ইস্পাত মুঠি পর্যন্ত। প্রত্যেক মুঠি যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিশান ওড়াচ্ছে। যেন অনাবিষ্কৃত কোন দেশের নাগরিকেরা। বুকের মধ্যে, স্মৃতির মধ্যে হাঁচড়-পাঁচড় করে, আর বোঁচকার ভিতরে জুতোর ভিড়ে হাতড়ায়।

কারা সে মিছিলের মানুষ।

সে বোঁচকা থেকে আর একটি চটি বের করে।

এটা মেয়েদের লাল চামড়ার চটি।

চোখ দুটি ছোট হয়। ভ্রূ নেমে আসে চোখের উপর। চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মণিদুটো স্থির দাঁড় করায় চটির উপর। এতদিনে মনে হলো– সুতো আর জুতো চেনা বড় গুঁতো।

স্মৃতির ভিতর লাল চামড়ার চটি এসে ভিড় করে। রামকিংকর ঝটিতি বোঁচকার মোড়ক খুলে ফ্যালে:

জোড়া নেই। যে গেছে, একটিই ফেলে গেছে।

দুখানাছোট্ট কচি পা। হাল্কা! শরীরের ভর লাগেনি যেন। চটিখানা নতুনই বলতে হয়।

ফর্সা নরম দুটো। সুগোল গোড়ালি, মাখনের মত রং! চোখে ভাসে। রামকিংকর ভাবে—কে কিনেছিল চটি জোড়া? কবে? কে, সে কে? মনে আসে না।

প্রস্ফুটিত ফুলের মতো একখানি পা যেন তার হাতে ধরা আছে। হাতে-বোনা নক্সাকাটা শায়ার লেশ দুলে ওঠে। গোড়ালির উপর দুলে ওঠে আকাশী রং বেনারসীর জরির পাড়।

মনে পড়েছে। হ্যাঁ মনে পড়েছে, সে মৃন্ময়ী। দীপংকরের মা। তার স্ত্রী। বিয়ে করা সদ্য নতুন বৌ, তার পা দুখানি, বিয়ের আলতারাঙা লজ্জারাঙা আড়ষ্ট পা দুখানি সেদিন...

মজাকি হাসির ছটায় রামকিংকরের কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। কানের লতি লাল হয়ে যায়, গরম বোধ হয়। কিন্তু আজ সে ভীত। এ চটির মাথায় খানিকটা রক্ত লেগে। কার চটি! অজানা অচেনা এক চটির আশঙ্কায় চোখ মুখে রক্তের প্রবল চাপ অনুভব করে।

এ কার রক্তপাত!

রামকিংকর স্থির হয়ে গেছে। যেন তার মাথায় লাঠির বাড়ি পড়েছে। সে কালিপড়া হেরিকেনের মতো বাইরে স্থির, আলোক শিখার মতো ভিতরে কাঁপুনিগ্রস্ত।

তার হাতের আংটিতে বাঁধা সুদীর্ঘ একটি চুল। অন্ধকারে দেখা যায় না। অনুভব করা যায়। রক্তমাখা। বুকের মধ্যে স্মৃতির ভিতরে হাঁচড়-পাঁচড় করে হাতড়ায়। ঝড়ের মধ্যে বৃষ্টির মতো লাঠি পড়েছে মিছিলে। উপর্যুপরি রাইফেলের আওয়াজ কানে এলো! রামকিংকর শুনেছে। দেখেছে দোতালায় দাঁড়িয়ে। পুলিশ লাঠি দিয়ে জানোয়ার-পেটান পেটাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। পা থেকে জুতো, কাঁধ থেকে ব্যাগ, চোখ থেকে চশমা খুলে পড়ছে।

সে দেখল, লাঠি এসে পড়ল মেয়েটির মাথায়! কপালের একরাশ চুল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। মেয়েটির মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। মাথার চুল খুলে গেছে। রেশম-কালো চুল নেমে গেছে কোমর ছাড়িয়ে। রক্ত গড়িয়ে পড়লো তার সাদা শাড়ি বেয়ে। তার পায়ের কাছে চটিতে। রাস্তায়। শিউরে ওঠে রামকিংকর। পুলিশের লাঠির সামনে লুটিয়ে পড়লো মেয়েটি। আর্তনাদ তার কানে বাজছে।

না, কোনো মুখ তার মনে পড়ছে না।

হাতের মুঠোয় প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো চটিখানি কেঁপে উঠলো। আর্তনাদ বাজছে তার এক কানে। মজাকি হাসির ফেটে পড়া আনন্দ আর এক কানে। বাজছে তো বাজছেই। রামকিংকর সটান দাঁড়িয়ে যায়। আলোর নিকুচি করে, ঘরের ঘোর অন্ধকার কোণে গেল। সোখানে টেবিল আর ড্রয়ারের ঠোকাঠুকি শব্দ করতে করতে ঝনাৎ শব্দে একতোড়া চাবি বের করে ফেললো। একটা টর্চ জ্বলে উঠলো। টেবিলের গায়ে ঠেকানো বহুকালের আবলুশ কাঠের সিন্দুক। চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেলে। বিচিত্র শব্দেরা নড়ে ওঠে অন্ধকারের গভীর জুড়ে। যেন প্রাচীন কোনো হারিয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া হাসির করুণ বার্ধক্য কেঁদে ওঠে বৃদ্ধার কণ্ঠে। অন্ধকার নড়ে ওঠে সিন্দুকের গভীরে।

রামকিংকরের টর্চ এবং চোখের জ্যোতি কথা বলে সিন্দুকের প্রত্যেক কোটরে-কোটরে।

শংকিত নিশ্বাস বুকে শব্দ তুলছে।

সিন্দুকের কলজেপাঁজরা ওলোট-পালোট করে খুঁজলো রামকিংকর।

– না নেই! একটা ভারি নিশ্বাস সিন্দুকের ভিতরে ছুঁড়ে দেয়! খোলা পড়ে থাকে সিন্দুক।

রামকিংকর সমস্ত উদ্বেগ নিয়ে ফিরে আসে লাল রং-এর চটির কাছে! হাঁটু গেড়ে বসে। অভ্যস্ত সেই একই ভঙ্গি। অথচ এক করুণ আবেদন লুকিয়ে ছিলো বাড়িয়ে দেওয়া দুটি হাতের ভিতরে।

হাতের মুঠোয় আলতো করে ধরেছে সে চটিটা। যেন প্রস্ফুটিত একখানি পা। সে পা মৃন্ময়ীর!

– এইতো পেয়েছে। চোখ দুটো উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মজাকি হাসির ফেটে পড়া শব্দের স্পষ্ট আওয়াজ কানে আসে। লজ্জারাঙা আড়ষ্ট পা দুখানি মৃন্ময়ী সেদিন

ভুল করে জুতো সুদ্ধ তুলে দিয়েছিলো দুধে-আলতা ভরা কালো পাথরবাটিতে। বিয়ের আলতাছাপা পা! সেই অদ্ভুত প্রিয় রঙের জল-জল দাগ এখনও সবটা মুছে যায়নি। অভিজ্ঞ রামকিংকরের চোখে ধরা পড়ে।

একদিনই সে পরেছিলো এই চটিজোড়া, আর পরেনি!

— হ্যাঁ এই চটিই, জোড়ার একটা। এই তো ফিতের কাছে কাটা। তার মনে পড়ে, ঘোমটা টানা চন্দনের আলপনাঘেরা মুখখানি। ফুলশয্যার রাত্রি। রজনীগন্ধার মালা থেকে ছিঁড়ে একটি কলি ফুঠে আছে অলোক-চূর্ণে। রামকিংকর অপলক চেয়েছিলো তার সঙ্গিনীর দিকে। ভুল করে কোনো শিল্পীর মানসপ্রতিমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তার কাছে। মুগ্ধ রামকিংকর ইতস্তত করছিলো।

এত বেশি সুন্দর স্পর্শ করার অধিকার তার আছে তো! সে সমস্ত স্পর্শ বাঁচিয়ে রজনীগন্ধার কলিটি তুলে নিয়ে বলল—তোমাকে এই ফুলটির মতোই ছিঁড়ে ফেললাম।

মৃন্ময়ী মস্ত ডাগরচোখ লজ্জায় তুলে আবার নামিয়ে নেয়। সে ঘরের মেঝের দিকে চোখ রাখে।

ফুলশয্যার রাতে মৃন্ময়ী প্রথম কথা বলল।

অবাক রামকিংকর মৃন্ময়ীর দিকে তাকিয়ে ছিলো।

নিচু হয়ে মেঝে থেকে একপাটি চটি তুলে রামকিংকরকে দেখালো।

রামকিংকর হেসে ফেলেছিলো, বলল— তোমার বরের জুতোর দোকান। মৃন্ময়ী লজ্জায় মরমে মরে যাচ্ছিলো।

কণ্ঠস্বর শুকিয়ে এসেছিলো। বললে—না না এটা বিয়ের চটি, এক বছরের আগে ছিঁড়তে নেই। অমঙ্গল হয়। আমি তুলে রাখব।

রামকিংকর কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলেছিলো—কালই একজোড়া নতুন চটি এনে দেব। আর এই জোড়া তোলা থাকবে—তোমার পুত্রবধূর জন্য।

তারপর রামকিংকর শুধুমাত্র শুনেছিলো—ধ্যাৎ!

একদিনই সে পরেছিলো এই চটিজোড়া, আর পরেনি। রামকিংকর নিজে হাতে চটিজোড়া তুলে রেখেছিলো সিন্দুকে। দীপংকর ছাড়া ও খবর কেউ জানে না।

এই চটি নেমে গেল রাস্তায়, মিছিলে, কোন পথে, কার পায়ে?

নিঃস্ব রামকিংকর কঠিন পায়ে উঠে দাঁড়ায়। টর্চের আলো দ্রুত নেমে আসতে থাকে অন্ধকার সিঁড়িতে।

দিন-একদিন

—দেশের যত আপদবালাইগুলো আমার পেটে জন্মেছে।

বিছানায় কুকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে দিব্যেন্দু। ওর শোয়ার অভ্যেস খুব খারাপ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন লড়াই করে।

— হাত পা ধোয়া নেই, জামা প্যান্ট ছাড়া নেই ; নোংরার ঝোশেল।

মা ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন আর আপনমনে বকছেন। ঝাঁট সেরে, মা দাঁড়িয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। জানালার ফাঁক গলিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে মুখে। মুখখানা সরল, মায়াময়, এখনও জগৎসংসারের জটিলতার কোনো ছাপ পড়েনি। ঘুমের মধ্যেও কপালে তিনটে ভাঁজ পড়েছে। যতরাজ্যের চিন্তা যেন মাথায়। ঘুমিয়েও রেহাই নেই।

— বুড়ো বাপ আমার।

মা ঠোঁট টিপে হেসে, জানালার কপাটদুটো ঠেসে দিলেন। নড়ে উঠলো দিবু। মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন; দিবু যেন জেগেই ছিলো, পরিষ্কার গলায় রেগে উঠলো

— দিলে তো বারোটা বাজিয়ে।

— তোর আবার কি বারোটা বাজালাম!

মা মুখ ফেরালেন।

— যাও, যাও, ও তুমি বুঝবে না।

মা ভারি মুখ নিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন,

— বেলা আটটা বাজে। এখন ঘুমোয় শুয়োরগুলো।

দিব্যেন্দু নির্বিকার পাশ ফেরে। কাঁধের ব্যথা টনটন করে ওঠে। আর একটু হলে রক্তারক্তি হয়ে যেতো। পুলিশটা ভজগৌরাঙ্গের মতো যা হাত তুলেছিলো। উফ্!

রবীনদা কেমন আছে কে জানে? বিকেলে একবার হাসপাতালে যেতে হবে।

—ভাই ঘুমুচ্ছিস?

দিদি ভিজে কাপড়ে ঘরে ঢুকলো।

—না।

—একটু বাইরে যা না ভাই।

—কেন? দিব্যেন্দু পেছন ফিরে বললো—ও! তুই ও ঘরে যা, আমি উঠবো না।

—লক্ষ্মী সোনা, ভাই আমার পাঁচমিনিট। আটটা বাহান্ন ধরবো আজকে।

—তুই আমার একটা কথাও আজকাল শুনিসনে।

শিপ্রা হেসে দিব্যুর মাথায় একটা টুসকি দেয়।

—ও আমার বড়দা যে... দিবু, তোর ঘাড়ে কী হয়েছে রে?

—বিরক্ত করিস না দিদি, আজ ভোরের স্বপ্নটা মা নষ্ট করে দিলো।

—ইস, এ যে একেবারে কালসিটে পড়ে গেছে।

—ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। মা-টা কী যেন!

—কাল কোথায় মারামারি করেছিস সত্যি করে বল?

—বলছি তো কিছু হয়নি। কাল আমাদের মিছিল ছিলো, পুলিশ লাঠি চালিয়েছে।

—তুই আজকাল মিছিল করছিস দিবু?

—আজকাল কোথায়? শুধু কাল, রবীনদা কিছুতেই ছাড়লে না।

দিব্যেন্দু জানে, রবীনদার কথা বললে দিদি আর কিছু বলবে না। বুদ্ধি করে চালটা খাটিয়ে দিলো।

শিপ্রা একমুহূর্তের জন্য থেমে বললে— রাত্রে ডাকলি না কেন?

—তুই যা মোষের মতো ঘুমোস।

—যাঃ! বাজে কথা। কিছু লাগিয়েছিস?

—একটু অম্রুতাঞ্জন ডলে দিয়েছি।

—আজ কলেজে যেতে হবে না! গরম সেঁক করবি।

দিব্যেন্দু আদুরে গলায় বললে— দিদি, পাঁচটা টাকা দিবি?

—কেন?

—বিকেলে রবীনদাকে দেখতে যাবো।

দিদির শাড়ি পরার খসখস আওয়াজ থেমে গেলো। শিপ্রার উদ্বেগ লুকানো গম্ভীর গলা শোনা গেল—

—তোমাদের রবীনদা কোথায়?

—হাসপাতালে। কাল তো রবীনদার মাথা ফেটেছে।

—এ্যাঁ! ও। কি, অনেকটা?

—আমার তখন শসেমিরা অবস্থা। আমাকে কে দেখে!

তোর কাপড় পরা হলো?

— এ্যাঁ! হ্যাঁ। এই হলো। বিছানার নীচে আছে নিস-খন। দিদি চলে গেল। দিব্যেন্দু তবুও শুয়ে থাকলো। উঠতে ইচ্ছা করছে না। সমস্ত শরীর ভীষণ ভারি। জ্বর-টর এলো নাকি? দিব্যেন্দু শুয়ে শুয়ে জানালার নীচের কপাট খুলে দেয়। ঝাঁঝালো রোদ্দুরের ঝাঁক এসে চোখ মুখ পুড়িয়ে দিলো। তবু ভাল লাগে মৃদু উষ্ণতা। ইচ্ছা করে চোখ বুজে পড়ে থাকতে। রোদ্দুর এসে পড়েছে গায়ের চাদরে। মৃদু ওম, শরীরটাকে অবশ করে দিচ্ছে। আঃ! ঘুম ঘুম আসছে। যদি সেই স্বপ্নটা ফিরে আসতো!

স্বপ্ন দেখতে দিব্যেন্দুর খুব ভাল লাগে। ও সব স্বপ্নেরই নামকরণ করে। একটু ভেবে আজ ভোরের স্বপ্নটার নাম দিলো— 'জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।'

কেননা জ্যোৎস্না নয়। জ্যোৎস্নার মতো একধরনের আলো সবসময় ছড়িয়ে ছিলো। স্বপ্নের মধ্যে ছিলো মা, দিদি, পরিমল, দুঃখী বাবা আর রবীনদা, আরও যেন কারা কারা ছিলো। আর ছিলো, ধবধবে ফর্সা শ্বেতপাথরের বিশাল বিশাল সমস্ত বাড়ি। রাস্তাটাও ছিলো ফুটফুটে সাদা। সবাই মিলে কী যেন লুকোচুরি খেলছে। শুধু বাবা রাস্তার ধারে একটা বিশাল বাড়ির আবছা অন্ধকারে বসে সারাক্ষণ বন্দুকের নল পরিষ্কার করছিলেন, কে জানে এর মানে কী? মা দূর থেকে ডাকছেন— খোকা, খোকা—

গায়ে কার ছোঁয়া লাগতে দিব্যেন্দু চোখ মেলে তাকায়। মা কপালে হাত রেখেছেন। —এ কি গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। খোকা কৈ দেখি কী হয়েছে তোর?

— তুমি খুব জ্বালাতন করছো। দু-দুবার স্বপ্নটা ম্যাসাকার করে দিলে।

পাশের ঘর থেকে বাবার বকুনি শুনতে পেলো দিব্যেন্দু।

— ও ছেলে মরণের পথে পা বাড়িয়েছে।

চুপ করে গেল সে। এই ক'দিনে বাবা কেমন হয়ে গেছেন।

মা প্রায় চীৎকার করে বললেন — শিপ্রা, বেরুবার আগে এক-বালতি জল দিয়ে যাস তো—মা।

মা দিব্যেন্দুর মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

শিপ্রা এক-বালতি জল ঘরের মধ্যে রেখে, দিব্যেন্দুর গায়ে হাত রাখলো। দিব্যেন্দুর অস্বস্তি হয়।

শিপ্রা যাওয়ার সময় বলে গেলো— ভাইকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেও।

দিব্যেন্দু ফিসফিস করে বললো— আমি যাবো না।

সে জানে তাদের সংসার এখন কষ্টে চলছে। বাবার চাকরি গেছে। লক আউট হয়েছে

কোম্পানিতে। ভাগ্যিস দিদি মাস্টারি পেয়েছে। দিদিটা তার লক্ষ্মীসোনা দিদি। দিদি চলে যাচ্ছে। চটির আওয়াজ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলে, একটা নি:সঙ্গ অসহায় বোধ জড়িয়ে ধরতে সে মায়ের কোলে মাথা গুঁজে দিলো। চোখ বুজেও দেখতে পেলো, দিদির তক্তোপোষ, শূন্য বিছানা পড়ে আছে। দিদি অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। মার হাতের ঠান্ডা জল তার মাথা, কপালে গড়িয়ে শব্দ তুলে বালতির জলে নামছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে, শিপ্রা স্কুলে যেতে পারলো না। রবীনের বাসার দিকে রওনা দিলো। রবীন এখানে একা থাকে, আত্মীয়-পরিজন এদেশে কেউ নেই। থাকে এক কমরেড বন্ধুর সঙ্গে। পরিমল। সে দিব্যুর বয়সী। একই সাথে কলেজে পড়ে। শিপ্রা কড়া নাড়লে সেই দরজা খুলে দিলো।

বললে— দিদি যে, ভারতবর্ষ কি অবস্থান পাল্টিয়েছে?

ঘরের মধ্যে ঢুকে শিপ্রা জিজ্ঞেস করলো— কেন?

— না, মানে এই চাকরি করা দিদিরা হঠাৎ বেকার ভাইদের বাড়িতে চলে আসছে।

শিপ্রা রবীনের ফাঁকা বিছানায় বসে বললে— এই তোমদের কুটনো কোটা দেখতে... কী যে কর তোমরা!

পরিমল বঁটি পেতে আলু ছাড়াচ্ছিল, ফের বঁটিতে বসে বললে —প্রয়োজন ছাড়া আমাদের কাছে কাজের কোনও ক্লাস নেই।

শিপ্রা একটু অসহিষ্ণু গলায় বললো—তোমরা কি বইয়ের ভাষা ছাড়া কথা বলতে পারো না।

— কৈ কোথায় বইয়ের ভাষা বললাম।

— এই, ভারতবর্ষ, কাজের ক্লাস, এগুলো কী?

— কেন আমি কী বলছি আপনি বুঝতে পারছেন না?

— তোমাদের কথায় কথায় তর্ক। সবসময় জিততে চাও। বড়ো যদি হতে চাও ছোট হও আগে।

— এ আপনার বৈষ্ণবীয় মতবাদ।

— উফ তোমাদের জ্ঞানের ঠেলায় প্রাণ পালাবে। সরো, সরো দেখি, ছেলেরা চোখের সামনে কুটনো কুটবে, এ সহ্য হয় না।

শিপ্রা পরিমলকে হাত ধরে তুলে দিলো। — পারো যদি স্টোভটা ধরাও। রবীনের খবর কি?

— দিব্যেন্দু যা জানে, আমিও তাই। নতুন কোনও খবর নেই। পরিমল ভাল ছেলে। স্টোভ ধরাতে লেগে গেছে। দিব্যেন্দু হলে বলতই বলতো— পারবো না, তুই ধরা।

পরিমলও যদি একই কথা বলতো! তার উপর পরিমলের অধিকার দিব্যেন্দুর চেয়ে কি কম? তা তো নয়। তবু বলে না। বললে একধরনের ভাল লাগে। রবীন, পরিমল এরা নিজেদের কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না। শিপ্রা দেখলো ঘরের দরজা খোলা। রাস্তা দেখা যাচ্ছে। সে বললো— পরিমল দরজাটা বন্ধ করে দাও।

— না, আমি একবার মুদিখানায় যাবো।

— চা-ফা আনতে হবে না। বাঙালদের ঐ এক মরণ— খাবার খাইয়ে আতিথেয়তা।

পরিমলের স্টোভ ধরানো হয়ে গেছে। বললে— বাঙাল নয়, স্ত্রী অর্থে বাঙালিদের। জল চাপিয়ে গেলাম। দু'জনের মতো দুবেলার চাল হাঁড়িতে চাপিয়ে দেবেন। আমি যাবো আর আসবো।

— আর একজন কে?

— একজন হাসপাতালে। আর একজন আপনি।

শিপ্রা রুক্ষস্বরে বললে— ধন্যবাদ।

পরিমলও যাওয়ার মুখে গম্ভীরভাবে বলে গেলো—অবস্থা, খুব একটা ভালো না। হয়তো রাত্রে থাকতে হবে। আপনি যেমন পরের বাড়ি অনর্থক খাওয়া পছন্দ করেন না, আমিও করি না, কিন্তু অপ্রয়োজনে ধন্যবাদও গ্রাহ্য করি না।

যাওয়ার মুখে দরজা ভেজিয়ে গেলো। শিপ্রা একা। কয়েক মুহূর্ত সে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। সুযোগ পেয়ে ছেলেটা বলে গেলো— পরের বাড়ি। সে তো জানে, রবীন তার কতখানি। ব্যথায় বুকটা মুচড়ে উঠলো। দিব্যেন্দুও যেমন, এরাও তেমনি। কেউ কিচ্ছু বলবে না। অথচ উচিত-অনুচিত বোধও তীব্র। কাল রাতে-ই আসা উচিত ছিলো। ছিঃ ছিঃ কার অবস্থা ভাল না। রবীনের, না আর কারো। সমস্ত কমরেডের কাছে সমস্ত কমরেডই সমান আপন। সে কিছুই বুঝতে পারলো না। শুধু এক অজানা আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠলো। এরা সবাই কেমন করে ভাবে শিপ্রা বুঝতে পারে না। জল ফুটে যাচ্ছে। কাঁপা কাঁপা হাতে সে আলু ছাড়াতে লাগলো। স্বপ্ন দেখতে সে ভালোবাসে না।

কিন্তু মনে পড়ছে—

— শিপ্রা!

— উঃ

— কাল একটা স্বপ্ন দেখেছি। ভাবি, তোমাকে ছুঁয়ে গেলেই রাত্রে স্বপ্ন দেখি;— রহস্যময় হাসি হাসলো রবীন।

— আমি কি তোমার স্বপ্নের সুইচ নাকি?

– না, না, ইয়ার্কি নয়। সত্যি, সত্যি। একটা অচেনা শহর। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। মাথার উপরে তারা, নিচে মিলিটারি গিজগিজ করছে, আমরা ক'জন কমরেড বাড়িগুলোর ছাদে গেরিলা কায়দায় বন্দুক নিয়ে...

—ভাবলাম, আমি তোমার স্বপ্নকা-রানি হয়ে আকাশপথে ...

– যাঃ সিরিয়াস বিষয়ে তুমি এত বাগড়া দাও। তোমার সাথে কথা বলা যায় না।

– আমাদের দিবু উনি আবার গুরুদেবের চেয়ে এককাঠি সরেস, স্বপ্নের নামকরণ করেন।

রবীন এবার গম্ভীর হলো। তার জেদি মুখখানা শিপ্রার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই-রকম রাগিয়ে দিলে ওর চোখ দুটো ছোট আর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

– দুঃখী মানুষের স্বপ্নই সম্পদ, দেখাও উচিত।

– কারণ স্বপ্ন দেখতে টিকিটও কাটতে হয় না। হাউসফুলও হয় না।

– যাঃ তুমি মেজাজটাই বিগড়ে দিলে।

– চলো না একটা সিনেমা দেখি।

– না। না। আমার...

– থাক তোমার দেশ উদ্ধারের ফিরিস্তি। যাবে কি না?

– না।

তোমরা মানুষের মনটা বোঝ না। অষ্টক্ষণ সিরিয়াস। লেকচার শোনাতে পারলে বেঁচে যাও।

শিপ্রার চোখ ছলছল করে ওঠে? বুকের কাছটা ভারি মনে হয়। কষ্টে ভরে যায়।

দরজাখোলার শব্দে শিপ্রা চমকে ওঠে। পরিমল ঘরে ঢোকে!

শিপ্রা আনাজের ঝুড়ি থেকে একটা পেঁয়াজ তুলে নেয়।

পরিমল স্টোভের কাছে গিয়ে বললে দিদি, মনখারাপ করে বসে থাকা কঠিন কাজ নয়। দুঃখবোধ থাকলে এদেশে হাওয়া বাতাসেও কান্না পাবে।

পরিমল চাল ধুয়ে হাঁড়িতে দেয়। শিপ্রা পেঁয়াজ কাটতে থাকে। কথার উত্তর দেয় না।

পরিমল জিজ্ঞেস করে– দিব্যেন্দু কেমন আছে?

– জ্বর।

– ওর কাঁধে লেগেছিলো, ওষুধ নিয়েছে কিছু?

পরিমলের কথা-বার্তায় শিপ্রা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলো। বললে– অন্তত সকালেও একবার আমাদের বাড়ি যেতে পারতে।

পরিমল শিপ্রার মুখের দিকে তাকায়। দিদি মুখ নিচু করে আছে। পরিমল দিদির খুব

কাছে এগিয়ে এসে বাবু হয়ে বসে পড়লো। এত কাছে যে শিপ্রা হাসপাতালের গন্ধ পেলো পরিমলের গা থেকে। পরিমল বললে– আমার তো দিদি নেই, দিব্যেন্দুর মতো। পরিমলের গলা আবেগে একটু ভারী মনে হলো। শিপ্রা চোখ তুলে তাকালো পরিমলের মুখে। মুহূর্তে একটা কষ্টের ছাপ পরিমলের মুখ থেকে ছায়ার মতো সরে গেল।

– আমারও একটা দিদি আছে, বাংলাদেশে। সে হলে, প্রথমে এসে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করতো–পরি, তোর কোথাও লাগেনি তো? বলেই পরিমল জায়গা ছেড়ে উঠে গেলো। শিপ্রার বুকের মধ্যে বন্ধ দরজা ধরে কে যেন একটা হ্যাঁচকা টান মারলো।

পরিমল উঠে গামছা নিয়ে, ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকলো। বাথরুমের জং ধরা কব্জা লাগানো দরজা যন্ত্রণাদীর্ণ শব্দ তুলে খুলে গেলো। শিপ্রা মুখ নিচু করে বসে রইলো। রবীন, পরিমল দুজনেই বাংলাদেশের ছেলে। এদেশে ওদের কেউ নেই। শিপ্রা প্রায় আকুল কণ্ঠে ডাকলো– পরিম-ল।

পরিমল দরজা বন্ধ করে দিলো। শিপ্রা বুঝতে পারলো না, ওর বাথরুমে যাওয়ার প্রকৃত দরকার ছিলো কিনা? শিপ্রার চোখের সামনে দিব্যেন্দুর জ্বরো মুখখানা ভেসে উঠলো।

—বুঝলি দিদি, আমার ওই স্বপ্নটা যদি সত্যি হয়ে যায়!

—কোন স্বপ্নটা?

—ওই যে 'সোনালি দিন' নাম দিয়েছি যেটা।

—কী দেখেছিলি যেন?

—তোর কিচ্ছু মনে থাকে না। কী করে মেয়েদের পড়াস? সেই যে বাবা চাকরিটা ফিরে পেয়েছে। রবীনদার সঙ্গে তোর বিয়ে হচ্ছে। রজনীগন্ধা ফুলের বৃষ্টি হচ্ছে তোর চারপাশে। আসলে আমি ছাদে লুকিয়ে রজনীগন্ধা ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছি...।

—তুই কিন্তু ভীষণ ফাজিল হচ্ছিস দিনকে দিন।

—কেন তুই আমার স্বপ্নের মধ্যেও শাসন করবি নাকি?

শিপ্রা বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে তাকায়। ভিতরে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। স্নান করছে পরিমল। ও কি দিদির বিয়ের স্বপ্ন এমনি করেই দ্যাখে? শিপ্রা বঁটি ছেড়ে উঠে পড়লো। পরিমল দুটো ডিম এনেছে। ডিম ধুয়ে ভাতের মধ্যে ছেড়ে দেয়। ভাতে ফুট ধরেছে। ভাতটা নেড়ে দিলো। ঝটপট স্নান সেরে পরিমল বেরিয়ে এলো। শিপ্রা বুঝলো, পরিমলের তাড়া আছে। আনাজের পাত্র নিয়ে শিপ্রা ধীরে ধীরে বাথরুমে ঢুকলো। নিঃশব্দে সবজি ধুচ্ছিলো সে। শুনতে পেলো—পরিমল বলছে—দিদি, ওদেশ-এদেশ আমার কাছে সমান হয়ে গেছে। ভাবি কবে ভারতবর্ষে বিপ্লব হবে। সেই ধাক্কায় বাংলাদেশেও বিপ্লব হয়ে যাবে।

ওইটুকু ছেলের মুখে এতো ভারি কথা শুনেও শিপ্রা কিছু প্রতিবাদ করলো না। ওর কষ্ট

হলো।

ভেবেছিলো– পরিমল বাথরুম থেকে ফিরে এসে বলবে– তুমি আমার এদেশের দিদি।– কিংবা বলবে, দিদি, তুই আমাকে একটুখানি ভালবাসিস। কিন্তু পরিমল, রবীনরা মুখ ফুটে একথা বলবে না। নিজের কষ্টের কথা ওরা বলে না। বলতে পারে না। নাকি কষ্টই হয় না!

শিপ্রা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছিলো। আসার মুখে দেখতে পেলো প্লাস্টিকের বালতির মধ্যে জামা-প্যান্ট ভেজানো। বাঁ হাত দিয়ে জামাটা উঁচু করে তুললো। রবীনের জামা, সেই তৈরি করিয়ে দিয়েছিলো– রক্তের দাগে মাখামাখি। বুকের মধ্যে বজ্রপাত হলো। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে আছে এ জামা প্যান্ট সে জোর করে নিজে হাতে কেচে দিয়েছিলো। জামা প্যান্ট পরে মিছিলে যাওয়ার আগে রবীন তার বুকের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিলো– তুমি প্রত্যেকবার আমার জামা প্যান্ট কেচে দেবে আর আমি সেই ধোপদুরস্ত জামা প্যান্ট পরে মিছিলে যাবো। শুধু এই! সেদিন শিপ্রা হেসেছিলো। জবাব দিতে পারেনি। বলতে পারতো– হ্যাঁ, শুধু এইটুকুই! এর বেশি আর কিছু আমাকে হতে বলো না। প্লিজ! 'শুধু এই' প্রশ্নে–

আজ তাড়াতাড়ি চোখে আঁচল চাপা দেয়। শিপ্রা কান্না পছন্দ করে না। ভালো করে চোখ মুছে বাইরে এলো। পরিমল তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

আনাজের পাত্রটা স্টোভের পাশে নামিয়ে ভাত দেখলো। ভাত ফুটিফাটি করছে। অনেক কাজ। তারমধ্যে রবীনের জামা-প্যান্ট কেচে ফেলতে হবে। শিপ্রা দেখলো, পরিমল একটা ফর্সা গেঞ্জি পরেছে। পেছন থেকে ওকে দিব্যুর মতনই দেখায়। সে আস্তে আস্তে পরিমলের কাছে এগিয়ে গেলো। গায়ে হাত রেখে ডাকলো–

– পরি, আজ থেকে তুইও দিব্যুর মতো তুইমুই করে ডাকবি আমাকে, পারবি না?

বলে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো। পরিমল উঃ! বলে পেছন ফিরেই কেঁদে ফেললো। বললো– দেখতে পাচ্ছিস না, কাল পুলিশে মেরে ফুলিয়ে দিয়েছে।

দুপুরের দিকে দিব্যেন্দুর জ্বর নামলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে লাইব্রেরি থেকে আনা একখানা ইতিহাস বই ওল্টাচ্ছিলো। ইতিহাস দিব্যেন্দুর প্রিয়। জ্বরো মনে ইতিহাসও অরুচি লাগছে। মাথার কাছে খোলা জানালা। ওপারে ছোট্ট মাঠ। অঢেল রোদ্দুর। রোদ্দুরে ঠাঁই দাঁড়িয়ে একটা গাব গাছ। তার ছেলেবেলার বন্ধু। বইখানা হাতেই ধরা আছে। তাকিয়ে রইলো দূরে। মাঠের দূরে। এখন একটা স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে। জানালার মাপে সবুজ মাঠের একটা ফ্রেম। স্লো-মোশান ছবির মতো সরু একটা পথ। এঁকেবেঁকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। দিব্যেন্দুর ভাল লাগে, সে ইচ্ছামতো স্বপ্ন দেখতে পারে। বাড়িতে মায়ের কোনও সাড়া নেই। বাবা বাড়িতে থাকা না থাকা সমান। কেউ তার স্বপ্নে এখন বিঘ্ন ঘটাতে আসবে না। নিশ্চিন্তে হারিয়ে যেতে পারে। হাঁটতে-হাঁটতে দৌড়াতে-দৌড়াতে। পায়ের

শব্দে মুখ তুলে দেখলো বাবা ঘরে ঢুকছেন, সে নিশ্চিন্তে গাবগাছটার নীচ দিয়ে দৌড়াতে লাগলো। কারণ বাবা তাকে কিছুই বলবেন না। চাকরি যাওয়ার পর থেকে বাবা তার সাথে কথা বলেন না। দিব্যেন্দু দু-একদিন কথা বলার চেষ্টা করেছে। বাবা কোনো কথার উত্তর দেননি। অথবা প্রচণ্ড রেগে গেছেন। সেই থেকে দিব্যেন্দুর খুব কষ্ট। বিশেষ করে বাড়ির মধ্যে থাকার সময়। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে সেও মুখ ঘুরিয়ে নেয় রাগে কিংবা কী একটা অভিমানে।

তখন দিদি মাস্টারি পায়নি। সে স্কুল থেকে ফিরেছে। খিদের চেয়ে বেশি ছটফট করছে, ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাওয়ার জ্বালায়। সেই অবেলায় তখন সবে হাঁড়িতে চাল চড়েছে। কার মাথা ঠিক থাকে। সে বলে ফেলেছিলো– খেতে দিতে পারবে না বললেই হয়। যে যার পথ দেখি। বাবা নাতো কসাই। ব্যস্! তারপর থেকে অদৃশ্য একটা ব্যবধান কঠিন ভাবে বেড়েই যাচ্ছে। দিব্যেন্দুর কষ্টও বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। ভেবেছে, একদিন সন্ধেবেলা দিদি, মা কেউ যখন বাড়িতে থাকবে না, বাবার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে ক্ষমা চেয়ে নেবে। কিন্তু পারেনি। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল কেঁদেছে। আর বলেছে, বাবা—আমাকে ক্ষমা করো। আর ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠেছে। দুঃস্বপ্নের ভিতরে। (দুঃস্বপ্নের সিরিজটা সেই সময় তৈরি হয়েছে) মুখ ফুটে বলতে পারেনি কিছু, কোনোদিন।

তার জানালার মাপের স্বপ্নের ফ্রেমখানা ভেঙেচুরে বেঢপ হয়ে গেলো। বাবার সুদীর্ঘ ছায়া নেমে এলো রোদেলা মাঠের ফ্রেমে। যেন একখণ্ড মেঘ। সে শুয়েই থাকলো। বই থেকে একবার চোখ তুলে আবার বইয়ে মুখ গুঁজে দিলো। সে এখন বড়ো হয়ে গেছে। সেদিন সে ভেবেছিলো, এটা এক ধরনের আড়ি। আজ বোঝে, আড়ি নয় বিচ্ছেদ। সে আর কোনোদিন আদুরে গলায় 'বাবা' বলে ডেকে উঠতে পারবে না।

সেই অনেকদিন আগে, কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে পথ হারিয়ে, বিষকন্যার মাঠে, দিব্যেন্দু কেঁদেছিলো– বাবা তুমি কোথায়? বাবা– সেই বিষকন্যার মাঠের সরু পথ দিয়ে দিব্যেন্দু এখন প্রাণপনে ছুটছে। শুয়ে শুয়ে এক দিব্যেন্দু আর এক দিব্যেন্দুকে দেখতে পেলো– ছুটতে ছুটেতে দূরে ছোট হয়ে যাচ্ছে, আর ভেসে আসছে সেই ডাক– বাবা তুমি কোথায়?

—দিব্যেন্দু

দিব্যেন্দু ভীষণ চমকে উঠলো।

– কেমন আছো?

বাবার স্বর গম্ভীর। কিন্তু অনেক অনেক দিনের হারানো সুর। চেনা বাঁশির স্বরে যেন ঝনঝন করে কাচের স্বপ্নগুলো নিয়ে ভেঙে পড়লো ঘরের বিছানায়। হাতের কব্জি থেকে ইতিহাস বইখানা নেমে এলো বুকের উপরে। সে কোনও উত্তর দিতে পারলো না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো বাবার মুখের দিকে। অনেক উঁচু থেকে একখানা

হাত আশীর্বাদের মতো নেমে আসতে লাগলো তার মাথার দিকে। ভুলের ক্ষমা পাওয়ার অপেক্ষায় দিব্যেন্দু চোখের পাতা নামিয়ে দিলো ধীরে ধীরে।

বাবার স্পর্শে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। বলতে চাইলো– আমি ভাল হয়ে গেছি। গলার স্বর ফুটলো না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলো। অনেক দূরে। সেই পথহারানো বিষকন্যার মাঠের পথে।

জ্যোৎস্না রাতের মাঠ। পায়ে চলা পথ ধরে পিতা পুত্রের ঘরে ফেরা একটি ছবির দিকে। সে চলতে চলতে বলে উঠলো– তোমার হাতের মধ্যে হাত দিলে আর ভয় করে না, বাবা। চৌকিখানা মৃদু শব্দ তুলে থেমে গেলো। বাবা বসলেন দিব্যেন্দুর পাশে।

দিব্যেন্দুর শরীর বেয়ে অনেকদিনের ভারি জ্বরের পাষাণ নেমে যাচ্ছে।

– কী বই এটা?

– ইতিহাস।

দিব্যেন্দু এখন সহস্র সহস্র বছরের ইতিহাসের পথ বেয়ে একা একা হেঁটে যায়। ভয় করে না। সে বড়ো হয়ে গেছে। পিতা সেদিন হাতের মুঠোয় পুত্রের কচি নরম হাতে চাপ দিয়ে বলেছিলেন– তুই যেদিন বড়ো হবি, খোকা, সেদিন আমি তোর হাতের মুঠোয় হাত রেখে এরকম হেঁটে যাবো। আমার ভয় করবে না। সে কথা বাবার মনে আছে?

বাবা বইখানা উল্টে পাল্টে দেখছেন।

– লাইব্রেরি থেকে এক-আধখানা বই তো এনে দিতে পারিস সারাদিন বসে বসে সময় কাটে না। তোরা, আজকাল কী সব বই পড়িস?

দিব্যেন্দু নিঃশব্দে মুখ ঘুরিয়ে বাবার দিকে তাকালো। বইয়ের আড়ালে বাবার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে না। বইয়ের আড়াল ভেদ করে, দিব্যেন্দু বাবার সেই মুখখানা দেখতে পায়।

– তুই যেদিন বড়ো হবি...

তুই! তুই!

তোরা!!

চমকে উঠেছে দিব্যেন্দু।

যেন এক যুগ পরে বাবার মুখে এই আদরের ডাক শুনতে পেলো। তার বুকের জমে থাকা একটা পাহাড় গলছে। গলে গলে পড়ছে। 'তোরা' মানে কারা? সে আর দিদি, তার সাথে কি রবীনদা আছে? অভিমান ভাঙা সুখে, সে কোনো কথা খুঁজে পেলো না। শুধু চেয়ে রইলো ছেলেবেলার বন্ধু গাবগাছটার দিকে। চোখ দিয়ে যেন তার ছেলেবেলার

বন্ধুকে বলতে চাইলো– তুমি আজও এই দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থেকো, হে বৃক্ষ।

– কী রে কথা বলছিস না কেন? কিছু খেয়েছিস?

হে বৃক্ষ তুমি বলে দাও, এখন আমি কী করে কথা বলবো, তাহলে যে আমার কান্না ছাড়া আর কোনও শব্দ বেরুবে না। বালিশের উপর দিব্যেন্দুর মাথা একপাশে কাত হয়ে জানালো– হ্যাঁ খেয়েছি।

বাবা যেনো এইটুকুতেই সব বুঝে নিলেন।

– কাল কোথায় লেগেছিলো, দেখি?

বাবা নিজেই দিব্যেন্দুর ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে ব্যথাটুকু অনুভব করতে চাইলেন। দিবেন্দু ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বাবার হাতখানা সরিয়ে দিতে গিয়ে নিজের হাতের মুঠোয় ধরে ফেললো। আঃ! শান্তি! কতদিন পরে, মনে পড়ে না, বাবার হাত আত্মনির্ভরতায় নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিলো। সাবলীলভাবে বলে উঠলো–না, না, তেমন কিছু হয়নি। বাবার হাতখানা কিরকম রুক্ষ আর রোগা হয়ে গেছে। হাতের শিরাগুলো পাকানো দড়ির মতো মনে হচ্ছে। ছোটবেলায় বাবার কোলের মধ্যে বসে হাতের মধ্যে হাত দিয়ে যখন হাতের লেখা শিখতো (ছবিটা দিব্যেন্দু স্পষ্ট দেখতে পায়, কিন্তু মা, দিদি শুনে হাসে, বিশ্বাস করে না)। তখন দেখেছে বাবার হাতে ছিলো শিল্পীর মতো আঙুল।

বাবা জেদি বালকের মতো বললেন– দেখি না। মিছিলে তোরা কতজন ছিলি?

– জানি না।

– কিসের মিছিল ছিলো।

– শিক্ষা-বিলের প্রতিবাদে।

বাবার হাতের লেখা ছিলো, ছাপানো ছবির মতন। বাবা অফিস থেকে ফিরে মার সঙ্গে গল্প করতেন– বোসবাবু আজ রিটায়ার করলেন। এবারও মানপত্র আমাকেই লিখে দিতে হলো। দিব্যেন্দু নিজেও দেখেছে, কোথাও ভালো হাতের লেখার দরকার হলে লোক বাবার কাছেই আসতো। হাতের লেখার জোরেই কোনো মুখার্জিসাহেবের নজরে পড়ে একটা প্রমোশন হয়েছিলো। এই সেই হাত। যে হাতের সমস্ত রস সুষমা সৌন্দর্য নিংড়ে শুষে ছিবড়ে করে ফেলে দিয়েছে কোম্পানি আর লক-আউট। দিব্যেন্দুর ইচ্ছা করছিলো, হাতখানা বুকে জড়িয়ে ধরে।

– দিব্যেন্দু, তোরা লক-আউট, টাউটের জন্যে মিছিল প্রতিবাদ করিস না? ধর, এই যে ক্ষমতা আছে বলে যখন-তখন কারখানা বন্ধ করে দেওয়া, এটা তো উচিৎ নয়। এর একটা হেস্ত-নেস্ত হওয়া দরকার, তুই কি বলিস?

এইবার দিব্যেন্দু সরাসরি বাবার মুখের দিকে তাকালো। মুখখানা মাংসহীন। টিনের কৌটার মতো তুবড়ে গেছে। চোখদুটো গর্তের মধ্যে বসে গেছে। আলোহীন নিষ্প্রভ

অসহায় দুটো চোখ।

— তুই কিছু মনে করিস না, দ্যিব্যন্দু, বিশ্বাস কর মিছিলে গিয়েছিস বলে আমি রাগ করিনি। যার বাবা লক-আউটে চাকরি খুইয়েছে, ছেলে, বৌকে খেতে দিতে পারে না? তার অন্তত প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। নিশ্চয় উচিত।

সেই মুহূর্তে দিব্যেন্দুর জ্বর কোথায় উবে গেলো। হাতের মুঠোয় নিজের অজান্তেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাবার হাতখানাকে চেপে ধরলো। চোখদুটো জ্বলে উঠল অন্য এক ভাষায়।

উফ্! ভীষণ ধকল গেছে। বিধ্বস্ত অবস্থা। শরীর আর চলছে না। শিপ্রা নিজেকে টেনে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। ঘরে ফিরে গা ধোয়া অভ্যেস। কী শীতে কী গ্রীষ্মে, প্রতিদিন। বাথরুমে ঢুকলেই মনে হয়, শান্তি! দিন আর রাত্রির সীমান্তে যেন এই শীতলের দেশ, তার নিজস্ব। এখানেই ফিরে পায় নিজেকে। বহু সময় ধরে জল ঢালে গায়ে। সমস্ত অভাবের মধ্যেও তার একটাই শখ, এই বাথরুম। এখানে সে একটা নীল বাল্ব লাগিয়েছে। আলোটা জ্বেলে দিলো। প্রশান্ত আলোয় ভরে গেলো চারপাশ।

নীল আলো জ্বেলে শাওয়ারের নীচে স্নান করার শখ শিপ্রার বহুদিনের। আর স্নান করার সময় প্রাণ ভরে স্মৃতির গহনে ডুবে যাওয়া।

বাবার চাকরি যাওয়ার পর, বড়োর দায়িত্ব আর বেকারত্বের জ্বালায় একসময় তার মনে হয়েছিলো, সে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলছে। সেইসময় রবীনের সঙ্গে তার আলাপ। তারপর থেকে প্রতিদিন, গায়ে অজস্র জল ঢালার সময়, সারাদিন কী করেছে পর পর সাজিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। এমনকী কে, কী বলেছে, কথা পর্যন্ত। এতে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। এই কথা সে একদিন দিব্যেন্দুকে বলেছিলো। দিব্যেন্দু দিদির বাথরুমের নাম দিয়েছে 'স্মৃতিশক্তি ব্যায়ামাগার'।

পরি একটু আগে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলো। বাবা-মা ছাড়া, সংসার ছাড়া ছেলেটির অদ্ভুত দায়িত্ববোধ। তাছাড়া বুকের ভিতরে যেন ভালবাসার আস্ত একটা পাহাড় বয়ে বেড়ায়। একদিনেই পরি, যেন শিপ্রার বুকের ভিতরে দিব্যেন্দুর সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ও যে মেয়েকে ভালবাসবে, সে খুব সুখী হবে। নীল আলো পড়েছে চৌবাচ্চার জলে। শিপ্রা মগ নামিয়ে দিলো জলে। তিরতির করে ঢেউ উঠছে। জল নিয়ে খেলা করতে সে ভালোবাসে। হাতের তর্জনী ভিজিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালো। সেই বা কম সুখী কিসে? রবীন তাকে ভালোবাসে। গর্বে ভরা তার বুক। জলের দিকে তাকায়। আবছা আলোয় নিজের অবয়ব দেখে। কিন্তু মুগ্ধ হতে পারে না। প্রথমদিকে হতো। আজ হয় না। মনে হয় গর্বোদ্ধত বুক অপরাধবোধে সংকুচিত। রবীনের সঙ্গী হতে না পারায় অপরাধবোধ। কিন্তু এ সত্ত্বেও অন্যদিনের মতো আজও মনে পড়ে যায় জীবনের সেই প্রথম মিছিলে যাওয়া। আর কখনও যায়নি। সেটা ছিলো আন্দোলনের মিছিল।

রবীন ছিলো নেতা। লম্বা ছিপছিপে দৃপ্ত উর্ধ্ববাহু রবীন। তখন সবে সে চাকরি পেয়েছে। সেদিন স্কুলে সবার মধ্যে মিছিলের জোয়ার? সেই জোয়ারে সেও নেমে পড়লো পথে। দীর্ঘদিন অনাহার, অর্ধাহারের দুর্বল শরীরের কথা মনে হয়নি। এক উদ্দামতা বলা যায়। সে শুধু রবীনের আবেগময় কথার যুক্তিতে।

আজ!

শিপ্রা গায়ে জল ঢালে। সাবান বুলিয়ে শরীর থেকে ফুরফুরে ফেনা তুলে আনে, এও সে রবীনের কাছে শিখেছে। নিজেকে পরিচ্ছন্ন থেকে পরিচ্ছন্নতর করে তোলে পরম তৃপ্তিতে। রবীন ছেঁড়া পরে, অপরিষ্কার পরতে কোনোদিন দেখেনি। স্কুলের নির্মলা, নীলিমাদিরা দু'তিন দিন অন্তর স্নান করে। অথচ বাড়ি থেকে বেরুবার সময় টিপটপ ফিটফাট। শিপ্রা ওদের দুচোখে দেখতে পারে না। বলিহারি শিক্ষা। নিজেকে ভালবাসতেও জানে না। পরিধেয়র অভাবে রবীন বহুদিন বাইরে বেরুতে পারে না। স্কুলে প্রথমদিন এই কারণেই সে আসতে পারেনি। পরি এসেছিলো। ক'দিন আগে সে রবীনের এক-জোড়া জামা প্যান্ট তৈরি করিয়ে দিয়েছে। এখন পোশাকের অভাবে রবীনকে আর মিটিং মিছিল বন্ধ করতে হয় না।

এইটুকুতেই তৃপ্তি।

রবীনের প্রিয়া হয়েও সে মিছিলে যায় না। প্রথম মিছিলের মূল্যবান সঞ্চয় বুকে করে যখন সে বাড়ি ফিরেছিলো তখন তার চোখে পড়েছিলো বাবার উদ্বিগ্ন, বিভ্রান্ত দৃষ্টি। কথা বলেছিলো। সেই ঘোলাটে দুটি চোখ— আমাদের কথা কি একটুও ভাবতে নেই রে শিপু? দিব্যুর কথাও! আহা, তার বড় আদরের দিব্যু!

সেই প্রথম এবং সেই শেষ।

কিন্তু সেদিনও সে চেয়েছিলো আজও চায়— ভাষা শিক্ষায় জ্ঞানের মর্যাদা। নিভৃতে বলেছে রবীনের কাছে। গলা তুলে মিছিলে বলতে পারেনি।

আজও রবীনের খুব কাছে বসেছিলো সে। রবীন চারপাশ দেখে নিয়ে শিপ্রাকে বললে

—শিপ্রা, মাথা নিচু কেন?

শিপ্রা আজ কেঁদেছে। নিজের অক্ষমতাকে কান্না দিয়ে ঢেকেছে।

—আমি তোমার যোগ্য নই। তুমি যা পারো আমি তা পারি না। আমাকে ক্ষমা করো।

—ছিঃ চুপ করো। এটা হাসপাতাল। বাবা, মা, ভাই পরিমল এদের জন্য যা করছো সেই অনেক। মাথা কুটে কি মাথা ফাটানো যায়? মুখ তোলো।

শিপ্রার সাবানধোয়া মুখ আবার নোনা জলে ভিজে যায়। গা ধোয়া হয়ে গেছে। শাড়ি পাল্টে বাইরে আসে। তারা ফুটফুটে আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সে কাঁদতে চাইলো। রবীনের কথা ভেবে কাঁদতে পারে না।

ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে। দিব্যেন্দু ঘুমুচ্ছে। ওর ঘুম পাতলা। হয়তো কোনো স্বপ্ন দেখছে। ঘুমন্ত কপালে হাত দিয়ে দেখলো জ্বর নেই। গা পাথরের মতো ঠান্ডা। লোডশেডিং হয়ে গেছে। কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না। ইচ্ছা করলেও ভাইয়ের মুখ সে দেখতে পেলো না। নিজের বিছানায় উঠে বসলো। খাবার ঢাকা আছে। খাওয়ার ইচ্ছে নেই। খিদে মরে গেছে। ভীষণ অভাব পেরিয়ে এসেছে শিপ্রা। আজকের মরা খিদে নিয়ে সে ভাবেই না। প্রথমদিন মিছিলে দীর্ঘপথ হেঁটে যখন সে ভীষণ দুর্বলবোধ করছিলো। পা এসেছিলো ভারী হয়ে। তারপর মনে নেই। সেই আতঙ্ককে সে ভুলতে পারে না।

এখন মনে পড়ে, সেদিন রোদ্দুরে তখন সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। চলতে পারছে না। শুধু রবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে মিছিলের ছন্দে মনের সমস্ত ইচ্ছাকে সে জড়ো করেছিলো।

খিদের যন্ত্রণা অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে। শরীরের ভিতর থেকে ঘাম যাবতীয় নোংরা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসা চেতনায়, মাথার মধ্যে চিড়িক মারছে অসংখ্য বিদ্যুৎ ঝলকানি। সেই মুহূর্তে সে চিৎকার করেছিলো– জিন্দাবাদ।

গলার আওয়াজ রবীনের কান পর্যন্ত পৌঁছেছিলো কিনা সে জানে না। আসলে সে রবীনকেই ডেকে বলতে চেয়েছিলো– আমাকে ধরুন।

তারপর রবীনের হাত আর কার হাত যেন.... মনে হয়েছিলো– অন্য এক অচেনা পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত সৈনিককে দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

অচেনা এক ছোট্ট খুপরির মধ্যে জ্ঞান ফিরেছিলো। রবীনকে দেখেছিলো মাথার কাছে। তার প্রিয়, ভালবাসার জন। এ রকম এক দৃশ্যের মধ্যে পরাজিত দুর্বল মানুষেরা মরে যেতে চায়। খিদেয়, বেকারত্বে ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে না পারার জ্বালায় শিপ্রা অনেকদিন চেয়েছে।

সেদিন কিন্তু বলেছিলো– ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা বলুন তো?

রবীন হেসেছিলো, বলেছিলো– এত দুর্বল শরীর নিয়ে মিছিলে আসা ঠিক হয়নি।

ঘরের মালিক মিছিলেরই একজন। শিপ্রা মিছিলে তাকে দেখেছে। একগেলাস দুধ এনে বললে– খেয়ে নিন।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি গোছানো শাড়িই ফের সামলাতে সামলাতে বললে– না, না ঠিক হয়ে গেছি।

রবীন দুধের গেলাস নিজে হাতে নিয়ে বলেছিলো– না, ঠিক হয়নি, খেয়ে নিন।

শিপ্রা না বলেনি? সমস্ত দুধটুকু খেয়েছিলো। সেদিন কিছু মনে হয়নি। আজ সেই দুধ পানের তৃপ্তি অনুভব করলো। দুধের স্বাদ, উত্তাপ যেনো জিভে গালে ছুঁয়ে আছে।

রবীনের প্রথমদিনের স্পর্শ সুখের রেশ তাকে ছেয়ে ফেললো।

শিপ্রা জিজ্ঞেস করেছিলো– মিছিল অনেক দূর চলে গেছে?

লোকটি বললে– হ্যাঁ।

রবীন বলেছিলো– মিছিলের পথ অনেক লম্বা। আপনি চাইলে সারাজীবন মিছিলে চলতে পারবেন। আপাতত সুস্থ হয়ে উঠুন।

– মিছিলে আপনি থাকবেন তো!

মনে পড়তেই শিপ্রা লজ্জা পায়। মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলো। নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে যেতেই, ম্লান হেসে হালকা রসিকতায় কথা ঢেকে ফেললো– আপনি না থাকলে যদি ফের অজ্ঞান হয়ে যাই।

রবীন একদৃষ্টে কয়েক পলক দেখেছিলো তাকে। সেই পলকটি শিপ্রার জীবনে অনন্ত আলোর মতো স্মৃতি হয়ে আছে। আজ রবীন হাসপাতালের বেডে বসে বললে– ছিঃ শিপ্রা নিজেকে তুমি বড়ো দুর্বল ভাবো কেন। যে প্রেমের জন্ম মিছিলে, তা কখনো এত দুর্বল হয় না।

শিপ্রা মাথা নিচু করেছিলো। পাতলা চাদরের নীচে রবীনের হাতের স্পর্শ তার মুঠোয় সারা দেহে কাঁপন তুলেছিলো। সে কিছুই বলতে পারেনি।

এখন বিছানায় বসে আপনমনে বললে—রবীন তোমার বিশ্বাস কত সবল। আমি কবে এমন বিশ্বাসী হয়ে উঠবো।

দিব্যেন্দু দৌড়ে উঠোনে ঢুকে পড়লো।

– দিদি কোথায়? মা–

বাবা উঠোনেই দাঁড়িয়েছিলেন। ছুটে এলেন। বাবার গায়ে যেনো অসম্ভব জোর বেড়ে গেছে। তিনি দু'হাতে বাচ্চা ছেলেকে আদর করার মতো দিব্যেন্দুকে ছুঁড়ে দিলেন আকাশে। আবার লুফে নিলেন। মা ঘরের দুয়োর ধরে আনন্দে কাঁদছেন।

—বাবা, দিদি কোথায়?

তিন লাফে ঘরে ঢুকে পড়লো দিব্যেন্দু। দিদি, নেই। মনখারাপ হয়ে গেলো। কে যেনো কাঁদছে। আজ কাউকে কাঁদতে নেই। আজ বিজয় উৎসব। কান্নার শব্দ কোথায়? মনে হচ্ছে এ দিদির কান্না।

– দিদি, তুই কোথায়? কোথায় লুকিয়ে আছিস? বেরিয়ে আয় দ্যাখ, কী এনেছি। জয় আমাদের।

দিব্যেন্দু চীৎকার করে উঠলো–দিদি–

তারপর ধড়মড় করে উঠে বসলো বিছানায়। ঘামে শরীর ভিজে গেছে। জ্বর নেই। শরীর হাল্কা। সে এখুনি উড়ে যেতে পারে। কিন্তু কে যেনো সত্যিই কাঁদছে। দু'চোখ রগড়ে মুছে নিলো। দেখলো, দিদি হাঁটু বুকের মধ্যে নিয়ে বিছানায় বসে কাঁদছে। খোলা চুল ছড়িয়ে আছে সমস্ত পিঠময়। জানালা দিয়ে ভোরের চাঁদের আলো এসে পড়েছে মুখের একপাশে। সে বিছানা থেকে ধীরে ধীরে নেমে এলো। দিদির কাছে। একেবারে কাছে। গলা জড়িয়ে বললো– দিদি, এই দিদি তুই কাঁদছিস। কাঁদিসনে। ঐ দ্যাখ ....

—দিব্যেন্দু তার ডানহাত টান টান করে তুলে ধরলো বাইরের দিকে। দিব্যেন্দু কী দেখাতে চাইলো কে জানে। কিন্তু শিপ্রা দেখলো ভোরের আলোয় পথ করে চলেছে এক মিছিল। রবীন বলেছিলো– মিছিলের পথ অনেক লম্বা। আপনি চাইলে সারা-জীবন মিছিলে চলতে পারবেন...

দিব্যেন্দুর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো শিপ্রা। বাইরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বললো

—এই দিবু। আয় সূর্য ওঠা দেখি।

হরিণডাঙার সাধুরাম

ভুখা নদী, শুখা চর। বালি আগুন, উড়ছে। বাঁধভাঙা পথ। চৈত্রমাস। গনগনে বালি ঢুকে পড়েছে, জুতোর খোপে। খই ফোটা পা ফুটছে। দূরে বট। দেখা যায়, মৃদুমন্দ বায়ু, ঘনশীতল ছায়া। যেনো বাবা-ছাতা, ছানা-ছাতাকে ডাকছে।

: আয়। ছুটে আয়।

ছাতাভাঙা রোদ। জ্বলন বাতাসে। আয়না লু। চরাচর কাঁপছে। জগৎসংসার। আতস আকাশে বুঝি উড়ে যাবে। হাড়জিরজিরে দাঁড়া-ওঠা পথে আগুন স্রোত বইছে। ছাতা ডুবছে। ছাতা ভাসছে। হাতের কনুই উঠছে, নামছে। পা-দুটো ছুটছে। নির্ঘাত কেউ পাগল। না হয় খ্যাপা, এই রোদ্দুরে!

নাগো, অন্য কেউ নয়। পেটের দায়। আমি নিজেই ছুটছি। হ্যাঁ, ওই আসছে। উফ! হরিণডাঙা আসছে। বট-পাকুড়ে জড়াজড়ি করা মোড়, হরিণডাঙার শুরু। ওইখানে, মানুষ দু'দণ্ড থির হয়ে বসে, বসছে।

হরিণডাঙা! আঃ মলো যা!! পেটে দু'মুঠো ভাতডাল, দু-চার অক্ষর থাকে তো খানিক মানায়! তেপান্তরের মাঠ, হাঁটতে হাঁটতে পায়ের গিঁট খুলে যায়। ধ্যাড়ধেড়ে বালিডাঙা, রাজোয়ারপাড়া ছাড়িয়ে, অঙ্গুঠাছাপ গ্রাম। অজ গাঁ বললেই সাজে। ক লিখতে কলম ভাঙে। হরিণ আবার ডাঙা, অত ভারি নামের বাহার কিসে! চাড্ডি ভরণ-পোষণের হিল্লে করে যেতে, চোদ্দপুরুষের মুরোদ হয়নি। তাহলে ধোপদুরস্ত হরিণডাঙায় হতো! বরং ভদ্দরলোকেরা শুধুলে, গাঁয়ের মানুষ আতালপাতাল হাতড়ায়। লজ্জা পায়।

: ও হুইনডা, তাই বলেন। হেঁ হেঁ।

নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না। মুখপাত ডাক, ওই হুইনডাই সই। দিগর জুড়ে বাঁশবাগান। বাঁশরার পত্তন। মুলি, তলতা, মাকলা। গায়ে পায়ে মাথায় জড়িয়ে ধরে। সাবধানে গা বাঁচিয়ে, গাঁয়ে ঢুকতে হয়। অসহ্য। ঘাট আছে তো বাট নেই। ঘর আছে তো কপাট নেই। ঝাঁট নেই। পাট নেই। হাটও নেই। সুতো কাটা ঘুড়ি, গ্রামখানা বাতাসে লাট খায়। আসতে নেই, যেতে নেই।

নেই নেই করতে নেই। হুন্ডাইয়ে যখন এসে পড়েছি, বলি,বাঁশঝাড়তো আছে। বাঁশঝাড়ের ছায়া আছে। গাঁয়ে কোনো কাজ নেইতো কি হয়েছে। ছায়া নামে মাটিতে। ছোট ছোট

ঘরের চালে। উঠোনে। বনে বাদাড়ে। নেই কাজতো খই ভাজ। বাঁশঝাড় দোল খায় বাতাসে। খুটখাট মায়ার আঁকিবুঁকি কাটে, গাঁ-ময় হাঁটে, ছোপ-ছাপ ছায়া। ছোপ-ছাপ মায়া। যেন গাঁ জুড়ে আলপনা। মনে হয়, চিতল হরিণ খেলে বেড়ায়। ঝাঁক ঝাঁক হরিণ। মায়াময় গাঁ বুঝি তাই হরিণডাঙা।

জ্যান্ত হরিণ নেইতো কী হয়েছে! বাঁশে বাঁশ ঠোকাঠুকি লাগে। যেন হরিণের শিং-এ শিং। শব্দ হয়। হুসহাস। বুঝি, হুইনডা আড়ামোড়া ছাড়ে। দিনরাত পাশ ফেরে। বাঁশের পাতা ঝরে। টুপটাপ। গাঁয়ে যেতে, পায়ে পায়ে শুকনো পাতা। মর্মর ধ্বনি হয়, কিন্তু পদ্যে। আমরা যারা কবি, কবিতা লিখি, আমাদের খাতায়। তখন হুইণ্ডা গাঁয়ে শোনা যায়,

: মর্, মর্, এত মানষের মরণ হয়, তোরা মরিস না কেন!

কে এত মরে! আদার বাদাড়, আস্তাকুঁড় শুনশান। এত বেলা হলো! কাউকে তো দেখি না। নাকি সব জেগে ঘুমায়!

বুকপকেটে একখানা ফর্দ আছে। ফর্দে হিসেব আছে। এই গাঁয়ে ঊনিশঘর সর্দার বাস করে। মর্ মর্ ধর ধর ঊনিশঘর থেকেই শোনা যায়। নাকি, আমাকে দেখে হুইনডা গাঁয়ে এত হৈ চৈ! ঊনিশ জনই যে আমার খাতক। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছে। বছরের পর বছর একপয়সা হাত উপুড় করে না। আদায় নিতে এলে, বাঁশপাতা বিছানো এই গাঁ, সাংঘাতিক পিছল, সাবধানে পা ফেলতে হয়। যেন হড়কে না যায়। পায়ে পায়ে সর সর, সরে পড় শব্দ। এই গাঁয়ে গালি খিস্তিখেউড় উজাড় হয়। হিসেব রেখে কান পাততে হয়। যেন কানে পড়ে পিছলে যায়। পা থেকে কান পর্যন্ত রাডার কম্পাস লাগিয়ে গাঁয়ে ঢুকি। এই মারে কি সেই ধরে! পথ নেই তাই যে কোনো পথেই পালানো যায়। পা তুলে প্রস্তুত থাকি।

অফিসে প্রবাদ শুনি, সাতজন গাধা মরে একটা রেডিও (রুরাল ডেভেলপমেণ্ট অফিসার) বাবু হয়। অফিসের তাবৎ বন্ধু পইপই করে বারণ করেছিলো।

: হরিণডাঙা চোরের গ্রাম, যেও না।

গাধা না হলে বুঝতে দেরি হয়! হরিণ মানে চোর। চোরের গাঁ না হলে ঊনিশজনই রেডিওবাবুর নামে হাওয়া! মুর্শিদাবাদে শুনেছি, ডাকাতের গঞ্জ আছে। তো, এ জেলায় চোরের গাঁ থাকবে! আশ্চর্য কী? মাথা চুলকাই। চুল হাঁটকাই। গাধার বুদ্ধি দেরি করে খোলে।

: ওঃ হো! তাই বুঝি, এ গাঁয়ের নাম হরিণডাঙা!

প্রবাদ আছে, গাধা জল ঘুলিয়ে খায়।

বুকপকেটের ফর্দ খুলে এক দরোজায় ধাক্কা দিই। কারণ, সে ঘরে আর একটা দরোজা নেই। ঘুপচি, খোঁয়াড় বললেই হয়। আলো ঢোকে না তাই আব্রু বাঁচে। এক মা-জননী অন্ধকার ঠেলে বেরিয়ে এলেন। পরনে বসন নেই। মানুষতো নই, গাধা। গাধার সামনে লজ্জা কিসের! দেখলাম, এক মানবীর পরণে শুধু শায়া। গাধার হাঁক ডাকে, টুকরো গামছা গায়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

চোরের গাঁয়ে দিনের বেলা কেউ হাঁকাহাঁকি পছন্দ করেন না। ঘুমের ব্যাঘাত হয়। তিনারা রাত জাগেন কিনা? মা জননী যখন আমাকে কাকুতিমিনতি, শেষে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট বাধিয়েও ফেরাতে পারলেন না। নেহাৎ আমি নাছোড়বান্দা। সামনের গামছার টুকরো টেনে পিছনদিক ঢেকে ফিরে গেলেন। চোখ মুছতে মুছতে এবং চিৎকার করতে করতে হাজিরা দিলেন,

: ছিরি ব্রেজোবাসি সদ্দার। পিতা: ঈশ্বর বেন্দাবন। সাকিন: হুইনডা। ন'পরগণা, ভারতবর্ষ। কন, কী বলার আছে।

ব্যান্ডবক্সে (বিখ্যাত লন্ড্রি) ধোলাই প্যাণ্টের ভিতর শার্ট ইন করে পরে এসেছি। পায়ে বাটার মশমশে জুতো। এহ বাহ্য। তদুপরি পাওনাদার, এক: সরকারি অফিসার, দুই: কলিকাতা নিবাসী, তিন: মনের গহনে, অহমের ইত্যাদি তকমাগুলো দিন-দুপুরের আলোয় ঝলমল করে উঠলো। গলকম্বলে ফুলে উঠলো জোয়ার। গম্ভীর গর্দভ রাগিণী,

: ব্যাঙ্ক থেকে এসেছি। লোনের টাকা কি চোরাই মাল? জল দিয়ে গিলে ফেল্লাম। ব্যস, হজম হয়ে গেলো! অতো সোজা! শোধ দিতে হবে না?

: কে বটে? সাহস আছে! তুর বাপের টাকা?

খাতকের এমন বাজখাঁই আওয়াজ, বাপের জন্মে শুনিনি। বুকের ভিতর ধড়াস করে উঠলো। প্রবাদ আছে, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন বাইরে কোঁচার পত্তন। মাইরি মাইরি করে গলা আর এক ধাপ তুললাম।

:সরকারের টাকা।

: সরকার দিখাচ্ছিস। উই মেম্বার শালো, উৎপাত (পঞ্চায়েত মেম্বার উৎপল সরকার) আমাদের সরকার। উৎপাতের ধন চিৎপাতে গেচে। যা উআর কাছে যা।

: বাড়িতে নোটিশ আসবে। পুলিশ আসবে।

: কী? পুলিশ? তাইলেতো ডরপুক আমি। কাঁপতে লেগেছি। দাঁড়া এখনই তোর লোন শুধ করে দিবো।

যেমন গাঁক গাঁক করে এসেছিলো, দ্বিগুণ দুপদাপ শব্দে ঘরে ফিরে গেলো। কার মুখ দেখে আজ ঘুম ভেঙেছিলো, মনে নেই। বাবার নাম মনে আছে কিনা টেস্ট করার সময়

পেলাম না। যা ভেবেছি তাই। বুকের ভিতরে গান শুরু হয়ে গেলো, হরি দিনতো গেলো সন্ধ্যা হলো ...

গোটা দুয়েক পাইপগান, একটা শুটার, একখানা রাম দা, দুটো ভোজালি, গোটা কয়েক সিঁদকাঠি, এক ঝাঁক সবখোল-চাবি একটা বাঁশের ঝুড়িতে বয়ে এনে আমার সামনে দমাস শব্দে ফেলে দিলো। আমি লাফিয়ে উঠলাম। মা মাগো, না, হরিহে দীনবন্ধু, পার করো ...।

: যা নিয়ে যা। আর কোনোদিন এমুখো হোবিনে। লোন শোধ।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাবা বেরজোবাসীর মুখপানে চেয়ে আছি। গলা দিয়ে চিঁ-চিঁ বাণীও পথ খুঁজে পাচ্চে না। মনে মনে বললুম, : বাবা বেরজো, ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। সামনে থেকে ঝুড়িখানা ক্লিয়ার দে। কাট মারি।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবো, নাকি মানে মানে কেটে পড়বো, নাকি পিছন ফিরলেই দুম ফটাস! আজই ফর্সা?। বউ বিধবা।

ঘিলুতে থান কাপড় উড়ছে। কোনো হিসেব খেলছে না। বেরজোবাসী মুখে মুখে লোনের টাকার হিসেব মিলিয়ে দিলো।

: লোনের টাকা কিছু গেছে উৎপাতে। বোমা বেঁধে কিছু ফাটিয়ে ফেলেছি। কিছু পেটে খেয়েছি। এই কটা আছে নিয়ে যা। বউটা হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করলো। তোর কপাল ভালো, বেঁচে ফিরে যাচ্ছিস।

: বাবা বেরজোবাবু নমস্কার, আপনার জিনিস আপনি তুলে রাখুন। আমি আসছি।

পিছনে ফিরে বেরজোবাবু মহা বিরক্ত হয়ে স্বগতোক্তি করলেন

: কাঁচা ঘুম নষ্ট। যত্তসব। ফালতু পাটি।

ব্যাকগিয়ারে ছুটবার একমুহূর্ত আগে, এক পাল্লা ঘরের দিকে একখানা চোখ রাখলাম। মনে মনে নিবেদন দিলাম,

: চাকরির দোহায়। ঘর নয়তো, তোমার মন্দির মা। মাঠাকরুণ, প্রণাম নিও, যাচ্ছি। দোষ নিও না।

এক চোখে কি ছোটা যায়? কানার মরণ। দিগভ্রান্ত আমি। চোখে মুখে ভিমরি। ভুলভুলাইয়া গাঁয়ে গোলোকধাঁধার অন্ত নেই। পথঘাট ভুলে পাশের বাড়ির উঠানে পপাত ধরণীতল।

২

ঝলমলে তকমাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় দেখে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। ভাবখানা এমন, পড়ে যাইনি হে, চিতুরি হাঁটনের কসরত দেখাচ্ছিলুম। ঝটপট উঠতে গিয়ে

আধখানা উঠেছি। মুন্ডুখানা আকাশমুখো, ঠিক তখনই তার সাথে দেখা। আগে কখনো দেখিনি। প্রথম দেখায় সে ঝুঁকে আছে আমার মুখের উপর। আলকাতরার (চেয়ে লিখলে অবিশ্বাস করবেন তাই) মতো কালো মুখখানা। চোখ দুটো ডিম-চটকানো কুসুমের পারা ঘোলাটে। আদুল গা। নেংটি পরনে। নেশা জড়ানো গলায় বললে

: থাক বাবা থাক। একা উঠতে হবে না। সঙ্গে একজন ধরে তোলার মানুষ আনোনি! ধরো, আমার হাতখানা।

শরীরের ভিতর থেকে ছে-লম্বা লিকলিকে একখানা হাত আর তাড়ি মদের গন্ধ মুখ থেকে ভক করে বেরিয়ে এলো। যে শরীর ছুঁয়ে ফেললে গায়ে আলকাতরা লেগে যেতে পারে তার হাত ধরে অগত্যা (মধুসূদন নয়) মোদো, কোলকাতা বরানগরের ধোপদুরস্ত আমি দেবল দাশগুপ্ত উঠে বসলুম এবং গা থেকে সরকারি তকমাখানা কখন অসাড়ে খুলে পড়েছে মোটেই টের পাইনি। তাই কেমন কালো আদমির মতো নিজেকে আদুল আদুল মনে হচ্ছে। সে তখনো ঝুঁকে আছে আমার মুখে। মুখ তার কামাই নেই। গন্ধ এবং বাক্য সমানে ছুটছে।

: আমি সাধুরাম রাজোয়ার। আমার বউ ফতিমাবিবি। মেয়ে কুমারী লক্ষ্মী খাতুন। মোসলমান বে করেছি বলে গাঁ থেকে খেদিয়ে দেছে, ব্যাঙ্কে কোনো লোন নেই। চুরি করি না। চোরের পাশে থাকি। আমি সাধু, সাধুরাম। তুমি বাবা কে? কতো খেয়েছো? শুখনো মাটিতে দিন দুপুরে উল্টে গেলে! বিহান থেকে খেয়েও উল্টাতে পারিনি। তুমি বাবা গুরুদেব। পেন্নাম হই।

সাধুরাম আমার সামনে সাটপাট হয়ে শুয়ে পড়লো। পা-দুটো বুকের মধ্যে জড়িয়ে মাথা ঠুকতে লাগলো হাজারবার। এবার আমি নিজেকে ঝেড়েঝুড়ে টেনে দাঁড় করালুম। এবং সাধুরামকেও খাড়া করার অসাধ্য সাধনে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। সাধুরাম বলেই চলেছে,

: গুরুদেব এবার তুমি শুয়ে পড়ো। আমি তুলি। তারপর আমি শুয়ে পড়বো। তুমি তুলবে। তোলাতুলি চলবে। তোমার আমার এ-খেলা চলছে, চলবে।

ছেঁচা পুকুরের মতো গলা শুকিয়ে চোত ফাটা। বুকে জল দরকার। বিরক্ত হয়ে বললুম, এক গেলাশ জল খাওয়াতে পারো?

: ঘনো না পাতলা?

পিপাসায় মাতলামি অসহ্য লাগলো। সাধুর দিকে তীব্র দৃষ্টি ফেলে তাকালুম। সে আমার চোখ সহ্য করতে পারলো না। ডাক পাড়লো,

: লকখী, ও মা লকখী, গেলি কোথায়? গুরুদেবকে এক গেলাশ জল দে।

উঠোনের আস্তাকুঁড়ে দরমার বেড়া ছাওয়া ঘরের ছায়ায় গুটলি পাকিয়ে শুয়ে আছে এক

আদুর বালিকা। অসময়ে অজায়গায় ঘুমুচ্ছে। কিংবা কেমন জানি মনে হলো নেশায় অসাড়। ও বুঝি এ বাড়ির লক্ষ্মী! দরমার বেড়া ঠেলে বেরিয়ে এলো রহস্যময় একহাত ঘোমটা। ঘোমটার ভিতর থেকে একখানা আশ্চর্য ফর্সা হাত। কালোর বিপরীতশব্দ ফর্সা। যদি দেখার সাধ হয়, এ গাঁয়ে আসতে হবে। বাক্যে, শব্দে, অক্ষরে ফুটবে না। অন্তত আমার ভাষায় না। মনোমুগ্ধকর হাতের শোভায় আমি স্ট্যাচু। আসলে প্রাণ-যায়-যায় পিপাসার্ত মানুষের চোখে তখন এক গেলাশ জল, সেই হাতের করতালুতে ধরা। জলের আর এক নাম জীবন। আমার জীবন যে হাতে ধরা সেই হাতের সৌন্দর্য বর্ণনা, আমার সাধ্যাতীত। ছেঁচা পুকুরের মাছ যেমন সামনে জলের আশ্রয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমিও পড়লুম। গেলাশ মাটি ছোঁয়ার আগে গলায় ঢেলে দিলুম, মরুভূমির মাটিতে এক গেলাশ জল কী হবে? এবং লজ্জা না পেয়ে হ্যাটট্রিক করে ফেললুম। পরপর তিন গেলাশ। অতঃপর দরমার দুয়োরে বসলুম থিতু হয়ে।

হরিণডাঙার বাতাস আঃ। কী শীতল!

মরমে উপলব্ধি করলুম, মেয়েদের কেনো মা বলা হয়।

পকেট থেকে বের করলুম সেই ফর্দ। ঊনিশ ঘরের হরিণডাঙায় বিশ নম্বর সাধুরাম রাজোয়ারের কোনো নাম নেই। এ কথায় সে কথায় তখন ডানা মেলতে শুরু করেছি। টের পাচ্ছি, দরমার আড়ালে একজন সাবলীল নারী। নড়েচড়ে বসলেন। কথায় কথা বাড়ে। মেয়েমানুষের পেটে কথাও রয় না। কথার টানে কথা ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। সাধুরাম অষ্টপ্রহর মাতাল। অভাবে স্বভাব নষ্ট। তাড়ি খেয়ে সংসারের খিদে মেটে? আজও ঘরে চাল বাড়ন্ত।

খিদের জ্বালায় খায়। খেতে খেতে নেশা হয়ে যায়।

: ওই দ্যাখেন, চুল্লু না কী সব আপদ বালাই খেয়ে গলায় ঘা বাঁধিয়েছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, উঠোনে উবু হয়ে বসে আছে সাধুরাম। বাঁশের নল (বাঁশের সরু ফাঁপের উপর টাইট করে একটু মোটা বাঁশের ফাঁপ তার উপরে আরও একটু মোটা ফাঁপ) গেঁথে তৈরি ফানেল নিজের গলায় বসিয়েছে। নারকেলমালার পাত্রে নিজেই তাড়ি তুলে ফানেলে ঢালছে। চিৎকার করে উঠতে গেলুম। ফতিমা মুখে তর্জনী রেখে আমাকে থামিয়ে দিল।

: বিষম খাবে বাবু, ফানেল লিক করে গলায় লাগলে এখনই জ্বলতে শুরু করবে। খেতে পারবে না। খিদের জ্বালায় খাচ্ছে।

: তাড়ি কিনতেও তো পয়সা লাগে?

: না। বাড়ির নীচে, ওই দেখছেন তালপুকুর, শহুরে বাবুদের। পড়েই থাকে। দেখভালে আছি। সাধুরাম গাছ ঝাড়তে-পাড়তে জানে। নিজেই তৈরি করে। আমরা খাই।

: লক্ষ্মী?

: লকখীও খায়। সেই দু'মাস বয়স থেকে। তাড়ি খেয়ে মানুষ। তালের তাড়ি ঠান্ডা। পেটও ভরে। একটু আধটু নেশা হয় বটে। কাঁদে না। নেশার টানে ঘুমায়, শুধু ঘুমায়। ঘরের কাজ কাম নিশ্চিন্তে সারি। এক গেলাশ খাবেন? ঘরে আর কিছুতো নেই। বলতেও সাহস হয় না। দেখবেন, কী খেয়ে বেঁচে আছি? জানেন তাড়ি খুব ভালো। পিপাসা মেটায়। খেয়ে দ্যাখেন। কেমন হাল্কা খুশি খুশি লাগবে। অনেকক্ষণ খিদে পায় না। তবে গন্ধ। খেলে কিন্তু, সারা গায়ে গন্ধ হবে। ঘামে গন্ধ হবে। পেচ্ছাবে, মলে, শ্বাসেও গন্ধ হবে। হরিণডাঙার মানুষের গন্ধ।

আস্তাকুঁড়ে আবার চোখ চলে গেলো। কতো বয়স হবে? বড়ো জোর চার পাঁচ। পেটের জ্বালায় তাড়ি খেয়ে বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছে, বালিকাও বলা চলে না। নেহাত শিশু। জীবনে এমন দৃশ্য দেখিনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম।

কথায় কথা বাড়ে। জানতে পারলুম, ফতিমার নামে একবন্দে ছ'বিঘে জমি আছে। জল নেই। বাঁজা। নয়ছয় করে এক ফসলও ঘরে আসে না। ব্যস্, সুবর্ণ সুযোগ। সুদখোর, ব্যাঙ্কওয়ালা আমি। দিলাম জাল ছুঁড়ে। এসো বাছা, ফাঁদে এসো।

: জমি কোন মাঠে?

: রাজোয়ার খন্দে।

: রাজোয়ার মাঠের জমি খন্দ কোথায়! তিন ফসলি মৌজা। কিছুই জানো না। আমি ব্যাঙ্কের রেডিও (রুরাল ডেভেলপমেণ্ট অফিসার) বাবু। শ্যালো পাম্পসেট লোন দিতে পারি। বলি, নিয়ে নাও।

: বাবু, অভাব আমাদের জন্ম জন্মান্তরের শত্রু। নিতে খুব ইচ্ছে করে। কুসীদ লেনাদেনা আমাদের ধর্মে হারাম। লুকলুক করে পাহারা দেয় গাঁয়ের মুলবিরা। আমারে নিকে করে মুলবির চেয়ে বড়ো মুলবি হয়েছে আমার রাজোয়ার।

নেবে না। কিছুতেই নেবে না। দেখছেন তো ওর হাল! কার ভরসায় নিই বলুন তো! বিটিছেলেটার দায়। যদি ভরসা দেন জনমুনিশ দিয়ে একবার দেখতাম। মুলবিদের আমি বুঝে নেবো। দিবেন বাবু?

ফতিমার ঘোমটা পড়ে গেছে। ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে আছে। যেনো রসুল আল্লার পানে চেয়ে আছে। ডাগর দুই চোখে ভিক্ষুকের ব্যাকুলতা।

ফতিমাকে দেখলুম। আর দেখলুম ফতিমার রঙ। ওভেন হলে বলতুম চোখে আমার আগুন লেগেছে। চোখ পুড়ে গেলো। জানতুম না রঙেও নেশা হয়। এ গাঁয়ে পালাবারও পথ নেই। সেখানেও নেশা বিছানো। গোলকধাঁধা। রঙের হ্যাঁচকা টানে হারিয়ে গেলুম।

বললুম : সাধুরামকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিও। দেখবো।

৩

সকাল দশটা:

আকাশে সূর্য। ঝলমল করছে দিন। ফতিমার জমিতে জলের স্রোত বইছে। সোনা রোদ লেগেছে জলস্রোতে। জ্বলজ্বল করছে চাঁদের পারা। যেন চাঁদসূর্যের যুগলবন্দী। কল চলছে। জল চলছে। জমি থেকে জমি। কল কল। কল কল। জল যেন ঝকমকে চাঁদির পারা। সাধুরাম কল্পনায় দেখছে, জলস্রোতে চাঁদি ছড়ানো। মাঠে মাঠে ধান। পাকা ধানে বাতাস বইছে। সোনার বাজনা বাজছে মাঠ জুড়ে। ঝন ঝন। ঝন ঝন। লক্ষ্মীর পায়ে সোনার মল। উঠোনময় ফর্সা দু'টো কচি পা। নেচে নেচে যায়। ঝমঝম ঝমঝম। দিশাহারা সাধুরাম। খুশিতে পুরো একভাঁড় তাড়ি খেয়ে ফেলেছে।

কবি কবি ভাব থাকলে কি হবে? ভদ্রমহিলার স্বামী। ভয়ে ভালো ছেলে। এমন আনন্দের দিনেও এক পিস কচি নেওয়াপাতি ডাব আমার বরাদ্দ। আজ সাধুরামের জমিতে শ্যালো পাম্পসেট বসেছে।

: শালোর শ্যালো দিয়ে বগবগিয়ে, জল উঠছে না, মাল উঠছে। বাবু তুই গুরুদেব।

সাধুরাম ঢপাস করে শুয়ে পড়লো আমার সামনে। ধুলোময় পথের মধ্যিখানে। একা নয়, এবার জোড়ে। ফতিমাও এসেছে। আসবে না তাই হয়! পাতাল থেকে মা গঙ্গা আসছেন তার জমিতে। সেই তো মাথা। ভগীরথ। সাধুরাম তার বাকি অঙ্গ। গাঁয়ে বরং দু'দশ ঘর জানান দিয়ে এসেছে। মা গঙ্গা দেখার পুণ্য বাসনা যদি কারো হয়? ফতিমাকে দেখলাম। যতবার দেখছি, রঙের পর্দা খুলছে। আহা, সেই রঙ! ধূলায় সাষ্টাঙ্গ লুটায় হরিণডাঙার রঙবাহার।

: আঃ ছিঃ ছিঃ, ফতিমা, করো কী, করো কী! সাধুরাম না হয়, মাতাল ছাতাল মানুষ। তুমি। ওঠো ওঠো।

সাত হাত পিছিয়ে গেলুম। পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলো কুমারী লক্ষ্মী খাতুন। কচি মেয়ে। ধাক্কা লেগে যায় বুঝি। পাশে সরে গেলুম। তৈরি হলো, সে একখানা দৃশ্য বটে। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মা লক্ষ্মী। পিছনে দিগন্তবিস্তৃত মা জগৎজননী বসুন্ধরা। আকাশ পাতাল ভেদ করে উঠে আসছেন মা গঙ্গা স্বয়ং। সামনে সাষ্টাঙ্গে ভূমিলগ্ন একজোড়া ভগীরথ, এ বঙ্গে, এক সন্তানের উদ্দেশ্যে একজোড়া জনকজননী, সাধুরাম আর ফতিমা বিবি। মা গঙ্গাকে দর্শনের আশায় দু'দশজন গ্রামবাসী এসেছেন। দূরে বটপাকুড়ের মোড়ে, ঘন ছায়া সুনিবিড়ে। দাঁড়িয়ে এ পবিত্র দৃশ্য দেখছেন লিখতে লজ্জা হলো, লিখলুম অবলোকন করছেন। কারণ তখন তাঁরা করজোড়ে ভক্তি-আপ্লুত।

দিনদুপুর বেলা বারোটা :

মৃদুমন্দ বাতাস। নিশান উড়ছে। জরিপাড় ত্রিভুজ পতাকা। পাঁচগাঁয়ের মেলা বসেছে পঞ্চায়েত অফিসের মাঠে। সাতগ্রাম থেকে দেখা যায়। মেলার চুড়ায় রঙ খেলছে। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ যেমন খুশি ... রঙে রঙে খুশি উড়ছে। আজ পৌষ সংক্রান্তি। (ল)গনে (ল)গন লেগেছে। সেই উপলক্ষে পঞ্চায়েত অফিসে ব্যাঙ্কের ঋণ আদায় শিবির। সবাই জানে, ফি-বছর মেলা বসে। ঋণ আদায় শিবির প্রথম হচ্ছে। লোনের কিস্তি শোধ দিতে হবে। ঢেঁড়ি পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রামে গ্রামে। টেবিল চেয়ার পেতে পঞ্চায়েত অফিসে সেজেগুজে বসে আছি। পাশে প্রধান সাহেব। পায়ের কাছে চৌকিদার। উবু হয়ে বসে আছে। মেলায় এসেছে, লোনের কিস্তি আনেনি, লুকিয়ে মজা মারার ধান্দা, এমন টিকির হদিশ পেলেই, ছুটে যাচ্ছে চৌকিদার, ঘেঁটি ধরে হাজির করাচ্ছে।

পাঁচ গাঁয়ের হোমড়াচোমড়া মদনবাবু, দাদনবাবু, শাসনবাবুরা এখানে অন্নসত্র, জলসত্র, দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছেন। দানে দুর্গতি খণ্ডানোর ফল্গুধারা বইছে। চলছে ফল্গু অবগাহনের গোপন অববাহিকায় বাবুদের গোঁফে তা দেওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা। প্রধানবাবু রাজনীতি করেন। তাঁরও গোঁফ আছে। কিন্তু আজ সাফসুতরো হয়ে এসেছেন। দেখা যাচ্ছে না। সে অবগাহনে তা দেওয়ার গোপন স্ক্রু-লাগানো পথ নিয়েছেন। কিস্তি শোধ দিলেই দু'গেলাশ চুল্লু কিংবা তাড়ি উপহার। যার যা খুশি পছন্দ। কিন্তু বিষয়টি গোপনে সারা হচ্ছে। জানাজানি হলে প্রধান সাহেবের নামে গন্ধ ছড়াবে, এ তিনি ভালোই জানেন। ম্যানেজারবাবুর সাথে ধান্দা চলছে, বড়োসড়ো একটা লোন বাগাবার। কিস্তি আদায়ে ম্যানেজারবাবু খুশি হলে তার একটা হিল্লে হয়। ফল্গুধারার গোপন অববাহিকার কিনার বেয়ে বিস্তারলাভ করছে একটি ধারা। সে ধারায় মুখ এবং কানের ফিস-ফিস স্রোতে বহে চলেছে তাড়ি, চুল্লুর কাহিনি এবং গোপন পথ বেয়ে গড়গড় করে কিস্তি আদায় হচ্ছে। মেলা জমে উঠেছে।

: পেধানবাবু, ফিরি মাল খাওয়াছে, যা কেনে দু'ঢোক মেরে আয়।

খবর এসেছে, হরিণডাঙা থেকে সাধুরাম আসছে। লোনের কিস্তি শোধ দেবে। হরিণডাঙার ইতিহাসে প্রথম লোনের কিস্তি জমা হবে। প্রধান সাহেব চুপিচুপি ঘোষণা করে দিলেন সাধুরাম আজ মেলার হিরো। সাধুরামের জন্য ঢালাও, যতখুশি টানতে পারবে। দিশি, পচাই, তাড়ি সাধুর প্রাণে যা চায়। যতক্ষণ চায়। সে খাবে।

প্রধানবাবুর পিছন পিছন চৌকিদার উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে ঘোষণা করলে, মাল খেয়ে সাধু বেহেড মাতাল হয়ে পড়লে সে ভ্যানরিক্সায় চাপিয়ে ফিরি ফিরি হুইনডায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। চেয়ারে বসে, প্রধানসাহেব বেচাল চৌকিদারের মুখ চেপে ধরতে পারেননি। কান চেপে ধরে একঝামটে মেঝেতে বসিয়ে দিলেন।

: দিবি দিবি ঠিক আছে, অতো চেঁচাবার কী আছে?

এই বয়সে অপেক্ষার নেশা থাকে না। বিরক্তই লাগছিলো। সাধুরাম এলো অনেক দেরি করে। দরোজায় দাঁড়িয়ে। ছে লম্বা। নিশানের দণ্ড যেন সোজা। সেই কালো মুখে ধবধবে সাদা হাসি। দুই হাত জোড় করে মাথার উপরে তুলেছে। গলা তুলে ডেকে উঠলো

: গুরুদেব, নমস্কার।

অল্প বয়সে প্রেমকরাকালীন বহু অপেক্ষা করেছি। এখন কহতব্য নয়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মধুমিলন ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলুম। ফিরে পেলুম অনেকদিন পর। আলকাতরার রঙে এত প্রশান্তি আগে বুঝিনি। রঙ যখন গায়ে লেগেই গেছে, দু'রকম ভেবে লাভ কি? চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলুম। সাধুরামের হাত ধরে এনে বসাতে গেলুম চেয়ারে, কিছুতেই বসলো না। উবু হয়ে হাতজোড় করে প্রথমদিনের মতো বসে রইলো মেঝেতে। চৌকিদারের পাশে। টেবিলের কোণাকুণি। মুখখানা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে। দুই হাতে নৈবেদ্য দেওয়ার মতো কিস্তি দেওয়ার শেষেও সেই হাসি। ফর্সা সাদা ছোট ছোট এক মাপের দাঁত। হাসি ফুটে আছে। অমলিন বড়ো সুন্দর হাসি যেন ফতিমার ফর্সা রঙ ফুটে বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়েছে অফিস ঘরময়। যেন ঘর ছাড়িয়ে হরিণডাঙার সেই উঠোন পর্যন্ত যেখানে খেলা করছে কুমারী লক্ষ্মী খাতুন।

ঘর ভর্তি মানুষ ভুত দেখলো, না ভুল লিখলুম, সাধুরামকে দেখলো। ভূতের মুখে নয়, মানুষ সাধুরামের মুখে এ কথা রাম রামই বটে, যখন দু'হাতে মুখ চেপে বললে, মদ খাবে না। প্রধানবাবু ব্যাপারখানা ঠিক হজম করতে পারলেন না। ভ্রু কুঁচকে উপর থেকে নীচ, নীচ থেকে উপর, এ পাশ, ওপাশ সাধুরামের কোনো পাশ থেকেই বিষয়টা মালুম করতে পারলেন না।

সাধুরাম বললে, চুল্লু খেয়ে তার গলায় ঘা হয়েছে। সে মাল খাবে না। কানমোলা খাওয়ার অপমান ভুলে চৌকিদার ফের চিৎকার করে উঠলো : আমি জানি, স্যর। ও আমার পার্টনার। সেই জন্যে ফাদেল (ফানেল) এনে রেখেছি।

সাধুরামের ভিতরে সূক্ষ্ম একটা জেদ আছে। প্রধানবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করে চুপচাপ বসে রইলো। প্রধানবাবুও অহং-এ একটা ধাক্কা খেলেন। আমি বসে আছি হিসেব কষে নিলেন মনে মনে, এবং জনগণের দিকে একপাক ঘুরে গিয়ে বলে উঠলেন : গুড গুড, এইতো চাই। সাধুরাম ইজ এ গুড ম্যান। সাধুরাম মদ খায় না।

অবাক কাণ্ড। ফল্গু অববাহিকার অন্য কিনারে তৎক্ষণাৎ আর একটি স্বতঃস্ফূর্ত ধারার বিস্ফোরণ ঘটলো। সে ধারাও বিস্তার লাভ করে চললো মুখে মুখে।

: সাধুরাম ইজ এ গুডম্যান। সাধুরাম মদ খায় না।

মেলা শেষে স্বতঃস্ফূর্ত একটা মিছিল হুইনডা গাঁয়ের দিকে ফিরে চললো।

বেলা নেমেছে, রোদ্দুর পড়েনি, তখনো বেশ জীবন্ত। মিষ্টি উত্তাপ মেখে মিছিলের আগে আগে চলছে, সাধুরাম। পাশে পাশে চলেছে এক তরুণতুর্কি নেতা।

: সাধুরাম ইজ এ গুডম্যান।

কোরাস : সাধুরাম মদ খায় না।

: সাধুরাম ইজ এ গুড ম্যান।

মিছিলের ছায়া মিলিয়ে গেলো। তখনো কোরাস শোনা যাচ্ছে।

প্রধানবাবু আমাকে বললেন : মিছিল দেখে এখনই কিছু বলা যায় না। গলার ঘা তো একদিন শুখুবে। কী বলেন!

বিকেল তিনটে:

কুকুরের লেজ হাজার টানো, সোজা হবে না। কাস্টোমার না বোঝে ব্যাঙ্কের কাহিনি। সময় নেই। অসময় নেই, হাজির দিলেই হলো। চাকর বাকর সব বসে আছে। ভাবে, গেলেই কাজ হবে। বেলা গড়িয়ে তিনটে। খাওয়া জোটেনি। দেশ উদ্ধার চলছে। আই আর ডি পি'র সরকারি দরখাস্তে লোন দেওয়ার কাজ। শ'য়ে শ'য়ে দরখাস্ত জমে পাহাড়। তিনখানা পঞ্চায়েত গড়িয়ে বন্যার মতো দরখাস্ত নামছে। খাওয়া নেই ঘুম নেই। গর্দান থেকে মালাইচাকি স্পণ্ডেলাইটিসের যন্ত্রণা। খিঁচিয়ে উঠলুম,

: ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে। (কাস্টোমার সার্ভিস তখন দুপুর দুটোয় বন্ধ হয়।) কী দরকার? এখন কিছু হবে টবে না।

: দরোজা জানলা খোলা। আলো জ্বলছে। কাজ হচ্ছে। ব্যাঙ্ক বন্ধ বুলছিস।। ভুরোর বাঙাল নাকি। যা ইচ্ছে বোঝাবি!

কথা শুনে হাসবো, না কাঁদবো, ঠিক করতে না পেরে রেগে উঠলুম। মাথা তুলে দেখি সাধুরাম।

সাধুরামের এমন কণ্ঠস্বর কখনো শুনিনি। করুণ, ভয়ার্ত। থামের গোড়ায়, সেই মেঝেতে বসে পড়েছে, হাতজোড় করে। হাজারবার বলেছি, চেয়ারে বসতে। কিছুতেই বসবে না। কুকুরের লেজ। গলা দিয়ে প্রায় ধমক বেরিয়ে এলো : চেয়ারে বসো।

সাধুরাম সটান শুয়ে পড়লো পায়ের কাছে। টানা বসে থাকার যন্ত্রণায় পা তুলে চেয়ারে বাবু হয়ে বসে আছি। পা না পেয়ে চেয়ারের পায়া চেপে ধরে বিষণ্ণ কুকুরের গলায় বললো,

: রাজব্যামো হয়েছে, গুরুদেব। চেয়ারে বসলে তোরও হবে। আমারে বাঁচা।

চমকে উঠলুন। কিডনির করুণ কাহিনি নয়। রাজকীয় রূপকথা।

: গুরুদেব, তুমি বাবা, তুমিই মা, বাঁচাও আমারে।

: বাবা, মা, আল্লা যাই বলো আমার কম্মো নয়। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

আমি ব্যাঙ্কের কর্মচারি। কিস্তিবাবু। গাঁয়ের লোক পিছন ফিরলে বলে, খিস্তিবাবু।

বলি : কিস্তি এনেছো?

কিস্তি শুনে সাধুরাম উঠে বসে। মালের রসে ফুলে টসটস করতো মুখখানা। চকচকে মাংস গলে ধুয়েমুছে তোবড়ানো টিনের কৌটো হয়ে গেছে। দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। আসলে সে হাসার চেষ্টা করছিলো।

: গুরুদেব, কিস্তি শোধ। সামনে চত্তিরে পাওনা হবে।

মাস আনি মাস খাই। সমাজ উদ্ধার করতে আসিনি। পাশ কাটাবার ধান্দায় পণ্ডিতের মতো নিদান দিলুম

: হেদিয়ে মরছো কেনো? আজকাল এটা কোনো অসুখই নয়। ছ'মাস নিয়ম করে ওষুধ খাও। আমাশা সারবে না। টি বি সেরে যাবে।

সাধুরাম খুব বিপাকে পড়েছে। কেঁদেই ফেললো।

: ওষুদতো খাচ্ছিলাম। পাঁজা পাঁজা ওষুদ। সহ্য হচ্ছে না। উল্টি দিয়ে দিয়ে পেট মচকে গেছে। পেটে কিচ্ছু থাকছে না। না খেয়েই মরে যাবো। বুকে, এইখানে, এইখানে জ্বলে যায়। পুড়ে যায়। অসহ্য জ্বালা।

দুইহাত দিয়ে বুকজোড়া হাতড়ায়। কোথায় দেখাবে? সবখানে জ্বালা। সাধুরাম হাঁপাচ্ছে। বুঝতে পারছি, সাধুরামের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছি। রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম

: মাল্লু চলছেতো তোমার? তাড়ি, বাংলু, পচাই, ধসাই?

সাধুরাম এমন মাথা নাড়লো হ্যাঁও হতে পারে নাও হতে পারে। বললে : ডাক্তারবাবু বলেছে আমাকে হাসপাতালে ভরে দেবে। হাত পা বেঁধে ওষুদ খাওয়াবে। আমি বাঁচবো না। গুরুদেব তোমার চ্যালা। তুমি বাঁচাও।

মহা উৎপাতে পড়া গেলো। কাজ কম্ম শিকেয় উঠে গেছে। নিজের শরীরটাও বইছে না। মাসের পর মাস আই আর ডি পি'র স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছি। কাল শনিবার। দু একদিন ডুব মারবো ভাবছিলুম। বাড়ি গিয়ে মেডিকেল ফেডিকেল কিছু একটা দিয়ে ম্যানেজ করবো। এখন দেখছি, সাত চোঙার বুদ্ধি এক চোঙায় ঢুকে যাচ্ছে। পোষা কুকুরের চেয়ে এ দেখছি নাছোড়বান্দা। কার মেডিকেলে কে ছুটি নেয়, 'খাবি খাই' অবস্থা।

মনে পড়ে গেলো, ডক্টর ডি. সেন। এম আর সি পি, এফ আর সি এস। চেস্ট স্পেশালিস্ট। লোকে বলে, দেবতা সেন। জেনারেল প্রাকটিসও করেন। গরিবের মা বাপ। ভাবতাম সৌভাগ্যক্রমে, এখন দেখছি, দুর্ভাগ্যক্রমে এক পাড়ায় বাড়ি। সাধুরামের

কপাল ভালো। ডাইরি ঘেঁটে নাম্বার পেলুম। ফোন লাগাতে পেয়েও গেলুম। ডাক্তারবাবু বললেন,

: যে ওষুধ খেলে রুগী জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। মানুষটা মরে যাবে। সে ওষুধ খাওয়াবেন কেন? ওষুধ বন্ধ করে দিন। ওকে নিয়ে চলে আসুন।

ডাক্তারবাবু। ব্যস্ত মানুষ। ফোন কেটে দিলেন। ভ্যালারে বাপু। ফ্যাসাদে পড়ে গেলুম। পাড়ায় বাড়ি। হাফ চেনেন। আসতে যেতে দেখা হয়। মৃদু হাসেন। হাসির একটা বাঁধনতো আছে। নিজেরও বিপদ আপদ আছে। কখন কী দরকার হয় ডাক্তারবাবুকে পাশ কাটিয়ে সাধুরামকে ছাড়ানো মুশকিল হয়ে গেল। অগত্যা আমিই সেই মদো (মধুসুদন)। অতএব চরৈবতি। যা আছে কপালে, হবে ; আমার এবং সাধুরামের। ধন্য গাধা, আরডিও। দেবল দাশগুপ্ত। ধান ভানতে শিবের গীত। গাও গাও।

প্রায় মধ্যরাত্রি:

লালগোলা (প্যাসেঞ্জারে)র তিনকুলে কেউ নেই। শিয়ালদা যায় কাঁদতে কাঁদতে। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে। কাঁদতে কাঁদতে ভুলেই যায় সে কেনো কাঁদছিলো। ঘণ্টা-কে ঘণ্টা বসে থাকো, চুপচাপ। বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হয়। খেয়ে, ঘুমিয়ে, খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করে পড়ে, ফের পড়ে আবার পড়েও কাল কাটে না, তখন আতালপাতাল ভাবি। হঠাৎ কান্নার কথা মনে পড়ে যায়। হেঁচকা হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে লালগোলা প্যাসেঞ্জার আবার চলতে শুরু করে। বউ, বাড়ি, পাড়ার ক্লাব, আড্ডা আর আছে চৌদ্দপুরুষের পাপ, নইলে কেউ লালগোলায় চড়ে!

সাতপাঁচ ভাবি, নতুবা সময় কাটে কই? বাঁজা বউ-এর ছেলে হয়েছে। সাধুরাম আজকাল আমার বউকে মা বলে ডাকে। বউ-এর ছেলে হলে, বরও বাবা হয়। ছেলের ঠাঁই হয়েছে, সদাশয় ডি.সেনের আশীর্বাদে, পাড়ার ক্লাবে। পথের ধারে পড়ো একটা ঘরে। আর চোদ্দপুরুষের পাপ, আমার সন্তান যখন ক্লাব ঘরে থাকেন। আসতে যেতে খবর নিতে হয়। না নিলে পিতৃকর্তব্যে অবহেলা ঘটে। পাপ বাড়ে। মাতৃদেবীর হাসি মুখে মাছি পড়ে।

চোখে ঘুম ঢুলঢুলু। শরীরের নাটবল্টু সব ঢিলেঢালা। হরিণডাঙা গোটা একটা গ্রাম, লালগোলা একটা আস্ত ট্রেন, কারো কোনো দায় নেই। সাধুরামকে পাঠিয়ে দিয়ে খালাস। এখন রাত-দুপুরে খবর নিয়ে ঘরে ঢোকার ঝক্কি আমাকেই পোহাতে হবে। ছোঁয়াচে রোগ। বলা যায় না। কী থেকে কী হয়! আসতে যেতে জানালার ফুটো গলিয়ে দেখি। শুয়ে আছে, বসে আছে, হাসির কথা, ইদানীং দেখি, অঙ্গুঠাছাপ হরিণডাঙার সাধুরাম, বই পড়ে কিংবা বইয়ের ছবি দেখে দিন কাটায়। প্রবাদ আছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এককালে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের নীচে লেখাপড়া করেছেন। তার লেখা বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয়ভাগে অবিস্মরণীয় সেই মহান ল্যাম্পপোস্টের ছবিখানা দেখেছি। দ্বিতীয়ভাগের শেষপৃষ্ঠা থেকে কবে তিনি আমাদের পাড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন, আশ্চর্য। এখন দেখলুম। ঘুমঘুম চোখ। বারদুয়েক মোছামুছি করেও দেখলুম, সাধুরাম সেই ল্যাম্পপোস্টের নীচে উবু হয়ে বসে আছে। পথের ধারে। সামনে মাটিখোঁড়া গর্ত। মানে উনুন। আগুন জ্বলছে। ভাত ফুটছে। একহাতে খুন্তি। অন্যহাতে বই। বিদ্যাসাগরের বাচ্চা ! বইখানা বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ নয় হলপ করে বলতে পারি। বেশ মোটাসোটা। বিদ্যাসাগরের হলে ভ্রান্তিবিলাস-টিলাশ হতে পারে। জিজ্ঞেস করলুম,

: এত রাত হলো ? মা, ভাত দেয়নি ?

সাধুরাম বই খুন্তি রেখে খুশিতে শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে : গুরুদেব নমস্কার। দেরি হয়ে গেলো। নেশা মুক্তি সমাজের মিটিং ছিলো ক্লাবে। এত রাতে আর আনতে যাইনি। কতক্ষণ লাগবে ? দুটো ফুটিয়ে নিচ্ছি।

সমস্ত পাড়া গুটিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। রাস্তা কে রাস্তা শুনশান। গোটাকয়েক কুকুর, আমি ব্যাঙ্কওয়ালা, আর হুইনডার (চোর গাঁয়ের) সাধুরাম বাইরে।

সুযোগ পেয়ে সাধুরাম শাসন করে দিলো,

: তোর এত রাত হলো বড়ো ? মা একা জেগে আছে। তাড়াতাড়ি যা বটে।

ভদ্রতার মোড়কে অভদ্রতা আর করতে দিলো না। অন্তত একটা খুচরো পাপ থেকে রেহাই পেলাম। আর মিনিটপাঁচেকের পথ। দেখি, তিন মিনিটে যেতে পারি কিনা।

সাধুরামের উঁচু লম্বা চেহারার সামনে দাঁড়ালে আজকাল কেমন আড়ষ্ট লাগে। নিজেকে পাপী, ছোটলোক-ছোটলোক মনে হয়। হাতে শ্যালো পাম্পসেট পেয়ে পরিশ্রম আর মাল খাওয়া দুই-ই বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তারিখে তারিখ কিস্তি দেয়। এমন আদর্শ দেনদার পাবো কোথায়। আমিও চাপিয়ে দিলাম। পাম্পসেট লোনের উপর পাটচাষের লোন। পাটচাষের গায়ে ধানচাষের লোন। লোনের উপর লোন। নে, সুদ কতো গুণবি গোন। সাধুরামেরও নেশা বেড়ে দিনরাত একাকার হয়ে গেলো। পয়সার নেশা, মদের নেশা, শরীর জুড়ে ঘামের নেশা, উদয়াস্ত অত্যাচার শরীর সইবে কেনো ? ফতিমা মেয়েমানুষ। মদের নেশা ছিলো না। তাকে রেহাই দিলেও, সাধুরামকে দিলো না। আমাকেও যেন লোনের টার্গেটে পেয়ে বসেছিলো। নেশার দায় বড়ো দায়। আমি সাধুরাম, দু'জনেই নেশার দায়ে ধরা পড়ে গেছি। আমি সুস্থ। সাধুরাম ভুগছে। অপরাধ কি আমার বেশি ?

ভোর হলো:

দরোজা খুলে দেখি, ও বাবা, এতো, গোটা হরিণডাঙা উঠে এসেছে। ফতিমা, লক্ষ্মী, সাধুরাম সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। সদাহাস্যময় সাধুরাম গলা খুললে,

: ডাক্তারবাবু ছুটি দিয়ে দিলেন। আমি সুস্থ হয়ে গেছি। এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দিলি, গুরুদেব।

ওরা নিতে এসেছে। চলে যাচ্ছি। শীতের বিহান খুব খাটো। ঘাড়েগর্দানে একাকার। চোখে দেখা যায় না। রাত থাকতে বেরিয়েছি। তাও দিনমান এসে গেলো। ফসলগুলান ডাকছে। বিদায় দে।

দাঁড়িগোঁফ কামিয়ে ধোপদুরস্ত সাধুরাম। আগের চেয়ে ঝকমকে। মুখভর্তি সেই হাসি। মুখে কোনো গন্ধ নেই। মদ খাওয়া সে ছেড়েছে। তবু সাধুরামের বকা অভ্যেস আর হরিণডাঙার গল্পটা শেষ হলো না।

সাধুরাম বলেই চলেছে : এ আমাদের ব্রজবাসী। চিনতে পারিস ? আমার প্রতিবেশী। ভালো ছেলে। চুরি-ডাকাতি আর করে না। শ্রীব্রজবাসী সর্দার। পিতা, ঈশ্বর বৃন্দাবন সর্দার। সাকিন, হরিণডাঙা। জেলা, ন'পরগণা। দেশ, ভারতবর্ষ।

ব্রজবাসীর মুখে মুচকি হাসি। দ্বিগুণ উৎসাহে বলে

: যন্তরপাতি সব পুঁতে ফেলেছি, স্যর। ফতিমার জমিতে জন-মুনিশ খাটি। সাধুরামের ঘরে এখন লক্ষ্মীর বাস। ফতিমার দক্ষিণায় নুন-ভাত জুটে যায়।

গল্পটা আসলে এখান থেকে আবার শুরু হলো।

আমার বাঁজা বউ কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। টের পাইনি। সাধুরামের চোখদুটো ছলছল করে উঠলো।

বললে : ফতিমারা নিতে এসেছে। চলে যাচ্ছি মা। দেওয়ার কিছু নেই। আমার মেয়ের লক্ষ্মী নামখানা তোকে দিয়ে গেলুম। আমার বউ কাঁদছে না বটে, দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। শাড়ির আঁচলখানায় মুখ চাপা দেওয়া। ফুলে ফুলে উঠছে। সাধুরাম সাষ্টাঙ্গে সাটপাট শুয়ে পড়ল দরোজার সামনে। দেখাদেখি ফতিমা, ব্রজবাসী, লক্ষ্মীও শুয়ে পড়লো সার বেঁধে। সাত হাত পিছিয়ে গেলুম। ওদের প্রণাম নেবো কোন আস্পর্দায়। আমি পাপী। সুদখোর। আমার চোদ্দপুরুষ পাপী। আর পাপ বাড়িয়ে কাজ নেই।

অবসর নিয়েছি। চুলও সাদা হয়েছে। আজকাল বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকি। সামনে খোলা আকাশ খেলা করে। আকাশের গায়ে শেয়ালদা স্টেশন। লালগোলা ছেড়ে যায়। কয়লার ইঞ্জিন। মেঘ ওড়ে, না ইঞ্জিনের ধোঁয়া ওড়ে! চোখেও ভালো দেখি না। বাজার, মর্নিংওয়াক, বেরুবার মুখে, চৌকাঠ পেরুতে মনে পড়ে, এইখানে কোনো এক হুইনডার হাসি কান্না পড়ে আছে। যেন বাঁশঝাড়ের আলোছায়া। পবিত্র আলপনা। আলগোছে ডিঙি মেরে পার হই, যেন মুছে না যায়। বৃদ্ধের সম্বল।

মৃত্যু থেকে ফিরে

[দেশ আলবেনিয়া। গল্পকার, নউম প্রিফতি। গল্পটি ইংরেজি ভাষা থেকে অনুবাদ]

প্যারেড। প্যারেড হবে বেলা এগারটায়। ম্যাথাজেনের প্রাক্তন সব যুদ্ধবন্দী কমিটি আবেদন জানিয়েছে। আবেদন মজবুত করেছে মিত্র-শক্তি। এমন মহড়া হবে ইতিহাস পর্যন্ত চোখ পালটিয়ে দেখবে। ভুলে যাওয়া ইতিহাস, মুছে যাওয়া ইতিহাস, চলমান ইতিহাসের পথ ধরে বহু বিজয়বাহিনী কুচকাওয়াজ করে চলে গেছে; ফুলে, ফ্ল্যাগে, ম্যারাপে অলংকৃত করে—বয়ে নিয়ে গেছে জয়, স্মৃতিচূড়া, উল্লাস মুখর অস্ত্রশস্ত্রগুলি। নিয়ে গেছে ঘোড়া, ঠেলাগাড়ি, রথ, হাতি আর খচ্চর, গেছে অশ্বারোহী সৈন্যদল, মোটরে মোটরে ছয়লাপ সাঁজোয়া, গোলন্দাজ বাহিনী, যন্ত্রবিজ্ঞানীর দল, ঝাঁক ঝাঁক নীল জ্যাকেটপরা নাবিকেরা, স্তবকে স্তবকে কড়া পোশাকের বৈমানিকদল, বাছাইকরা রক্ষী বাহিনী মিলিটারি স্কুলের ক্যাডেট—সকলেই উৎসব করে চলে গেছে। জীবন্ত কঙ্কালের এমন মহড়া কখনো দেখা যায় নি। এমনকি তাদের পোশাক-আশাক, জেলখানার গরাদের মতো আঁজিটানা, চোখ ঠারিয়ে দেখার মতো, পুরোপুরি সাধারণের বাইরে। মনে হবে, মহড়ার পোশাক-আশাক শিবিরে ছেড়ে রেখে, কুচকাওয়াজের জন্য পাজামা পরে বেরিয়ে এসেছে। জ্যাকেটের বাঁ দিকে প্রত্যেকেরই একটা করে নাম্বার। এ নাম্বার, না কোনো রেজিমেন্টের না কোনো ডিভিশনের। বরং সুবিধে প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা নিজস্ব নাম্বার। নাম্বার প্লেটের মতই স্পষ্ট। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের পিঠে একইরকম লাল ত্রিভুজ ছাপ মারা। ওরা যে ক'জন টিকে আছে সব রাজনৈতিক বন্দী। ইউরোপের বিভিন্ন দেশোয়ালি। বাকিরা এখন স্রেফ ধোঁয়া আর ছাই। ধোঁয়া মিলিয়ে গেছে আকাশে। নরকের চুল্লির মতো শ্মশানের চিতা জ্বলত দিনরাত। জ্বলত হাহা শব্দে। মানুষ পুড়ত। আর উগড়ে দিত উর্ধ্বে। রাশ রাশ ছাই ছড়ান হতো ক্ষেতে খামারে। নাৎসী বিশেষজ্ঞদের মতে নরভস্ম উত্তম সার হতে পারে। এবং একটি বিশেষ খামারে সারের সর্বাধিক মাত্রা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল।

গ্যাসচেম্বারে কতশত মানুষ দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে, কতশত মানুষ অত্যাচারে পঙ্গু, প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে। কতজন যে বুলেটের মুখে ...? শিবিরটা ছিল সাক্ষাত নরক।

মানুষ খেকোর হিংস্র হাঁ আর লোল-জিভ। মাসের পর মাস, হাজার হাজার পোল, রাশিয়ান, ফরাসি, বেলজিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, চেক, গ্রিক, বুলগেরিয়ান, যুগোশ্লাভ, আলবেনিয়ান, ইতালিয়ান, জিপসি, ইহুদি, জার্মানদের আস্ত গিলে ফেলত। হ্যাঁ, জার্মানকেও। কোনো জাতকেই নাৎসিরা আপন বলে ভাবতে শেখেনি। যাকে যেখানে পেয়েছে, শ্যেনদৃষ্টির চোখে চোখ রাখলেই, আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। ছেলে, বুড়ো নারী পুরুষ নির্বিচারে সমান অপরাধী। যতই ওরা অন্ধ-আনুগত্যে বৈজ্ঞানিক কায়দা কানুন করে, টিপে টুপে দেখে শুনে লড়ুক না কেন। ভয় ছড়িয়ে, প্রতিহিংসা নিয়ে, কচুকাটা করে, গণকবর দিয়ে, এমনকি Concentration Camp যা নিজেনিজেই ঘৃণা, প্রতিরোধ আর সংগ্রামের বান ডাকা জোয়ারের গলা টিপে ধরতে ওস্তাদ, সেখানে পুরেও কিছুতেই সামলাতে পারছিল না। নাৎসিদের কালান্তক বাহিনী রক্তবীজের মতো বেড়ে যাচ্ছিল। নাৎসিরা পৃথিবীকে একটা জ্বলন্ত চুল্লি বানিয়ে ছেড়ে দিল। এখন সেই প্রজ্বলন্ত আগুনের লোল জিহ্বায় নিজেরাই ঝলসাচ্ছে। একদিকে বিসকে উপসাগর থেকে পলোপন্নেসিয়ান দ্বীপ পর্যন্ত, অন্যদিকে নরওয়ের দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পাহাড়ঘেরা সমুদ্রের খাঁড়ি থেকে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত, কোথায় নয়, অটল সৈন্যবাহিনী, প্রতিরোধী মানুষেরা, কে নয়; কারখানার শ্রমিকেরা, চাষি, মজুর, ফ্যাসিস্ত মড়কে লড়ে যাচ্ছিল মানুষ যে যেখানে, যেভাবে পারে লড়ছিল। যতদূর সাধ্যে কুলায় বন্দীরা পর্যন্ত লড়ে যাচ্ছিল।

এখন, এখন তাদের অধিকার আছে প্যারেডে, মহড়ায়। নাৎসিদের গোহারা পরাজয়ের বিপক্ষে, উৎসবে। তারা মৃত্যুর পথকে ঘুরিয়ে ধরেছে জীবনের দিকে। শুরু হবে তাদের যাত্রা। কুচকাওয়াজ। আর নিছক নাম্বার নয়। তারা মানুষ। তাদের নাম আছে। শুধু শুরু নয়। পদবিও আছে। যুদ্ধ-বন্দী নয়। কাঠগড়া, অপমান নয়। আর কোনো নির্যাতন নয়। জন্তু-জানোয়ারের মতো জঘন্য ইতর জীবন আর নয়। তারা মানুষ। এখন স্বাধীন মানুষ। গর্বিত মানুষ। গর্ব স্বাধীনতার জন্য। গর্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য। গর্ব সংগ্রামে শাস্তির জন্য। নারকীয় যন্ত্রণার মধ্যেও যে গর্বে বেঁচে ছিল, গর্বিত সেই গর্বের স্পর্ধার জন্য।

ভোর। ধীরে ধীরে কুটিরের জানালা দিয়ে স্বচ্ছ আলো এসে পড়েছে ভিতরে। মিনেলো ঘুম থেকে জেগে উঠল। কান পেতে ছিল। এখুনি সাইরেনটা চিৎকার করে উঠবে। খানিকটা বুঝি অভ্যেস হয়ে গেছে। সাইরেন বাজার কয়েক মিনিট আগে ঘুম ভেঙে যায়। এবং প্রতীক্ষা করে। ঝড়ো আর্তনাদ করে ওঠে সাইরেন। শিরদাঁড়ার প্রত্যেকটি হাড় পর্যন্ত কাঁপে। পরিবর্তক্রিয়া। জীবনের পনেরটা মাস কেটে যাচ্ছে, এই জেলখানায়। বার বার মার-ধোর, অত্যাচার সহ্য করতে করতে মিনেলা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেও শিখে গেছে। কোনোকিছু ষড়যন্ত্রের লুকোচাপা ব্যাপারগুলোয় ওদের নজর এড়িয়ে চলত। দাঁড়াত ভিড়ের মাঝবরাবর। আর নিজেকে পাটিগণিতের একটা অসীম সংখ্যার

দিকে ছুড়ে দিত। খাটান দিতে বেরুনোর গোছগাছ, স্কোয়াডে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো সব মিলিয়ে বন্দীরা কুড়ি মিনিট মাত্র সময় পেত। এস. এস., গার্ড আর নেকড়ে-কুত্তাগুলো শ্যেন দৃষ্টিতে পাহারা দিত। মিনেলা আরও কিছুক্ষণ কান খাড়া করে থাকল। সাইরেনটা কুৎসিত চিৎকার করে উঠবে। যেন ভয়ংকর নেকড়ের একটা আর্তনাদ এখনি ছাউনির ছাদ আর জানালা দিয়ে ব্যারাকে লাফ মেরে ঢুকে টানা হেঁচড়া শুরু করবে। একটা বুকভাঙা লম্বা কান্নার মতো কোঁকানি দিয়ে শুরু হয় শব্দটা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই উঁচু পর্দায় চড়তে শুরু করে। শেষমেষ চিল-চিৎকারে হাজার হাজার কয়েদিকে ঝাঁকুনি দিয়ে ঠেলতে শুরু করে। কিন্তু ... সাইরেনটা বাজছে না কেন? ওঃ হো! সাইরেনটা বাজানো হচ্ছে না।

এটা মার্চ মাস। একটা সকাল বটে। নরম আলো আয়াসে গড়িয়ে পড়ছে শ্মশান চিমনির গা বেয়ে। ছড়িয়ে পড়েছে ঘড়িঘরের মাথায়, জমায়েতি উঠোনে, আর টান টান করে তুলেছে নিজের সবুজ মাঠখানা। হ্যাঁ, গতকালই তো, মিত্রশক্তি হাঁটতে হাঁটতে শিবির টিবির সব স্বাধীন করে ফেলেছে। কমান্ডার, মিনারের গার্ডফার্ড সব ভোঁ-ভাঁ হয়ে গেছে, হাওয়ার গতিক সুবিধের না। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। প্রশাসনিক ভবন খাঁ খাঁ করছে। সবেধন নীলমণি ডাক্তার আর হাতের পাঁচ দু'চারজন রাঁধুনি-কাঁদুনি পড়ে আছে। মিনেলা গা ঝাড়া দিল। সে কি রোবট নাকি! নাকি জড়ভরতের মতো শুয়ে থাকার সময়। এখন সে স্মৃতির ভিতরে হাতড়াতে শুরু করল। দামি একটা কিছু, মূল্যবান একটা প্ল্যান, গতকালই তো ছক করা হল। ভাবনাটা সারা বিকেল মাথার ভিতর গুন গুন করেছে, সারারাত ঘুমের মধ্যে ফর্ ফর্ ফর্ ফর্ জ্বালিয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম রাত্রি, যোগ্য মর্যাদায় কাটাল মিনেলা। অকল্পনীয় রাত। কিন্তু ভোরে তার ঝটপট উঠে পড়া উচিৎ ছিল। একদম ভোরে। প্ল্যানটাকে কাজে লাগাতে হলে এটাই সঠিক রাস্তা। ঠিক হ্যায়। প্রত্যেক কুটিরে গিয়েই খুঁজে বের করতে হবে আলবেনীয়দের। একা অসম্ভব। ফেনি ভারোসি তুমি কোথায়! জিরোকাস্ত্রার ফেনি। মাত্র এক হপ্তা আগেই ফেনি ছিল। ছিল বুক জুড়ে। ভাগাভাগি করে নিয়ে ছিল সমস্ত চোখের জল আর রক্তপাত। ভাগ করে নিয়েছিল একচিলতে বাঙ্ক। জার্মানরা আট মাস আগে বালকানের কোনো একটা জায়গা থেকে ওকে ধরে এনেছিল। জার্মানরা ওকে ফাহনা (বাংলাভাষায় : পতাকা) বলত। যখনই ডাকত তাচ্ছিল্যে উল্টে দিত ঠোঁট। এক সপ্তাহ আগে ফেনি মারা গেছে। ফেনি নেই। ঘুমের মধ্যে সে বুক ফসকে চলে গেছে। হারিয়ে গেছে খুব ধীরে ধীরে। না খেতে পেয়ে, কষ্টে যন্ত্রণায়। ক্ষীণ হয়ে আসছিল দিন দিন। শুকিয়ে যাচ্ছিল। শেষ দিকে ফেনি একটা জীবন্ত কঙ্কাল হয়ে গেল। হাঁটার সময় হাড়-কজ্জায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হত। সেইরাতে নিদ্রাহীন মেনিলা বসে ছিল তার পাশে। দূরে কোথাও গুমগুম শব্দে রাত কেঁপে উঠছে। মেনিলা বুঝতে পারে মুহুর্মুহু বন্দুক গর্জাচ্ছে। তবু সে নিশ্চিত হতে চাইছিল। পাশে শুয়ে থাকা বন্ধুকে ঝাঁকানি দিয়েছিল।

—ফেনি শুনতে পাচ্ছ? আকাশ পরিষ্কার। মেঘের ডাক তো মনে হচ্ছে না?

ফেনির চোখের মণি ঘোলাটে আর দৃষ্টিহীন হয়ে এল। খোলা চোখের আয়নায় বৈদ্যুতিক আলো একবার ঝলসে উঠল। মারা গেল ফেনি। যুদ্ধের ডাক এসে ফিরে গেল। ফেনি সাড়া দিল না। আর কোনোদিন দেবে না। সকালে ওকে নিয়ে যাওয়া হল স্ট্রেচারে। গভীর শোকস্তব্ধ মেনিলা পায়ে পায়ে কুটিরের দুয়োর পর্যন্ত গিয়েছিল। বন্ধুত্বহীন, নিঃসঙ্গতম মধ্যরাত্রি কেটে গেল মেনিলার। আজও বয়ে যায় বন্ধুত্বহীন রাত্রির নিসঙ্গতম অন্ধকার স্রোত। কেউ নেই। কার সঙ্গে দুটো কথা বলে? আলবেনীয় ভাষায় প্রাণের কথা। কেউ নেই। পাশে কেউ নেই।

লাফ মেরে উঠে পড়ল মেনিলা। অনেক কাজ পড়ে আছে। মুক্ত-বন্দীরা ময়দানে ঢুকে পড়ার আগে প্রত্যেক কুটিরে যেতে হবে। এরপরে জনতার ভিড়ে সহযোদ্ধাদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। প্রতিদিনের মতো সে নিদারুণ ক্লান্ত। নিঃশেষিত। আজ তার অনেক দায়িত্ব। একান্ত নিজস্ব। কর্তব্যবোধে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলল। আলবেনিয়ান হলেই জড়ো করতে হবে। আর, এক জায়গায় সকলে কাছাকাছি থাকতে হবে।

একনম্বর কুটিরের দরজা সে ঠেলে খুলে ফেলল। হাতের তালুদুটো শাঁখের মতো মুখের সামনে ধরে বুকের তাবৎ বাতাস ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে দিল ঊর্ধ্বমুখে।

—হেই এদিকে কোনো আলবেনীয় আছ?

সে বাঙ্কের অলিগলির ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আর গলা ফাটিয়ে ডাকতে থাকল। অনেকে তখনও ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। তারা শাপ-শাপান্ত জুড়ে দিল। অনেকে পাগল-ছাগল ভেবে গা টেপাটিপি আর হাসাহাসি করছিল। মেনিলা থোড়াই পাত্তা দিল। যখন একখানি আলবেনিয়ান হাত সটান এগিয়ে এল তার দিকে, মেনিলা সবেগে জড়িয়ে ধরল তাকে। যেন ভাই। একের পর এক, এভাবেই এগারোজন আলবেনিয়ান কে সে জোগাড় করল। একজন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল—ব্যারাকে নেচে নেচে বেড়িয়ে ফ্যাঁস ফেঁসে গলার বারোটা না বাজিয়ে, মাইকে ডাকতে কি হয়েছিল?

আঁচকাঁচ করে মেনিলা কুচি জবাব দিল—মনে পড়েনি। অভ্যাসে করায় কর্ম কি দোষ আমার। জার্মান পাঁঠাদের শিঙে ফোঁকা আর শিঙ ঝাঁকান শুনতে শুনতে সে ভুলে গেছে ওটা কাজে লাগত পারে। তার মাথায় ঢুকে আছে, লাউডস্পিকার আলবেনীয় ভাষায় কথা বলতে রাজি হয় না। কক্ষনো রাজি হয় না।

—ভাই সব—মেনিলা বলতে শুরু করে—আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা কয়েকজন মাত্র বেঁচে আছি। কিন্তু যে কজনই থাকি না কেন, আমাদের দেশের, আমাদের জন্মভূমির,

আমাদের প্রিয় আলবেনিয়ার প্রতিনিধি আমরা। সারা বিশ্ববাসীকে জানানো আমাদের কর্তব্য। কিভাবে আমরা সংগ্রাম করেছি। নাৎসীদের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছি। বলতে হবে এই সংগ্রামে আলবেনীয়রা অংশ নিয়েছিল। এবং, অগুন্তি ত্যাগের মহিমায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। হ্যাঁ, আমরা লড়াই করেছি। লড়াইয়ের ময়দানে অগ্নিদগ্ধ হয়েছি। মৃত্যুবরণ করেছি। অন্তরীণ থেকেছি। আমরা পালিয়ে যাইনি। ভাইসব, আজ বেলা এগারোটায় প্যারেড হবে। আমরা অংশ নেব।

—মানুষ চিনবে কিভাবে, আমরা আলবেনীয়?

—আমরা একটা প্ল্যাকার্ড বয়ে নিয়ে যাব। প্ল্যাকার্ডে লেখা থাকবে 'আলবেনীয়'।

দু'নম্বর কুটিরের ইশাক বলল, আমার পাশের ঘরে ফরাসিরা একটা পতাকা বুনছিল।

—ঠিক, আমাদেরও একটা পতাকা চাই। —চিঁ চিঁ স্বরে বলল শেরিফ মেটা। ওর গলা খ্যাংরা কাঠির মতো সরু। মনে হচ্ছিল শব্দগুলো কণ্ঠা ছিঁড়ে বেরুচ্ছে।

—তাই ত, পাব কোথায়? প্যারেডতো দু'ঘন্টার মধ্যেই শুরু হবে।

—খুঁজে বের করতে হবে।

মেনিলা দৃঢ় প্রত্যয়ে বলে উঠল—যেভাবে হোক খুঁজে আমাদের বের করতেই হবে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যারা লড়েছে, তাদের পাশে আমাদের পতাকা উড়বে। নিশ্চিত উড়বে।

এমনভাবে বলল, যেন সে জানে, স্বদেশবাসীদের খুঁজে বের করার মতোই কুটিরগুলোর মধ্যে কোথাও কোণা-খোচড়ে লুকিয়ে আছে। শুধু খুঁজে পেতে যেটুকু দেরি।

মিনেলা ভাবতে লাগলো। তাকে পেতেই হবে, এই ব্যারাকে। কোথায় আছে এক টুকরো লালকাপড়। আবছা কি ফিকে কোন ব্যাপারই না। তবে যতটা সম্ভব লাল হওয়া চাই। দ্রুত পা বাড়িয়ে দেওয়ার পথে মিনেলা বিশ্বাসের গভীর থেকে উচ্চারণ করল—আপনারা একটা খুঁটিকে চুড়ো তৈরি করার মধ্যেই আমি ফিরে আসবো।

অভ্যাসবশত বাটির মতো টুপিটা মাথায় ঠেসে দিল মিনেলা। লিকলিকে দুখানা পায়ে যত দ্রুত পারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফ্লানজ ব্রিমার একজন শিল্পী। ভদ্রলোক অস্ট্রিয়ান। সুন্দর ছবি আঁকে। এক সময় মিনেলার পাশের বাঙ্কে ঘুমাত। কাজ করে ব্যারাকের অফিসে। জার্মানরা যখন দেখল, ফ্লানজের অপূর্ব হাতের লেখা, তারা ওকে জেরার হাত থেকে রেহাই দিল। কাজ দিল অফিসে। যদি বেঁচে থাকে, ফ্লানজ ব্রিমার নিশ্চয় তার সাহায্যে আসবে। ব্রিমার তখন পায়ে পায়ে নিজেকে তাতিয়ে নিচ্ছিল। মার্চ মাসের মিষ্টি রোদ্দুর। খুবই আরামদায়ক। এমনিতেই সে শান্তশিষ্ট, তাকে আরও ধীর স্থির মনে হচ্ছিল। কুটিরের আশেপাশেই এক লহমা আয়েশ করার জন্য পায়চারি করছিল।

ফ্লানজ, তুমিই একমাত্র আমাকে উদ্ধার করতে পার।

বালকানদের রীতি ব্রিমার জানত। নাম জানা সত্ত্বেও পদবী ধরে ডাকা বড্ড বিশ্রী লাগে। অষ্ট্রিয়ানরা তো রীতিমত অপমানিত বোধ করে। প্রথম প্রথম ফ্রানজ বিরক্ত হত। কাছাকাছি দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে বন্ধুতার আবেগ চিনতে সে আর ভুল করে না।

—কী খবর? পাশপোর্ট লাগবে নাকি? এটা তো দূতাবাস নয় হে!

হেসে উঠল ব্রিমার।

—ঠাট্টা করো না তো। সময়ের দাম আছে। এক টুকরো লাল কাপড় দিতে পার?

—রেশমি?

—যদি পার। সুতি হলেও চলবে। তবে লাল হওয়া চাই।

—বড্ড দেরি করে ফেলেছ বন্ধু, দুঃখিত। দর্জিখানা, লন্ড্রি কোথাও এক টুকরো ত্যানা পর্যন্ত পড়ে নেই। যারা চলে গেছে। কুড়িয়ে নিয়ে গেছে।

বলে সে তার চোখ ঘুরিয়ে ধরল আকাশের দিকে। —ওদের কম্বলগুলো পড়ে আছে। সবকিছুই আজ সকালে আমাদের দখলে চলে এসেছে। চলবে?

—কোথাও কোন আশা নেই?

—না। সে গুড়ে বালি। একগাদা জার্মান পতাকা পড়ে আছে। তবে তা দিয়ে কিছু হবে না। এক মিনিট। দাঁড়াও, মিনেলা একমিনিট। তিনটে লাল জার্মান পতাকা দিয়ে দিব্যি একটা নতুন বানানো যায়। নেবে?

ফ্রানজের মগজ থেকে হঠাৎ বুদ্ধিটা গজিয়ে উঠল। মিনেলা কুচির চোখে বুদ্ধিটা কিন্তু লাগসই হল না। মনে পড়ে গেল কিছু একটা। ঘৃণায় অশ্রদ্ধায় ঠোঁট মুখ বেঁকে গেল। ফ্রানজকে বেপাত্তা করে দিল। মিনেলা যেনো নিমরাজি হয়ে বলল—ঠিক আছে, না হয় লাল কাপড় হল। কিন্তু একটা কালো রঙের ঈগল দরকার।

—কালো কি হতেই হবে? জার্মানদের প্রতীকী ঈগলটায় কালো রঙ চাপিয়ে দিলে হয় না?

রাগে অবজ্ঞায় মিনেলা বলে উঠল—ওদের ঈগল একটা পুটুলি, কুঁজো মার্কা, জানোয়ারদের মতো থাবা মেরে কিছু আঁকড়ে আছে। আমাদের ঈগল একদমই আলাদা। তাছাড়া আমাদেরটার দুটো মাথা।

—যাঃ! গুলগাপ্পা। জীবনে কখনো একটা ঈগলের দুটো মাথা দেখিনি।

—হ্যাঁ, বন্ধু, তুমি দেখবে। একটাই। সেটা আমাদের পতাকা জুড়ে। একটা পেন্সিল আছে তোমার কাছে? মিনেলা সর্বান্তকরণ দিয়ে একটা দু'মাথাওয়ালা ঈগলের নকশা

আঁকল। এবং বুঝতে পারল ছবি আঁকায় তার কোনো দখলই নেই। তার স্বপ্নের ঈগল আকাশ-পাতাল ফারাক।

তাহলেও ছবিটায় দুটো মাথা, বিশাল বিস্তৃত ডানা সবই সে এঁকেছে। সেই ছোটবেলায় যেমন দেখেছিল, সব এঁকেছে। এখন শুধু শিল্পীর হাতের ছোঁয়া দরকার।

ফ্রানজ ব্রিমার হেসে ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। মুখের কোণায় কতগুলো ভাঁজ ফুটে উঠল।

ঘন্টা খানেক পরেই দু'মাথা ঈগলের ছবি আঁকা একটা পতাকা উড়িয়ে দিল মিনেলা। পতাকা উড়ছিল প্রাক্তন যুদ্ধবন্দীদের মাথার অনেক উপরে। যখন শুনল, মিত্রশক্তি ঠিক করেছে ইংরেজি বর্ণের ক্রম অনুযায়ী প্যারেড সাজান হবে, আনন্দে তারা হুল্লোড় করে উঠল। আলবেনীয়রা থাকবে সবার, সবাইয়ের সামনে। তাদের পরেই অস্ট্রিয়ানরা। তারপর বেলজিয়ামবাসীরা। এইভাবে প্যারেড সারিবদ্ধ হবে। পেরিকপামা চাইছিল পতাকাটা তার হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে উড়বে। পতাকা এখন হাত থেকে হাতে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। দুবার ঘোরার পরেই, পামার মাথা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল। নিঃস্ব, হাড় সম্বল পা দুটো আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সে পড়ে গেল।

তার কপালে, হাড়-বেরুনো মুখে ফুটে উঠেছিল হিমেল ঘাম। সীমানার বাইরে পেয়ে ভোরের শিশির যেন তাকে লুফে নিয়েছে। কুয়াশার জলে যেন ভিজে গেছে তার বহু কালের শুকনো ঠোঁট।

—পেরিক, চলো। ভাইয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। টেনে নিয়ে চলো নিজেকে। আমাদের প্যারেড এসে গেছে।

সে তার মাথা সোজা, উঁচু করে ধরতে চাইল। আহ্! কী করে সম্ভব এটা। একটা মানুষ ফিনফিনে চামড়া দিয়ে মোড়া। চামড়াও বলা যায় না। একটা ঝিল্লি। হাড়ের দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সরু সরু নীল শিরা, শরীরের গ্রন্থি, স্নায়ু-জালিকার অসংখ্য সুতো পর্যন্ত। যেন টিসু কাগজের মত স্বচ্ছ।

ধীরে ধীরে সে শান্ত হল। স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাসপ্রশ্বাস। সে সাহায্য চাইল তাদের। একখানা হাত বাড়িয়ে দিল। চেষ্টা করছিল নিজে নিজেই উঠে দাঁড়ানোর জন্য। কমরেডদের হাত ধরে কোন রকমে হাঁটতে শুরু করল।

প্যারেড শুরু হল। সূচনা করল আলবেনীয় যুদ্ধবন্দীরা। সকলের সামনে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছিল মিনেলা কুচি। আলবেনীয় পতাকা উড়ছিল তার হাতে। এখন আলবেনীয়রাই সমস্ত দেশের প্রতিনিধি। ভোলা কি কোরচা, ডুরিস কি ডিব্রা কোত্থেকে তারা এসেছে, কোনো ঘটনাই না। তারা আলবেনীয়। তারা ব্যারাকের পথে পথে কুচকাওয়াজ করে চলেছে। তারা লড়াকু। একই আদর্শের জন্য সংগ্রামশীল।

পেরিক বেঁকে যাচ্ছিল। বন্ধুদের হাতে শরীরের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েছে। তবু পা দুটো ঘষটে ঘষটে নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছে। যেন সে শরীরের উপর জরুরি তলব জারি করেছে। টেনে তুলে আনছে তাবৎ শক্তি। নিঃশেষ করে ফেলতে চাইছে সমস্ত সামর্থ। প্যারেডে অংশ নিতেই হবে। কিন্তু পারল না। পড়ে গেল। ডাক দিল মিনেলাকে।

—নেলা, স্বাধীনতা দেখলাম। মনে হচ্ছে জন্মভূমিকে আর দেখতে পাব না। কিন্তু ম্যাথাওজেনকে মনে রেখো। ভুলো না।

—কী বলছ কি তুমি! এ সব কেন বলছ? আমরা বহুদূর থেকে আসছি। এখনও আমাদের অনেক পথ যেতে হবে। মিনেলা তাকে শক্তি যোগাচ্ছিল। কিন্তু সে নিজেই জানে সে কী বলছে। এই পনের মাস সে মৃত্যুর সাথে ঘর করেছে। মৃত্যুকে সে ভালই চেনে।

আজ তাদের দুঃখ রাখার জায়গা নেই। এরকম কষ্ট তারা কোনোদিন পায়নি। তারা বিস্মিত। বিহ্বল হয়ে গেছে। আজ তারা স্বাধীন। এরকম একটা মুহূর্তে পেরিক মারা যাচ্ছে। আজ ভাবতে পারে, তারা গ্যাস চেম্বার থেকে মুক্ত, এস্ এস্ দের চাবুক থেকে মুক্ত, মুক্ত ওদের গুলিবারুদ থেকে! মুক্ত! অদ্ভুতভাবে মুক্ত! দু'দিন আগে হলেও মনে হত পেরিকের মৃত্যু সম্পূর্ণ সহজ, স্বাভাবিক! আজ?

—পেরিক, তোর এরকম যাওয়ার কোনো মানে নেই।

এক কাপ জলের মধ্যে মিনেলা এক টুকরো চকোলেট মেশাল। পেরিকের দাঁতহীন মুখ এখন একমাত্র এটাই খেতে পারে। মেনিলা কোলের মধ্যে তুলে নিল তার মাথা। অল্প অল্প করে ঢেলে দিল ঠোঁটে। পেরিক ধীরে ধীরে খেতে পারছে। একটু পরেই সে ভয়ংকর ভাবে বমি করে ফেলল। বহুদিনের শূন্য পাকস্থলী কিছু সহ্য করতে পারে না।

দু'ঘণ্টা পর সে মারা গেল।

—পেরিককে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি। যদি সর্বান্তকরণে সমস্ত মর্যাদার সাথে সমাহিত করি।

ইশাক বলল।

এভাবেই তারা কমরেডদের প্রতি অন্তিম ভালবাসার চিরচিহ্ন এঁকে দিতে পারে। পতাকা দিয়ে তারা ঢেকে দিল মরদেহ। শোয়ান হল স্ট্রেচারে। সেই ছিল প্রথম সাথী যাকে এমন সম্মানের সঙ্গে সমাহিত করা হল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। পার হয়ে গেছে বহুদিন। তবু কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তার শাস্তি দিয়ে চলেছে। গিলে খাচ্ছে তার শিকার। ভোলা যায় না। ভোলা যাচ্ছে না।

এ্যাপাসোনেটা

[ইউরোপের একটি ছোট্ট দেশ আলবেনিয়া। গল্পকার ড্রিত্রিরা এ্যাগাল্লি একজন আলবেনীয়। সবচেয়ে বড় কথা মার্কসবাদী তত্ত্বকে তিনি সাহিত্যরসে পরিপুষ্ট করেছেন। বর্তমানে তিনি তাঁর আদর্শগত অবস্থান বদলেছেন। এ্যাপাসোনাটা সংগীতস্রষ্টা বেটোফেনের একটি সিম্ফনি]

শেষমেষ ফয়শালা করে ফেললাম। এমনকি মীরাকেও 'টু' শব্দটি করিনি। ও তো জানেই কলেজে আমি ঢেড্ডি মার্কা, ফেলু। তিন তিন বার আমার জন্য বোর্ড বসেছে। বহু গুরু-গম্ভীর আলোচনা-টোনা করে শেষমেষ আমাকে খেদিয়ে দেয়নি। আমি তো কোর্সের পয়লা থেকেই চম্পট দিতে চেয়েছিলাম। মাইরি বলছি, এ গাড্ডায় পড়তে চাইনি। ঐ যে আমার বাপ! টুপিটাপা পরিয়ে... আর কী বলি 'উচ্চতর শিল্পকলা মহাবিদ্যালয়' নামের ঢাক পিটুনি—ব্যস্ বাপের মন ভিজে গেল। 'মহান মর্যাদা' যাকে বলে স্ট্যাটাস। ঘরের একটা মাথাও যদি ওখানে গোঁজা থাকে, আস্ত সংসারটাই নাকি হাই, থুড়ি—হায়ার ইনটেলেকচুয়াল সমাজের মাথায় চড়ে থাকে। বাপ আমার ভি আই পি হলে কি হয় আসলে কচি খোকা। ছেলেপুলেদের যেমন অভ্যেস থাকে কিছু হলেই বড়দের কানে তোলা, বাবাও তেমনি ইনটেলেকচুয়ালদের ... যারা হাঁচলেও শিল্প আর সংস্কৃতি ঝরে পড়ে। বাবার পান থেকে চুন খসবে তো জলসা নাটক, নাচ, ফসকাবে না। আসলে লোকটা গান-ফান কিছুই বোঝে না। সিমফনি তো নয়ই। অথচ উঠতে বসতে গান, গান আর গান। গা জ্বলে যায়। ... বেহদ্দ এই রাগের হয়ত কোনো মানেই নেই। তোমারও হতে পারে। যখন 'আর পারিনে' ক্লান্তি তোমার মুড়ো চিবিয়ে খায়, যখন সবাই তোমাকে দূর ছাই করে, যখন তোমার ইচ্ছার ওপর সবাই চেপে বসে, তখন। বাবা করেন কি একরাশ ছাইপাঁশ জিনিস রং চড়িয়ে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। সেবার এক শিল্পীকে নিয়ে এলেন বাড়িতে। লোকটা চিত্রশিল্পী কিনা কে জানে! ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাবা সব দেখালেন। ঘর, দেওয়াল। শেষে চার-চারখানা ছবির বায়না করে দিলেন। ব্যাপারটা কিছুই না। যদি লোকটা আদতে শিল্পী হত! ব্যাটা বাড়ি চুনকামের ওস্তাদ হয়ত। ছবি বাঁধার মিস্ত্রি বড় জোর। যাঃ কী বলছিলাম যেন। হ্যাঁ ফেলু, আমি ফেলুরাম। হতাশ রামফেলু। একদিন বাবাকে বলেই ফেললাম।

—ও সব কলেজে ফলেজে যেতে পারবো না, আমার ভাল্লাগে না।

উরিব্বাস! বাবার মুখখানা কেলে হাঁড়ির মতো অন্ধকার হয়ে এল। সটান দাঁড়িয়ে

গেলেন। হাত দুটোকে পাজামার দু-পকেটে ঢুকিয়ে মারলেন দুই ধাক্কা। তারপর ঘরের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো চলল পায়চারি। যেন ধাক্কা খেয়ে কেলে হাঁড়িটা দুলতে লেগেছে। আমি বসেই থাকলাম। আর দেখেই গেলাম পাজামার নিচ গলিয়ে বেরিয়ে পড়া ছোট দুটো পায়ের ছটফটানি। খুবই চিন্তাঘন মুখ। আগুনের আভার ভ্রুকুটি। তিনি থুতনি জাপটে ধরলেন। থুতনি বুলিয়ে হাত আবার ঢুকে গেল পকেটে। আমি দেখছি বাবা আসলে পোজ নিচ্ছেন। পোজ নিয়েই যাচ্ছেন। আমার মনে চাপ তৈরি করছেন। কোণঠাসা যাকে বলে। চেয়ার থেকে বলে উঠলাম—কলেজ আমি ছাড়বই।

বাবা গেলেন দাঁড়িয়ে। তাকালেন আমার মুখের দিকে। কী একটা ব্যথা, কী একটা সমবেদনা যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম তার মুখে। একমুহূর্ত তারপর যথাপূর্বং, ভ্রূ ব্যাঁকা চাঁদ।

—পাঁঠার মতো ভাবতে শিখলে কবে থেকে?

ভাবগম্ভীর গমগমে গলায় জিজ্ঞেস করলেন। বেলুন গাম্ভীর্য দেখলে গায়ের চামড়া পর্যন্ত চিড়বিড় করে জ্বলে যায়। চুপসে দেওয়ার মতো বরফ-গলায় বললাম।

—কে বললে পাঁঠার মতো! আঁতিপাঁতি করে ভেবেছি।

বাবা ক্ষেপে উঠলেন। চোখদুটোতে আমার মুখখানা যেন মেপে নিচ্ছেন। চোখ দিয়ে আগুন ঝরিয়ে দিলেন। কিচ্ছুটি বললেন না। তারপর এমন ভাব করলেন যেন ভাবনার অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। যত্ত সব ভণ্ডামি। একতিল ভাবনাও নেই ওর মুড়োয়। আমি জানি। বেলুনের সামনে পিনের মতো একটা মিটমিটে হাসি কোত্থেকে আমার ঠোঁটে খেলা শুরু করল। এটুকুই মারকাট। ভাবলাম উনি বুঝি হাতল-চেয়ারে থিতু হতে চাইছেন। কিন্তু ভুল, সোজা দরজার দিকে গেলেন। আলতোভাবে দরজা খুললেন। বেরিয়ে গেলেন। আমি একা তলানি পড়ে রইলাম বাড়িতে। মা বোন দু'জনে কোথায় বেরিয়েছে। শেলফ থেকে একটা বই টেনে খুললাম। মেজাজ যদি ঠান্ডা হয়। বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। ফেব্রুয়ারি মাস। বৃষ্টি তুফান মিলে মিশে ঝরছে। বইটার প্রথম পাতায় একটা দিনের বর্ণনা। রোদ্দুরে ভেসে যাওয়া দিন। একজন চাষা আর গোয়ালিনী। যাচ্ছেতাই। চাষা আর কাকে বলে। দিলাম বই মুড়িয়ে। উঠলাম, জানালা পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। মাথার ভিতরে ভাবনাগুলোকে এলিয়ে দেখতে থাকলাম, বৃষ্টির ফোঁটা নামছে, পড়ন্ত তুষারের পালক ভিজছে। মা বলে 'পাঁক'। মা গাঁয়ের মেয়ে। শিক্ষাদীক্ষা নেই। পড়ার দৌড় পাঠশালা পর্যন্ত। কিন্তু ভাল। সত্যি, মা আমার আজও ভাল। অবশ্য বাবার কিছু এঁড়েমি রপ্ত করেছে। একটু আধটু ফাঁপাটে ভাব এসেছে। এলেবেলে মেয়েমহলে দেখানেপনা স্বভাবও আছে। আশেপাশের লোকজনের সামনে স্বামীকে ফুলিয়ে বেলুন বানায়। যেন মন্ত্রীমহলে তাঁর স্বামীর কত দহরম মহরম। আমদানি রপ্তানি, রাজনীতির ব্যাপারে বিরাট হাত। শুধু তাই না, মার আপ্তবিশ্বাস তার স্বামী সব চেয়ে 'চালাক' আর নেতাদেরও কর্তাব্যক্তি। এক সন্ধেয় মার সাথে রাগারাগি হল।

কে একজন টেলিফোনে বাবাকে চেয়েছিলেন। মা উত্তর দিলেন—কমরেড ডেমস্টেন তো বাড়িতে নেই। ট্রান্সমিট করে দেব।

কথাটা আসলে ট্রান্সমিট নয়। ভুল ইংরেজি বলার কী দরকার। রাগ হয় কিনা। তাছাড়া কমরেড ডেমস্টেনের মতোই ভুল উচ্চারণ।

—দ্যাখো মা, তুমি এসমস্ত করবে না।

মাথার উপর হাত নাড়িয়ে বললাম। মা জিজ্ঞেস করল—তুই কী বলতে চাস?

মুখ ভেঙচে বললাম, 'কমরেড ডেমোস্টেন' যত্তসব, ফাঁপানোর দরকার কী?

মা বলল—আর্থার তোর বাবা যে হেজিপেজি নয় এটা তোর বোঝা উচিৎ।

'আর্থার' নামটা আমি একদম সহ্য করতে পারিনে। ভাবলেই অস্থির হয়ে পড়ি। বাবাই নামটা রেখেছিলাম আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করার জন্য।

জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। নীচে সবুজ বীথি ভিজে গেছে বৃষ্টিতে। মানুষজন আসা যাওয়া করছে ছাতা মাথায়। ছাদে জল জমেছে। ছাদের জল নালার ভিতর দিয়ে বেড়িয়ে আসার জন্য তড়পাচ্ছে। রেডিওতে বাজছে বেটোফেনের 'এ্যাপাসোনাটা'। যন্ত্রসংগীত আমার ভালো লাগে। যত বার শুনি যন্ত্রণাদগ্ধ করে তোলে। কিছুতেই নিজে বাজাতে পারিনে। কালই প্রিন্সিপালের অফিসে যাব। পরিষ্কার জানিয়ে দেব আমি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি। সংগীত বিষয়ে আমার কোনো প্রতিভা নেই। স্রষ্টা অর্থাৎ কমপোজার হওয়ার জন্য যে গুচ্ছের সংগীতলিপি নিয়ে গেছি ওসব আমার কোনো কাজেফাজে লাগবে না। সংগীত স্রষ্টাদের আমি কেউ নই। বাবার জাতে ওঠার শখ মেটাতে গিয়ে আমি একটা জোকার হয়ে গেছি। মীরা জানে ওরা সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। মীরা পিয়ানো শেখার গ্রুপটায় আছে। ওর প্রতিজ্ঞা একজন সেরা পিয়ানো বাজিয়ে হবে। আর আমি? সংগীত-স্রষ্টা! ভাবলেই মনে হয় সংগীতের সমস্ত কম্পোজিশন যা সৃষ্টি হওয়ার সব হয়ে গেছে। সৃষ্টি করার ম্যাজিক আর নেই। নতুন আর কিছু হবে না। লাখে লাখে গান, যন্ত্রসংগীত, রাগসংগীত, যাত্রাগান, পালাগান কনসার্টের সুর পাঁচ পাঁচটা মহাদেশ জুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী ছেয়ে আছে এক বিশাল সুর জগৎ। স্বীকার করতেই হবে এ জগতে প্রত্যেকেরই নিজস্ব রূপারূপ আছে। কিন্তু আমার নেই। মীরার আছে। বাইনের আছে। আমার ওসবের বালাই নেই। হয়ত একটা ব্রিজ বানাতে পারতাম। কিংবা একটা টারবাইন স্থাপন করতে পারি। আমাকে ধরে বেঁধে কেন সিম্ফনি গড়ার কাজে লাগান হবে? কিংবা যা হোক একটা সংগীত?

সাব্যস্ত করলাম মেয়েদের হোস্টেলেই যাব। মীরাকে বলা দরকার—কলেজ ছাড়ছি। যদ্দূর মনে হয়, ও আমার কাজে খুশিই হব। অন্তত হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। আমার ওপরে

টর্চার ও একদম সইতে পারে না।

—আর্থার বলোতো, 'ডো' আর 'সাই' এর ভিতরে কতগুলো সরগম আছে?

এই সব বিদ্রুপের জ্বালা থেকে তো বাঁচবো।

মীরা, আমার মীরা, হোস্টেলে এখন কী করছে কে জানে? হয়ত অপেরা মিউজিকের ইতিহাস পড়ছে। ভারডি, ওয়াগনার এইসব। ভারডি, ওয়াগানার আমিও পড়েছি। কিন্তু জ্ঞান বিতরণের জন্য নয়। ভাল লাগে তাই পড়েছি। কত বিচিত্র ঘটনা ইতিহাসে! কত বিচিত্র জীবন। বিষয়টা মজার না কি?

মানসচক্ষে দেখতে পাই, আমি আর মীরা চলে যাচ্ছি, দূরে কোথাও ... শুনতে পেলে বাবা?

২

কোট খুললেন, ঝুলিয়ে দিলেন করিডোরে, অতঃপর ঘরে ঢুকলেন বাবা। আমি দাঁড়িয়ে আছি। জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় বেরুচ্ছ?

—বাইরে বন্ধুর সাথে দেখা করতে।

—বসো কথা আছে।

চেয়ারের দিকে যেতে যেতে বললেন। আমি বসে পড়লাম। বাবা পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করলেন। একটা ছোট্ট লাইটার বের করলেন। লাইটারটা সব-সময় ওনার ছোট্ট কোটের পকেটে থাকে। একটা সিগ্রেট ধরালেন, সামান্য গন্ধ পেলাম। তামাকের গন্ধও পাচ্ছি। তিনি শুরু করলেন—এটা ঠিক, জীবনে নানা বিষয়ের প্রভাব এসে পড়ে, প্রতি পদে তুমি এসবের মুখোমুখি হচ্ছ।

'যাইহোক' এমন একটা অবধারিত শব্দ, আমি চিনি। আর চিনি বলেই এর আগমনকে পাত্তা না দিয়ে তড়ি-ঘড়ি শুরু করলাম—বিষয়গুলো পালটায়। তার ক্রমোন্নতি ঘটে।

তাঁর ঘন ভ্রূর ভিতর থেকে উঠে এল দুটো চোখ। আমি অবাক হয়ে শুনলাম, উনি ফেটে পড়লেন হাসিতে। তারপর একটা রুমাল বের করলেন টেনে। ভালো করে চোখদুটো মুছলেন। মাথাটাকে হেলিয়ে রুমাল ফিরিয়ে নিলেন পকেটে। পকেট থেকে খালি হাত টেনে বের করতে করতে বললেন—জোকার দেখেছো? তুমি একটা তাই।

সোজা দাঁড়িয়ে গেলাম। —স্যরি বাবা, বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি এমনভাবে শরীর বাঁকালেন, আমি পরিষ্কার বুঝলাম, ওঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছে। ভেতরে ভেতরে ফুলছেন। তিনি বকে উঠলেন—বসো।

অনেকক্ষণ পা দুটোকে নিয়ে ইতস্তত করছিলাম। অবশেষে বসে পড়লাম। সেই বরফগলা শীতল কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল তার ভিতর থেকে।

—তুমি আমার কাছে অনেক কিছু লুকোচ্ছ।

—আমি তো পরিষ্কার জানিয়েছি ও-কলেজ আমার সহ্য হচ্ছে না।

বাবা আমাকে বিশ্বাস করেন না। ইঙ্গিতবাহী গলায় বললেন—আছে বাবা, আছে তোমার গোপন ব্যাপারস্যাপার! —দ্যাখো বাবা, তোমার বিদ্যার দৌড় তুমি জানো। আর্ট কলেজে ভর্তি করার জন্য বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বহু লোকের দুয়োরে হত্যে দিতে হয়েছে। বেশকিছু পায়াভারি লোক তোমার ভর্তির জন্য গোঁজ দিয়েছেন। গোটা মন্ত্রীমহল তোমার হয়ে ওকালতি করেছেন। আর পাঁচটা মাসও গেল না, বাবুর এসব ভাল্লাগছে না। খাটাখাটনি তো জলে গেল, মুখে চুনকালি অবস্থা। ভেবে দ্যাখো, সবার সুনজর থেকে সরে যাচ্ছো। বন্ধু-বান্ধব মহলে শুনলে আমাকে ছিঃ ছিঃ করবে। তারাও অকওয়ার্ড পজিশনে পড়ে যাবেন। তোমার বাবা বলে আমার অবস্থা হবে সবচেয়ে জঘন্য। তোমার কলেজে খোঁজখবর নিয়েছি। বলেও এসেছি, সংগীতে তোমার মাথা খুব খারাপ না। এই কোর্স তোমার মনঃপুত নয়, খাটতে ভালো লাগছে না, এজন্য তুমি অনুতপ্ত।

বাবাকে করুণা করতে ইচ্ছে হল। বাবার দিকে তাকালাম। তিনি ঘেমে যাচ্ছেন। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে। বড় গোঁফ থাকলে ঠোঁটের উপরে ঘাম গড়িয়ে গোঁফের আগায় ফুটে উঠতো। অবশ্য তিনি ঠিকই বলছেন। স্বগোতক্তি করলেন, অনুতপ্ত! হাঃ!!

বললাম—সত্যি, অবাক লাগছে।

—না, না, অবাক হওয়ার কিছু নেই। অনুতপ্ত, হ্যাঁ, আমি আজই বলে এলাম। পড়াশুনোয় তোমার মন নেই। রেওয়াজ করো না। লোকে যা খুশি বলে যাচ্ছে আর তুমি ভেবে যাচ্ছ, সেমিজ...

বাবা রেগে গেছেন। 'লোকে যা খুশি' বলার সময় তোতলামি দেখে বুঝে ফেলেছি। কিন্তু আকাশ থেকে পরার মতো 'সেমিজ' শব্দটা কোত্থেকে এল বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—সেমিজ?

তিনি মুখটুখ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—হ্যাঁ, সেমিজ, স্কার্ট, মেয়েমানুষ!

আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, উঠে দাঁড়িয়ে হো-হো করে হেসে উঠলাম। তিনি ভীষণ বকে উঠলেন—একদম হাসবে না। বসো, বসো বলছি, অসহ্য, নবাব কোথাকার, মেয়েমুখো, এ সমস্ত টিভির কুফল, হিপি কালচার, বাঁদরামি পশ্চিমি আদত, পূর্ব-পশ্চিমের জারজ। হাসি থামানোর জন্য হাত কামড়ান ছাড়া গতি ছিল না।

—মুখের থেকে হাত সরাও।

বলে উঠে দাঁড়ালেন।

হেসে ওঠার ভয়ে মুখ থেকে হাত সরাতে পারলাম না। তিনি কাছে চলে এলেন। এক হ্যাঁচকায় হাতখানা সরিয়ে দিলেন মুখ থেকে। তখন আর হেসে ওঠার মতো ইচ্ছে আমার ছিল না।

—হিপি কোথাকার!

বাবা আবার বকলেন। বকতে বকতে ছিটকে সরে গেলেন আমার কাছ থেকে। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। আবেগ-টাবেগ বাদ দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে গেলেন—কলেজে তোমার যে স্কার্ট আছে... মীরা—সবাই বলে সে একটা কলগার্ল। ভাল, পুত্র আমার, খুব সুন্দর, স্কার্ট সেমিজ নিয়েই থাকো। শিক্ষা ফিক্ষা রেওয়াজ টেওয়াজ চুলোয় দাও। চব্বিশ ঘণ্টা মীরাকে নিয়ে পড়ে থাকো, দ্যাখো কী হয়! ভালো, পুত্র আমার, খুব ভালো। ফের বললেন। বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। একা, আমি একা পড়ে রইলাম ঘরে। মনে হচ্ছে মীরার প্রতি কিছু একটা অন্যায় করা হচ্ছে। ওর নামে কলঙ্ক সেঁটে দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমি সেটা বোঝার চেষ্টা করছি না। বাবা কেন ওর নাম উচ্চারণ করবে?

৩

পরদিন সকালে ক্লাস ধরার জন্য যথাসময়ে কলেজ গেলাম। 'সৌন্দর্য্যতত্ত্বের গোড়ার সূত্র' নিয়ে আজ তিন নম্বরে একটা বক্তৃতা ছিল, প্রথম দু'ঘণ্টায়। বিষয়টা আমার লাগসই। বেশ ভাললাগে। আর পাঁচটা ব্যবসাদারি বক্তৃতার মতো নয়। সংগীতের বাতিক নেই বলেই, সাধারণ বিষয় আমাকে টানত। আর একটা দিক, সৌন্দর্যতত্ত্বের এই গোড়ার নিয়ম কানুনগুলো বেশ বুঝতে পারি। এমনকি মীরাও আমাকে বুঝিয়েছিল, সঙ্গীতের কোর্স ছেড়ে দিয়ে শিল্প সমালোচনার লাইনে চলে যেতে। কোনোটাই পছন্দ হয়নি। আমি জানি ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে আরও ভালো ফল করতে পারবো। আচ্ছা শিল্প সমালোচনাকে পাত্তা দেব কিসের জন্য? বুদ্ধি-মত্তা থাকলেও কেন দেব? আসলে আমার ভালো লাগে না। 'ভ্রিতা' কাগজে আমাকে সমালোচনা লিখতে হবে। আর 'লেখক ক্লাবে' যাব সংগীতজ্ঞদের চোখখিঁচুনি খেতে হবে। আমি এসব সহ্য করতে পারব না। মানুষজনের সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার ইচ্ছে নেই। বরং একটা বাড়ি কিংবা একটা বাঁধ তৈরি করলাম। আসলে ব্যাপারটা হল, সংগীতে আমার কোনো প্রতিভা নেই, অথচ বাবা মনে করেন, তার ছেলে একজন দিগ্‌গজ।

ক্লাশে মীরা আর বারহানের সঙ্গে দেখা হল। ওদের মনে হয়েছে, আমি খুব ক্লান্ত আর পাণ্ডুর হয়ে গেছি। আমার অসুখ করেছে। বললাম, রাতে ভাল ঘুম হয়নি। লেকচার তখন চলছে। ফিসফিসিয়ে বারহানকে বললাম—আমি ঠিক করে ফেলেছি কলেজ

ছেড়ে দেব।

বারহান ওর মোটাসোটা নোট নেওয়ার খাতা বন্ধ করে বলল—শিক্ষা বছরটা তো কাটাও। তিন চারটে পরীক্ষায় অন্তত বসো তারপর না হয় কলেজ ছেড়ে দিও।

—না, না। আমি এক্ষুনি ছেড়ে দিতে চাই।

—ভুল করছো আর্থার, বছরটা শেষ হোক। গরমের ছুটির পরে য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকে যেও। ডিসিশান তুমি ঠিকই নিয়েছ। তোমার জীবন নিয়ে কী করবে সেটা তুমিই ঠিক করবে। কিন্তু ডিসিশান নিয়েছ বলেই অন্ধের মত ছুটো না, গোটা তিনেক মাস সবুর করো।

বারহানকে আমার খুব ভাললাগে। শান্ত, খুব চিন্তাশীল ছেলে। কোন বিষয়েই সে আবেগে ভাসে না। যুক্তি, বিচার বিশ্লেষণ করেই প্রত্যেকটা ডিসিশান নেয়। আমরা সবাই ওকে পছন্দ করি। অবশ্য, কিম্ভূত গোষ্ঠীপতিসুলভ কিছু ধারণা ওর আছে, এটা সত্যি। কলেজে ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেম হলে ও সঙ্গে সঙ্গে সেটা মেনে নেয় না। ওর মতামত, আগে বাছা হাতের কাজ শেষ করো ইতিপূর্বে নৈব নৈব চ। অদ্ভুত ব্যাপার, আমি যে মীরার সঙ্গে প্রেম করি ও কিছুই মনে করে না। মীরাকে ও কোনোদিন দাঁতমুখ খিচিয়ে কিছু বলেনি। বরং আমাদের বন্ধুত্বাকে বেশ উৎসাহ দেয়। আমাদের সঙ্গেই ওর বেশি মেলামেশা। মাঝে মাঝে মীরার সঙ্গে এত বেশি সময় কাটায় যে আমারই হিংসে হয়। দু'এক সময় সন্দেহ হয়, ও বুঝি মীরার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু না, সে সব লক্ষ্মণ কখনও পাইনি। ওর মধ্যেও না, মীরার মধ্যেও না।

—আমার পক্ষে একতিল দেরি করাও সম্ভব না। কলেজ ছাড়তে পারলে বাঁচি। দেখছ না দিনকেদিন একটা জোকার হয়ে যাচ্ছি।

বারহান কিছুই বলল না। ফের নোট টুকতে লাগল। আমি লেকচার শোনার ভান করছিলাম। আর বারহানের দিকে ফিসফিস কথা ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম। প্রফেসার লক্ষ্য করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। প্রফেসার মানুষটি আসলে 'দয়া ক্ষমা' করা টাইপের। খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে খস্ খস্ করে লিখে ফেললাম—'মীরা, ঠিক করে ফেলেছি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি।' কাগজের টুকরোটা মীরাকে পাস করে দিলাম। ঠিক আমাদের পেছনের বেঞ্চেই ও বসেছিল। মিনিটখানেক পরেই মীরা চিরকুটটা আমার পকেটে ফিরিয়ে দিল। ও লিখেছে—'কলেজ ছাড়লে ভাল করবে।' হ্যাঁ, মীরা ঠিকই লিখেছে। আন্তরিকভাবে সে এটাই বিশ্বাস করে। কিন্তু আমার যে কষ্ট হচ্ছে। কেন ও এই রকম লিখল। ও কি আমাকে সহ্য করতে পারছে না। কলেজ ছেড়ে যেতে বলছে কি শুধু আমার সংগীতপ্রতিভা নেই বলে, না ও আমার উপরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বারহানের সঙ্গে প্রেমে পড়তে চাইছে। এখন ও সেইরকম কিছুতো দেখিনি। কিন্তু মেয়েজাতটার উপর আমার ঘেন্না জন্মে যাচ্ছে। এমনকি বারহানের উপর আমার রাগ হচ্ছে। বারহান

আমার পাশেই বসে আছে। মেজাজটা ভীষণ খিচরে যাচ্ছে। গোমরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকলাম। গোল্লায় যাক আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। আমিতো এখানেই ফার্স্ট হতে পারি। মনে পড়ল বাবার কথা। পড়তেই রাগটা ঘুরে গেল বাবার দিকে। সংগীতকে সামনে রেখে তার এই সমস্ত ভণ্ডামির কোনো দরকার ছিল না। তার যতখানি অজ্ঞতা, আমি জানি, সবটাই সংগীতে। 'কমরেড ডেমোসটেন এবং সঙ্গীত' মানিক জোর আরকি! কতটা নচ্ছার হলে তবে এসব লোক নিচুতলার মানুষ পেয়ে সংগীত বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ভাবে। বাবা সম্পর্কে এরকম ভাবতে গিয়ে অনুশোচনা হচ্ছে। বাবা আমার জন্য কিনা কষ্ট করেছেন। তাকে নচ্ছার ভাবছি! ছিঃ আসলে আমিই নচ্ছার, কীট। এটাই সত্য।

ঘণ্টা বাজল। পিরিয়ড শেষ। ক্লাসে লেকচার শেষের চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। বারহান মীরার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাইরে এলাম। গোমড়ামুখো আমি মাথা নিচু করে ছিলাম। কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। হাতদুটো পকেটে ঢুকিয়ে কেবল হেঁটে যাচ্ছি।

করিডোরে একটা জানালার পাশে দাঁড়ালাম। কলেজের সামনের মাঠটা ফেব্রুয়ারি মাসের বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। মীরা, বারহান কেউ কথা বলছে না। ওরা জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়েছিল। একটা দুধসাদা গাড়ি মাঠের মধ্যে দিয়ে এসে সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল। গাড়িটা আমার বাবার অফিসের। দেখলাম, বাবা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। ওভারকোট আর কালোটুপি পরা। রাশভারি মুখে ধীরেসুস্থে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। একটা দামি মানুষের সমস্ত অঙ্গভঙ্গি ফুটে উঠছিল তাঁর চলায়। আমার বন্ধুরাও তাকে চিনতে পারল।

বারহান আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—

—কমরেড ডেমোসটেন।

জানালার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বললাম—হ্যাঁ আমার বাবা। মীরাও জানলার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, বাবার সাথে দেখা করবে না?

বললাম—বাড়িতে রোজই দেখছি। এখানে দেখা করে কী হবে?

মীরা জিজ্ঞেস করল—বাবার সঙ্গে তোমার মেলে না?

—কী যে জিজ্ঞেস করো?

—না, মানে তোমার বাবা যখনই কলেজে আসেন তোমার মেজাজ ঠিক থাকে না!

—ওনার কায়দাকানুন দেখলে আমার বিরক্তি হয়।

—উনি কি তোমায় কলেজ ছাড়তে বারণ করেছেন?

মিথ্যে বললাম, উনি একজন জ্ঞানবান।

আমার কথার ভিতর ব্যঙ্গ ফুটে উঠল। কিন্তু আমি চাইনি। আমি চাই না, আমার আর বাবার সম্পর্কটা মীরা জেনে ফেলুক। কিন্তু মীরা এই ব্যাপারটা খেয়াল করেনি।

ঘণ্টা বেজে গেল। আমরা ক্লাশে ফিরে গেলাম।

৪

বারহান আর মীরা আমাকে প্রায় বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। ওরাও আমার চেয়ে কম দুশ্চিন্তায় নেই। আমার এ কলেজে শেষ ক'দিন। আপন ইচ্ছায় কলেজ ছেড়ে যাচ্ছি তবু বুকের ভিতর তীব্র ব্যথা মুচড়ে উঠল। কষ্ট হচ্ছে ক্লাশের বন্ধুদের জন্য, ক্লাশ ঘর, সিঁড়ি,ঢোকার গেট সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার যদি সংগীতে একটু প্রতিভাও থাকত। যদি একটু টানও অনুভব করতাম থেকে যেতাম। কত ছেলেই তো রয়েছে। ওদের টানও নেই, প্রতিভাও নেই, গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে। ক্ষমতার চেয়ে বেশি উঁচু ডালে ওরা ঘোরাফেরা করে। বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেদের সঙ্গে মেশে, ওদের আচার, আচরণ, মুদ্রাদোষ নকল করে। অন্যদের চেয়ে বেশি বোঝার ভান করে। বন্ধুদের কাজ নিয়ে লম্বা সমালোচনা করে, সন্দেহ করে, এমনকি বলে দেয়, শিল্প কি সাধারণ যে কোনো বিষয়ে—কিছুই হয়নি।

এরা সব পা-চাটা পাবলিক। বাঁদর যখন মানুষকে অনুকরণ করে, বুঝি, কিন্তু মানুষ যখন বাঁদরের স্বভাব পায় তখন পা-চাটা আর কাকে বলে। চামচেবাজি চালবাজি কি বুঝিনে! বুঝি! ইচ্ছে করলে পারি, আমিও। কিন্তু না, আমি চাই না। বারহান বলল কলেজ ছেড়ে কী করবে? বাড়িতে বোর হয়ে যাবে। বছর শুরু না হলে তো বছরের মাঝখানে অন্য কলেজে ভর্তি হতে পারছো না।

বারহানের কথায় আমার মুখের ভাব কি হয় দেখার জন্য মীরা চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল।

আমি বাড়ি বসে কী করি না করি সে সব ওদের ভাবার দরকার নেই। আমার বাবা যেহেতু দামি পোস্টে আছে, বারহান ভেবে নিয়েছে যেকোনো কাজ করার ব্যাপারে আমার খুঁতখুঁতে বাই থাকবে। আমি ক্লান্ত মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালাম।

বললাম—কে বলল বছরটা বসে কাটাব।

বারহান জিজ্ঞেস করল, তবে কী করবে?

—ফ্যাক্টরি ট্যাক্টরিতে কাজের জন্য দরখাস্ত করবো। ক'দিনের জন্য কোনো ট্রাকটর তৈরির কারখানায় ঢুকে যাবো। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমার ভাললাগে।

বারহান চলতে চলতে থমকে গেল। ওর চোখে চমকে ওঠার কোনো ভাব নেই। কিন্তু

জানি আমার কথার বিন্দুবিসর্গ ওর বিশ্বাস হচ্ছে না।

—কমরেড ডেমোসটেন রাজি হবেন না।

আমার বাবার সম্পর্কে এরকম মন্তব্য! একটু ক্ষুণ্ণই হলাম। বাবার সাথে প্রায়ই মনোমালিন্য হয় ঠিক। কিন্তু মিথ্যে বদনাম সহ্য হয় না। বারহান কী করে বুঝল বাবা আমাকে কারখানায় কাজ করতে দেবেন না।

—বারহান মনে রেখো, আমার বাবা রুপোর চামচ মুখে নিয়ে বড় হননি।

—মাফ করো আমি ঠিক তা বোঝাতে চাইনি। আসলে তোমার বাবা চাইছেন তুমি উচ্চশিক্ষিত হও। সে জন্যই গ্রাজুয়েট হওয়ার আগে কোনো কাজ করতে দিতে চাইবেন না। মীরা আমাদের ঝগড়া থামানোর জন্য মাঝখানে বলে উঠল—

হ্যাঁ, ঠিকই। বারহান এটাই বোঝাতে চাইছে।

আমার রাগ চড়ে গেল। আমি মীরার দিকে তাকালাম। মনের মধ্যে বাজে চিন্তাগুলো চাগিয়ে উঠল। ভাবলাম, মীরা সবসময় ওর দিকে যাবে। আসলে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল বারহান এখন কেটে পড়ুক। আমি আর মীরা একটু একা থাকতে চাই। ও কি চোখের মাথা খেয়েছে। রাস্তায় নেমে পড়েছি বুঝতে পারছে না? ও কি মীরার পাশাপাশি আমাকে হাঁটতে দেবে না? আমার এখন মীরাকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছা হতে পারে। কিংবা মীরাকে একটা চুমু খেতে পারি। বারহান কী চাইছে? ও কি বন্ধু? ঠিক আছে বন্ধু না হয় হলো। কিন্তু যেখানে সেখানে ওর নাক গলানো কি ঠিক হচ্ছে? আমার বাড়ির কাছাকাছি এসে বারহান চলে গেল। কোন এক বন্ধুর সাথে দেখা করার অজুহাতে। আমি কি ভাবছি ও ঠিক বুঝে ফেলেছে। আর! শেষপর্যন্ত আমি আর মীরা নিরিবিলি হলাম। গায়ের নীলরঙের কোটটা মীরা আর একটু জড়িয়ে নিল। চিন্তামগ্ন সে আমার পাশে হেঁটে চলেছে। পথের সোঁদা বাতাস আর জলে ঠান্ডা যেন ওর কোট ফুঁড়ে চামড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

মাঝে মাঝে সে কেঁপে উঠছে আর আমার কোল ঘেঁষে সরে আসছে যেন গরম হতে চাইছে। জিজ্ঞেস করলাম—শীত লাগছে?

—হুঁ, একটু।

—মীরা, কলেজ ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে হারাতে আমি চাই না। আমার হাতের মধ্যে ওর হাতখানা নিয়ে বললাম। মীরার আঙুলগুলো খুব কচি। মনে হল, আমার তালুর মধ্যে তলিয়ে গেছে। শীতল আঙুলগুলোকে গরম করার জন্য চাপ দিলাম। যেন একটা উষ্ণ স্রোতের শিহরন। বুকের ভিতর থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে গেল। মীরা মাথা নিচু করল। বিশ্রান্ত নিশা কুন্তল ছড়িয়ে ঢাকা পড়েছে তার একটা চোখ আর আধখানা সুন্দর মুখ। আহা! মীরা আমার একমাত্র ভালবাসার মীরা। কোরকা দেশের

মেয়ে কলেজে প্রথমদিন থেকে আলাপ। তবে সংগীতে আমি গবেটমার্কা এটা সে জানতনা সেদিন। কলেজে উপরি পাওনা হিসেবেই সে আমাকে পেয়েছিল। ভেবেছিল আমি খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু আমিতো ভাল করেই জানতাম আমার বুদ্ধির দৌড়। বিশেষত সংগীতে আমার হৃদয় কতটা নিরেট। আমার মাথায় ষাঁড়ের গোবর জানলে বা না জানলে কি, আমি নিশ্চিত মীরা আমাকে ভালবাসতই।

সংগীতে আমার এলেম দেখে বন্ধুবান্ধব হাসাহাসি করত ক্লাশে, মীরার তখন কি নাজেহাল অবস্থা। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠত। তারপরেও সে আমাকে ভালবাসে।

পেছনে কার পায়ের আওয়াজ পেলাম। বিশাল কোট আর কালো টুপিতে মোড়া বাবা! আমাদের পাশাপাশি এসে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন। মীরা ভয়ে আমার গায়ে সেঁটে এল। বুঝি একবার কেঁপেও উঠল। গম্ভীর মুখে বললেন—ক্লাশ শিকেয় তুলে রাস্তায় আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছ? গলা নিচু করে বললাম—এইমাত্র ক্লাশ শেষ হলো। তিনি আর একবার দেখলেন। বুঝলাম আমাদের পছন্দ হয়নি। ভ্রূ নামিয়ে, ভারি পায়ে তিনি চলে গেলেন।

মীরা মুখ খুলল—বাব্বা, যা ভয় পেয়েছিলাম।

বললাম—তোমার ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। এসব অফিসের ক্ষমতা বুঝলে? ওনার হুকুমের আমলা ঠাওরেছেন আমাদের। পথে-ঘাটে সবাইকে হুকুমের গোলাম ভাবেন।

—ছিঃ আবার; নিজের বাবা সম্পর্কে এভাবে কেউ বলে?

আমি হেসে উঠলাম। জাস্ট হিউমার। মজা, রসিকতা বোঝ না।

বাসস্টপের দিকে চলে গেল মীরা।

বাবা-মা এই মাত্র খেতে বসেছেন। চামচের ভাবভঙ্গি খেয়াল করলাম এবং মেপে নিয়ে একটা চেয়ার সরিয়ে বসলাম। বাদলা হাওয়ায় আরাম করে ঠোঁট নাড়িয়ে শব্দ তুলে মটরদানা খাচ্ছিলেন বাবা। আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন—বাবুর আসা হলো?

উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, এলাম।

বাবা আবার বললেন—তুমি বলছ, তুমি বাড়িতে ফিরে এলে?

উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, তার মানে তাই।

মুশকিল বুঝে মা কথার মাঝখানে বলে উঠলেন—তুই কি আমার সঙ্গে খাবি?

—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে।

ভাবসাব দেখে বুঝলাম আমাকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। বাবা আমার নামে

লাগাচ্ছিলেন। মা নিশ্চয় আমার হয়ে লড়ে যাচ্ছিলেন।

মা প্লেটে ঝোল ঢেলে দিলেন। বসেছি বাবার পাশেই, সবাই মিলে খেয়ে চলেছি। বাবার ঠোঁট নাড়ান শব্দ বেড়ে গেছে, আমি ততোধিক নিঃসাড়ে।

বাবা বললেন—মনে হচ্ছে, খুব ক্লান্ত?

হাতে চামচ, চোখে প্লেট রেখেই বললাম—একটু। তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বললেন—সবুজ বীথিতে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত?

ঠান্ডাগলায় বললাম—সবুজ বীথিতে হেঁটে, আরও অনেক কারণে ক্লান্ত। বাবা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। মুখমণ্ডলে রক্তের আভা। উত্তরে বাবা বেশ রেগে গেছেন। বাবার কথার পিঠে উত্তর ছাড়া কিছুই বলিনি।

—বকাটে মেয়েটার সঙ্গে বাজে সময় কাটাচ্ছ।

মা বললেন—হয়েছে ছাড়ো।

লেখাপড়ায় ভাস্যি নেই। প্রেমে ঝড় বয়।

বাবার গলার স্বর আস্তে আস্তে চড়ছে।

মা বললেন—ছেলেটাকে শান্তিতে দুটো খেতে দাও।

—তুমি বলছ, শান্তিতে খেতে দেবো?

বাবা বললেন বটে, কিন্তু আওয়াজ দু-একপর্দা নেমে গেছে।

আমার খিদে পালিয়েছে। তবু খেয়ে যাচ্ছি। বাবা এত রেগে গেছেন, আমার খিদে না থাকাই উচিত। হাত থেকে হঠাৎ চামচটা কেড়ে নিয়ে ঝনাৎ শব্দে টেবিলে ফেলে দিলেন বাবা।

—আমি তোমার সাথে কথা বলছি। তুমি খেয়েই যাচ্ছ, যেন গাছ-পাথরের সাথে কিছু কথা হচ্ছে। এদিকে তাকাও। যা বলছি তোমাকে শুনতে হবে। ওসব শান্তিফান্তি বুঝি না।

ঘাড়ের কাছে গরম নিশ্বাস পড়ছে। বাবা রেগে আছেন। উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। মার মুখেও কথা নেই। আমি বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছি। একটা সাংঘাতিক জেদ আমার বিষণ্নতায় মাথা উঁচু করে রয়েছে। আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে এলে আমি বুঝতে পারি।

তিনি একমুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়ালেন, তারপর চলে গেলেন শোবার ঘরে। আমি আর মা রান্নাঘরে পড়ে থাকলাম। আমার আর বেরস কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছে ছিল না। একটা সাদা দেওয়ালের দিকে আর একটা সাদা দেওয়ালের মতই তাকিয়ে ছিলাম। এরকমই একবার পরীক্ষার শেষে দাঁড়িয়ে ছিলাম কলেজে। আমার

পরীক্ষা ছিল শেষে। সবাই চলে গেছে। প্রফেসর, বন্ধুবান্ধব সবাই। হাতে ধরা এ্যাডমিটকার্ড। আমি একা। নির্নিমেষ দাঁড়িয়ে দেওয়াল দেখে যাচ্ছি। পরীক্ষার হলঘরের বিশাল শূন্যতা, ফাঁকা দেওয়ালগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি অসহায়। মানসিক যন্ত্রণায় নির্বাক। হা-হা। ভয়ংকর হলঘরে এক ভুলের শিকার। প্রতিটি মুহূর্তে দীর্ঘায়িত হচ্ছে। আর আমার যন্ত্রণা বেড়ে যাচ্ছে। যেন আমার অপরাধের শাস্তি, আমাকে সারাজীবন ভোগ করতে হবে। আমি তুচ্ছ, সাধারণ, কলেজের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে, বহুদূরে এক শিক্ষার্থী। আমি সেই হাজার মানুষের ভিড়ে একজন। যাদের ডিপ্লোমা আছে, সার্টিফিকেট আছে, উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, প্রতিভা নেই, বুদ্ধিজীবীর কেউ নই। বৎসরান্তিক শিক্ষিত মানুষের ফর্দে একটি সংখ্যা মাত্র, আর কিছু না।

না। এ আমি চাই না। চাই না। আমার চতুর্দিকে পরীক্ষাগারের প্রাচীর। হাতে অ্যাডমিটকার্ড। আমি কাঁপতে শুরু করলাম।

অকস্মাৎ অনুভূতির এক বিচিত্র মোচড়ে খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠলাম। উপলব্ধি করলাম নিজেকে। মনে মনে বলে উঠলাম—এপথ আমার নয়। খোলা আছে অসংখ্য পথ আমার দুয়ারে। এ্যাডমিট পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। হল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। এই সেই ক্ষণ, আমার সামনে প্রাচীর। দাঁড়িয়ে আছি রান্না ঘরে। মা নিঃশব্দে বসে আছে। বাবা চলে গেলেন পাশের ঘরে। খাবার প্লেটে ঝোল ঠান্ডা হচ্ছে। মীরা হয়ত হোস্টেলে এখন পড়ার ঘরে। মা বলে উঠলেন—আর্থার, বাবা যা বলছেন শোন, তোর ভাল হবে।

মা-র পাশের চেয়ারে বসে পড়লাম। মা কী বলছে বোঝার চেষ্টা করলাম। বললাম—ফর্দের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাই না।

—ফর্দ?

—হ্যাঁ ফর্দ।

মা কিছুই বুঝলেন না।

৫

পরদিন কলেজে গেলাম না। শুয়ে ছিলাম কোচে। হাত দুটো মাথার নীচে, ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবনার সমস্ত বাঁধন এলিয়ে দিয়ে ভাবছিলাম, ক্লাশে বন্ধুরা এখন দ্বিতীয় ঘন্টার বক্তৃতা শুনছে। মীরা বসে আছে ডেস্কে। লিখছে। বারহানও ওর ভারি চোয়াল সমেত বসে আছে মীরার ঠিক পিছনে। নোট নিচ্ছে। বাবা তার অফিসে। দামি দামি পুঁথিপত্তর ঘাঁটছেন, পড়ছেন, তার এলাকার। সবাই বলে তিনি খুব কেজো। অন্যদেরও

তার মতো হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমার কোনো অবিশ্বাস নেই। বাবা সত্যিই কাজ করেন। কঠোর পরিশ্রম এবং এ বিষয়ে সৎমানুষ। আমি নিজে ব্যাপারটা দেখেছি। কি বাড়িতে কি অফিসে। যখন একটা রিপোর্টও লিখতে হয়, তিনি বাচ্চা ছেলের মতো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। লেখেন, পেনসিলের পেছন কামড়ান, টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েন, বসেন, আবার লেখেন। সমালোচনা করার সময় তিনি কাউকে থোড়াই কেয়ার করেন। তার চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল কমরেড সামসুদ্দিনকেও ছেড়ে কথা বলেন নি। শহরের বস্তি অঞ্চলে লাইব্রেরির জন্য অহেতুক কিছু টাকা লাগিয়ে বসে আছেন। এমন একটা বাড়ি বানাচ্ছেন আসছে দশবছরে কোনো কাজেই লাগবে না। অনুরোধ আসছে, বিল্ডিংটা শেষ হওয়ার আগের সময়ের জন্য একটা বাড়ি বানাতে ... হ্যাঁ, এখানে আমার বাবা যথার্থ। আমিও মনে করি। কিন্তু মীরা বাবাকে কি ভাবছে? মীরা, বারাহনকে অবশ্য বলেছি বছরটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। কিন্তু কলেজ আজই ছেড়ে দেব। সে জন্য হয়ত মীরার সাথে ছাড়াছাড়ি হবে। দু'জনার পথ দুদিকে বেঁকে যাবে। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে চলে যাব। ওরা রয়ে যাবে ওদের সংগীত নিয়ে। কোথায় ইঞ্জিনিয়ারিং, আর কোথায় সংগীত, আকাশ-পাতাল। না, এটা ঠিক নয়। সংগীতের বহু বিষয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সংগে যুক্ত। আর হ্যাঁ সে কারণেই, আমি মীরাকে বিয়ে করলেও করতে পারি। হি-হি, আমার বৌ হবে একজন সংগীতজ্ঞ। এবার বেশ শব্দ করেই হেসে উঠলাম—হো—হো।

মা ছুটে এলেন। বিচলিত ভেবে জিজ্ঞাস করলেন—কী হলো আর্থার কাঁদছিস?

চোখের জল মুছে জিজ্ঞেস করলাম—কই কাঁদছি?

মা কাছে এলেন। কপালে হাত রেখে চুপি চুপি বললেন—কলেজ ছেড়ে দিয়ে ঠিক করেছিস খোকা, এ নিয়ে তুই ভাবিসনে।

মার চোখের নীচে জল চিকচিকিয়ে উঠল। মৃদু হাসি ফুটল আমার ঠোঁটে।

—যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি। ছেলেবেলা থেকে কোনোদিন তুই শব্দ করে কাঁদিসনি।

—আমি কেঁদেছিলাম? কী বলছ তুমি?

—কেঁদে উঠলি যে!

—নাগো মা, আমি হেসে উঠেছিলাম।

—হাসি? হতেই পারে না। তুই কাঁদছিলি।

বলে ঘাড় নাড়িয়ে চলে গেলেন। মার কথা শুনে একটা শীতল স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। কোনো কুসংস্কারের বাতিক আমার নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন সন্দেহ হল। সন্দেহ নয়। ভয়। হ্যাঁ ... আমি কেঁদেছিলাম আমি নিশ্চিত।

টেলিফোনটা বেজে উঠল। মা ছুটে রিসিভার তুললেন।

—কি? কমরেড ডেমোসটেন? না, তার কোনো মিটিং নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—আড়াইটে নাগাদ বাড়ি পাবেন। আপনি কোত্থেকে বলছেন? কলেজ? ওনাকে কিছু বলতে হবে?

ঠিক আছে।

বলা শেষ হল। মা রিসিভার নামিয়ে দিলেন। দেখলাম, মা-র মুখ দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেছে।

—তুমি এটা কি করলে মা? কমরেড ডেমোসটেন? টেলিফোনে কমরেড ডেমোসটেন? বাড়িতে তুমিতো ডেমোস বলো। সেটাই কি ঠিক না?

মা স্নেহার্দ্র চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন—টেলিফোনে সবাই 'কমরেড ডেমোসটেন' বলে। আমারও কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে।

—এ অভ্যেসটা তুমি ছাড়।

—আমি যা জানতে চাইছি সেটা কিন্তু বললিনে। তুই কলেজ ছাড়বি কেন?

গম্ভীরভাবে বললাম—গানের কলেজ আমার সহ্য হচ্ছে না। গান আমার জন্য নয়।

—গান তোর জন্য নয়। বারহান দ্যাখতো কত কাঁচা। তুইতো তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝিস।

হাসলাম।

—তুমি জানো না। সে সত্যিই বেশি বোঝে।

—কক্ষণো না। তোর অন্য কিছু হয়েছে। তোর বাবা বলছিলেন, তুই প্রেমে পড়েছিস। লেখাপড়া তোর ভাল লাগছে না। এজন্যেই তো কলেজ ছাড়তে চাইছিস্।

—মিথ্যে কথা। সংগীতের কানই আমার নেই।

—কান নেই! বারহানের কান তো চাম্‌চের মতো। ওর চেয়ে তোর কান কত সুন্দর।

আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

—হাসছিস্ কেন? তোর মাথায় কত বুদ্ধি, আর এই কলেজটা পড়ে শেষ করতে পারবিনে?

আমি উঠে মার কোল ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

—আচ্ছা মা, বলোতো—খুব ভাল কিছু করার নাম করে বন্ধুদের পেছনের সারিতে দাঁড়াই, না কম ভাল করে বন্ধুদের সামনের সারিতে দাঁড়ানো; কোনটা ভাল? মা ধীরে ধীরে তার মাথা নাড়লেন। শান্তভাবে বললেন,

—তোর বন্ধুরা যেমন ...

রাস্তার দিকের দরজা খোলা। দেখলাম ভারি কোট আর কালো টুপি, বাবা। নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করলেন। ঝুলবারান্দার দিকে একবার তাকালেন। তারপর ঘরে ঢুকলেন। টুপি খুললেন, কোট খুললেন। নিঃশব্দে চেয়ারে এসে বসে পড়লেন। ঘন ভ্রূর নীচ দিয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়ে মার দিকে ফিরলেন।

—কেউ আমার খোঁজ করছিল?

—হ্যাঁ, কলেজ থেকে। মা বললেন।

—ঐ বাঁদরটার জন্য নিশ্চয়।

তিনি মাথাটা সবেগে ঘুরিয়ে আমার দিকে ফেরালেন। মা বলল—জানিনে।

বাবা বললেন—কিন্তু আমি জানি।

বলে আমার দিকে ফিরে বললেন।

—এই যে স্যার, কলেজ না গিয়ে ঘুমোনো হচ্ছে, ব্যাপারটা কী?

মনে মনে বললাম—ওহঃ, যন্ত্রণা! 'ব্যাপারটা কী' দিয়ে শুরু হলো।

বাবা বলেই চলেছেন—ব্যাপারটা পরিষ্কার। আমাকে কিছু খেতে দিতে হবে।

জমাট নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। শব্দ আসছে রান্না ঘর থেকে—চামচ ছুরি প্লেট, মজা লাগল। প্লেট চামচ সহযোগে প্রত্যেকবারই আমাদের ঝগড়া জমে ওঠে।

তা'হলে এবার

খাবার টেবিলে বসার আয়োজন করতে করতে বাবা বললেন—কিংকর্তব্যহীন আমরা এখন কেবল শ্রীমান পুত্রের দুঃসাহসিক বীরত্বের আলোচনা করতে পারি। আলোচনা করতে পারি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর মহলে। একটি উত্তম পুরস্কার কী বলো বঁধুয়া, এমন বিশ্বাসঘাতক ছেলে মানুষ করার শাস্তি।

আমি চুপচাপ। ঠিক করে নিয়েছি, এই মুহূর্তে কোনো কথা নয়। মা বললেন—খেয়ে নাও ডেমোস।

—বিষ, বিষ, একপ্রকার অপূর্ব বিষ! উঃ!

আমরা সবাই শুনেছি। তবু মা বললেন—কী?

বাবা বললেন—বিষ, যা খাই, সব বিষ। মা ভয়ে আমার দিকে তাকালেন।

—এই যে ভদ্দরলোকটি এখানে বসে আছেন, লোকে বলছে, হ্যাঁ, বলছে তার ক্ষমতা আছে। প্রতিভাবান কিন্তু লবডঙ্কা কিছুই করছেন না। নাথিং। চর্চা করলে হতো। অনেক কিছুই হতে পারতো। তার ছিল। মস্তকটি একটি উর্বর ক্ষেত্র। সেটিকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কী বলব, পতিত—হ্যাঁ, তারা বলছে পতিত জমি। পড়াশুনায় ভাস্যি নেই। তিনি একটি মিনিস্কার্টের ঝুল ধরে ঝুলছেন। ওইসব লোফার ছোকরাগুলোর

মতো। উঠতি মেয়েদের গায়ে ঢলাঢলি। ছিঃ! ছিঃ ছিঃ!

এরকম কৌতুক নক্সা আমি জীবনে শুনিনি। কিন্তু গম্ভীর হয়ে থেকে গেলাম। মা কিন্তু হেসে ফেলল। বাবা জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে মাকে পুড়িয়ে দিতে চাইলেন। টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে আছেন, চামচ পর্যন্ত ছোঁননি।

—হনুমান চেনে কলা, উনিও চিনেছেন, প্রথমে পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে দিলেন, তারপর কলেজে যাওয়া। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই—ওইসব লোফার মেয়েগুলো কলেজে থাকে কী করে? প্রিন্সিপাল, প্রফেসররা পর্যন্ত দোষ দিচ্ছে। অবাক ব্যাপার!

বাবাকে থামিয়ে দিলাম।

—একটা ভাল মেয়েকে বদনাম দিও না।

জমে থাকা রাগের একটুকরো পাথরের মতো ছিটকে দিলাম নিশ্চিত লক্ষ্যে। বাবা ফিরে তাকালেন আমার দিকে। তার সমস্ত ভ্রূ, চোখ ক্ষুদে করে ফেলেছেন। তার ফাঁক গলিয়ে রাগান্ধ চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। বাবা হতাশভাবে বললেন—তুমি একটি পাঁঠা, নিজেকে বাঁচাতে জানোনা অন্যকে বাঁচাতে যাও।

—আমরা নিজের লোককে বাঁচাতে অপরকে দোষ দিই। আপনি আমাকে বাঁচাতে মেয়েটার নামে দোষ দিচ্ছেন। আপনি আপনার রাস্তা পরিষ্কার করতে চাইছেন। আসলে আপনি শুরুই করেছেন একটা ভুল জায়গা থেকে। আমিতো আগেই বলেছিলাম, ওসব আমার দিয়ে হবে না। বুঝেছিলাম একটা ভুল পথে এসে পড়েছি। এপথে আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। যদি চলতে শুরু করি আবার ফিরে আসতে হবে। তখন আরও মুশকিলে পড়ে যাবো। সেজন্যে এখনই ফিরতে চাই। আপনি ভাবছেন, মেয়েটি আমার বাধা। মিথ্যে কথা। সত্যি বলতে কি আপনার গার্জেনগিরি আমার টুঁটি টিপে ধরেছে। চলতে ফিরতে উঠতে বসতে আপনার অভিভাবকত্ব আমার অসহ্য লাগছে। আপনার রাস্তা আমার কাছে ভুল। আমাকে নিজের পথ খুঁজে নিতে দিন। আমি আপনার অভিভাবকত্ব মানি না।

বাবার চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। শুরু করলেন পায়চারি। ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা। খাবার প্লেট টেবিলে ঠান্ডা হচ্ছে। অবাক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন আমার দিকে। বললেন—অভিভাবকত্ব?

অনেকটা আত্মমগ্ন। আশ্চর্য? এসব তুমি কোত্থেকে শিখেছো! সমস্ত নতুন ছেলেরাই কি এরকম ভাবছে? হাঃ! তোমরা শুধু তর্ক করতে শিখেছো। নিজের রাস্তা খুঁজে নেবে! নিজেকে খুঁজে বের করবে! কী পারবে না পারবে নিজেই জেনে নেবে—হায়! তবে হ্যাঁ, নিজের জন্য যুক্তি নিশ্চয় করতে পারো। আর তুমি নিজের যুক্তিকে ব্যাখ্যা দিতেও শিখেছ। তুমি আমাকে বোঝাতে পারবে? তিনি বসে পড়লেন। তুলে নিলেন

চামচ। কয়েক মুহূর্ত আর কিছুই বলেননি। শুধুমাত্র ঝোল খাওয়ার মৃদু সুপ্—সাপ্।

৬

পরের ক'দিন কলেজ গেলাম না। বাবা প্রচার করলেন আমি অসুস্থ। আমি কিন্তু ঠিক করেই রেখেছি—কলেজে যাচ্ছি না। একটা ট্রাকটর প্লান্টে দরখাস্ত করেছি কাজের জন্য। যদ্দিন না কলেজগুলোতে পরের বছর শুরু হয়। প্ল্যান্টের অফিসার জানিয়েছেন, পরের সোমবার থেকেই কাজ শুরু করতে পারি। যন্ত্রপাতির টেবিলের কাজ ভালই জানি।

হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ার সময় এসমস্ত আমাদের শেখান হয়। বাবাকে কিছুই বলিনি, ভয়ে। তিনি আমার প্ল্যান ভেস্তে দেওয়ার জন্য একপায়ে খাড়া, সেদিন আমি বাড়িতে। ইংরেজি শিখছিলাম। একটা সাদামাটা সাধারণ বই। ডিকশনারি থেকে না জানা শব্দগুলোর মানে খুঁজে বের করছি। টেপরেকর্ডার থেকে শব্দ আর ফ্রেজগুলোর উচ্চারণ শিখছি। টেপরেকর্ডারটা বাবা এনে দিয়েছেন। বিশেষ কায়দায় শেখার ব্যবস্থা। আমার পয়লা প্ল্যান ইংরেজিটা শিখে ফেলা। তারপর ফ্রেঞ্চ। দুটো বিদেশি ভাষাই যথেষ্ট। এর বেশি দরকার হবে না। আমি ভাষাবিদ হতে যাচ্ছি না।

পড়ছি, মা এসে বললেন, বারহান আমার সাথে কথা বলতে চায়।

জিজ্ঞেস করলাম—কী, টেলিফোনে?

—না, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

দৌড়ে ঝুলবারান্দায় এলাম। বারহান দুয়োরে ঠেস মেরে দাঁড়িয়ে। হাতে ছাতা।

—ভিতরে এস।

ধীরে ধীরে সে ভিতরে ঢুকল। থুতনি ধরে এদিকওদিক দেখতে দেখতে ঘরে এল। ওকে একটা হাতল চেয়ারে বসতে বলে ওর সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম—কলেজের খবর কী?

—তেমন কিছু না। তুমি কি কলেজ যাবে না ঠিক করে ফেলেছো!

—হ্যাঁ, বারহান।

ও চওড়া কপাল থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে নিল।

মীরাও আসতে চেয়েছিল, কিন্তু বাবাকে ছেড়ে আসতে পারল না।

—ওর বাবা কি এখন শহরে?

একটু চুপ করে থাকল। টেবিলে টেপরেকর্ডারটা দেখল। ইংরেজি শেখার কায়দাও দেখল। জিজ্ঞেস করল—পড়ছিলে?

—হ্যাঁ, ওই কিছুমিছু।

বারহান বলল—প্রিন্সিপাল মীরার বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

—কেন?

—দ্যাখ, ব্যাপারটার সঙ্গে ও জড়িয়ে নেই তবু ওরা কলেজ থেকে ওকে তাড়াতে চাইছে।

আমি চমকে উঠলাম।

—তাড়িয়ে দেবে?

আর্থার, যাই বলো এটা খুব নোংরামি।

—ঝাড়ে বাঁশ কেটে লাভ নেই। ব্যাপারটা কী বলোতো?

বারহান ঢোঁক গিলে গিলে কথা বলায় আমার রাগ চড়ে যাচ্ছিল।

—ওরা বলছে, মীরা একটা বাজে মেয়ে। উঠতি ছেলেদের ও কুপথে নিয়ে যাচ্ছে।

রাগে ফেটে পড়লাম। মীরা একমাত্র আমার সাথে মেশে। সাধারণ বন্ধুত্ব, কি তার চেয়ে কিছু বেশি। জিজ্ঞেস করলাম—কোন্ উঠতি ছেলেদের?

—তুমি, তার জন্যেই তোমার পড়াশোনায় মন নেই। তাকে কলেজ ছেড়ে দিতে হবে। তোমাকে বাঁচানোর জন্যেই তাকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়।

রাগে আমার শরীর জ্বলছে।

বললাম—মিথ্যে মহানুভবতা।

বারহান বুঝতে পারল না। বুঝিয়ে বললাম—তার মানে আমাকে বাঁচাতে মীরাকে উৎসর্গ করা হচ্ছে। একটি মহত্তম প্রতিভার জন্যেও কোনো মহিলাকে উৎসর্গ করা যায় না। ইতিহাস বলে, যখন একটি মহান প্রতিভার জন্য একটি স্ত্রীলোক নিজেকে উৎসর্গ করে, ঘরের চারদেওয়ালের মধ্যে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে, প্রতিভাবান স্বামীর কাজের যাতে অসুবিধে না হয়, তার জন্যে সমস্ত সুখ আনন্দ জলাঞ্জলি দেয়, সে করে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছায়। আর তারা মীরাকে আমার জন্য উৎসর্গ করছে। আমি কে? না, একজন সাধারণ মানুষ। যার তিলখানেক প্রতিভাও নেই। একজন ভিআইপি আমলার ছেলে।

কিছুক্ষণ বলে গেলাম। মনের মধ্যে যা কষ্ট যা ব্যথা ছিল সমস্ত উজাড় করে দিলাম। বারহান থুতনিতে হাত রেখে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শুনে গেল সব।

ধীরে প্রসঙ্গ বাবার দিকে মোড় নিল। মীরার নামে তার সমস্ত ভয় দেখান কথাবার্তা একটা দিক জুড়ে নিল। আমার উচ্চশিক্ষা শেষ হওয়া, জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে আমার বিয়ে না দিতে চাওয়া—এই সমস্ত কথা। তিনি মীরার সম্পর্কের ব্যাপার দেখেছেন, যেন আমি এখুনি বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমাকে বাঁচাবার জন্য তড়িঘড়ি

মীরাকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। অর্থাৎ উৎসর্গ করতে চাইছেন। এ-এক নোংরা জটিল পরিস্থিতি।

—ওরা মীরার বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, মেয়ের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ জানাতে। মীরার বাবাও এককাট্টা। দুঃখ হয় অসহায় মানুষটার জন্য। তাকে খুব ম্লান আর কোণ-ঠাসা দেখাচ্ছিল। মীরাকে ওরা সাফ জানিয়েছে হয় তোমাকে ছাড়তে হবে অথবা কলেজ। শেষমেষ কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার বাবা তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন। ওর বাবাকে দেখে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল। হতভাগা, অসহায়, উঃ! বলো, তুমি কী বলবে? আমার অবস্থা কী হয় দেখার জন্য বারহান মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সে আশা করছিল—আমি কিছু বলি। বললাম—না, হতে পারে না। মীরা কিছুতেই কলেজ ছাড়তে পারে না।

—দ্যাখো আর্থার, আমার যা সন্দেহ তাই বললাম। তোমার বাবা বারবার গেছেন প্রিন্সিপালের অফিসঘরে।

আমার ধারণা ছিল না, বারাহান এমন বলতে পারে। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে এল। হাঁটুর উপরে রাখা আঙুলগুলো আপনা থেকে কাঁপতে শুরু করল। জিজ্ঞেস করলাম

—এ্যাঁ, তার মানে?

সে উত্তর দিল না। পিতৃনিন্দা আমি আর শুনতে চাই না। বারহান আমার প্রিয় বন্ধু, তার মুখেও না। হতে পারে ঠিক, বাবা প্রিন্সিপালের কাছে মীরার নামে অভিযোগ এনেছেন। সত্য। আমি কল্পনা করতে পারি—বাবা প্রিন্সিপালের কাছে কি বলেছেন? কিছু মেয়েদের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ, দোষারোপ বুঝতে পারি, বিশেষ করে মীরার বিরুদ্ধে কিন্তু বারহানের মুখ থেকে শুনতে চাই না। তার সন্দেহ থেকে নয়।

—দ্যাখো বারহান, আমার বাবা সে ধরনের মানুষ নন। লজ্জায় মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে, তবু বললাম। জানি ঠিক বলছি না, মিথ্যা বলছি, বারহান সেটা ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু বাবা কি এতদূর যাবেন? একজন সৎ, নিষ্ঠাবান কর্মী, এরকম নীচ অসৎ উপায় নেবেন? বারহানের স্থৈর্য, পরিচ্ছন্ন ভাবনাচিন্তা, আর অপূর্ব বিচার বিশ্লেষণের ফাঁক গলিয়ে আমি এই সমস্ত ভেবে যাচ্ছিলাম।

—আর্থার এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাকে প্রশ্ন করো না, প্লিজ। বিভিন্ন ভাবে নানা কারণে তোমার বাবাকে শ্রদ্ধা করি, তবু বলতেই হবে মীরার দুর্ভাগ্যের বীজ তিনিই বুনেছেন। এ ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। তিনি ক্ষমতাবান। ক্ষমতার ব্যবহার করেছেন।

বারহান তার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করল। আমি সঙ্কুচিত হয়ে গেছি। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। কোনোরকমে বললাম—এ প্রসঙ্গ এখন থাক। বারহান ভ্রূ কোঁচকাল।

দেখলাম, ও রেগে যাচ্ছে।

—থাক মানে? যদি আমরা রেখেও দিই, ঘটনা কিছু বদলাবে না। ওরা মেয়েটার ভবিষ্যত ধ্বংস করে দিচ্ছে। দড়িতে ঝোলানো মেয়েটির ভবিষ্যত একটু পরেই উদ্যত কাঁচিতে কাটা পড়বে। ঠিক আছে, আমরা সন্দেহ করব না।

বারহান একরাশ ঘেন্না উগরে দিল। তার কথার শিরা-উপশিরায় ক্রোধের স্রোত লক্ষ্য করলাম। ওরা হর্তাকর্তা বাবার চেয়ে বেশি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সর্বেসর্বা। রুক্ষ গলায় বললাম—তুমি যেমন খুশি ভাবতে পার, সে স্বাধীনতা তোমার আছে।

বারহান উঠে দাঁড়াল।

বললাম—একটু দাঁড়াও।

আমার পাটভাঙা প্যান্টের দিকে তাকিয়ে খুব ঠান্ডা গলায় বলল—না, আমায় যেতে হবে।

অনুনয় করলাম—আর একটুখানি দাঁড়াও।

—তোমাকে জ্বালাতন করার জন্য মাপ করো। তোমার পড়া আছে। যাচ্ছি।

সে প্রায় দাঁত চেপে কথাগুলো বলল। তারপর ছাতাটা হাতে তুলে বেরিয়ে গেল। নিঃশব্দে।

নিঃসীম একাকী ঘরের মধ্যে অনুভব করলাম ওর কথার ব্যঞ্জনা—'তোমার পড়া আছে।' একটা মানুষ যখন আমার জন্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে, আমি নিষ্কর্মা বসে আছি। তার কোনো কাজেই লাগছি না। আমাকে যেতে হবে। হ্যাঁ, বারহানকে অনুসরণ করতেই হবে। আমি মীরার সঙ্গে দেখা করব। দ্রুত জুতো আর কোট চড়িয়ে নিলাম। হু হু করে নামতে থাকলাম সিঁড়ি বেয়ে। মা শুনতে পেয়ে ডাকলেন—আর্থার কোথায় যাচ্ছিস?

চলে যাওয়ার শব্দ ছাড়া কোনো উত্তর ছিল না।

৭

বারহানকে ধরতে পারলাম না। মীরার হোস্টেলের দিকে যাচ্ছিল একটা বাস, লাফ মেরে চড়ে বসলাম। বারবার মীরার কথাই মনে পড়ছে। আর ভিতরে ভিতরে বাবাকে গালমন্দ করে যাচ্ছি। এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, ওরা মীরাকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবে। মাঝখানে কোথাও ভুল বোঝাবুঝি আছে। সিওর। ভুলটা কোথায় বোঝা দরকার। একটা লোক কী বলল না বলল, তাই দিয়ে মীরার ভবিষ্যৎ ঠিক হয়ে যাবে? সে যত বড় হোমরাচোমরাই হোক! এ হতে পারে না। ভুল বোঝাবুঝির শেষ

হওয়া দরকার।

লাফ মেরে নেমে, ঘুরেই গলিতে ঢুকে পড়লাম। গলির শেষে মীরা থাকে। কখনও মীরা আর আমি, কখনও একা এই পথে বহুবার এসেছি। কখনও-বা বসন্তে এ গলি গানে গানে ভরপুর থাকে, কখনও-বা চটুল কথার মৃদু গুঞ্জনে। এখন এই ফেব্রুয়ারি মাসে নিঃঝুম শুনশান, কেউ কোথাও নেই। যেন মরুভূমি, বৃষ্টি আর ঠান্ডায় জমে আছে।

হস্টেলের গেটে একজন বেঁটে লোক দাঁড়িয়ে। জরাজীর্ণ ওভারকোট গায়ে, মাথায় শেড লাগান টুপি। কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। অস্থিরভাবে ধূমপান করছে আর ঘন ঘন গেটের বাইরে তাকাচ্ছে। মনে হল, এ নিশ্চয় মীরার বাবা। আমি তাকে চিনি না। আমাকে দেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বাইরের চত্বরে। মনে মনে ভাবলাম, মীরার বাবা না হয়ে যায় না। লোকটি কয়েক মিটার দূরে থাকতে গেটে পৌঁছে গেলাম। দরোয়ানকে বললাম মীরাকে ডেকে দিতে। লোকটি মাথা নিচু করে সম্ভাষণ করল আমাকে এবং বেরিয়ে এল চত্বরের চালা থেকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—ওর বাবাও ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

লোকটিকে আর একবার দেখে নিয়ে বললাম—ঠিক আছে। লোকটি চত্বরের এমুড়ো থেকে ও মাথা পায়চারি করছে। ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে। একবার ভাবলাম, পরিচয় দিয়ে আলাপ করি। পরে ভাবলাম—না, থাক, মীরা আসলেই হবে। প্রথম দেখায় মনে হল একজন শান্ত-ভালোমানুষ, একটা বিশ্রী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে যন্ত্রণায় ভুগছেন।

মীরাকে দেখা গেল ফুলবাগানের ভিতরে। গায়ে ওর নীল কোটটা। আমি এখনও মানুষটিকে খেয়াল করে যাচ্ছি। উনিও আন্দাজ করেছেন আমিও মীরার জন্য অপেক্ষা করছি। লোকটিকে তার বয়সের চেয়ে বৃদ্ধ, অপেক্ষাকৃত কুঁজো দেখাচ্ছে। হয়তো বেঢপ সাইজের ওভারকোট পরার জন্যে, মনে হচ্ছে কুঁকড়ে গেছেন।

মীরা আমার হাত স্পর্শ করল। দুঃখের বিষণ্ণতা চিরে একঝলক আনন্দের আলো ছড়িয়ে গেল তার চোখে। ও নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে, আমি ওর জন্য আশার আলো বয়ে এনেছি।

—আমার বাবাও এসেছেন।

সে কোমল কণ্ঠে উচ্চারণ করল। লজ্জামাখা পায়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। আবেগে থর থর করে কেঁপে ওঠা করুণ গলায় তিনি বললেন—খুকি, মা আমার, কাছে আয়।

আমি মীরার পিছনে, একটু দূরত্ব রেখেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু মীরা ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। বাবাকে বলল—বাবা, এ আমার একজন কলেজের বন্ধু।

আমরা করমর্দন করলাম। তিনি তার ছোট্ট চোখদুটো তুলে সোজা আমার দিকে

তাকালেন। যেন জিজ্ঞেস করলেন—এই কি সে?

কিন্তু সে আঁখিদ্বয় একজন নিয়তিশয় দয়ার্দ্র মানুষের। হস্টেল পেছনে ফেলে আমরা তিনজন স্মিতপদে হাঁটতে লাগলাম। গুচ্ছ গুচ্ছ প্রশ্নের তীক্ষ্ণবিদ্ধতা আমার ভিতরে। আমরা কোথায় যাচ্ছি? এদের সঙ্গে আমি এখন কী করছি? মীরার বাবাকে আমার কী বলা উচিত? সেই তারা—কলেজে এই মানুষটিকে কি শুনিয়েছিল? কেমন করে জানব? আমার যে এখন মীরাকে একা দরকার, কী করি? ভীষণ দরকার। কিন্তু মেয়েকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ঠিক হবে কি?

তিনি ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—খোকা, তুমি থাকো কোথায়?

—তিরানায়। মা বাবা অবশ্য কোরকার মানুষ। স্বাধীনতার পর পর তিরানায় বাড়ি করেছেন।

—সত্যি! তোমার বাবার নাম কী?

—ডেমোসটেন রফি।

—ও তাহলে তুমি ডেমোসটেনের ছেলে?

—আপনি আমার বাবাকে চেনেন!

—চিনি বৈকি, যুদ্ধের সময় আমরা একই ব্যাটেলিয়নে ছিলাম যে। হ্যাঁ, ডেমোসটেন। আমি চিনি।

ঠোঁটের কোণে হাসলাম। ভ্রূ কুঁচকে এল। তাহলে মীরার বাবা আমার বাবাকে চেনেন। পরক্ষণেই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কখন, কিভাবে মানুষ ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে ঝড়ের মধ্যে পড়ে যায়!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী ভাল, ডেমোসটেন, আহা, একবার আমরা একসাথে আহত হই। একই গরুর গাড়িতে আমাদের বয়ে আনা হয় একটা দলীয় হাসপাতালে। একই ডাক্তার আমাদের দুজনকে দেখাশোনা করেন। কিন্তু আমাকে দ্যাখো! ও, হ্যাঁ, ডাক্তার কারাকুলি—কী ভাল ডাক্তার। কে জানে এখন কোথায়! বললাম, জানি, তিনি তিরানায় আছেন।

—আর ডেমোসটেন কেমন আছে? ... আমি তো বুড়ো বনে গেছি।

—ধন্যবাদ, তিনি ভাল আছেন। তিনিও বুড়ো হয়েছেন।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি তাহলে ডেমোসটনের ছেলে। তোমার বাবাকে আমার কথা বলো। বলো টেকডোকো তাকে অন্তরতম শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। সেই টেকডোকো, যার সাথে আহত হয়েছিল। একসাথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তার কারাকুলি আমাদের দু'জনকে সুস্থ করেছিলেন।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, আমার বাবা যুদ্ধ করেছেন, আহত হয়েছেন, টেকডোকের সঙ্গে। এই ঘটনাটাই আমাকে বেশি নাড়া দিল। অথচ আমার বাবা এই মানুষটার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে একসংগে যুদ্ধ করেছেন, একসঙ্গে আহত হয়েছেন, একই গরুর গাড়ির মধ্যে পাশাপাশি দুজন শুয়ে দুলতে দুলতে গিয়েছেন। আজ আমার বাবা তার চেয়ে বেশি ক্ষতবিক্ষত করেছেন সহযোদ্ধাকে, যতখানি করেছিল শত্রুরা ... কী ভয়ংকর!

আমার অন্তর-কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। পিছিয়ে পড়া বৃদ্ধ মানুষটি কেবলই নিজেকে দ্রুততর করছেন মেয়েকে ধরার জন্য। চতুর্দিকে ফেব্রুয়ারি মাসের শীত নেমেছে জাঁকিয়ে।

আমি বললাম—মীরা তোমরা কোথায় যাচ্ছো?

—বাবা এক পুরোনো বন্ধুর বাড়ি যাবেন। আমি কিছুটা পথ এগিয়ে দিচ্ছি।

টেকডোকো বললেন—আমি যাচ্ছি, মেয়েটার প্রেমের ব্যাপারে কী হলো—জানতে। আমার এক বন্ধুকে বলব, কলেজে এ ব্যাপারটায় কিছু একটা করার জন্য। আমি বলব, মেয়েটা কিছুই অন্যায় করেনি। সে তার পড়াশুনা খুব ভালভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা যা বলছে আমি বিশ্বাস করি না। আমি একটু সেকেলে হতে পারি, কিন্তু ওদের বিশ্বাস করিনা। ওরা বলছিল—মেয়েটা নষ্ট মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তারপর আমি চিৎকার করে উঠলাম—কে বলেছে?

নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। বৃদ্ধ মানুষটি চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। ভেবেছেন সাংঘাতিক খারাপ কিছু। মীরাও দাঁড়িয়ে গেছে।

—ঐ যে নামটা ভুলে যাচ্ছি ... প্রিন্সিপালের অফিসে ... কে যেন একজন মীরা নির্বিকার বলল—কমরেড দারগাতা। বৃদ্ধ বললেন—হ্যাঁ, দারগাতা ঘৃণায় আমার গলা বেয়ে বেরিয়ে এল—উঃ এইসব কেলেঙ্কারি!

—তুমি কি এসব সত্যি ভাবছ? দ্যাখো, আমার মেয়ে কিন্তু ভাবে না আমি বলছি ওসব গুজব।

তিনি তার মেয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তার চোখে দেখলাম এক ঝলক আশার আলো। এ আলো আগে দেখিনি। পাণ্ডুর হেসে তিনি মাথা দোলালেন। আরও বললেন—হ্যাঁ, কিছু লোক গুজব ছড়ায়, কিছু লোক মনে করে।

বৃদ্ধের প্রতি আমার উষ্ণ সহানুভূতি অনুভব করলাম। মেয়ের প্রতি অপূর্ব এই বিশ্বাস। সুন্দর এই একাত্মতা। আমি ভেবেছিলাম, একজন বদরাগী বৃদ্ধ, কমরেড দারগাতের সামনে মেয়ের চুল টেনে, মেরে শাস্তি দিতে এসেছেন। কিন্তু তিনি মেয়েকে কোনো দোষ দিলেন না। বকলেন না শুধু বললেন—ওরা বলে।

—সে নাকি নষ্ট মেয়েদের সাথে যোগাযোগ রাখে।

আমরা কিছুক্ষণ বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকলাম। টেকডোকো মীরাকে হস্টেলে ফিরে যেতে বললেন। তিনি একাই তার বন্ধুর কাছে যাবেন। মীরা আমার দিকে তাকাল। তারপর বাবার দিকে ফিরে বলল—তুমি কি রাতে হোটেলে থাকবে, না বন্ধুর ওখানে?

—আমার মনে হয় না, নাসি হোটেলে ফিরতে দেবে। আমি নাসির কাছেই থাকব। বলে, তিনি বাসে উঠে পড়লেন। যতদুর বাসখানা দেখা যায় আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। ধূসর আকাশে ছড়ান হিম। বাতাসে তুষারের গন্ধ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মীরা বলল—হতভাগ্য পিতা।

মীরা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। যেন শীতে পেয়েছে। মৃদু, স্থিরগলায় বলে উঠলো,

—আশ্চর্য। অবিশ্বাস্য! প্রিন্সিপালের অফিসে আমার নামে সমন জারি হয়েছে। ওখানে কমরেড দারগাতা বলেছেন—আমি একটা নষ্ট মেয়ে। আমার জন্য তুমি পড়াশুনো জলাঞ্জলি দিয়েছ। একজন নেতৃত্বকারী ক্যাডার তৈরির পথে আমি বাধা। তিনি আরও বলেছেন—কিছু নষ্টমেয়েদের আমি কলেজে ঢুকিয়েছি, ওদের সঙ্গে কলেজের ছেলেদের নিয়ে নির্লজ্জ ব্যবহার করেছি। এজন্যে সবার সামনে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। দেয়াল পত্রিকায় আত্মসমালোচনা করে একটা লেখা লিখে অঙ্গীকার করতে হবে, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যদি আমি না করি আমাকে কলেজ থেকে এক্সপেলড করা হবে। তিনি আমার বাবাকেও নোটিশ জারি করে জানিয়েছেন। অবশ্য আমাকে যা বলা হয়েছে সেটাই সবকিছু নয়। সবাই গোল করে ঘিরে তাকে আক্রমণ করেছে। আমি রাগে, ঘৃণায় অপমানে সেই মুহূর্তে সেখানেই অস্বীকার করেছি।

মীরার ঠোঁট কাঁপছে। কান্নার সমস্ত আবেগ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জিজ্ঞেস করলাম—দেওয়ালপত্রিকায় অঙ্গীকার লিখলে না?

মীরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

—কমরেড দারগাতা যে কুৎসিত অভিযোগ এনেছেন সে কি আমি মেনে নিতে পারি? আর্থার, তুমি কী করে ভাবতে পারলে?

আমি ওর বাহু দুটো চেপে ধরলাম। নিয়ে এলাম বুকের কাছে।

বললাম—তুমি ঠিকই করেছ মীরা। কেন লিখবে? যে সব অভিযোগের কোনো মাটি নেই, যত বড় সুযোগই হোক, যে খুশি নিক, আমি আত্মসমর্পণ করতে চাই না, মীরা তুমি ভেবো না।

আমি মীরার চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। আমার বুকের মধ্যে শব্দহীন মীরা হৃদয়ের ভার মুক্ত করে আঁকড়ে রইল অনেকক্ষণ। —আর্থার, আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু না বলেও পারছি না, কমরেড ডেমোসটেন কি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন?

আমার ডানদিকের কাঁধ আপনা থেকেই শক্ত হয়ে এল। কথাগুলো যেন চাবুক চালিয়ে

গেল আমার উপর দিয়ে।

—তোমার এ সমস্ত ভাবা ঠিক নয়, মীরা চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখো, মানসম্মানের সঙ্গেই ঠিক হয়ে যাবে।

কোনকিছুই না ভেবে বলে দিলাম। যে যার ভাবনায় আত্মমগ্ন আমরা হাঁটছি, এই সেদিনও নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। কলেজ ছাড়ার সমস্যা। কিন্তু এখন, আরও শক্ত আরও জটিল সমস্যায় জড়িয়ে গেলাম, সমস্ত সমস্যাটাই আমার কলেজ ছাড়ার সিদ্ধান্ত থেকে শুরু হয়েছে। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূলে আমার বাবা। অন্ধকার হয়ে এল। ফেরার পালা, মীরা হস্টেলে, আমি বাড়ি।

৮

বাবা বই পড়ছেন। রান্না ঘরের হেলান চেয়ারে শুয়ে। পরনে পাজামা, চোখে চশমা। ভিতরে ঢুকলাম। বাবা চোখ তুলে একবার দেখে নিলেন। মা বললেন—বারহান আবার এসেছিল।

কিছু বললাম না। হাতের উপর মাথা রেখে টেবিলে বসে পড়লাম। মাথার যন্ত্রণায় ভুগছিলাম।

—কোথায় ছিলি তুই? মা জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম—বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বাবা কিছু বললেন না। শোয়া অবস্থায় বাবাকে দেখছি আর মীরার বাবার কথা ভাবছি। তারা হাসপাতালে পাশাপাশি শুয়ে আছেন। আমার বাবা একজন দেশপ্রেমিক, যোদ্ধা, কল্পনা করতে চেষ্টা করছিলাম। বর্ষার স্যাঁৎসেতে আবহাওয়া এখন। বাবা তার পুরোনো ক্ষতের ব্যথায় কাতরে উঠবেন।

—টেকডোকো তোমাকে 'অন্তরতম শুভেচ্ছা' পাঠিয়েছেন।

আমি এই অভাবিত সংবাদ হঠাৎ বলে ফেললাম। তিনি শোনেন নি। সুতরাং আমাকে ফের বলতে হল—টেকডোকো।

—এ্যাঁ!

আবার বললাম—হ্যাঁ, টেকডোকো।

বাবা বই ফেলে দিলেন পাশে। নড়েচড়ে বসলেন। তারপর উঠে বসলেন, শেষপর্যন্ত কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন ভাবতে ভাবতে।

—টেকডোকো? নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

তার সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন।

—হঠাৎই তাঁর সঙ্গে দেখা হল। তাঁর কথা তোমাকে বলতে বললেন। তোমরা একসঙ্গে সৈনিকদের হাসপাতালে ছিলে।

—ওঃ হো! বটে! আমরা একইদিনে আহত হই। একই পরিখায় পড়ে ছিলাম। জার্মান আর ব্যালিস্টরা এক নাগাড়ে আমাদের দিকে গুলি চালাচ্ছিল। একটা মর্টার শেল আমাদের কাছে পড়ে। আমরা দু'জনেই আহত হই। টেকডোকো একজন ভীষণ যোদ্ধা। ভয়ংকর সাহসী। তা—প্রায়... পঁচিশ বছর... হতে চলল। হ্যাঁ সে ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠমনের বন্ধু। তুমি তাকে আসতে বললে না কেন? আমরা পুরোনো সেই সব দিনের কথা ফিরিয়ে আনতে পারতাম। বলতে বলতে বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উদার হয়ে এল মুখের অভিব্যক্তি। একটা পেনসিল নিয়ে টেবিলে খেলা করছিলাম, আর ভাবছিলাম।

বাবা ফের বললেন—তুমি তাকে নিমন্ত্রণ করতে পারতে।

আমি আস্তে মাথা তুললাম এবং বাবার চোখের দিকে সোজা চোখ রেখে তাকালাম। তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন আমরা পরস্পরকে বুঝে নিচ্ছিলাম।

তার চোখের থেকে চোখ না সরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কি নিমন্ত্রণ করা উচিত হতো? আমি করতে পারতাম না, বাবা নিমন্ত্রণ করতে আমার লজ্জা হলো।

লক্ষ্য করলাম, তার নাকের দুপাশের পেশি কুঁচকে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। —লজ্জা! ছিঃ! কী বলছ আর্থার?

হ্যাঁ, বাবা লজ্জা। তুমি টেকডোকোকে ক্ষতবিক্ষত করেছ।

—তুমি বোকার মতো কথা বলছ। আমরা দু'জনে একই শেলের আঘাতে বিক্ষত হয়েছিলাম।

—টেকডোকো হচ্ছেন মীরার বাবা।

বাবা উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। তিনি মাথার চুলে হাত ঢুকিয়ে টানতে লাগলেন। তারপর হাত নামিয়ে মুছতে লাগলেন কপালের ঘাম। আমি নিঃশব্দে তাকে লক্ষ্য করে গেলাম। তার উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছিল। আর ঘামের ফোঁটা ক্রমাগত বড় হচ্ছিল। তিনি ধীরে ধীরে হেলান-চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর রক্তিম মুখমণ্ডল ক্রমাগত ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। মা মীরার কথা কিছুই জানেন না। আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন। বাবাকে উত্তেজিত করার জন্য নিঃশব্দে আমাকে বকলেন। তারপর উঠে এলেন বাবার কাছে। হাত রাখলেন কাঁধে।

বললেন—ডেমোস শুয়ে পড়। ভাল লাগবে।

আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন—বাবাকে একটু একা থাকতে দিবিনে? সব

সময় তোর ঝগড়া।

শান্ত গলায় বললাম—আমি ঝগড়া করছিনা মা।

—ঠান্ডা কথা মানুষকে বেশি আঘাত দেয়, জানিস?

বাবা ফের উঠে পড়লেন। খুলে ফেললেন শোয়ার ঘরের দরজা। আঘাত যন্ত্রণা জর্জরিত মুখখানা তুলে একবার আমার দিকে তাকালেন। তারপর পিছন ফিরেই বন্ধ করলেন ঘরের দরজা। মা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

রান্নাঘরের ঘড়িটা অন্যদিনের চেয়ে বেশি জোরে শব্দ করছে। টেবিলে বসে আছি। গুণে যাচ্ছি ঘড়ির—টিক টিক। ঘরের ভিতর থেকে ভেসে এল বাবার অনুশোচনা। মিশ্রিত আর্তস্বর। ফুঁপিয়ে কান্নার হাহাকার। দীর্ঘশ্বাস। তারপর শুনতে পেলাম মায়ের ফিস ফিস গুঞ্জন—ওঃ ... আঃ ইস্। কেবল ঘড়ি আমার সাথে কথা বলে যাচ্ছে—টিক্—টিক্—টিক্—টিক্—সেতো আর কিছু জানে না।

প্রথম

গল্পসংকলন

তাপস গুপ্ত



শিল্পনগরী প্রকাশনী
ISBN 978-93-84383-28-2

৩০০ টাকা

ISBN 978-93-84383-28-2



সে খুব কম কথা নয়। বরং যথেষ্ট বিস্ময়ের। সেই কোন ১৯৭৮-র প্রারম্ভ বা মধ্যকাল। বনগাঁবাসী সাধন দাস ওরফে তাপস গুপ্ত চাকরিসূত্রে এসে নোঙর ফেললেন বহরমপুরে। সূচনা-যৌবনের সজ্জন বিনয়ী এবং একাধারে কবি সাধন, কোন প্ররোচনায় কিভাবে যে তাঁর চরিত্রের উল্টোপন্থী এবং প্রবল আগ্রাসী ‘রৌরব’ পত্রিকাগোষ্ঠীর ভেতর মুহূর্তে সিঁধিয়ে গেলেন, সে ছিলো যথেষ্ট ধন্দের। কবিতাই তাঁর প্রথম প্রেম, প্রথম যৌব-অবলম্বন। তো যথারীতি রৌরবের পৃষ্ঠায় উৎকলিত হতে থাকলো তাঁর কবিতার পরিক্রমণ। এবং অচিরেই তিনি রৌরবের অন্যতম প্রধান কুশীলব। রৌরবে তখন গল্প লেখকের ভীষণ অভাব। কবিতার দরজায় শেকল তুলে সদ্য আবুল বাশার ফিরেছেন গল্পে। অতঃপর সাধন দাস ওরফে তাপস গুপ্তও গল্পে ফিরলেন এবং সেই শুরু তাঁর গদ্যযাত্রা। রৌববের বাইরে প্রায়-অলক্ষ্য তাপসের সেই নিভৃত, কোন অতীতের গল্পযাত্রা, অর্থাৎ ১৯৮০-র ধূসর প্রান্ত থেকে ২০১০-র এক বিপুল কালখণ্ড, আজ এই মুহূর্তে একমলাটবন্দি, আমাদের হাতে।

তাপসের বাল্যকৈশোর এবং প্রাক-যৌবনের ক্রম-পরিবর্তমান ইছামতী, তীরবর্তী জনপদ, গ্রামদেশ, বনবাদার লোকস্মৃতি আর কাহিনিকথনের অনুপুঙ্খে ধাবিত মমতাজর্জর অন্তরের ক্ষুভিত-সন্ধানই তাঁর মানসভূমির প্রারম্ভিক আঁতুর। এবং যা পরবর্তীকালে পেশা ও বহরমপুরে স্থায়ী বসবাসের কারণে মুর্শিদাবাদের শহর গ্রামগঞ্জ এবং তার স্থানিক বৈচিত্র– এই দ্বিবিধ রসায়নে নির্মিত তাঁর গল্পের ক্রান্তিকালের চিত্রপট। খুব সংগোপনেই তিনি তাঁর হস্তচালিত তাঁত থেকে বুনন করে গেলেন দীর্ঘ ত্রিশ বছরের বর্ণবিপুল সম্ভার। যা এই ঈর্ষণীয় আয়তনের গল্পসংকলন হিসেবে আমাদের প্রতি উৎসর্জিত হলো।

উপরন্তু যা লক্ষ্যণীয়, তাপস তাঁর গল্পে কেবল আপামর মানুষ প্রকৃতি বা বিচিত্র রসরুচির নানান সংঘট্ট, অন্তবর্তী সখ্য-সংঘাত বা ভাষাবিবিধতার মুসাবিদায়-মাত্র নমিত বা উদ্বেল থাকেননি। বরং নির্মাণের শৈলী, নিরীক্ষা, ভাষা ও গঠনগত স্তরে তাঁর মেধামননশ্রম সমেত এক আয়াসসাধ্য পরিক্রমায় আদ্যন্ত লিপ্ত থেকেছেন। যা তাঁর গদ্যকে দিয়েছে তাঁরই নিজস্ব ভুবনের মাধুর্য ও রূপাধার। প্রকৃত শিল্পীর কাছে একজন অনুভবী পাঠকের যা শেষপর্যন্ত কাম্য। এই সংকলন শেষঅব্দি সত্যিকারের পাঠকলালিত হোক বন্ধুহিসেবে এইমাত্র অভিলাষ।

সমীরণ ঘোষ